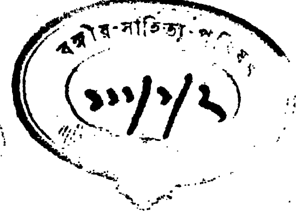


শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



সুবোধিনী।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালিদাস মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড } বৈশাখ—১২৯৮। { প্রথম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

ভৈরব—একতালা।

নারায়ণ হৃষীকেশ কেশব অচ্যুত হরি।
জনার্দ্দন পদ্মনাভ, মাধব মুরারি॥
নবীন নীরদ শ্যাম, নীলতনু অভিরাম,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধারী।
হৃদয়-মণ্ডল-বাসী, সরসিজাসনে বসি,
উজারি' দশ দিশি অচিন্ত্য-বিহারী;
কনক কেয়ূর করে, কুণ্ডল কর্ণ-পূরে,
পূরট কিরীট শিরে, কিরণ-বিথারী।
গায়ত্রীর উপলক্ষ, ভক্তের ভজন লক্ষ্য,
বিশ্ববীজ, বিশ্বপ্রাণ বিপদ-কাণ্ডারী;
রাস-রসিক-বর, নটবর রাসেশ্বর,
আনন্দ-কন্দর ত্বংহি সুন্দর, শৌরী।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।



সূচনা।

বলিতে হইবে আজ আমাদের আনন্দের দিন। বিস্তীর্ণ সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে, অতি নিভৃত স্থানে, একটি ক্ষুদ্র সাধের লতা-মণ্ডপ রচনা করিয়া, এই শ্রান্ত অন্তঃকরণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য, শান্তি পাইবার আশয়ে, স্নিগ্ধ হইবার অভিলাষে, প্রাণের পরিতৃপ্তি লাভের বাসনায়, যে বীজ রোপন করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন-বারি-সিঞ্চনে সেই বীজ হইতে অঙ্কুরিতা লতা কাল-ক্রমে পল্লবিতা—কুসুমিতা হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিকিরণ-পূর্ব্বক আমাদের প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে। এক বৎসর কাল আন্তরিক প্রয়াসে, প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে, প্রাণপণ পরিশ্রমে, উৎসাহিতচিত্তে যে "সুবোধিনী"র স্থায়িত্ব-কামনার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম, আজ সেই "সুবোধিনী" গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে, জগদীশ্বরের কৃপায়, আমাদের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিয়া, দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে;—তাই বলি, আজ-আমাদের মত সুখী কে?

এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের শিক্ষিত বঙ্গনিবাসী—যাঁহাদের নিকট মাতৃভাষার আদৌ আদর নাই,—যাঁহারা বিদেশী-প্রেমে উন্মত্ত, বিজাতীয় ভাষায় প্রাণ মন সমর্পণ করাই যাঁহাদের জীবনের অনন্যগতি, যাঁহাদের মস্তিষ্ক বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ, যাঁহারা স্বীয় অন্তরের ভাব প্রকাশ করিবার সময়ে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে পত্রাদি লিখিবার কালে, বিজাতীয় ভাষা ভিন্ন মাতৃভাষা প্রয়োগ করিতে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন, বঙ্গভাষায় পরিচালিত পত্রিকা প্রভৃতিকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া অনর্থক অর্থ-নাশ ভাবিয়া পদে পদে হতাদর করিয়া থাকেন,—এমনি বিড়ম্বনা,—এ হেন বঙ্গদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া এ হেন বঙ্গনিবাসীর আশায় আশ্বাসিত হইয়া, মাতৃভাষার সেবার জন্য—দুর্ব্বল আমরা,—আমরা যে এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সফল-প্রযত্ন হইয়াছি,—তখন আমাদের মত সৌভাগ্যশালী কে?

আমরা দুর্ব্বল,—আমাদের সামর্থ্য নাই, অর্থ নাই, প্রতিপত্তি নাই। দুর্জ্জনের ভ্রূকুটি-

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের

ভ্রাতা

শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত

ও

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট ৩২নং ভবন হইতে

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বৎসর

দ্বিতীয় খণ্ড—সন ১২৯৮ সাল।

কলিকাতা।

৩নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

সুবোধিনী-সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত।

"SUBODHINI"—A monthly magazine in Bengali, Unlike other Bengali magazines which are not very particular in point of regularity this periodical has been very steadily coming out every month, and we are glad to state that we have in hand the complete set for the Bengali year ending Chaitra last. We note its decided improvement every month. Some of the articles and poems of the last 3 issues are excellent. We wish it a long life and every success——PEOPLE, May 9 1891.

"SUBODHINI"—Is the name of a Bengali periodical that I have received for review. It is a smartly written paper, but there is some room for improvement——INDIAN PLANTER'S GAZETTE, June 3 1891.

SUBODHINI—This is a monthly magazine in Bengali, started by the late Babu Kalidas Mitra and now conducted by his brother Babu Bholanath Mitra. The tone of the paper is thoroughly Hindu; and subjects concerning diverse regions of thought are very ably handed. It is expected, therefore, that the magazine, which is in its second year of existence, will grow more and more in favour with the Bengali reading public.——AMRITA BAZAR PATRIKA April 12, 1892.

সুবোধিনী—শ্রাবণ মাসের সুবোধিনী আমরা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের ভ্রাতা শ্রীভোলানাথ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। সুবোধিনীর গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই সরস ও ভাবব্যঞ্জক। উপন্যাসের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল ও অতিরঞ্জন দোষ বিবর্জ্জিত। জনৈক খৃষ্টীয়ান তনয় কৃত বাইবেল সমালোচনাটীও অতি পরিপাটী। ফলতঃ, এরূপ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মাসিকপত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

—বঙ্গনিবাসী ২৬এ ভাদ্র, ১২৯৮।

সুবোধিনী—মাসিক পত্র শ্রীভোলানাথ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র মাসের) সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুবোধিনীর ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, প্রবন্ধগুলি পাঠের উপযুক্ত। মোটের উপর ইহা সাধারণের উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, আশ্বিন, ২য় সংখ্যা।

সুবোধিনী—(মাসিক-পত্রিকা)। দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ হইল এখন এ পত্রিকায় সমালোচনায় সাহস করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারি। "দোলযাত্রা" প্রবন্ধে বেশ একটু ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গেল। দোলের আধ্যাত্মিক ব্যাখা অতি পরিপাটী। "দার্জ্জিলিঙ্ ভ্রমণ কারীর পত্র" প্রস্তাবটিও মন্দ হয় নাই। 'পাষণ্ড দলনে' বাস্তবিকই পাষণ্ডগণের দলন হইয়াছে। তাহার দুই একটী পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।——নবযুগ, ২৮ই বৈশাখ, ১২৯৮।

সুবোধিনী।—এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ১২৯৮ বৈশাখ আমরা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম—ইহার লেখার বেশ ভাবুকতা আছে। গবেষণারও গভীর উচ্ছ্বাস আছে। ভাষার উদ্বোধিনী শক্তি আছে। স্থানে স্থানে সম্পাদকের ধর্ম্মানুরাগ অধ্যবসায়ের চিহ্ন আছে। তবে পত্রিকার পরিমাণ অনুসারে লিখিত "বিষয়"বড় বেশী হইয়াছে। ইহার দীর্ঘ জীবন আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দিনাজপুর পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

সুবোধিনী নাম্নী মাসিক পত্রিকা আমরা নিয়মিত পাইতেছি। এই মাসিক পত্রিকা খানি দুই বৎসরে পদার্পণ করিল। উপযুক্ত লেখকগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মাসিক পত্রিকা-মহলে যেরূপ জন্ম মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব- তাহাতে সুবোধিনী আজিও জীবিত আছে, ইহাতেই ইহার কার্য্য তৎপরতার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

—কাশীপুর নিবাসী, আষাঢ়, ১২৯৮।

সুবোধিনী।—মাসিক পত্রিকা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র; আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি। সাহিত্যের আলোচনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হইল, কাগজ খানিতে নবীন ও প্রবীণ অনেকগুলি সুলেখকের লেখা থাকে। ইহার ছাপা কাগজটিও ভাল। পত্রিকাখানি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।——চিত্রদর্শন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের "সুবোধিনী" মদগ্রজ ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। বিগত আষাঢ় মাসে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর আমি ইহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয় ধার্য্য হওয়াতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি অধিকাংশ গ্রাহকদিগের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের করাল গতিতে তিনি গ্রাহকদিগকে সন্তুষ্ট না করিতে করিতে ইহ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইলেন। আমি যে নিতান্ত অক্ষম হইয়া এক বৎসরের পুস্তক গ্রাহকদিগকে দিতে সক্ষম হইব, তাহা স্বপ্নেও আশা করি নাই; কিন্তু অদ্য আমার কি পরম সৌভাগ্য যে, জ্যেষ্ঠের গুরুভার যেমন স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলাম, অদ্য তদ্রূপ গ্রাহকদিগকে স্বীয় স্বীয় প্রেরিত মূল্যের ঋণ শোধ করিলাম।

"সুবোধিনী" এক্ষণে কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল। ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার চালাইতে মনে মনে আশা রহিল। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যদ্যপি কেহ জুয়াচুরী পূর্ব্বক "সুবোধিনী" নাম দিয়া মাসিক পত্রিকা চালাইতে সাহস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিষম গোলমালে পড়িতে হইবে। আমাদের পুস্তক রেজেষ্টারী কি না তাহা আমরা কাহাকেও বলিতে ও জানাইতে বাধ্য নহি কিন্তু এই মাত্র সকলকে বলিয়া রাখিলাম যে, যদ্যপি কেহ আমাদের অগোচরে ও বিনা অনুমতিতে "সুবোধিনী" নাম দিয়া কোন সাপ্তাহিক পাক্ষিক কিম্বা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে বিস্তর বেগ পাইতে হইবে। ইতি চৈত্র ১২৯৮।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।
সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।)

শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—সন ১২৯৮ সাল।

সূচীপত্র।

(গদ্য।)

(পদ্য।)

* প্রহেলিকার উত্তর——(১) সিঁদ, (২) মাস

(সঙ্গীত।)

ভঙ্গিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিঃসহায় আমরা, আমরা যে, সাহিত্যানুরাগী স্বধর্ম্ম-প্রিয় সহৃদয় হিন্দু সন্তান মাত্রেরই সহানুভূতি স্বল্প কালের মধ্যে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি,—ইহা মনে করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা জানি জ্ঞানোন্নতির জন্য, সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য, শাস্ত্র-সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত লুক্কায়িত রত্ন রাজি প্রকাশের জন্য, সর্ব্ব সাধারণের সুশিক্ষার জন্য, নব্য লেখক ও ভাবুক-বৃন্দের মানসোত্থিত অভিনব তত্ত্ব-সমূহ সহজে প্রকাশ ও জন সমাজে প্রচার জন্য, সাময়িক পত্রের ন্যায় প্রশস্ত পথ আর নাই। আমাদের স্থির বিশ্বাস—আমরা যখন এই পবিত্র ভারতে, হিন্দুর আবাস-স্থান হিন্দু-স্থানে, জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যের বলে, পবিত্র হিন্দুর-গৃহে মানব-জন্ম লাভ করিয়াছি, তখন, হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, যে কোন পথ অবলম্বন করি না কেন, তাহাতে যে সিদ্ধকাম হইব, তাহা অবশ্যম্ভাবী। আমরা স্থির জানি যে,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। হিন্দুর এই তেজঃপুঞ্জ বাক্য পরম সত্য; এই জন্য বলি অবোধ হিন্দু-সন্তানদিগকে স্বধর্ম্মে অটল রাখিবার জন্য, পর ধর্ম্মের ভয়াবহ প্রজ্জ্বলিত নরককুণ্ডের প্রলোভনপূর্ণ দ্বার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা পাষণ্ডদিগের দলনের জন্য, আমরা সত্যের অনুরোধ রক্ষা করিতে কখনই বিরত থাকিতে পারি না।

আমরা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এই ম্লেচ্ছ-প্রপীড়িত রাজ্যে, সাধ্যমত হিন্দুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মাসিক পত্রিকা-পরিচালন-রূপ গুরুভার গ্রহণ করিয়াও, এক দিনের জন্যও ভাবি নাই যে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইব।

আমরা জানিতাম যখন বঙ্গ-দর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার,—প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ মাসিক পত্র সকল, প্রতিভাসম্পন্ন লেখক মহোদয়গণের সাহায্যে, সুযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াও নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে ও স্থায়িত্ব-লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের পরিচালিত মাসিক পত্রিকার উত্থানেই পতন—অনিবার্য্য। কিন্তু জানি না, কোন্ সুকৃতির ফলে আমাদের "সুবোধিনী" এক বৎসর কাল সুনিয়মে প্রকাশিতা হইয়া, সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠক-মণ্ডলীর নিকট সমাদৃতা হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্রের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণতম' উচ্ছাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি মাতৃভাষানুরাগী খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য লেখকগণের গভীর গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে আমাদের পত্রিকার অঙ্গ সুশোভিতা না হইয়াও যে, আমাদের "সুবোধিনী" 'যোগ্যতার সহিত সম্পাদিতা হইতেছে,'—ইহা শুনিলেও আমাদের হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়।

বঙ্গের সুসন্তান উক্ত লেখক মহোদয়-গণের দ্বারস্থ হইয়া, নিরুৎসাহিত চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া সময় নষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে, আমরা তাঁহাদিগকে আদর্শ রাখিয়া

তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, সাধ্যমত যত্নের সহিত প্রাণপণ পরিশ্রমে, সুনিয়মে প্রকাশ করিয়া, মাসিক পত্রিকার "মাসিক পত্রিকা" নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছি,—ইহাই আমাদের যথেষ্ট।

আজ কাল দেখিতে পাই, অনেক মাসিক পত্র, ভূত বা ভবিষ্যৎ কাল লইয়া দুই মাস তিন মাস কখন বা ছয় মাসের সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়। আমরা বলি এ সকল মাসিকপত্র "মাসিকপত্র"নামের কলঙ্ক-স্বরূপ; যদি তিন মাস অথবা ছয় মাসের পত্র একত্রে প্রকাশ হয়,তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপে "মাসিক পত্র" বলিব? আবার তাহাদিগকে ত্রৈমাসিক বা ষান্মাসিক পত্রও বলিতে পারি না; কারণ, তাঁহারা কখন মাসিক, কখন দ্বিমাসিক, কখন ত্রৈমাসিক, কখন ষান্মাসিক, কখন ঐহিক কখন বা পারলৌকিক মূর্ত্তি ধারণ করেন! অতএব, তাঁহাদিগকে "মাসিক পত্র" না বলিয়া, "সম্পাদকের ইচ্ছা ও সুবিধানুসারে প্রকাশ্য পত্র,"—বলাই কর্ত্তব্য। সুতরাং, এরূপ পত্রকে "মাসিক পত্র" নামাভিধেয় করা, আর গ্রাহকগণকে প্রবঞ্চনা করা আমাদের মতে একই কথা, এবং সেই জন্যই আমরা ইহার ঘোরতর বিরোধী।

আমাদের বিশ্বাস, যদি মাসিক-পত্রিকা, সুনিয়মে প্রকাশ করিতে পারা যায়, "সুবোধিনী" যদি মাসে মাসে এইরূপ সুনিয়মে প্রকাশিতা হয়,তাহা হইলে,কৃত-বিদ্য সহৃদয় মাতৃভাষানুরাগী সাহিত্য-সেবী হিন্দু-সন্তান মাত্রেই ইহার প্রতি মমতা প্রদর্শন করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না। "নবজীবন"-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি আমাদের এই বিশ্বাসকে আরও বদ্ধমূল করিয়াছে; আনন্দের সহিত জানাইতেছি, তিনি এই বৎসর হইতে আমাদের "সুবোধিনী"তে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বধর্ম্মে ভক্তি রাখিয়া সততা অবলম্বনই উন্নতির একমাত্র উপায়। বৃথা বাক্যাড়ম্বরে ও আত্মম্ভরিতায় সাধারণকে মন্ত্র-মুগ্ধ করা, স্বীয় স্থায়িত্ব-মূলে কুঠারাঘাত মাত্র। সৎপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে, অগ্রসর হওয়াই ভাবী উন্নতির মুখ্যতম উপায়। "সুবোধিনী" যে, ধীরে ধীরে উন্নতির পথে প্রধাবিতা হইতেছে, তাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি; সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠক মাত্রেই তাহা দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী সহযোগিগণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া, দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত দ্বিতীয় বৎসরের "সুবোধিনী"র উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলাম। গুরুদেবের কৃপায় আমরা যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি। তবে যদি আমরা কখন স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া সততা-ভ্রষ্ট হইয়া আমাদের দায়িত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে, আমাদের পতনও অনিবার্য্য।

সম্পাদক—

নববর্ষ।

পোহাইল মাধবের মধুরা যামিনী,
অস্তমিত শশধর—কাঁদে কুমুদিনী।
স্নান করি সিন্ধুনীরে,
কনক কলস শিরে,
ধীরে ধীরে এলো ঊষা
মরাল-গামিনী,
পবিত্র উজল বাসে ঝলকে দামিনী।

বহিছে দখিণানিল ঝুরু ঝুরু করি,
শ্রবণে ঢালিছে পাখী সুতান লহরী।
প্রসারি পল্লব-কর,
নাচে কিবা তরুবর,
নাচিছে সোহাগ ভরে
বিলোল বল্লরী;
কি সুখে ভাসিছে আজি আহা মরি মরি!

সুরভি কুসুমচয় ঢালে পরিমল,—
উথলে উল্লাস-ভরে তটিনীর জল,
বিবিধ পয়োদমালা,
কুতূহলে করে খেলা,
নাদিল সহস্র কম্বু
নীলাম্বু প্রবল;
গাহিছে কাহার আজি বিজয়-মঙ্গল?

নূতন বরষরাজ শুভ আগমন।
পেতেছে প্রকৃতি কিবা হরিত আসন!
শিশির-কণিকা-পাঁতি,
বিমল মুকুতা-ভাতি,
মরি কি মধুর শোভা
করেছে ধারণ!
নীল নভঃ-চন্দ্রাতপ—অদ্ভুত রচন।

এস, এস বর্ষরাজ! করি সম্ভাষণ;
বিস্তৃত তোমার তরে নব সিংহাসন।
থাক থাক মনোসুখে,
সতত প্রসন্ন মুখে,
অপত্য সমান প্রজা
করহ পালন;
হউক মঙ্গলময় তোমার শাসন।

নিদাঘের পরিমল, বরষার জল,
মাধবে মলয়ানিল,—শরতের ফল,
এ সব সম্পদ তব,
নিত্য কত অভিনব,
সুখদ শিশির রৌদ্র
কৌমুদী ধবল,
নাচিবে চপলা কভু উড়া'য়ে অঞ্চল।

এ সব সম্পদ লয়ে থাক মহাসুখে,
কাঁদে না তোমার প্রজা যেন মনোদুখে।
সতীর নয়ন-জল,
বহে না ধরণী-তল,
বিঁধে না দারুণ শেল
জননীর বুকে,
বিহরে সকলে যেন সদা হাসি-মুখে।

নানা শস্যে পূর্ণ কর ভারত-ভাণ্ডার,
হউক, ভারত-ক্ষেত্র সুখের আগার।
সজল জলদ-দল,
বরষি বিমল জল,
করুক্ ধরিত্রীহৃদে
জীবন সঞ্চার,
বহুক্ আনন্দ-নদী উল্লাসে অপার।

চারি দিকে বহিতেছে দুখের বাতাস,
অনাথ ভারতবাসী ফেলিছে নিশ্বাস।
চিরদিন কারাবাসে,
সতত তাড়নে ত্রাসে,
জনমের মত মোরা
হ'য়েছি হতাশ,
হৃদয়ে অনন্ত অমানিশার বিকাশ।

প্রফুল্ল নৃপতিনেত্র প্রজা-অশ্রুপাতে,
দলিত ভারত-বক্ষ পর-পদাঘাতে।
রাজনীতি অত্যাচারে,
তিলেক তিষ্ঠিতে নারে,
ভয়ার্ত্ত ভারত-বন্ধু,
দারুণ আঘাতে,
গ্রাসিল সুখের রবি গভীর নিশাতে।

নিয়ত পতন-ভয়ে প্রকম্পিত মন,
পতন ইহার চেয়ে আছে কি রাজন ?
আদরে লালিত হই,
জানি না আদর বই,
জানি না কাহারে বলে,—
দুখের রোদন,
এই কি ললাটে ছিল বিধির লিখন !

বলিতে—"ভাতরবাসী" উজ্জ্বল বদন,
শুনিয়ে ভারত-যশ জুড়ায় শ্রবণ।
এমন ভারতাকাশে,
ঢেকেছে ধূমল বাসে,
তাই ত জ্বলেছে আজি
শোকের দহন,
তাই ত ভারতবাসী চিন্তায় মগন।

স্বদেশ-সম্ভূত অন্নে সন্তোষ জীবন,
ধরি না পরের পদে ভিক্ষার কারণ।
আমাদের রীতি নীতি,
জগৎ জুড়িয়া দ্যুতি,
আমাদের বেদ বিধি,
শাস্ত্র-আলাপন।
দাঁড়া'ব কাহার কাছে বিনম্র বদন ?

চাহি না পরের ধন—পর আভরণ,
পরের মুকুতা মণি রতন কাঞ্চন;
আমাদের সব আছে,
যাইব কাহার কাছে
করিব কাহার কাছে
দুঃখের ক্রন্দন ?
মোরা যে ভারতবাসী—ভারত-নন্দন !

এবে সেই কুল-লক্ষ্মী হ'য়েছে চঞ্চল,
বহিছে ভারত-বক্ষে তপ্ত অশ্রু-জল।
আমরা কঠোর প্রাণী
মানি না মায়ের বাণী,
বাক্‌যুদ্ধ আমাদের
হ'য়েছে সম্বল,
শিখেছি বিদেশী কাছে বাক্যের কৌশল।

শুন ওহে নৃপবর ! করি নিবেদন,
বিপন্ন আমরা তব লইনু শরণ।
তোমার চরণ-তলে,
সকলে কাঁদিয়া বলে,—
সমদৃষ্টে কর দেব !
রাজ্যের শাসন।
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের দমন।

যদি হে অক্ষম তাহে—কাজ নাই আর,
ডুবুক প্রলয়-জলে ভারত-সংসার।
উঠিয়া দ্বাদশ রবি,
বিকাশি ভীষণ ছবি,

বিস্তার করুক্ রাজ্যে
বিপুল সংহার।
সহে না সহে না আর ঘোর অত্যাচার।

আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত মেঘে হউক বর্ষণ,
সজোরে বহুক ঊনপঞ্চাশ পবন,
বিরাট আঁধার-ছায়া,
ডুবাক্ ভারত-কায়া,
অচিরে নূতন সৃষ্টি
হউক সৃজন
ঘুচুক জন্মের মত দাসত্ব বন্ধন।
হায়েরে বলিনু কত হইয়ে বাচাল!
উন্মাদ রসনা তুমি হও রে সামাল।

চিরদিন এই ভবে
সমভাব নাহি রবে
সুখ দুঃখ চক্রসম
ঘোরে চিরকাল;
আবার হইবে সুখ—ঘুচিবে জঞ্জাল।

এস এস বর্ষরাজ! লহ সিংহাসন,
প্রাণপণে নিজ কার্য্য করহ সাধন।
অদৃষ্টে আছয়ে যাহা,
বিফল নহে ত তাহা,
অনন্ত—কালের কাণ্ড
কে করে বারণ?
কালেতে সৃজন, স্থিতি, কালেতে নিধন।

সম্পাদক—

মুরসিদ কুলি খাঁ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সকল সমাচার অবগত হইবামাত্র বাদশাহ আরঙ্গজেব নবাব আজিম উশ্‌শানকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন, ও বলিয়া পাঠাইলেন যে,—"বঙ্গ-সুবাদার যতই কেন তাঁহার আত্মীয় বা নিকট সম্পর্কীয় হউন না, যদি মুরসিদ কুলির উপর কোন অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তিনিও সমুচিত দণ্ডার্হ হইবেন।" বাদশাহ কেবল এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ আজিম উশ্‌শানকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বেহারে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিতে আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। নবাব, পিতামহের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব, দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বকীয় দ্বিতীয় পুত্র ফেরোক্সেরকে ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করতঃ জলযানে বেহার যাত্রা করিলেন ও রাজমহলে উপনীত হইয়া, সুলতান সুজার প্রাসাদে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু, অল্পকালমধ্যে তথাকার জলবায়ু তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে রাজমহল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া সপরিবারে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় পাটনায় প্রাসাদ

ও দুর্গ উত্তমরূপে নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল, এবং উক্ত নগর 'আজিমাবাদ' বলিয়া খ্যাত হইল।

এদিকে, মুরসিদ কুলি খাঁ মকসুদাবাদে নিজ বাসস্থান স্থাপিত করিয়া অধীনস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে তথায় সমবেত করিলেন ও সেই বৎসরের শেষভাগে রাজস্ব-সংক্রান্ত আয় ব্যয় বাদশাহের গোচর করিতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাদশাহ তখনও দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। অতএব দেওয়ান সেই স্থানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। বাদশাহ-সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও পারিষদবর্গকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন, ও বঙ্গদেশের রাজস্বের তৎকালীন অবস্থা জ্ঞাত করিলেন। বাদশাহ ইহার পরিবর্ত্তে পরম প্রীতিপূর্ব্বক দেওয়ানকে পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সহকারী নাজিম পদে নিযুক্ত করিলেন। আজিম উশ্শান এই সকল শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন বটে, কিন্তু, পিতামহের ভয়ে শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করিলেন না।

মুরসিদ কুলি খাঁ মকসুদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'নবাব' উপাধি ধারণ করিলেন ও উক্ত নগরের নাম 'মুরসিদাবাদ' বলিয়া প্রচার করিলেন। তথায় সুন্দর প্রাসাদ ও অন্যান্য রাজকার্য্যালয় স্থাপিত করিলেন। সেই অবধি মুরসিদাবাদ বঙ্গদেশের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইল।

এই ঘটনার পর, দুই তিন বৎসর অতীত হইলে, ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বাদশাহ আরঙ্গজেব গতাসু হইলেন। মুসলমানের চির-প্রথানুসারে দিল্লীর সিংহাসন-প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিগণ মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র-বিপ্লব-স্রোত প্রবাহিত হইল। বঙ্গদেশ হইতে আজিম উশ্শান, তাঁহার পিতা বাহাদুর সার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সুতরাং, এতদ্দেশের শাসনভার এক কালেই মুরসিদ কুলির হস্তে ন্যস্ত হইল। পুরাবৃত্ত পাঠক অবগত আছেন যে, পুত্রের সাহায্যে বাহাদুর সাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু অধিককাল রাজ্যশাসন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। পিতার শাসনকালে আজিম উশ্শান প্রায় দিল্লীতেই বাস করিতেন ও বাহাদুর সার মৃত্যুর পর, তিনি পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু কিয়ৎ কালের মধ্যেই ভ্রাতাগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

আজিম উশ্শান যদিও মুরসিদ কুলির উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তথাপি বঙ্গদেশে তাঁহার অনুপস্থিতি বশতঃ ও পিতার আজ্ঞা-ক্রমে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের উপর সমগ্র প্রদেশের শাসনভার সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আকবর সাহের সময় হইতে দেওয়ান্ ও নাজিমের পদ স্বতন্ত্র ছিল; কিন্তু অধুনা মুরসিদ কুলি এই দুই পদ একত্রে প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দেশে শাসনের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে যত্নবান হইলেন। পুরাতন অর্থলোভী ও অপটু কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় করিয়া তৎ-

পরিবর্ত্তে স্বীয় মনোনীত কার্য্যক্ষম লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

মুরসিদ কুলি যেরূপ সুদক্ষ ও সুনিপুণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, যদি প্রজাবর্গের প্রতি ভীষণ অত্যাচার-দোষে দূষিত না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু, নিজামত তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইবামাত্র তাঁহার অত্যাচারে লোকে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজস্বের নিমিত্ত প্রপীড়িত হইয়া হিন্দু জমীদারগণের কষ্টের অবধি রহিল না। বাদশাহের কর অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু মুরসিদ কুলির নাম এতদ্দেশে চিরদিন ঘৃণিত হইয়া রহিল। নূতন নাজিমের আজ্ঞায় ভূস্বামিগণ কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইল ও ভূমির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য উহাদের প্রাপ্য কর-সংগ্রহের ভার রাজসরকারের কর্ম্মচারীদিগের উপর নিহিত হইল; এবং উহাদ্বারা রাজকোষ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। জমীদারগণ ও ও তাহাদিগের পরিবারবর্গের নিমিত্ত মাসিক বৃত্তি ধার্য্য হইল। ইহাই 'ননকর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাহারও বা এতদ্ব্যতীত 'বনকর' ও 'জলকর' ছিল অর্থাৎ তাঁহারা অরণ্যে পশু শীকার ও বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পাইতেন এবং তাঁহাদের নদী তড়াগাদি হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও ছিল।

এইরূপে দেশের প্রায় সমস্ত ভূস্বামিগণ কারাবন্দী হইল। সুদূরে বঙ্গদেশের প্রান্তভাগবাসী জমিদার; মুরসিদ কুলির ভয়ে কম্পিত হইল। ত্রিপুরা, কুচবেহার ও ও আসামের রাজাগণ,—যাহাদের প্রাসাদশিখরে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা কখনও উড্ডীয়মান হয় নাই, তাহারাও ভীত হইয়া হস্তী প্রভৃতি বহুমূল্য উপঢৌকন নবাব সরকারে প্রেরণ করিতে লাগিল। মুরসিদ কুলির প্রতাপ এতদূর অপ্রতিহত ছিল যে, কেবল দ্বিসহস্র অশ্বারোহী ও চতুঃসহস্র পদাতিক সৈন্যে তিনি সমগ্র দেশের সম্যকরূপে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কদাচিৎ কোন প্রতাপশালী ভূস্বামী বিদ্রোহী হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইত। নতুবা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল ও নিয়মিত রূপে কর প্রদান করিতে ত্রুটি করিত না। নবাবের নাম এতদূর ভীতিপ্রদ ছিল যে, দেশ মধ্যে যেখানেই হউক না কেন, কেবলমাত্র একজন কর্ম্মচারী নির্ব্বিবাদে রাজস্ব সংগ্রহ করিত। তাহাকে দেখিয়া সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিত। সেই রাজ-দূতের আদেশে পিতৃপিতামহাগত ভূমিখণ্ড জমীদারদিগকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে পরিত্যাগ করিতে হইত এবং শত শত দস্যুর নায়ক দুরাত্মাগণও নির্ব্বিবাদে একজন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিত।

মুরসিদ কুলি খাঁ যেরূপ প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের কোনও যবনরাজা সেরূপ পারেন নাই। আলিবর্দ্দি খাঁ যতদূর সুচতুর শাসন কর্ত্তা থাকুন না কেন, নৃশংস সিরাজুদ্দৌলা যেরূপ ভয়ানক অত্যাচারে প্রজাদিগকে প্রপীড়িত করুন না কেন, মুরসিদ কুলির ন্যায় রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। দরবারে ওমরাহগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে এত

ভয় করিত যে, নবাবের অনুমতি বিনা পরস্পর অভিবাদন বা কথোপকথন করিতে সাহসী হইত না। কি রাজা কি প্রজা সকলকেই তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। নবাবের আজ্ঞাক্রমে হিন্দু জমীদার ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি শিবিকা আরোহণ করিতে পারিত না। তাহাদের জন্য ডুলি ব্যবস্থা ছিল।

রাজকার্য্য সম্বন্ধে মুরসিদ কুলি কোন কর্ম্মচারীর প্রতি পক্ষপাত করিতেন না। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্য্যে কেবল বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাই নিযুক্ত থাকিত। রাজসাহীর জমীদার রাজা উদয় নারায়ণ তন্মধ্যে একজন প্রধান। কিন্তু কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারই উপর নবাবের বিশ্বাস ছিল না,—তিনি প্রত্যহ স্বয়ং রাজ্যের আয় ব্যয় পর্য্যালোচনা করিতেন।

মুরসিদ কুলি খাঁ যেরূপ কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ ভূপতি ছিলেন, যদি হিন্দুদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-দোষে দূষিত না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার নাম ইতিহাসে সমাদৃত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সকলের অবগত হওয়া উচিত যে, উক্ত অত্যাচার নিমিত্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষী ছিলেন না। নাজির আহমেদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ নামক দুইজন তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী, এই নৃশংস ব্যবহারের মূল কারণ। জমীদারগণের করপ্রদানে বিলম্ব হইলে, নাজির আহমেদের আজ্ঞায় তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। সৈয়দ রেজা খাঁর অত্যাচার আরও ভয়ানক ছিল। সে সরকারী দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইবার পর, হিন্দুদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। উহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য রেজা খাঁর আজ্ঞায় এক পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল। উহা মলমূত্রাদি ও অন্যবিধ পূতিগন্ধযুক্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ স্থান হইতে এরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হইত যে, কেহ উহার নিকটে অগ্রসর হইতে পারিত না। হিন্দুদিগকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত ঐ পুষ্করিণী যবনদিগের দ্বারা 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত হইত।

দুর্বৃত্ত যবন, হিন্দু জমীদারগণকে নানাবিধ শাস্তি প্রদানের পর, রজ্জুদ্বারা হস্ত বন্ধন-পূর্ব্বক এই নরক-কুণ্ডে নিমজ্জিত করিত; ও পরে ঐ রজ্জু সহকারে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিত। কখনও বা তাহাদের পায়জামার ভিতর বিড়াল কুক্কুরাদি জন্তু প্রবেশ করাইয়া দিয়া আমোদ করিত। এইরূপে ভয়ানক অত্যাচারে পীড়ন করিয়া রাজস্ব-সংগ্রহ-ছলে হতভাগ্য জমীদারগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

এই রাজস্ব হইতে প্রায় দেড় কোটী মুদ্রা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই দিল্লীতে বাদশাহ-সমীপে প্রেরিত হইত। রাজকরের সহিত বাদশাহ ও ওমরাহদিগের নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি বহুমূল্য উপঢৌকনও প্রেরিত হইত। এইরূপে মুরসিদ কুলি বঙ্গদেশীয় ভূস্বামিগণের সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া বাদশাহ-সকাশে আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা বিনা দিল্লীর সম্রাট্ এতদ্দেশ সম্বন্ধে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার অনুমোদিত ও মনোনীত ব্যক্তি ভিন্ন কোন রাজকর্ম্মচারী

নিযুক্ত হইত না। যদি কেহ তাঁহার আজ্ঞাতে দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করিতে ত্রুটি করিতেন না। এমন কি তোরব খাঁর ন্যায় তাহার অদৃষ্টে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিত।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ দে, বি, এ, বি, এল।

শুক-পক্ষী।

ধান্য ক্ষেত্র-কাছে এক কদম্বের গাছে,
বাসা বাঁধি কোন শুক মনোসুখে আছে।
চাষার আশার ধন ইচ্ছামত খায়,
শিষ-শুদ্ধ পাকাধান আনে সে বাসায়।
আহারের সেরা খাদ্য—ধান খেয়ে খেয়ে,
মোটা সোটা গেঁটা গোটা, সেটা সব চেয়ে।
শুকের সুখের সীমা নাহি এইরূপে,
বুদ্ধিহত হ'ল তার পড়ি ভ্রম-কূপে।
একদিন দুর্ব্বুদ্ধি-মেঘ হৃদয়-আকাশে,
ব্যাকুল হইল বুড় উন্নতির আশে।
শুকের ধান্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়,
(দশায় ধরিলে লোক সুবুদ্ধি হারায়।)
মনে মনে সেই শুক করিল বিচার,—
"ধান্যে প্রতি ঘৃণা বড় হ'য়েছে আমার।
ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে ফলাভাব নাই,
ধান খেয়ে শুধু কেন জীবন কাটাই?
"ধান খেগো" নাম হ'ল ধান খেয়ে খেয়ে!
কি ঘৃণার কথা,—মরা ভাল, এর চেয়ে।
ফল মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে মানি 'নারিকেলে',
কত তৃপ্তি পাব আমি সেই ফল খেলে!
'নারিকেল'-ফল যবে র'য়েছে ধরায়,
কি লাগি নজর নীচ—ধানে মন যায়?
যা খেয়েছি তা খেয়েছি আর নাহি খাব,
'নারিকেল' খেয়ে এবে, জীবন জুড়াব।"
বৃক্ষে বসি ধান্য-ক্ষেত্র পানে নেত্র রাখি,
ধান্য দোষ, নারিকেল গুণ, কহে পাখীঃ—
"নারিকেল-ফল যেন বৈকুণ্ঠের সুধা,
সে ফল খাইলে আর রবেনাক ক্ষুধা।
আপনার গুণে ফল বিখ্যাত জগতে,
যত কিছু ভাল খাদ্য হয় ইহা হ'তে।
'নারিকেল'-নীর-পানে, দেহ উষ্ণা নাশ,—
লুকা ছাপা নহে কথা—জগতে প্রকাশ।
উপাদেয় খাদ্য যারে 'চন্দ্রপুলী' কয়,
'নারিকেল' না হইলে নির্ম্মাণ না হয়।
খাইলে মুড়ীর সঙ্গে মুড়ী মিঠা লাগে,
'নারিকেল' ব্যবহার যত যোগে যাগে।
'নারিকেল'-লাড়ু লোকে গণ্ডা ফেলে খায়,
'নারিকেল'-কুমুড়ায়—অরুচি পলায়।
শাকের ঘণ্টেতে দিলে 'নারিকেল'-কোরা,
ফেলিয়া বিলাতী খাদ্য খায় এসে "গোরা"।
ছাঁকা তেলে তাজা তাজা 'নারিকেল'-ভাজা,
তার কাছে উপাদেয় নহে কভু খাজা।
'নারিকেল'-দুগ্ধ লোকে খায় ক্ষীর ছেড়ে,
'নারিকেল'-খোঁপল, খায় হে লোকে কেড়ে!

'নারিকেল'-খণ্ডেতে নাশয়ে অম্ল রোগ,
রসকরা, মনোহরা,—খাদ্য রাজ-ভোগ।
শুদ্ধ ব'লে পূর্ণ-ঘটে 'নারিকেল' রাখে,
'নারিকেল'-তৈল দেখ জগজ্জন মাখে।
'কাঠে' হয় ঘাট বাঁধা, 'ছোবড়ায়'—দড়ী,
'কাটি' গুলি ঝাঁটা হয়,—বেচিলেই কড়ি।
বর্ষাকালে ভিজাকাঠ, ('পত্রে' কত গুণ)
কোন কষ্ট নাহি হয় ধরা'তে উনুন।
শুখাইলে 'বালিদা', কাষ্ঠের কাজ করে,
পেট-রোগা-লোক ছাড়া সবাই আদরে।
একটা না একটা সবারি দোষ আছে,
কোন দোষ নাহি দেখি, 'নারিকেল'-গাছে!
হেন বৃক্ষ রহিয়াছে যবে এ জগতে,
অন্য বৃক্ষে বাস বিধি নহে কোন মতে।"
পুরাতন বাসস্থান ঘুচাইয়া সাধে,
'নারিকেল'-গাছে শুক, নব বাসা বাঁধে।
শুকের সাধের ফল কাঁদী কাঁদী ঝোলে,
পবন-হিল্লোলে কিবা, শাখা গুলি দোলে!
'নারিকেল' উপরেতে পদদ্বয় রাখি,
পুলকিত মনে খেতে বসে শুক-পাখী।
যে ফলে কাটারী-চোপ সহজে না বসে,
সেই ফলে চঞ্চু-ঘাত শুকের হরষে।
ফল না বিদীর্ণ হয়, চোপ মারে যত,
লাভে হ'তে চঞ্চু চূর্ণ,—ফল কার্য্য মত।
শুকের সকল দিক্ তখন যাইল,
ধান খাইবার আর শক্তি না রহিল!
খেদে শুক কহে, "চুক গেছে মোর বড়,
ঘোড়া চড়া সাজে তার—আটে পিটে দড়।
'নারিকেল,' বিটকেল, শুক-খাদ্য নয়!
আগে যদি বুঝে চলি, এ দশা কি হয়"!
লোভে পড়ি মহাক্ষোভ, শুকের হইল,
ঠোঁট গেল, অনাহারে মরি সে যাইল।
এরূপ দুরভিলাষ মূর্খগণ করে,
ধরাধামে নিজ দোষে দুঃখ পেয়ে মরে।
দুরাশা-পবনে যার মনের চালনা,
ক্ষিতি-তলে যত কষ্ট পায় সেই জনা।
আপনার শক্তি বুঝি কার্য্য করে যেই,
না হয় পস্তা'তে তারে, সুখী হয় সেই।
আপনার অদৃষ্টে সবাই তুষ্ট রবে,
শুকের মতন দশা কাহারো না হবে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রহেলিকা।

১।

দ্বি-অক্ষরে নাম তার রাত্রে জন্ম হয়,
দিবসে মরণ তার অবশ্যই হয়।
পিতা তার জন্ম দিয়া যায় পলাইয়া,
যার ঘরে জন্মে সেই কাঁদে তার হিয়া!

২।

দুই পক্ষ ধরে—কিন্তু নহে সেই পাখী,
হস্ত পদ নাহি তার, নাহি তার আঁখি।
দুই পক্ষ মধ্যে তার এক পক্ষ কালো—
অপর পক্ষেতে করে ত্রিভুবন আলো।

শ্রীদ্বারকানাথ সাহা।

বাইবেল-সমালোচনা ।*

আদি পুস্তক অর্থাৎ মোশি-লিখিত প্রথম পুস্তক ।

"শাস্ত্র আলোচনা কর ; যেহেতুক তাহাতেই তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেছ ।"—যোহন ৫ ; ৩৯ ।

"আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে নিলীয়মান ছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক ; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিয়া অন্ধকার হইতে তাহা পৃথক করিলেন। এবং ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"—আদি পুস্তক ১ ; ১—৫ ।

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।" এখানে "আদিতে" শব্দটি নিতান্ত অর্থহীন, কারণ এই "আদি" কোন্ সময়কে লক্ষ করিয়া বলা হইল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গোড়া থাকিলেই ডগা থাকে, আরম্ভ থাকিলেই শেষ থাকে, আদি থাকেলেই অন্ত থাকে, কিন্তু সময় বা কাল অনাদি অনন্ত—অনাদি অনন্ত কালের আদি থাকা নিতান্ত অসম্ভব। খৃষ্টিয়ান্‌দের গণনা অনুসারে বর্ত্তমান জগতের বয়ঃক্রম ছয় সহস্র বৎসর মাত্র—ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ সৃষ্ট হয় নাই, কেবল পৃথিবী, জল ও আকাশ মণ্ডল একত্র মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এই "আদি" যে ছয় হাজার বৎসরের

* পূর্ব্বে আমি আমার মন্তব্যে লিখিয়াছি যে, আমার পরম বন্ধু "সুবোধিনী"-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকার পদপ্রান্তে আমাকে "বাইবেল সমালোচনা" প্রকাশ করিবার জন্য স্থান প্রদান করিয়াছেন। এই "বাইবেল সমালোচনা" আমি স্বীয় বিশ্বাস ও বিবেচনা অনুসারে লিখিতেছি। এক্ষণে এসম্বন্ধে আমার আরো কিছু বক্তব্য এই যে, আমি বাইবেল সমালোচনায়, বাইবেলের যে সমস্ত অসারতা জন-সমাজে প্রকাশ করিতেছি, যদি কোন বাইবেল ভক্ত খ্রীষ্টিয়ান্, স্বীয় কর্ত্তব্য পালনার্থ ইহার সুসঙ্গত প্রতিবাদ-পূর্ব্বক, বাইবেলের মর্য্যাদা রক্ষা ও সারত্ব সমর্থন করিতে সক্ষম হন—সুখের বিষয়। আমি আমার সমালোচনার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। এই সমালোচনা যদি অযথা ও ভ্রমময় হয়, তাহা হইলে, প্রতিবাদকারী তাহার যথাযথ প্রতিবাদ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া সাধারণের গোচর করিতে পারেন, এসম্বন্ধে আমাকে কোন প্রশ্ন করিবার আবশ্যক নাই। বাইবেল সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য।—লেখক

পূর্ব্বে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ছয় হাজার বৎসরের কত পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করে কে ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের বলে স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে তাহা প্রাণি-বর্গের বাসোপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত,মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা মনুষ্যের গণনায় অনেক লক্ষ কোটী বৎসর ; সুতরাং, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যদি এই পৃথিবীকে কেবল ছয় হাজার বৎসরের বলিয়া প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকেরা আমাকে লইয়া পাগলা গারদের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং কিছু না বলিলেও পাঠকগণ বিরক্ত হইতেছেন,কি করি, বিষম সমস্যায় পড়িলাম ;—আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমি এই "আদি" শব্দটি এখানে বসাইবার তাৎপর্য্য আমার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লই।

পরমেশ্বর তাঁহার মনোনীত বংশকে সৃষ্টির বিবরণ জানাইবার জন্য যখন মোশির মসীপাত্রে ও লেখনীর অগ্রে, অথবা মোশির জিহ্বাগ্রে, উদয় হইয়া আনুদৈনিক সৃষ্টির বিবরণ লিখাইলেন বা বলাইলেন, এবং সামান্য তৃণ,বৃক্ষ,লতা,পশু, পক্ষী,সরীসৃপ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীব জন্তুদের পর্য্যন্ত যখন সৃষ্টির দিবস ধরিয়া দিলেন, অথচ যে পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের বাসস্থান ও যাহার সহিত মনুষ্যের এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক সেই পৃথিবী কোন্ সময়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিলেন না, তখন অবশ্য ইহার মধ্যে কিছু গূঢ় তাৎপর্য্য আছে।

ঈশ্বর পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম করেন এবং কখন কখন নিদ্রাও যান,—ইহা আমরা বাইবেল পাঠেই অবগত হই। পৃথিবীর জল, স্থল বিভিন্ন করিয়া কয়েকটি আলো জ্বালাইতে ও কয়েকটি বৃক্ষ লতা ও জীব জন্তু সৃষ্টি করিতে, যে পরমেশ্বরকে ক্রমাগত ছয় দিন খাটিয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য গোটা এক দিবারাত্র বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে এই আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিতে কত লক্ষ কোটী বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে ও তৎপরে কত সহস্র বৎসর বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না ; সুতরাং ঈশ্বর কঠিন পরিশ্রমের পরে, দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিতে করিতে ঘোরনিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের শিয়রে এলার্মিং ক্লক্ও ছিল না এবং দিন, মাস, ঋতু, বৎসর ও যুগ পরিমাণ করিবার জন্য তখন সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদিরও সৃষ্টি হয় নাই ; সুতরাং পরমেশ্বরের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন পরমেশ্বর স্বয়ংও বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কোন্ সময়ে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার পরেই বা কত কাল নিদ্রিত ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়—পরমেশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টির ঠিক্ সময় নিরূপণ করিতে না পারিয়া "আদি"তে বলিয়া একটি অর্থহীন দুর্ব্বোধ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, "আদি" নামক কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর আকাশ-মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন—ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সৃষ্টির বিবরণ বাইবেলে পাঠ করি সে সৃষ্টির সময় ঈশ্বরকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে হয় নাই।

"পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর নিলীয়মান ছিলেন"—ছয় হাজার বৎসরের পূর্ব্বে কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর যে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পৃথিবীর তখন কি ভয়ানক অবস্থা ছিল এবং সেই সময়ে পরমেশ্বরের কত ক্ষুদ্র কলেবর ছিল ও তাঁহার কি দুরবস্থা ছিল, একবার চক্ষু মুদিয়া কল্পনা চক্ষে ছবি আঁকিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি?—মনে করুন, আমাদের এই আকাশ এখন যেমন দেখিতেছেন, তখনও সেইরূপ। কিন্তু তাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র বা একটিও নক্ষত্র,এমন কি একটিও উল্কা বা জোনাকী-পোকা পর্য্যন্ত নাই—তাড়িতালোক, গ্যাসালোক বা দীপালোকও নাই—সম্পূর্ণ আলোক-বিহীন ঘোর তমসাচ্ছন্ন আকাশ—উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার!—প্রাণ-উদাসকারী অন্ধকার!—সেই অন্ধকার-রাশির মধ্যে "ঘোর" কিম্বা ইংরাজিতে যদ্রূপ আছে—"without form" অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট আকার-বিহীন, জল-মিশ্রিত বা জল-মণ্ডিত পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছে—(এখানে 'জল' শব্দে কেহ যেন আমাদের পানোপযোগী—স্নানোপযোগী তরল জল কল্পনা করিবেন না; কারণ, তখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের অস্তিত্ব না থাকাতে সর্ব্বদা জল যে জমাট অবস্থায় রহিয়াছে,তাহা কোন বৈজ্ঞানিকেই অস্বীকার করিবেন না।)

সেই পৃথিবী "শূন্য" অর্থাৎ তাহাতে ধাতব,—উদ্ভিদ বা জঙ্গম কোন পদার্থই নাই। পাহাড় পর্ব্বত নাই, সমুদ্র ও নদ নদী নাই, মরু-ভূমি নাই, অট্টালিকা বা একটা পর্ণ-কুটীর পর্য্যন্ত নাই—একেবারে সর্ব্বশূন্য, বরফ-মিশ্রিত বা বরফাবৃত আকার-অবয়ব-হীন পৃথিবী রহিয়াছে—(আকার অবয়ব হীনই বটে—কুম্ভকারের মৃৎপিণ্ডের ন্যায় আকার অবয়ব বিহীন—কারণ, পৃথিবী তখনও চক্রের উপর ঘুরিতে আরম্ভ করে নাই) আর সেই পৃথিবীর জমাট জলের চতুর্দ্দিকে বরফাবরক কম্বলের ন্যায় ঈশ্বরের আত্মা "নিলীয়মান" অর্থাৎ লুক্কায়িত রহিয়াছেন—(আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,—"জলের উপরে" কিরূপে লুক্কায়িত থাকিতে পারেন?" আপনাদের মনে থাকা উচিত যে, "অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল"; সুতরাং, ঈশ্বর বারিধি ও অন্ধকারের মধ্যে ছিলেন, কাযেই তিনি লুক্কায়িত না ত কি? ইংরাজিতে—"ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে নিলীয়মান ছিলেন",—এই পদটির অনুবাদ এইরূপ আছে,—"the spirit of god moved upon the face of the waters." এখানে "নিলীয়মান ছিলেন" এবং "moved" একই কথা, কারণ যে ইব্রীয় বাইবেল হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে, সেই ইব্রীয় বাইবেল হইতেই ইংরাজিও অনুবাদ হইয়াছে; তাহা ছাড়া "শালগ্রামের শোয়া বসা," একই কথা, এ বিষয় ত ভারতের সকলেই জানেন; সুতরাং ঈশ্বরের ও লুক্কায়িত থাকা বা গতি-বিধি করা, একই কথা বুঝিতে হইবে।)

উপরে ও চতুষ্পার্শ্বে অনন্ত ঘোর অন্ধকার এবং নিম্নে অসীম বরফ রাশি—বরফে ঈশ্বরের সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া যাইতেছে, আবার উপরে অনন্ত ঘোর অন্ধকার দেখিয়া ঈশ্বরের আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যাইতেছে—

উঃ! নরকেও কি মনুষ্যাত্মায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট হইতে পারে? এই ভয়ে পরমেশ্বর বরফ ও অন্ধকারের মধ্যে "নিলীয়মান" লুক্কায়িত রহিয়াছেন, কিন্তু বরফের শৈত্য অসহ্য হওয়াতে "the spirit of god moved upon the face of the waters," যদি অন্য কোন স্থানে কিছু উত্তাপ পাওয়া যায়, সেই সন্ধানে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে এখানে ওখানে গতিবিধি করিতেছেন। এরূপ কষ্টে মনুষ্য এক দিনও থাকিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরে আত্মা বলিয়া এত দীর্ঘকাল সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি, তাঁহার যে কষ্ট হয় নাই এরূপ নহে, কারণ ঈশ্বর সেইরূপ অবস্থাতে আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন,—"দীপ্তি হউক"; তাহাতে দীপ্তি হইল। যখন দীপ্তি হইল, তখন ঈশ্বরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, কিন্তু সেই আলো ও তৎপূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল সেই অন্ধকার, আমাদের এই কলিযুগের আলো অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কারণ আমাদের এই যুগের আলো সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তাড়িৎ, গ্যাস, তৈল প্রভৃতি কোন একটি পদার্থ-সম্ভূত এবং অন্ধকার অপদার্থ, অর্থাৎ আলোর অভাবের নাম অন্ধকার—অন্ধকার বলিয়া কোন পদার্থ নাই; কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথমে যে দীপ্তি করিলেন তাহা এক প্রকার পদার্থ হইলেও কোন পদার্থ-সম্ভূত নহে, তাহা ঈশ্বরের বাক্যসম্ভূত এবং সে সময়ে যে অন্ধকার ছিল তাহাও এক প্রকার পদার্থ; কারণ পদার্থ না হইলে পদার্থের সহিত মিশিতে পারে না, কিন্তু বাইবেল-মতে আলো ও অন্ধকার যৎকালে মিশ্রিত ছিল তখন আলো ও অন্ধকার উভয়কেই পদার্থ বলিতে হইবে; কারণ মিশ্রিত না থাকিলে পৃথক করার প্রয়োজন হয় না, বাইবেলে লেখে,—"দীপ্তি উত্তম দেখিয়া অন্ধকার হইতে তাহা পৃথক করিলেন। এবং ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।"

ঈশ্বর আলো ও অন্ধকার পৃথক করিয়া কাহাকে কোথায় রাখিলেন, সে বিষয় বাইবেলে কিছুই লেখা নাই; কিন্তু সূর্য্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই আলো ও অন্ধকারে যে, দিবস ও রাত্রি হইত, তাহা বাইবেলে স্পষ্ট রূপে লেখা আছে যথা—"ঈশ্বর দীপ্তির নাম 'দিবস' ও অন্ধকারের নাম 'রাত্রি' রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"

মোশির নিকটে পরমেশ্বর যখন শেষের কয়েকটি কথা প্রকাশ করেন, তখন মোশি নিজে কি বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ লোক দিগকেই বা কিরূপ বুঝাইয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি; কারণ পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি, গতি বিধি ও সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রগণের সহিত পৃথিবীর যে কি সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে মোশি কিছুই জানিতেন না এবং মোশির নিকটে ঈশ্বরও সে বিষয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই; কেন না মোশি যদি পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি, গতি বিধি ও সৌর জগতের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ জানিতেন, তাহা হইলে, খ্রীষ্টের ১৫০০ সনের শত বৎসর পূর্ব্বে, মোশির পরিচারক ও উত্তরাধিকারী যিহোশূয়, সূর্য্য ও চন্দ্রকে "প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস" আকাশের একই

স্থানে স্থগিত রাখিয়াছিলেন (যিহোশূয়ের পুস্তক ১০; ১২—১৫) এরূপ অবৈজ্ঞানিক প্রলাপ বাক্য ঈশ্বরের প্রকাশিত ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল মধ্যে সন্নিবেশিত হইত না; তাহা হইলে, মিসরদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ টলেমির মত —'পৃথিবী একস্থানে স্থির ভাবে আছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে'—এই মত খৃষ্টের ১৫০০ পনের শত বৎসর পর পর্য্যন্ত চলিত থাকিত না; এবং টলেমির সেই ভ্রমাত্মক মতকে খণ্ডন করিবার জন্য, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রুষিয়া রাজ্যে, কোপারনিকাস্‌কে জন্মগ্রহণ করিতে হইত না; সুতরাং মোশি যখন পরমেশ্বরের আত্মার আবেশে জ্ঞাত হইলেন যে, পরমেশ্বর দীপ্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অন্ধকার হইতে পৃথক করিয়া দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন, তখন মোশি নিশ্চয়ই এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর সেই আলো ও অন্ধকার পৃথক করিয়া যখন অন্ধকারকে তাঁহার উদরের মধ্যে পূরিতেন, তখন দিবস হইত, আর যখন অন্ধকারকে বমন করিয়া আলোকে মুখের মধ্যে গ্রাস করিতেন, তখন রাত্রি হইত; কারণ পৃথিবীকে কমলা লেবুর মত গোল ও ঘূর্ণায়মান পদার্থ বলিয়া মোশির তখন বোধ ছিল না, পৃথিবীকে যে একটি বিস্তীর্ণ চৌরস ভূখণ্ড বলিয়াই সে কালের লোকের ধারণা ছিল তাহা মোশির সময়ের ১৫০০ পনের শত বৎসর পরেও ঐ বাইবেলেই দেখিতে পাওয়া যায়—"আরবার শয়তান তাঁহাকে (যীশু খৃষ্টকে) এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগতের যাবতীয় রাজ্য দেখাইল।"—লূক ৪; ৫।

যাহা হউক, ঈশ্বরের সেই আলো-আঁধারি কৌশল দ্বারাই তখন দিবস ও রাত্রি হইতে লাগিল, "এবং (সূর্য্যের অস্তিত্বের পূর্ব্বেই) সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"

এই সকল ছেলে মানুষী, মূর্খতার পরিচয় ও গাঁজাখুরী গল্প যে শাস্ত্রে নাই, সে শাস্ত্রকে কিরূপে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র বলিব?

ক্রমশঃ

জনৈক খ্রীষ্টীয়ান-তনয়।

সঙ্গীত।

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত।

বেহাগ—একতালা।

কেরে বামা বারিদ বরণী তরণি ভালে—
ধ'রেছে তরণি কাহার ঘরণী?
আসিয়া ধরণী
করিছে দনুজ জয়।

হের হে ভূপ কি অপরূপ
অনুপরূপ নাহি স্বরূপ
মদন নিধন করণ কারণ
চরণ শরণ লয়।

নব-বিবাহিতের আক্ষেপ।

হইয়াছে ছুটী, তাই গুটি গুটি
পাটি পাটি বাটী যাই;
পাইয়াছি ছুটী, সব হ'ল মাটী,
"সরলা"টি ঘরে নাই।
ব'লে দেছে খুড়ী, বেলোয়ারি চুড়ী
নিয়ে যেতে তার তরে;
কিবা ফল তায়? কে পরিবে হায়!
সে যদি না থাকে ঘরে।
বিনাইতে বেণী, কিনেছি চিরণি,
আরসি মনের মত;
সোপ্, 'ল্যাভেণ্ডার্', সুরভি পাউডার্
বিলাতী 'এসেন্স' যত।
তুলিবারে ফুল, কিনিয়াছি উল্,
কলের পুঁতুল আর;
নভেল্—নাটক, না মিষ্টি, না টক্
তাও খান তিন চার।
কি হবে এ সব বিষয় বিভব
কাহার চরণে দিব?
আমোদে মাতিয়া, সোহাগে গলিয়া,
বাহাবা কাহার নিব?
'দশে'তে পা দিয়ে, হইয়াছে বিয়ে,
এখন এগার প্রায়;
আজও কি বালিকা! আজও কি কলিকা!
এ বড় বিষম দায়!
তাই যদি হবে, মোর পানে তবে
ফিরে ঘুরে কেন চায়?
চাহনি ঠমকে, চপলা চমকে
চপলা হরিণী প্রায়?

বিমল বদন, বিনোদ বরণ
যেন নব কিশলয়;
এ কি বিপরীত! সে ধনে বঞ্চিত!
এও কি পরাণে সয়!
একে রাঙা পদ, যেন কোকনদ,
তাহাতে মলের শোভা;
গুঁজরি পঞ্চম, করে ঝম্ ঝম্
মরি কিবা মনোলোভা!
ঘোরে আলো ক'রে, এ ঘরে ও ঘরে
যেমন চাঁদনি-ভাতি;
তারে কাছে পেয়ে, ছুটো কথা কয়ে,
সুখেতে পোহায় রাতি।
বিমল বিছানা, যেন দুধ-পানা
কি হবে তাহাতে শুয়ে?
পুড়ে মনাগুণে, কড়িকাঠ গুণে
আকাট সমান হ'য়ে?
ছেলে বেলা হ'তে, নাড়িতে চাড়িতে
তবে ত মানিবে পোষ;
নতুবা কলিতে, হইবে থাকিতে
যেমন "আয়ান ঘোষ"।
কত গেছি বাটী, এবে কেন হটি,
কি হেতু এমন ধারা?
আহার—বিহার, সকলি অসার,
কেবল বিরাগ-ভরা।
কখন না জানি, এমন কান্দানি,
এও কি কখন হয়?
এ বড় বালাই, নেপো মারে দুই!
যার ধন তার নয়!

পুলিষ প্রহরী, কবে দিবে সারি,
বিবাহে বাসর-ঘরে ;
ফুল-সজ্জা রাতি, জ্বালাইয়া বাতি
দাঁড়াইবে ঘেরে ঘুরে।
ঋতুমতী মেয়ে আইনের ভয়ে
স্বামী-পাশে নাহি যাবে ;
কি বিষম কথা! 'ডাইভোর্স্'-প্রথা,
ভারতে চলিত হবে।
করো না ইংরাজ! নিদারুণ কাজ,
কেন দুখ দাও মনে?
আর বলিব না, অসতী ললনা
বিড়াল-নয়নাগণে।
আর বলিব না, সফেদ-বরণা
পর পুরুষেরে ভজে ;
বলিব না ত্রাসে, তুই পেনি-আশে,
সতত কুপথে মজে।
যত জেতে-ঠেলা, তোমাদের চেলা,
তাহাদের টেনে লও ;
নাহি কোন ব্যথা, তাহাদের মাথা
কচ্ মচ্ করে খাও।
করেছ আইন্, —দুঃখের 'মাইন্'
সুখ-লেশ নাহি তাতে ;
মিছে গণ্ডগোল, উৎপাত কেবল,
ছাই দিলে বাড়া ভাতে।
এ আইন-বশে, বসন্তে বরষে
নিদাঘে শীতের দাপ ;
চৈত্রে, ভাদ্র ব'লে, 'ঢল' নামে জলে
শিশিরে রবির তাপ।
কে বলে,—"স্কোবল, বুদ্ধিতে প্রবল?"
কেবল হাবল চাঁদ!

দাম্পত্য-প্রণয়, কিবা সুখময়,
সে সুখে সাধিল বাদ।
কি করি ললনে! আইন দহনে,
জীয়ন্তে মরিয়ে রব ;
চিঠি চাপাটিতে, সুখ নাহি চিতে
'টেলিফোঁ'তে কথা কব।
থাক থাক প্রিয়ে! এই মুখ চেয়ে
এস—হ'লে বার পার ;
আমি ত না জানি, জানেন কোম্পানি
কবে খুলে প্রেম-দ্বার।
উঠ ভ্রাতৃগণ! কেন অকারণ
বিচেতন বসে থাক?
ভূমেতে রাখিয়া, আঙুল মট্কিয়া
কেবল মরণ ডাঁক।
বঁটী ঘাড়ে করি, শানা'য়ে কাটারি
চাদর বাঁধিয়া বুকে ;
কামানের আগে,— "আও আও লাগে",
বলিয়া দাঁড়াও রুকে।
ও গো মহারাণি! ব্রিটন জননী।
সায় দিলে কোন্ প্রাণে?
একি বিবেচনা! তুমি কি জাননা
চুম্বকেতে লোহা টানে?
না পেয়ে রমণী, দিবস—রজনী
কেঁদে কেঁদে সারা হব ;
চোর নাহি পেয়ে, ভুঁয়ে ভাত খেয়ে
ভূমিতলে শুয়ে রব।
উঠ ভ্রাতৃগণ, ঘুমে অচেতন
চোখে মুখে দাও জল ;
পট্কা ছুঁড়িয়া, দাও উড়াইয়া,
বিপক্ষের দল বল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

অন্তিম-মিলন।

(উপন্যাস)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাইতি।

জগতে কেহই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। যদি তাহাই হইত, তবে, এই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সুখময় রাজ্য, দুঃখের আগার বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? যদি তাহাই হইত, তবে এক পিতার সন্তান হইয়া পরস্পর পরস্পরের উচ্ছেদ-সাধনায় অনুরক্ত হইবে কেন? এক স্বার্থপরতাই সমস্ত অনর্থের কারণ—এক স্বার্থপরতা হইতেই সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। কাম ও ধন-লিপ্সা! তোমাদিগের মাধ্যাকর্ষণী শক্তির ইয়ত্তা নাই! উদার-চরিত্র শান্ত-প্রকৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণও তোমাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না। মহারাজ যযাতি একদা স্বীয় পুত্র পুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—"হে পুত্র! দুর্ম্মতিগণ যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে কদাচ সক্ষম নহে,—যে তৃষ্ণা জরাগ্রস্থ ব্যক্তির হৃদয়েও পূর্ণমাত্রায় অবস্থিতি করে, এবং যে তৃষ্ণা প্রাণান্তিক রোগ-সদৃশ, সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। হে পুত্র! যদি এই জগতের যাবতীয় ধান্য, যাবতীয় যব, সমস্ত হিরণ্য, সমস্ত পশুপাল এবং সমগ্র রাজনীতি, একজনের অধিকারভুক্ত হয়, তথাপি ঐ সমস্ত তাহার পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" এই বিপদ-সঙ্কুল অরণ্যময় জগতে নিরপরাধীরও নিস্তার নাই! আমি কাহারও কিছু ক্ষতি করি নাই, আমি অকারণ কাহাকেও মনোবেদনা প্রদান করি নাই, আমি সর্ব্বদা পরোপকারে রত, অতএব আমার শত্রু নাই, অতএব আমাকে কেহই কিছু বলিবে না,—এই কৃতঘ্ন জগতে সে আশা দুরাশা মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে মনের সুখে কালযাপন করিব, অশান্তি-কণ্টক ক্ষণকালের নিমিত্তও আমাকে বিদ্ধ করিবে না, হীনমতি মনুষ্য! কদাচ এমন মনে করিও না।

শিরোমণি মহাশয়ের গণনা ও হরিচরণের রহস্যভেদ, প্রতাপচন্দ্রের অনেক উপকারে আসিল। যদিও তিনি ইঙ্গিত-মাত্রে বা এক ভেরী-নিনাদে ত্রিশতাধিক লাঠিয়াল একত্র সমুপস্থিত করিতে পারেন, তথাপি প্রবল শত্রুর সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে

হইলে, পূর্ব্ব-আয়োজন ও পূর্ব্ব পরামর্শের প্রয়োজন। যদুনাথ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত; কিন্তু সেই যদুনাথ এখন পথে। এখানে এত অনর্থপাত, যদুনাথ তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিতেছেন না।

একদা, তিনি বিশেষ চিন্তাকুল-হৃদয়ে বাহিরে আসিয়াই ভূমিতলে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। পত্রখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া উর্দ্ধনয়নে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন পারিষদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপচন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহারা কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি বলিলেন,—"ভাই! এতদিনে এ সংসারে অশান্তির উদয় হইল। মোকদ্দমা মাম্‌লা ত আমি গ্রাহ্যই করি না। তবে এই পূজার পর অবধি মাতাঠাকুরাণীর সাংঘাতিক পীড়া,—তিনি এ যাত্রায় রক্ষা পান কি না সন্দেহ। একে তাঁর এই বৃদ্ধ বয়স, তাতে আবার শোকতাপে জর্জ্জরীভূতা। অদৃষ্টে আমার কি আছে—জানি না। যদুনাথ যে কবে আসিবে, তার ত কোন ঠিকানাই নাই। তবে ভাই! তোমরা এসেছ, তোমাদের সঙ্গেই একটা পরামর্শ করি।" এই বলিয়া প্রতাপচন্দ্র পত্রখানি প্রথম পারিষদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"চুপি চুপি পাঠ কর।" তিনি মৃদুস্বরে পাঠ করিলেন,—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়
বরাবরেষু।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং-মহাশয়! অদ্য হইতে দুই এক দিবসের মধ্যে আপনকার ভদ্রাসনে ডাকাইতি হইবে। মহাশয়! সতর্ক থাকিবেন। পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলাম। ইতি তাং—কার্ত্তিক সন, ১১৭৭ সাল।

একান্ত বশম্বদস্য
শ্রী———স্য।

পত্র পাঠান্তে সকলেই বিষণ্ণ হইলেন। প্রতাপচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি কর্ত্তব্য?"

দ্বিতীয় পারিষদ বলিলেন,—"দিন ত নিকট। অতএব, আর কাল বিলম্ব না করিয়া আপনার প্রজাবর্গের ঘরে ঘরে, এ সংবাদ দেওয়া হউক। সকলে যেন সজাগ ও সতর্ক থাকে। তারা যেন আপনাদের ধনসম্পত্তি মাটীর ভিতর, বা অন্য কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখে। দস্যুগণ কোন্ দিক দিয়া আসিবে, তার ত কোন স্থিরতা নাই, সেই নিমিত্ত বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করুন। অষ্টপ্রহর যেন সকলেই সুসজ্জিত থাকে,—ইঙ্গিত মাত্রেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। তরবারি, বল্লম, কিরিচ প্রভৃতি ভাল করিয়া শাণ দেওয়া হউক; কারণ, সে সকল অনেক দিন ব্যবহার হয় নাই। পাইক ও লাঠিয়ালেরা, রাত্রে ছাদের উপর উঠিয়া খুব সজাগ হইয়া বাটীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হউক। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার,—জহরৎ প্রভৃতি লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। প্রলোভনের বস্তু যেন কিছুই সম্মুখে থাকে না। যখন পত্র লিখিয়াছে, তখন বিবেচনা হয়—দস্যুগণ দলে ভারি, তবে আপনার যে সকল সুশিক্ষিত লোক আছে, তাতে তারা সহজে যে, কিছু করিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, সাবধান থাকাই

সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ছাদের উপর বহু-সংখ্যক প্রস্তর ও ঝামা তুলিয়া রাখা আবশ্যক। কি জানি, কখন কোন্ বস্তুর প্রয়োজন হয়। গ্রামের সরদার ও আপনার প্রধান প্রধান আম্‌লাদের এই দণ্ডে ডাকাইয়া এ বিষয়ে বিশেষরূপ উপদেশ প্রদান করুন। গ্রামস্থ কেহই যেন একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া নিদ্রা না যায়,—সকলেই যেন স্বার সোর করিয়া রাত্রি যাপন করে। ফাঁড়িতেও একবার খবর দেওয়া আবশ্যক। জানা আছে যত তারা কর্‌বেন! উহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই হইবে না। নিজের সাবধান নিজে করিয়া লউন। আমরা ত সকালে-বিকালে এইখানে হাজির আছি। একত্রে পরামর্শ করিয়া যেমন আবশ্যক হইবে, সেইরূপ বিধান করা যাইবে। বিধাতার কি বিড়ম্বনা! এতকাল দিব্য সুখ-স্বচ্ছন্দে এ দেশে বাস করিতেছি, এ সকল উৎপাত ত কখন ছিল না। এই সে দিন এক ভূতের উৎপাত লইয়া লোকের আর রাত্রে নিদ্রা হইত না। সে উৎপাত গেল, আবার কোথা হইতে এক ডাকাতীর খবর আসিয়া উপস্থিত! যাহা হউক, মনে একটা ভাবনা আসিয়া জুটিল। এখন আমরা আসি, বাটীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় বৈকালে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এখন আর ভাবিবার সময় নাই,—প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে এই মুহূর্ত্তে এখানে আহ্বান করুন,—আর বিলম্ব করিবেন না।"

পারিষদদ্বয় বিদায় হইলে—প্রতাপচন্দ্র এক ভেরী-নিনাদ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ ও তাহাদের অধীনস্থ কৃষি ও জাল ব্যবসায়ী-সম্বলিষ্ট বলিষ্ঠকায় প্রজারা লম্ফঝম্প-সহকারে যষ্টি-সঞ্চালন করিতে করিতে তদীয় সমক্ষে সমাগত হইল। তাহাদের কোলাহলে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান এবং প্রমত্ত-পদ-বিক্ষেপোত্থিত ধূলি-পটলে গগণ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তাহারা সকলেই প্রতাপচন্দ্রের নিকটে আসিয়া নমিত মস্তকে আদেশাপেক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাদের উৎসাহ-পরিপূর্ণ বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি-সহকারে সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—"সকলে অষ্টপ্রহর সশস্ত্রে সুসজ্জিত থাক এবং পর্য্যায়ক্রমে এই বাটীর চতুর্দ্দিক রক্ষণাবেক্ষণ কর, খবর বড় মন্দ।" সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল।

প্রতাপচন্দ্র পারিষদবর্গের পরামর্শানুসারে পল্লীস্থ যাবতীয় প্রজাবর্গের নিকট এই অমঙ্গল সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সকলেই স্বস্ব সাধ্যানুসারে সতর্ক হইল। অস্ত্র-শস্ত্র সকল সুশাণিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে, প্রতাপচন্দ্র দ্বারপাল ও প্রহরিগণকে যথাস্থানে সশস্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া স্নানাহার করিতে গেলেন।

এই বিপদ্‌কালে মাতাঠাকুরাণী প্রাণান্তিক রোগে আক্রান্তা; অতএব তিনি স্নানান্তে সর্ব্বাগ্রে মাতার নিকটে গিয়া স্বহস্তে তাঁহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, রাজলক্ষ্মী, শারদাসুন্দরী ও অন্যান্য পুরনারিগণের হস্তে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন, এ সমস্ত অনর্থপাতের বিষয় মাতাকে বিন্দু বিসর্গও জানিতে দিলেন

না, এবং অপরাপর সকলেই এক প্রকার অনভিজ্ঞ রহিলেন।

সত্বরে পূজা ও আহারাদি সমাপন করিয়া প্রতাপচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। বেলা তখন অপরাহ্ণ। দেখিলেন—তাঁহার পারিষদবর্গ সকলে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত বসিয়া কথোপকথন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় হরিচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; প্রতাপ চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিচরণ! খবর কি?"

হরি। মহাশয়! খবর বড় ভাল নয়,—বোধ করি আজ রাত্রেই—

প্রতাপ। কেমন করিয়া জানিলে?

হরি। মহাশয়! আজ আমি সকালে উঠেই গঙ্গার কিনারায় কিনারায় উত্তর দিক্ পানে খানিক দূর গিয়েছিলেম, একটা পড়োবাড়ীর পাঁচিলের আড়াল থেকে দেখ্‌লেম—কতকগুলো নৌকা হুগলীর ঐ দিক থেকে এসে ঘাটে লাগল—

প্রতা। আরোহীরা কি লোক?

হরি। তা মহারাষ্ট্রীও আছে—বাঙ্গালীও আছে।

প্রতা। তাদের তুমি চেন?

হরি। আজ্ঞে হাঁ—অনেক গুলিকে চিনি বটে।

প্রতা। তাদের সঙ্গে কিছু—

হরি। আজ্ঞে না অস্ত্র-শস্ত্র কিছু নেই বটে—

প্রতা। তবে—?

হরি। আজ্ঞে সে সব রাত্রে পার্ কর্‌বে। সে সব কি আর দিনমানে বার কর্‌বে?

প্রতা। ভাল—যা দেখ্‌লে, সংখ্যায় কতগুলি হবে?

হরি। তা শতাবধি দেড় শ হবে। তাদের পাল্লায় ঢের লোক। রাত্রে বোধ করি আরও আস্‌বে।

প্রতা। তুমি স্নানাহার ক'রেছ?

হরি। আজ্ঞে না—আমি ত এই আস্‌ছি।

প্রতা। আচ্ছা তবে তুমি যাও—শীঘ্র এসো।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হরিচরণ প্রস্থান করিল। প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন—মহা বিভ্রাট্।

হৈমন্তিক দিবা, দেখিতে দেখিতে অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই অন্তঃপুরের দ্বার সকল বাহির হইতে অর্গল বদ্ধ করা হইল। বাটীর চতুর্দ্দিক মশালের আলোকে উদ্ভাসিত হইল। পাইকগণ ছাদের উপর উঠিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ ও ইতস্ততঃ পাদ-চারণ করিতে লাগিল। পল্লীস্থ সকলেই স্ব স্ব শিশু সন্তান ও ধন সম্পত্তি সকল কোন নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত করিয়া সজাগ ও সতর্ক হইয়া, চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে প্রতাপ বাবুর বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইল।

দুই এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, রজনীর গভীরতা প্রযুক্ত দূর হইতেই একটা ভীষণ কোলাহল ও উচ্চ বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। সকলেই সত্রাসে দণ্ডায়মান হইল। পাইকগণ সিংহনাদ করিয়া এই ভয়ানক সংবাদ সকলকে জ্ঞাত করিল। প্রহরিগণ দীর্ঘ যষ্টি-সঞ্চালন-পূর্ব্বক সদর্পে আস্ফালন করিতে লাগিল। মল্লগণের

মালসাটে মেদিনী কম্পিতা হইল। তুরবারি, কিরিচ, টাঙ্গী ও বল্লমধারীর সংখ্যা বড় অধিক নহে,—কিন্তু তাহারা সকলেই সুশিক্ষিত। সকলেই অধর-দংশন-পূর্ব্বক স্ব স্ব অস্ত্র বিঘূর্ণিত করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

আলোকমালা, বাদ্য-ধ্বনি ও কোলাহল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। শিবাগণ চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্র সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বন্দুক হস্তে ছাদের উপর উঠিলেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণ গভীর খাত। সন্তরণ দ্বারা কয়টা লোক পার হইতে পারে? তথাপি, প্রহরিগণ প্রাচীরে উঠিয়া চতুর্দ্দিক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সিংহদ্বার সম্মুখস্থ সেতু অবলম্বন করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিব,—এই অভিপ্রায়ে দস্যুগণ তদভিমুখেই গমন করিতে লাগিল। সেতুর নিকটে গমন করাই সুকঠিন। দস্যুগণ এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই যে, অস্ত্রধারী প্রহরিগণ সেতুর সম্মুখে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহাও তাহারা এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই যে, সিংহদ্বার বজ্রসম লৌহ কবাটে আবদ্ধ রহিয়াছে। মক্ষিকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার সুযোগ নাই। তাহারা আশা করিয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে বাটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া, তৎপরে ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে। কিন্তু, প্রতাপচন্দ্রের বন্দোবস্ত দেখিয়া তাহাদিগের সেই আশালতা সমূলোৎপাটিতা হইল। যাহা হউক, এক্ষণে তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অস্ত্রধারিগণের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয় দলই অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেছে না, একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইতেছে, কোলাহলে কান ফাটিয়া যাইতেছে এবং অন্তঃপুর মধ্যে সর্ব্বনাশ-সূচক ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, প্রতাপচন্দ্র বন্দুক হস্তে লইয়া বিপক্ষ দলের প্রতি অনবরত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অগ্নিবাণ সহ্য করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অবিলম্বে বিপক্ষ দলের অনেকগুলি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অবশিষ্ট দস্যুগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। যে যে দিকে পাইল, সেই দিকেই মহাবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি জঙ্গলমধ্যে—কতকগুলি গঙ্গার দিকে—কতকগুলি বা অন্ধকার মার্গে প্রধাবিত হইয়া রক্ষা পাইল। বিজেতাগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল, কিন্তু অধিক দূর না গিয়াই নিরস্ত হইল। এত আড়ম্বর এক কথায় ফুরাইয়া গেল।

দুই এক জন পুলিস-প্রহরী প্রতাপচন্দ্রের বাটীর নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। দস্যুগণের কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়াই, তাহারা নিকটস্থ বেশ্যালয়ে প্রবেশ করে। তৎপরে যখন সকল গোলমাল থামিয়া গেল, যখন প্রতাপচন্দ্র ও তাঁহার পারিষদগণ মৃত দেহ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিলেন, সেই সময় তাহারাও বাহির হইয়া সারফরাজি করিতে আরম্ভ করিল। বর্ত্তমান কালেও পুলিশ প্রহরিগণের এইরূপ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। যখনই কোন সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গাম উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা

কিছু তফাতে গিয়া দণ্ডায়মান হয়; পরে গোলমাল থামিয়া গেলে, কাহাকে ধরিব, কাহাকে মারিব, কাহাকে বাঁধিব, করিয়া মহা তম্বি আরম্ভ করে। যাহা হউক, ইহাতে আমরা তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না; কেন না—“প্রাণাযথাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।”

মশাল ধরিয়া মৃত-দেহ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে প্রতাপচন্দ্র একটি কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায় ব্রাহ্মণ-তনয়কে দেখিতে পাইলেন। ঐ যুবা মৃত-দেহ সকলের মধ্যে পতিত হইয়া, মৃদুস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে—সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত এবং দক্ষিণ হস্তটি যুদ্ধে কাটা গিয়াছে। প্রতাপচন্দ্র ভৃত্যকে বলিলেন,—“মশাল ভাল ক’রে ধর্।” সে মশাল বাগাইয়া ধরিলে, তিনি সেই যুবকের মুখ দেখিয়া চিনিলেন—চণ্ডীচরণ। প্রতাপ বাবু তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং পাপের চাক্ষুষ প্রতিফল দেখিয়া জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি আজ্ঞা করিবামাত্র ডুলিবাহক ডুলি লইয়া আসিল। চণ্ডীচরণকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে একটি গৃহ মধ্যে শয়ন করাইয়া, দুই এক জন পরিচারককে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশ্রূষা করিতে আজ্ঞা দিলেন। চণ্ডীচরণ লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিলেন না। তৎপরে প্রতাপ বাবু স্বপক্ষ ও বিপক্ষবর্গের শব সকল, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। পুলিশ-প্রহরিগণ বক্‌সিস্ লইয়া বিদায় হইল।

এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে সমাধা হইবামাত্র রজনী প্রভাত হইল। দিবাকর উদয় না হইতেই উচ্চ রোদন-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি দ্রুপদ সিংকে বাটীর মধ্যে প্রেরণ করিলেন। দ্রুপদ সিং ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিল,—“নাভিশ্বাস হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী আর রক্ষা পান না। প্রতাপ বাবু ও পারিষদবর্গ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে বাহিরে লইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার অন্তিম-কালীন বেশ-ভূষা সমাধা করিয়া ‘হরিবোল’ দিতে দিতে তাঁহাকে তীরস্থ করিলেন। তীরে ক্ষণকাল মাত্র অবস্থিতি করিয়াই বৃদ্ধা প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রতাপচন্দ্র সমারোহ-সহকারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। প্রহরী সংবাদ দিল,—“হুগলী হইতে দামোদর ঘোষাল আসিয়াছেন।” প্রতাপচন্দ্র শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সাদর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইলেন। অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর দামোদর সজল-নয়নে পুত্রের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতাপচন্দ্র কি করিবেন, সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া দামোদর অধোমুখে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“হায়! গ্রহ আমার নিতান্তই অপ্রসন্ন; নচেৎ হতভাগাকে এত করিয়া বুঝাইলাম, কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলাম না! গৃহিণী এ সংবাদ পাইলে হয় ত উদ্বন্ধনে বা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। হা চণ্ডীচরণ! পরিশেষে তোর এই মূর্ত্তি দেখিব বলিয়া তোকে এত করিয়া

মানুষ করিলাম! তুই বই আর আমার কে আছে? তুই যে আমার সর্ব্বস্বধন। এই-রূপ বিলাপ-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপ-চন্দ্র অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দামোদরকে অশেষ বিধানে বুঝাইয়া, যে গৃহে চণ্ডীচরণ শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

দ্বারোদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—চণ্ডীচরণ অধো-মুখে একান্তে উপবেশন করিয়া আছেন। দেহ-যন্ত্রণা যত হউক বা না হউক, মর্ম্মবেদ-নায় তাঁহাকে নিতান্ত অধীর করিয়াছিল। ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ—পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিতেছিল। ছিন্ন বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোন প্রকার ঔষধ বিলেপন করা হয় নাই। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া চণ্ডীচরণ আর আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দামোদর নিতান্ত হতাশ ও অবসন্ন-প্রায় হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। প্রতাপচন্দ্র নীরব।

দামোদর দেখিলেন যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, এক্ষণে আর কালবিলম্ব না করিয়া এই অকালকুষ্মাণ্ডকে বাটী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উপায় কি? এ অবস্থায় কেমন করিয়াই বা লইয়া যাই? এ অবস্থায় লইয়া গেলেই ত চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য হইবে, সকলেই তামাসা দেখিতে আসিবে, কোম্পানীর লোকে জানিতে পারিলে, মহা গোলযোগ বাধাইবে। এখন কি করি?

প্রতাপচন্দ্র একখানি মোটা চাদর আনিয়া চণ্ডীচরণের সমস্ত অবয়ব উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিলেন এবং একখানি পাল্‌কী আনাইয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে, তিনি দামোদরকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া পাল্‌-কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বলিলেন, এবং ইহাও বলিয়া দিলেন, যেন পাল্‌কী শুদ্ধই নৌকায় চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং পাল্‌কী শুদ্ধই অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দামোদরের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দামোদর হঠাৎ হরিচরণকে দেখিতে পাইয়া, ভাব গোপন করিয়া বিস্ময় ও ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে বেটা চাষা পুত্তুর! তুমি এখানে? আর তোমার বাপ মা এ পাড়া সে পাড়া ক'রে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! এই তোমার আক্কেল! চাষা কি না—কথাই আছে,—"ন চাষা সজ্জনায়তে"।

হরিচরণ বিষম চতুর। দামোদরের কপট হাস্যে তাঁহার মন টলিল না। সে প্রণাম করিয়া দেশের কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। দামোদর আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া প্রতাপ-চন্দ্র নিরস্ত হইলেন। সহচরীর কথা দামো-দর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, প্রতাপ-চন্দ্রও কিছুই ভাঙ্গিলেন না, বরং একদায়ে নিষ্কৃতি পাইলেন। দামোদর হরিচরণকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে বাপু! দেশে যাবি কি?" হরিচরণ বলিল,—"আজ্ঞে যাব বই কি, দু-দিন যাগ্‌, আপনি আমার বাবাকে বল্‌বেন, আমি এখানে বাবুর বাড়ী

কর্ম্ম কচ্চি, আর আমি ভাল আছি।" দামোদর,—"আচ্ছা" বলিয়া বিদায় হইলেন। প্রতাপচন্দ্র অশৌচ-নিবন্ধন প্রণামাদি করিতে পারিলেন না—কেবল মৌখিক সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। প্রতাপচন্দ্র অন্তঃপুরে গিয়া আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, এবং ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাতার স্নেহ মমতা, মাতার মিষ্ট বচন, মাতার প্রশান্ত মূর্ত্তি, তাঁহার চিত্রপটে যতই আবির্ভূত হইতে লাগিল, ততই তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। মাতার মৃত্যুতে তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন এবং কয়েক দিবস কোনও কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না।

এদিকে, দামোদর পুত্রকে লইয়া হুগলী যাত্রা করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রাহ্মণী পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন। পুরবাসিনিগণ সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। দামোদর কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন।

(চতুর্দ্দশপদী কবিতা)

পথ।

এ জগত-কারাগারে রুদ্ধ চারি ধার,
মায়ায় শৃঙ্খলে বদ্ধ যত জীবগণ;
মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে ভ্রমে অনিবার,
স্বসুখ মদিরা-বশে সদা অচেতন।
দেখে না কেহই হায়! মেলিয়া নয়ন—
"কেন যে এসেছি এই ভব-কারাগারে;
কে আমি—কোথায় আমি—কেন অচেতন?
কেন বদ্ধ রহিয়াছি—কোন কর্ম্ম ফেরে?
হায়! রে করিত যদি কভু অন্বেষণ,
নিশ্চয় মিলিত তবে কাণ্ডারী তাহার;
(দয়াময় নিরদয় নহেন কখন)
ভক্তি-বলে দেখিত সে মুক্ত রুদ্ধদ্বার।
সেই পথ দিয়া পুন করিত গমন,
স্বধামে—পরমানন্দে—হইয়া উদ্ধার!

মল্লিকা।

বিমল—বিশদ বেশ বিনোদ-বরণ,
শান্ত-মূর্ত্তি শুভ্র-কান্তি বিশুদ্ধ বসনে
শোভিছে—কোমল কলি তরুর ভূষণ—
মল্লিকা—দুলিছে মৃদু, মৃদুল পবনে।
কোমল হৃদয় তব সদা মধুময়,
বিমল সৌন্দর্য্যে তব নাহি অভিমান!
সুস্নিগ্ধ-সুরভি-শ্বাস—সরস-হৃদয়
সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি শান্তি করে দান।
মল্লিকে! হেরিলে তোর মধুর মাধুরী,
প্রগাঢ় ভকতি রসে মগ্ন হয় মন;
সাধে কি বঙ্গের সাধ্বী কুলবতী নারী
কোমল-কুসুম করে করিয়া ধারণ,
চন্দনে—তুলসীসনে—তোরে সিক্ত করি,
পুণ্যাহ বৈশাখে পূজে হরির চরণ।

শ্রীরসময় লাহা।

সেই মুখ খানি।

কত দিন—কত দিন—হায় কত দিন !
দেখিনি সে মুখ খানি, শুনিনি মধুর বাণী ;
দেখিনি দেখিনি তার নয়ন নলিন,
হায় কত দিন ;

আহা ! সেই মুখ খানি—মধু-মাখা মুখ,
কত দিন হ'ল হায় ! চুম্বন করিনি তায়,
আনন্দে অধীর হয়ে ধরিয়া চিবুক ;
মধু-মাখা মুখ !

কি যেন মাধুরী-মাখা সে চারু বদনে
যেন চন্দ্রিকার রাশি, খসিয়া পড়েছে আসি ;
তাই বুঝি সুধাময় সদা হয় মনে
সে চারু বদনে !

সলজ্জ বদনে কিবা ভাবের বিকাশ !
যতবার যতবার— হেরি মুখ খানি তার,
ততবার হেরিবার মনে হয় আশ ;
ভাবের বিকাশ !

আহা সেই সুধামুখী হৃদয়-রঞ্জিনী
এখন কোথায় আছে ? বল গেল কার কাছে
দেখিতে পাইব সেই চাঁদমুখ খানি ?
হৃদয়-রঞ্জিনী !

কত দিন পরে পুনঃ সেই মুখ খানি—
ধরিয়া পুলকে হায় ! আদরে চুমিব তায় ;
শুনিব দুইটি তা'র সুমধুর বাণী—
সেই মুখ খানি।

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।



মাসিক সংবাদ।

সমর-স্রোত ভারতের চারিদিকে প্রবাহিত। দক্ষিণে—তিওতিকরণে গোলযোগ ; পশ্চিমে—গিরগ্রাই ও কৃষ্ণ পর্ব্বতে বিদ্রোহ ; পূর্ব্বে—মণিপুরে সংগ্রাম। সিংহ শিকার দেখিয়া চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু মাঝে থাকিয়া আমরাই মারা যাইব দেখিতেছি ; কারণ, রাজ্য হজম করিবার জন্য রজত-খণ্ড আমাদিগকেই যোগাইতে

হইবে। সিংহের হুঙ্কার,—তর্জ্জন গর্জ্জন, প্রবল প্রতাপ থাকিলে কি হইবে? আমাদের ধন-বলেই ত তাঁহার এত আধিপত্য।

ইংরাজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে মণিপুরের গৃহ-বিবাদ মিটাইতে যান এবং বড় লাটের আদেশানুসারে মণিপুরের সেনাপতি ও যুবরাজকে কৌশলে ধৃত করিবার জন্য তথায় গিয়া এক দরবার করিয়া যুবরাজ ও সেনাপতিকে তলব করেন। যুবরাজ ইংরাজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন না। ইংরাজ রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। শুনিতে পাই রাজ-অন্তঃপুরচারিণী রমণী ও শিশু সন্তান দিগকে ও নাকি, ইংরাজ-সৈন্যেরা হত্যা করিয়াছিল। এবার মণিপুরীরা ক্ষেপিল—ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল—ভীষন অনল প্রজ্জলিত হইল। ইংরাজ-সৈন্য পরাস্ত হইল, রেসিডেন্সি ভস্মসাৎ হইল. আসামের চিফ্ কমিশনর কুইন্টন,তাঁহার পার্শ্বচর কজিন্স, পলিটিকাল এজেণ্ট গ্রীম্ উড্, সেনাপতি কর্ণে লস্কীন,সহকারী সেনাপতি স্কিমসন্, এবং টেলিগ্রাফের মেলভিল্ ও ব্রিয়েল সাহেব, মণিপুরিগণ কর্তৃক বন্দী ও শেষ শমন-সদনে প্রেরিত হইল।

এখন ইংরাজ প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা করিয়া ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইয়াছেন,চারিদিক হইতে মণিপুরে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। মণিপুরধ্বংশের বিরাট আয়োজন হইতেছে।

এতদিনে মণিপুরের কপাল ভাঙ্গিল। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজের কাছে কে না পরাজিত হয়? মণিপুরীরা যে পরাজিত হইবে, ইহা নিশ্চয়; তবে নর-শোণিতে ধরণী প্লাবিতা না হইলে আর নিস্তার নাই। যা' হোক সুখের বিষয়, শুনিতেছি যে, মণিপুর-রাজ তাঁহার দুই ভ্রাতা ও সেনাপতি সমভিব্যাহারে রাজ-বাটী ও দুর্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তর পূর্ব্বে গমন করিয়াছেন এবং ইংরাজেরা নির্ব্বিবাদে রাজবাটী ও দুর্গ দখল করিয়াছেন।

***

শুদ্ধ যে যুদ্ধ-বিদ্রোহ হইতেছে এরূপ নহে, দাঙ্গা হাঙ্গামও বন্ধ নাই। চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাদেবের পূজা-উপলক্ষে হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থ-স্থান তারকেশ্বরে অনেক সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। মহাত্মা খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রীগণ এ সময়ে অলস থাকিতে পারেন না। আহা! এই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু, নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া—উপবাস করিয়া—নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া,দুঃসাধ্য সন্ন্যাস-ব্রত পালন করিতেছে, ইহা কখনই তাঁহাদের দয়াদ্র চিত্তে সহ্য হয় না; সুতরাং তাহাদের স্বধর্ম্ম হইতে বিশ্বাস নষ্ট ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করিবার জন্য,শ্রীরামপুর হইতে এক জোড়া পাদ্রী তথায় প্রচার করিতে যান। তাঁহারা যবন ও হিন্দুর অস্পৃশ্য হইলেও পাদ্রী বলিয়া আপনাদিগকে পবিত্র ও ঈশ্বরের বরপুত্র জ্ঞানে, একেবারে ৺ তারকেশ্বরের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং মহাদেবের উদ্দেশে ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্য-প্রয়োগ, সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে নিন্দা ও হিন্দু-ধর্ম্মের গ্লানি করিতেও ক্রুটি করেন নাই, এবং ইহার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহারা যথেষ্ট রূপে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েন। পাদ্রীদ্বয়ের তখন প্রচার করা ঘুরিয়া গেল, বিষম শঙ্কট দেখিয়া শান্তি-রক্ষক শান্ত-মূর্ত্তি-

দের শরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া, আসরে নামিলেন; পুলিষ আসিল, সৈন্যসামন্ত আসিল; রব উঠিল,—"সন্নাসী বিদ্রোহ হইয়াছে।" যাহারা পাদ্রীদের লাঞ্ছিত করিয়াছিল, তাহারা দেখিল অনেক লাল মুখ আসিয়াছে; সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারাও নারিকেল—বেল-বৃক্ষ-প্রসূত গোলা চালাইতে লাগিল। জনরব—ইহার আঘাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের টুপি পড়িয়া যায়। তাহার পর—দাঙ্গা হাঙ্গামকারীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। গ্রেপ্তার হইল—দূর দেশবাসী, গৃহত্যাগী, ধর্ম্ম-সচক্ষয়াভিলাষী, উপবাসী, নিরপরাধী ব্যক্তিগণ!

***

ধর্ম্ম-বিভ্রাটেরও বিরাম নাই। ৺কাশী-ধামে, নূতন জলের কল হইবার বন্দোবস্ত হয়। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা রামজীর মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে জলের কল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুরা ইহাতে আপত্তি করে এবং অধঃস্তন মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী হইতে সর্ব্বোচ্চ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী লাট বাহাদুরের নিকট পর্য্যন্ত আবেদন করে; কিন্তু কোন সন্তোষ-জনক উত্তর পাইল না। অধিকন্তু তাহাদের বিদ্রূপ করা হয় এবং তাহাদের অন্তরে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, মন্দির ভঙ্গ করা হইবে। এই বিষয় লইয়া সেখানেও একটি ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জলের কল ও নল সমূলোৎপাটিত হইয়াছে, সীতারাম ও শিবপ্রসাদের বাটী এবং রাজঘাট ষ্টেশন্ লুণ্ঠিত হইয়াছে, ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। দোষী নির্দ্দোষ সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা বিচারাধীন।

***

কাপ্তেন ভার্ণে এবং মিঃ ডিকোবিয়ান, বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার দুই জন সভ্য। কাপ্তেন ভার্ণে বকিংহামের প্রতিনিধি ও মিঃ ডিকোবিয়ান বেলফাষ্টের প্রতিনিধি। ইহাঁদের দুই জনের নামেই গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। অপরাধ—কাপ্তেন ভার্ণে একটি বালিকাকে বাহির করিয়া আনিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন, এবং মিঃ ডিকোবিয়ান অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়াছেন। কাপ্তেন ভার্ণে ধৃত হইয়াছেন, বাস্কেট নাম্নী জনৈক বালিকা তাঁহাকে দেখাইয়া বলিয়াছে যে, "এই ব্যক্তিই আমার প্রতি পাশব অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।" তিনি এক্ষণে জামিনে আছেন। মিঃ ডিকোবিয়ান বৃটিশ রাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। হায়! এই সকল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষরাই আবার, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—যিনি ভারতে বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য 'সহবাস সম্মতির' আইন পাশ করিয়াছেন, তাঁহার পরিচালক সভার সভ্য!!!

***

গিরিজা সুন্দরী—মেয়ে মানুষ—বয়ঃক্রম ৩৩।৩৪ বৎসর। তিনি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও পবিত্র প্রেমের মডেল ভগিনী; সুতরাং, নৈরাকারিক ভায়াদের চক্ষে তিনি হিন্দু! কেননা তিনি বাস করিতেন—ব্রাহ্ম-পরিবারে সহিত এবং এই বয়সে, বিদ্যাভ্যাস করিতেন—বিলাতী মিস্ নিলের স্কুলে, এই

খানে তাঁহার মৈত্রী ভাব। তিনি আহার করিয়াছিলেন—বিজাতীয় বিদায় ভোজ, এই খানে তাঁহার সাম্যভাব! তিনি ছিলেন—বালবিধবা, হইলেন—আবার যৌবনে সধবা, এই খানে তাঁহার স্বাধীনতা। তিনি হইয়াছিলেন—গর্ভধারিণী ও গর্ভধ্বংশিনী দুই,—এই খানেই তাঁহার পবিত্র প্রেমের ফলোদয়!

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা-প্রিয়া সহযোগিনী বলেন,—"ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয়ে অনেক পতিত লোক পবিত্র হইয়া গিয়াছে, গিরিজাও পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য উৎসুক হইল।" আমরা বলি—সহযোগিনীর কথাটা বড় ঠিক, গিরিজার "পবিত্র জীবনই" বটে, এমন পবিত্র জীবন অপবিত্র হিন্দু-সমাজে কেমন করিয়া যাপন করিতে পারে? সেই জন্যই গিরিজা সুপবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় লইয়াছিল।

অম্বিকাচরণও হিন্দু. কারণ সে বালবিধবা গিরিজাকে তাহার পিত্রালয় হইতে বাহির করিয়া, বরিশালে পাচার করে, তাহার বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া, স্বীয় বালিকা-স্ত্রীকে সধবা-অবস্থায় বৈধব্য-যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ গান্ধর্ব্ব্য-মতে বিধবা গিরিজাকে বিবাহ করে। গিরিজার গর্ভ হয় এবং গর্ভ নষ্টও করা হয়। তাহার পর গিরি যখন বেহাত হইয়া, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর তাঁবে আসিয়া পড়িল, তখন অম্বিকাচরণ গিরির পতি-পদচ্যুত হইয়া ভ্রাতৃস্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য পত্র লিখিল,—"তোমার উপর আমার কুভাব নাই, চল গিরি, চল গভীর কাননে যাই, নচেৎ আর শান্তি নাই। চল, 'ভ্রাতৃ ভাবে' গিয়া ভগবানের ভজনা করি।" কিন্তু ইহাতেও গিরিকে না পাইয়া অম্বিকাচরণ পতি-প্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেমের সমাবেশ-বলে গত ২৪শে চৈত্র তারিখে রাত্রি ১০টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে গিরিজা যখন গাড়ী হইতে অবতরণ করে, তখন তাহাকে হত্যা করিয়া ভালবাসার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করে। অতএব, অম্বিকা ও গিরিজা উভয়েই হিন্দু! কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসভ্য হিন্দুরা আজও এরূপ "ভ্রাতা ভগিনী" প্রেম শিখে নাই!! এবং হিন্দু-ললনা এখনও এরূপ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-প্রিয়া হয় নাই!!!

আমরা এইখানে গিরিজাম্বিকা অভিনয়ের যবনিকা পতন করিলাম, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিবার প্রয়োজন নাই; তবে নিতান্ত আবশ্যক হইলে, মধ্যে মধ্যে দু'একটা প্রহসনের অভিনয় দেখাইব।

***

হুগলীর অন্তর্গত বইচি গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের মৃত্যু হয়। ৩০শে চৈত্র তাহার শ্রাদ্ধ হইবার কথা। উক্ত মৃত ব্যক্তির বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা পত্নী পতি-বিয়োগ-যন্ত্রণা অসহ্য বোধে, সর্ব্বদা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিত। গত ২৮শে চৈত্র সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার মৃত স্বামীর কতিপয় জামা পরিধান করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্থিরভাবে শয্যার উপর উপবেশন করেন। অগ্নি যখন প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার পবিত্র শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম' করিতে লাগিলেন,

এই শব্দে তাঁহার আত্মীয়গণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছে, অথচ, তিনি প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন! তাঁহার কোনও কষ্ট হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"অল্পক্ষণ মধ্যেই সমস্ত কষ্ট নিবারণ হইবে।" এইরূপে সাধ্বী, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়া স্বামীর অনুমরণ করেন।

গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ উঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কি যে, প্রকৃত সতীকে স্বামীর অনুগমন করা হইতে বিরত রাখেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচন।

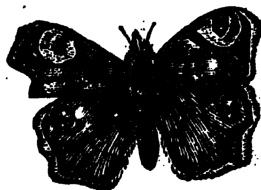
১২। **নিকুঞ্জ-বিহার** বা গোপিনী-লীলা—নাট্যগীতিকা। শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৯ নং, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া, কলিকাতা। ১২৯৭ সাল। মূল্য—।০ আনা মাত্র।

এই পুস্তক খানিতে অনেকগুলি সঙ্গীত আছে, সঙ্গীত গুলিতে মধ্যে মধ্যে রচনা-মাধুর্য্য ও ভাবের সমাবেশ আছে। ভুবন বাবু উত্তরোত্তর লেখার উন্নতি করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

১৩। **বিল-বিভ্রাট পঞ্চরং** (প্রথম ভাগ) এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক খানি সহবাস-সম্মতির আইন সম্বন্ধে ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকার কবিতা রচনায় পটু নহেন, কিন্তু, তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গ্রন্থকার বা প্রকাশকের বা প্রেসের নাম ধাম কিছুই নাই। এই পুস্তকের মধ্যে ব্রাহ্মদৈত্য পর্ব্বের একস্থলে লেখা আছে,—

"মানি মোরা ঈশ্বরের সুগুপ্ত নিয়ম—
গুহ্য কার্য্য—বংশবৃদ্ধি. ভগিনি সহায়ে,
পালিতে, জন্মেছি মোরা এই ভূমণ্ডলে!
কিন্তু, তা ব'লে কি, তারা অপ্রাপ্ত যৌবনে
পারে সহিবারে পাশবিক অত্যাচার!"

এরূপ পুস্তকের প্রশংসা অপ্রশংসনীয়।



শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



সুবোধিনী

শ্রীকালিদাস মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১২৯৮।

কলিকাতা।

৩ নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ; ও ৩২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট

হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৮।

নিয়মাবলী।



১। সুবোধিনী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে এক সংখ্যা করিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

২। সুবোধিনী সর্ব্বত্র ডাক-যোগে প্রেরিত হয়, অতএব যদি কেহ কোন মাসের সুবোধিনী নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তিনি তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন; ইহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। সুবোধিনীর অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল লাগে না। অগ্রিম মূল্য না পাইলে, কাহাকেও গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

৪। যাঁহারা আগামী আষাঢ় মাসের মধ্যে সুবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত **চারি খানি পুস্তক উপহার পাইবেন।**

(ক) মানসকুসুম (কবিতাপুস্তক) শ্রীকালিদাস মিত্র প্রণীত।

(খ) A Visit to Darjiling, by Bhola Nath Mitter.

(গ) ধর্ম্ম-পরীক্ষা (নাটক) শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

(ঘ) একটি চিত্র (উপন্যাস) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

যাঁহারা মানস-কুসুম পাইয়াছেন, তাঁহারা মানস-কুসুম ব্যতীত অপর তিন খানি পুস্তক পাইবেন।

৫। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী থাকিবেন। সম্পাদক বা প্রিণ্টার দায়ী নহে।

৬। যদি কেহ সুবোধিনীতে নিজ বিরচিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

৭। সুবোধিনীতে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি লাইন ।০ আনা।

৮। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

৯। সুবোধিনী সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র ও মূল্যাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—সিমুলিয়া।

শ্রীকালিদাস মিত্র,
সুবোধিনী-সম্পাদক ও সত্বাধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ—১২৯৮। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

(চতুর্দ্দশপদী কবিতা।)

চিতা ও চিন্তা।

মানবের প্রিয়তম যতনের ধন,
মানব সতত মুগ্ধ যাহার মায়ায়;
ভোগসুখ-অভিলাষে যাহার কারণ—
সুবেশে আবেশ কত বিবিধ সজ্জায়;
এ হেন শরীর যবে হইবে পতন,—
পড়িয়া রহিবে যবে এ নশ্বর কায়—
ফুরাইবে ভব-লীলা—ফুরা'বে জীবন,
দহিবে তখন দেহ জ্বলন্ত চিতায়।
হায় রে! চিতার চেয়ে কি আছে ভীষণ—
অনল?—যাহার বলে দহে অনিবার
জীবন্ত মানবে?—চিন্তা; (জীর্ণ করে মন)
নিভে না—যতই ঢাল নয়ন-আসার।
চিতা—শব-দেহ দগ্ধি' করে ছারখার;
চিন্তা—দগ্ধে নর দেহ থাকিতে জীবন।

সম্পাদক।

নদী ও জীবন।

তটিনি! তোমারি সম অভাগা জীবন!
আজনম একাকিনী সংসার-মাঝারে—
কেহ নাই কভু তোরে পথ দেখা'বারে
'অনাথিনী' ভালে তব বিধির লিখন।
উচ্চ আশা-গিরি যদি কর আরোহণ,
তখনি লো! ফেলে ছুঁড়ে নিরাশা-আঁধারে;
শতেক বাসনা তার অকূল পাথারে
দুরদৃষ্ট ঝঞ্ঝাবাতে হয় নিমগন।
দলে শত সেতু তোরে,—ভাগ্যধর যথা
সংসারের পথে দলে অভাগা জীবন;—
বুঝিল না কেহ কভু তোর খেদ-কথা!
হেরিল না কেহ তোর উত্থান পতন।
চিরদিন নিজ মনে বিষাদের গান
গাহিয়া, হৃদয়-জ্বালা কর অবসান।

শ্রীমন্মথনাথ দে।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

এদিকে জমীদার বাবুর বাটী হইতে বিতাড়িত হইয়া সহচরী নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রোদন করিতে করিতে মাতঙ্গিনীর বাটীতে গমন করিলেন মাতঙ্গিনী তাঁহার মুখে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু অবিশ্বাসও করিলেন। সহচরী তাঁহার বাটীতে বাস করিবেন, ইহা তাঁহার মনে ভাল লাগিল না। পূর্ব্বে আমরা মাতঙ্গিনীর কথা কিছু কিছু বলিয়াছি। সহচরীর মিথ্যাপবাদ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাতঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন এবং এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সহচরী তাহাতে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া গঙ্গা গর্ভে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া গোপনে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। মাতঙ্গিনী স্বীয় উদারতা দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিবেশিনীদিগের বাটীতে সহচরীর অন্বেষণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপ জানিতেন।

নিরপরাধা সহচরী আশ্রয় না পাইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। যে ঘাটে লোকজনের বড় গতিবিধি নাই, সহচরী সেই ঘাটেই গমন করিলেন। গাঙ্গিনীর প্রশস্ততা ও তরঙ্গ-নিচয় অবলোকন করিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সহচরী মনে ভাবিলেন আত্মহত্যা করিব কেমন করিয়া? আত্মহত্যা মহাপাপ। একে এ জন্মে এত কষ্ট ভোগ করিতেছি, আবার কি আত্মহত্যা করিয়া নিরয়গামিনী হইব? তাহা হইবে না। আর কেনই বা মরিব? কি দুঃখই বা আমার হইয়াছে? আমার যখন সোণার-চাঁদ স্বামী বর্ত্তমান আছেন, তখন আমার কি নাই? আমি যখন স্বামীধনের ধনী, তখন আমার কোন ধনের অভাব আছে? দেখিব—ভাল করিয়া দেখিব বিধাতা আরও কি করেন, দেখিব দুঃখের শেষ কোথায়, দেখিব পাতাল কোথায় অবস্থিত।

সহচরি! মগ্ন হইয়া যাও, চক্ষু কর্ণ বুজিয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাও। লোকের কাছে বলিতে পারিবে দুঃখের শেষ দেখিয়াছি, দুঃখ-সাগরের তলস্পর্শ করিতে পারিয়াছি।

দ্বাদশ বৎসরের পর স্বামীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সহচরীর সাহস বাঁধিয়া গিয়াছে। সহচরী এখন বেশ বুঝিয়াছেন,—দুঃখ সুখ চিরস্থায়ী নহে। সহচরি! তুমি মাতঙ্গিনীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছ, ভালই হইয়াছে, কাংসের সহিত সুবর্ণের অবস্থিতি ভাল দেখায় না। তুমি কৃশানু-দগ্ধ সুবর্ণ;

ক্ষণমাত্র ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছ বলিয়া কি তোমার বিমলত্বের ব্যত্যয় জন্মিয়াছে?—কদাচ এমন মনেও করিও না। যদুনাথের হৃদয়রূপ নিকষ-পাষাণই তোমার একমাত্র পরীক্ষার স্থল। সহচরী ক্ষণকাল অবস্থিতি কর; যদুনাথ আসিয়া তোমার অন্তর প্রত্যাপ্ত অলাত-শল্য উৎপাটন করিবেন, ক্রকচ কর্ত্তিত হৃদয়-মর্ম্মে শান্তি-বারি সেচন করিবেন। সহচরি! তুমি যাতি কুসুম দেখিয়াছ? পদবিদলিত বা মযূখভ্রষ্ট হইয়াও তাহার সৌগন্ধ বিনষ্ট হয় না। তুমি সেই যাতি কুসুম।

পাঠক মহাশয়! সহচরীকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহার দুঃখের অবসান নাই। সহচরীর সুখ যেন প্রাবিট্ গগনের ক্ষণপ্রভা,—প্রচণ্ড নিদাঘের মুষ্টিমেয় দক্ষিণানিল—কি করিব?—বিধিলিপি খণ্ডন করে কাহার সাধ্য?

সহচরী মাতঙ্গিনীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। মনে করিলেন যত দিন না স্বামীমুখ দেখিতে পাই, ততদিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক কোন প্রকারে দিনপাত করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহচরী গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি সমীর-দোদুল্যমান সন্তানকের সর সর শব্দ শ্রবণ ও গাঙ্গিনীর বলাকা-শোভিত সৈকত-চরের বিমল শোভা সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেহই নিকটে নাই, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই কেবল বৃক্ষ, লতা, বন, শস্যক্ষেত্র, নদী—এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; রাত্রি হইলে কোথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবেন—এই রূপ নানা কারণে ও নানা ভাবনায় তাঁহার মন প্রাণ হু হু করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য তাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে সলিল-প্রান্তে উপনীত হইয়া এক অঞ্জলি গঙ্গামৃত্তিকা উত্তোলন করিলেন এবং উহা ললাটে, বাহুতে ও বক্ষস্থলে উত্তম রূপে লেপন এবং ললাটের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে ভিখারিণী—সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া তণ্ডুলাদি ভিক্ষা প্রদান করিলেন। সহচরী পুনরায় গঙ্গাতীরে আসিয়া উহা ভিজাইয়া আহার করিলেন। সে দিন কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। রজনী সমাগতা হইলে, তিনি একজনের বাহিরের দাওয়ায় পড়িয়া নিদ্রা গেলেন।

নিত্য নিত্য এইরূপ আমান্ন ভোজন ও রজনীতে হিমভোগ করিয়া সহচরী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার স্বর্ণকায় শীর্ণ হইয়া আসিল। নয়ন জ্যোতিঃবিহীন ও বদন-মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। মাসাধিক কাল এইরূপ অতিবাহিত হইলে, একদা তিনি এই বেশে জমীদার বাবুর বাটীর দিকে গমন করিলেন। সহচরী এখন শ্রীহীনা,—তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গ মৃত্তিকালিপ্ত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; বরং ভিখারিণী বলিয়া সকলেই উপেক্ষা করিল। সহচরী বিষণ্ন মনে গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলেন। কত পরিচিত

লোক তাঁহার নয়ন পথের পথিক হইল, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট পরিচিতা হইলেন না।

অবিরত গাত্রদাহ-নিবন্ধন একদা বেলা দ্বিপ্রহরের প্রাক্কালে শ্যামার ইচ্ছা হইল গঙ্গাস্নানে গমন করিবে। সে শারদা সুন্দরীর অনুমতি লইয়া কলসী কক্ষে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামা দূর হইতে সহচরীকে দেখিতে পাইয়া চিনিতে পারিল না। কিন্তু সে সর্ব্বদাই চিন্তা করে সহচরী কোথায় গেলেন,—সহচরী কি জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলেন—না সহচরী নিরুদ্দেশ হইয়া ভিন্ন দেশে গমন করিলেন? যেমন করিয়াই হউক, ধর্ম্ম, দিনান্তে অন্ততঃ একবারও সহচরীর বিমল মূর্ত্তি তাহার সম্মুখীন করিতে ক্রটি করেন না। এই নিমিত্ত শ্যামার সভয় নয়ন যখনই সহচরীর সমবয়স্কা কোন কামিনীর প্রতি হঠাৎ কটাক্ষপাত করে, তখনই তাহাকে সহচরী বলিয়া তাহার ভ্রম জন্মে। শ্যামার সমস্ত কার্য্যই এখন সহচরী-বিরহিত; শ্যামার শয্যা এখন সহচরী-শূন্য। শ্যামা কখন স্বপ্ন দেখিয়া "সই" বলিয়া ডাকিয়া উঠে, কিন্তু সই যে উত্তর দিবে শ্যামা কি সে পথ রাখিয়াছে? যাহা হউক, তাহার শরীরও মনের অবস্থা এখন বড় মন্দ।

শ্যামা দূর হইতে মৃত্তিকা-বিলেপিতাঙ্গী সহচরীকে দেখিয়া মনে মনে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিল—ইনি সহচরী ভিন্ন আর কেহই নহেন। যাহা হউক, নিকটে যাইবার আবশ্যক নাই, এই বিবেচনায় সে অপর ঘাটে নামিয়া মুহূর্ত্ত মাত্রেই স্নানাদি সমাপন করিল এবং তাঁহার দিকে গুপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে বাটী-অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। শ্যামা ইহাও দেখিল যে, দুর্বৃত্ত বালকগণ সহচরীকে পাগলিনী মনে করিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে লোষ্ট্রাঘাত ও ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে। সহচরী ম্রিয়মাণা হইয়া সমস্তই সহ্য করিতেছেন।

শ্যামা! পাপিয়সি! একবার নিকটে যাও—সতী সাধ্বীর চরণ ধরিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে বাটী প্রত্যাগমনের অনুরোধ কর—শারদা সুন্দরীর নিকট পাপের সমুচিত প্রতিফল মাগিয়া লও।

শ্যামা! তোমার সাধ্য কি যে তাঁহার নিকটে যাও? জ্বলন্ত অঙ্গার-স্বরূপ সতীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তোমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে—ঐ দেখ তোমার চরণ আর চলিতেছে না—শ্যামা! দূরে পলায়ন কর, নতুবা ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে।

শ্যামা চলিয়া গেল। সহচরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বামী-চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। বসিয়া বসিয়া সহচরীর নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি ঘাটের উপরেই বিবশা হইয়া নিদ্রা গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি ভিখারিণীর গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভিখারিণী তাঁহার চির-পরিচিত। ভিখারিণী সুরট-মল্লারে গাহিল,—

সাধ পূরিবে কি আর?
সে সাধে বিধাতা বাদ সেধেছে আমার!
বহুল যতন ক'রে, রতন রাখিনু ঘরে;
কে তারে লইল হ'রে, হইল সে কার?
যাহার লাগিয়ে মরি, সে দেয় গলায় ছুরি!
এ লীলা বুঝিতে নারি, একি চমৎকার!

গীত শুনিয়া সহচরীর চক্ষে জল আসিল, ভিখারিণী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কি করিয়াই বা চিনিবে?

সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিখারিণী আমায় চিনিতে পার?"

ভিখা। না ভাই! চিন্‌তে পারি না।

সহ। তুমি হুগলীর ঘোষাল মশাইদের বাড়ী যাও কি?

ভিখা। হাঁ, সেই খানেই অনেক দিন ছিলাম।

সহ। চ'লে এলে কেন?

ভিখা। সে ভাল লোকের বাড়ী নয়।

সহ। কেমন ক'রে জান্‌লে?

ভিখা। সে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

সহ। এত দিন সেখানে কি কর্‌ছিলে?

ভিখা। ঘোষাল মহাশয় যত্ন করিতেন, আমিও আর ভিক্ষা কর্‌তেম না।

সহ। এখন?

ভিখা। এখন?—আবার ভিখারিণী।

সহ। আমিও একজন ভিখারিণী। আমায় বল না, কেন চলে এলে?

ভিখারিণী কানে কানে সমস্তই বলিলেন। চণ্ডীচরণের দক্ষিণ হস্তটী কাটা গিয়াছে শুনিয়া সহচরী ব্যথিতা হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ভিখারিণী বলিলেন,—"আমি এখন নৈহাটীতেই থাকিব—তুমি পরিচয় দাও।"

সহচরী তাঁহার কানে কানে আত্ম বিবরণ প্রদান করিলেন। ভিখারিণী শুনিয়া বিস্মিতা হইলেন। পাঠক মহাশয়! এখন চিনিয়াছেন ভিখারিণী কে? ইনি সেই রাজা সিতাবরায়ের কন্যা শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী। বিধাতা সহচরীর দুঃখ দেখিতে না পারিয়া, ইহাঁকে নৈহাটীতে প্রেরণ করিয়াছেন। সহচরীকে আর এখন শুষ্ক তণ্ডুল ভোজন করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না। এখন দুই ভিখারিণী একত্র হইয়া স্বতন্ত্র রন্ধন পাকাদি করিয়া আহারাদি করিতে পারিবেন। শয়নের একটা স্থান নির্দ্ধারিত হইবে। অনঙ্গমোহিনী ত আর সামান্য লোকের কন্যা নহেন। সহচরি! তোমার সুরাহা হইল; এখন তুমি মনের মত মানুষ পাইয়াছ, এখন কথাবার্ত্তা কও সকলই মিলিবে—, উভয়ের হৃদয়-তন্ত্রী একসুরে বাজিবে।

সহচরীর দুরবস্থা দেখিয়া গিয়া শ্যামার মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সে সত্বরে অশন পানাদি সমাপন করিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। মনে মনে সহচরীর গুণরাশি যতই আন্দোলন করিতে লাগিল, ততই তাহার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সহচরী আমার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতেন, আমিই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছি,এই সকল ভাবনা মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আর তিলার্দ্ধ সুস্থির হইতে দিল না। সে কখন শয়ন, কখন উপবেশন, কখনও বা পাদচারণ করিতে লাগিল। কোথায় গিয়া কেমন করিয়া মনস্থির হইবে, তাহার নির্ণয় করিতে পারিল না। শ্যামা দেখিল এ পাপের আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; মৃত্যুই ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! মৃত্যুই যদি স্থির হইল, তবে সহচরীর একটা উপায় করিয়া যাইব; সে কেন আর পথে পথে কেঁদে বেড়ায়? তার

ত কোন দোষ নাই, সে যে সতী সাধ্বী পতিব্রতা। আমিই পাপিয়সী। ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তাহাকে নানা কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছি। শ্যামা করযোড়ে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল,—"হে জগদীশ্বর! এই পাপিয়সীকে এই পাপরাশি হইতে উদ্ধার কর—প্রভো! আমায় নরকে নিক্ষেপ করিও না—এই কর নাথ! যেন এই ভব যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে পারি—আমার যে আর সহ্য হয় না—প্রাণ যে ফাটিয়া যায়—দয়াময় হরি! চরণ প্রান্তে স্থান দান কর।"

শ্যামা, শারদাসুন্দরীর নিকট কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। সে মনে করিল লেখা পড়া আর কোন্ কালের জন্য? এইবার শিক্ষয়িত্রীর নিকটে লেখা পড়ার পরিচয় দিব,—এই মনে করিয়া শ্যামা পত্র লিখিতে বসিল। দ্বার ত রুদ্ধই আছে।

শ্যামা লিখিল,—

বৌ-ঠাকুরাণি!

আমার এই হিজি বিজি লেখা তুমি পাঠ করিবে, ইহা মনে হইলে আমার লজ্জা হয়। যাহা হউক, তোমার সহিত ত আর আমার দেখা হইবে না, যে তুমি আমার লেখার জন্য গঞ্জনা দিবে। তবে যদি মরা মানুষ গঞ্জনা খাইতে পারে, তবে আমিও খাইব। দুই চারি কথায় শেষ করিয়া দি—তোমার সময় অল্প, তুমি অধিক পড়িয়া উঠিতে পারিবে না। আমার মত পাপিয়সী ও দুশ্চারিণী এ জগতে নাই। আমি সতী সাধ্বীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর অধিক পাপ কি হইতে পারে? সহচরী অকলঙ্ক চাঁদ আর আমি পোড়ার মুখী রাক্ষসী। সহচরী ভিখারিণী-বেশে এই পল্লীতেই বাস করিতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। সহচরীকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, তুমি তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া লইয়া আইস এবং পূর্ব্বের মত স্নেহ মমতা কর, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। আমি চলিলাম—এ জগৎ ছাড়িয়া চলিলাম—আমাকে বিদায় দাও। গুরুদেব করুন তুমি সাত বেটার মা হও আর সুখে সচ্ছন্দে ঘর কন্না করিতে থাক। আমার সইকে বলিও যেন তিনি আমার কোন অপরাধ না লন। আমার প্রায়শ্চিত্ত আমি করিতে বসিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে সমস্তই দেবতা ব্রাহ্মণকে দান করিও। এখন আমি চলিলাম, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আমার দেহ আমার ঘরেই রহিল—দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইবে। ভয় পাইও না, নামাইয়া সৎকার করিও।

পাপিয়সী—
শ্যামা—

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, শ্যামা উহা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া উপরিভাগে শারদা সুন্দরীর নাম লিখিল। পত্র হস্তে করিয়া ভাবিতেছে এমন সময় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শ্যামা, শারদা সুন্দরীর শয্যা প্রস্তুত করিতে চলিল। শয্যা প্রস্তুত হইলে শ্যামা ঐ পত্র খানি শারদা সুন্দরীর উপাধানের নিম্নে লুকাইয়া রাখিল এবং গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য গৃহকার্য্য সমাধা করিতে লাগিল। সে যাহার নিকট যাহা কর্জ্জ লইয়াছিল, সকলকেই সমস্ত চুকাইয়া দিল। শ্যামার অন্তঃকরণে কি আছে তাহা কে জানিবে?

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে, শ্যামা প্রসঙ্গ-ক্রমে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সকলে কত উপহাস করিতে লাগিল। সে যাহা হউক্ শ্যামা আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া লইল এবং সকলকে বলিল,—"ভাই! তোমরা উপহাস কর আর যাই কর, আমার প্রাণ কিন্তু থেকে থেকে কেমন করে উঠে আমি আর বোধ করি বেশী দিন বাঁচ্‌বনা।" তাহারা বলিল,—"মরণ আর কি! অমন কথাও মুখে আন্‌তে আছে! মর্‌তে যাবি কেন? কার ধার ক'রে খেয়েছিস্?"

ক্ষণকাল পরে শ্যামা কোন কার্য্য-ব্যপদেশে উঠিয়া গেল এবং আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তৎপরে এক খানি কাপড় লইয়া লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিল; এবং উহা ভাল করিয়া পাকাইয়া তাহাতে একটি ফাঁস প্রস্তত করিল, এবং আপন সিন্দুকের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পট, মহাপ্রসাদ, চরণ তুলসী, প্রভৃতি বাহির করিয়া অন্তিমকালে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিল। কলসী হইতে গঙ্গাজল গড়াইয়া কিঞ্চিৎ পান করিল এবং তৎপরে ঐ সিন্দুকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঐ বস্ত্র নির্ম্মিত রজ্জু কড়িকাঠে শক্ত করিয়া বাঁধিল, এবং ঐ ফাঁস গলদেশে লাগাইয়া দিয়া হরিবোল দিতে দিতে ঝুলিয়া পড়িল। ফাঁস গলায় বসিয়া গিয়া যখন ছট্‌ ফট্‌ করিয়া প্রাণ বাহির হইতে যায়, তখন শ্যামা মনে করিলে ঐ সিন্দুকের উপর পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া কোন প্রকারে রক্ষা পাইতে পারিত; কিন্তু সে তাহা করিল না, নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিয়া অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। ক্রমে, রাত্রি অধিক হইলে সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিল। শ্যামাকে বড় কেহ অন্বেষণ করিল না। শ্যামা সকল মায়া কাটাইয়াছে, এখন আর কে তাহার খবর লইবে?

রজনী প্রভাত হইল—দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শারদাসুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। উপাধান কিঞ্চিৎ সরিয়া যাওয়াতে তন্নিম্নস্থিত পত্র খানির কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। শারদা উহা সাগ্রহে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে প্রতাপচন্দ্রকে জাগাইলেন এবং পত্রখানি পাঠ করিতে বলিলেন, পত্র পাঠ করিয়াই প্রতাপ চন্দ্র শশব্যস্তে শ্যামার গৃহোদ্দেশে গমন করিলেন। শারদাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৃহ-সন্নিকটে গিয়া দেখিলেন—দ্বাররুদ্ধ। "শ্যামা শ্যামা" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। শ্যামা কি আর আছে—যে উত্তর দিবে? প্রতাপচন্দ্র দ্বারে দুই চারিটা পদাঘাত করিতেই অর্গল ভগ্ন হইয়া কবাট উন্মুক্ত হইল। শারদাসুন্দরী দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিলেন। প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অগত্যা লোক জন ডাকাইয়া মৃত দেহ নামাইলেন এবং উহা সত্বরে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। পুরনারিগণ সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। শারদাসুন্দরী সকলকে পত্রখানি দেখাইলেন এবং "অভাগিনীকে এমন কাজ কে করিতে বলিয়াছিল", বলিয়া কত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাটীতে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিল। মধ্যে মধ্যে

এইরূপ অনর্থপাত হইতে লাগিল দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র নিতান্ত বিমনা হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নসীরাম ও হরিচরণ-সংবাদ।

গঙ্গাদেবীর চৌদ্দপুরুষের চিরসঞ্চিত পুণ্যবলে নসীরাম ভদ্র বহুকালের পর একদিন গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিল। অপরাধের মধ্যে নসীরাম সন্তরণ ভুলিয়া গিয়াছে কি না দেখিবার নিমিত্ত একবার গা ভাসাইয়াছিল। একে ত নসীরাম বাবু সহজেই একটা অতি আশ্চর্য্য বস্তু, তদুপরি আবার গা ভাসান। আর রক্ষা আছে! ঘাট-শুদ্ধ লোক যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই রহিয়া গেল, সকলেই মহা কোলাহলে হো হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। নসীরাম ভিন্ন আর আর সকলেই হাসিয়া আকুল। নসীরাম আন্তরিক চটিয়া উঠিল। হাঁস ফাঁশ্ করিতে করিতে ঘাটে উঠিয়া বলিল,—"জগদীশ্বর যাকে যেমন করেছেন্ সে তেমনই হয়েছে, তাতে আবার লোকের এত নজর দেওয়া কেন? আমি এই পৃথিবীতে একটু বেশী জমী নিয়ে বসি, তাতে লোকের এত চোখ টাটান কেন? আমি কি কা'রো কাছে ধার ক'রে খেয়ে মোটা হ'য়েছি? না কা'রোর সঙ্গে এক চালায় ঘর ক'রে থাকি? মানুষকে দেখে মানুষের এ রকম ক'রে হাসা অত্যন্ত অনুচিত। ভাল আপদেই প'ড়েছি—যে খানে যাব সেই খানেই আমাকে তিষ্ঠতে দেবে না; তবে আর আমার কোথাও গিয়ে কাজ ন্যাই,—তবে আর আমার কোন সঙ্গে কাজ নাই! আর সকলের সঙ্গে দরকার আছে, আর আমি শালা পরমেশ্বরের ত্যাজ্য পুত্তুর এসেছি আর কি?

নসীরামের এই মাংসল বাক্যে সকলেই আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ফলতঃ, নসীরাম পথে বাহির হইলেই, পাঁচজনে দাঁড়াইয়া দেখিবার একটা বস্তু বটে। দুই চারিটি করিয়া লোকও জমিয়া গেল বিস্তর। নসীরাম মনে করিল গঙ্গাস্নানে আসিয়া কি ঝক্‌মারি করিয়াছি! জনতার মধ্যে ভাল মন্দ লোক থাকে। তাহাদের মধ্যে দুই একজন প্রবীণ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া নসীরামের হস্ত ধরিয়া পুনরায় তাহাকে জলে নামাইল এবং বলিল,—"মশায়! স্নান ক'রে ঘরে যান্, কেন লোকের কথায় কান্ দেন? লোকে কেবল রঙ্গ দেখ্‌তেই আছে। আপনি ও সকল কিছু মনে কর্‌বেন না—"

এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় হরিচরণ স্বীয় পারিষদবর্গের সহিত গঙ্গাস্নানে আগমন করিল। হরিচরণ নসীরামকে ভালরূপ জানিত; কিন্তু নসীরাম হরিচরণকে চিনিত না; কারণ, নসীরাম প্রতাপ বাবুর বাটীতে অনেক দিন যায় নাই। হরিচরণ দেখিল, ঘাটে মহা গোলযোগ। ভিড় ঠেলিয়া হরিচরণ দেখিল—নসীরাম! হরিচরণ অমনি বলিয়া উঠিল,—

অরে ভাই! দেখ্‌সে তোরা নবীন গোরা
উদয় হ'য়েছে;
অতি অপরূপো, যেমন কুপো
জলে ভেসেছে।

এই কথা শুনিয়া হরিচরণের দিকে সকলেই চাহিয়া দেখিল। হরিচরণ আবার বলিল,—

দুঃখী আমি ট্যাঁকে আমার,
নাইক টাকা কড়ি,
নইলে এঁকে নিয়ে যেতেম
গলায় দিয়ে দড়ি।
কোন্ জানোয়ার বুঝতে নারি
পড়ে গেছি ফেরে,
কোন পিঁজরায় ছিল এটা,
কে পুষেছে এরে ?

হরি চরণের এই কথায় কতকগুলি লোকে কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কেরে বাপু তুই ? একে মানুষটাকে সকলে পড়ে জ্বালিয়ে তুলেছে, আবার তুই এলি ফোড়ন দিতে। নে নে চান করিতে এসেছিস্, চান করে যা আর অত কবিতে পাঠ কর্‌তে হবে না।" তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে আবার হরিচরণকে কটাক্ষ দ্বারা ইঙ্গিত করিতে লাগিল। হরিচরণ আবার বলিল —

ছোট্ট মাথা, পেট্‌টা মোটা
হাত পা গুলি খাটো,
গাঙের ঘাটে কাছিম্ যেমন
চল্‌ছে মাটোমাটো।

এই কথা শুনিয়া নসীরাম দ্বিগুণতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, বলিল—ওরে বেটা উন্‌পাঁজুরে বাঁদর! আমার কোন খান্‌টা কাছিম্ দেখ্‌লিরে বেটা ? যত বড় মুখ, তত বড় কথা! জানিস্‌নে জুতোর চোটে সিধে ক'রে দেব।" সকলে বলিল, "আঃ আপনি রাগ করেন কেন ? ছেলে ছোক্‌রায় কি বলেছে না বলেছে, তাতে আপনি প্রবীণ হয়ে কান দেন কেন ?"

নসীরাম বলিল,—"আরে মশায়! আপনারা ত খুব দেখতে পাই। ও আবার ছেলে—ওকে আবার ছেলে বল্‌তে হয়! কথা গুলো বল্‌ছে যেন গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ও অমনি করে বল্‌বে আর আমি চুপ্ করে থাকব ?—না।" নসীরাম এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছে এমন সময় দুই চারি জন হরিচরণকে পশ্চাৎ হইতে ইঙ্গিত করিল; হরিচরণ আবার বলিল,—

কোন্ বিধাতায় গড়্‌লে তোরে
কিবা মুখের ছাঁদ!
আকাশ থেকে পড়্‌লো যেন
অমাবস্যার চাঁদ।
একটু দাঁড়া একটী কথা
জান্‌তে চাই এখন,
তুমি কোন কামিনীর কোলের নিধি
বুকজুড়ান ধন ?

এই কথাটি শুনিয়া নসীরাম অমনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল সকলে অমনি 'হেসেছে—এই হেসেছে' বলিয়া করতালি দিতে লাগিল।

নসীরাম দেখিল, হরিচরণের মত রসিক আর ভূভারতে নাই। নসীরাম হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোথায় ভাই ?"

হরি। আজ্ঞে, বাড়ী আমার আকাশের নীচে।

নসি। বলি তা নয় ঠিক্ ক'রে বল না ?

হরি। আজ্ঞে আমার বাড়ী হুগলি জেলা।

নসি। বটে! তোমার নামটী কি ভাই ?

হরি। আমার নাম "হরি"।

নসি। তোমার নাম "হরি"? ভাল ভাল, ও বাপ্ হরিদাস!

হরি।—

ও তোর বুদ্ধি মোটা নাদাপেটা!
করতেছ হাঁস ফাঁস্;
আমার নামটি হ'লো "হরিচরণ"
বল্‌চ হরিদাস।

নসি। এই—এই—আবার ও কেন? এই মাত্র যে কথা কইছিলে ভাল।

হরি। ও আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। ও এমন আমি ব'লে থাকি, আপনি স্নান করুন।

হরিচরণের কথায় নসীরাম অনেকটা সুস্থির হইয়া স্নান করিতে লাগিল। স্নান সমাপ্ত করিয়া ঘাটে উঠিয়া গা মাথা মুছিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গা-ক্রোড়ে গজেন্দ্রের জল-ক্রীড়া সমাপ্ত হইল, হরিচরণ ও তাহার পারিষদবর্গ সত্বরে জলে নামিয়া স্নানাদি করিয়া লইল। অদ্য আর সাঁতার কাটিল না; নসীরামের সহিত একত্রে বাটী যাইতে হইবে। স্নানান্তে নসীরামের অপরূপ শোভা হইল। গাত্র দিয়া তৈল গড়াইয়া পড়িতেছে, মস্তকের কেশ-কলাপ উন্নত হইয়া উত্তেজিত শল্লকি-কণ্টক শোভা ধারণ করিয়াছে, বস্ত্রখানি কটিদেশে আছে কি না সন্দেহ। নসীরাম বাটী চলিল এবং হরিচরণ ও তাহার পারিষদবর্গ তাহার সঙ্গ লইল, দিনমানে পেচক দেখিতে পাইলে, দিবাকরগণ যেরূপ তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে থাকে, বাটীর বাহির হইলে নসীরামের ও ঠিক্ তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, পথে একটা লঙ্কাকাণ্ড ব্যাপার না ঘটাইয়া নসীরাম বাটী প্রত্যাগমন করিবে, ইহা কদাচ আশা করা যায় না। হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল মহাশয়! আজ পদব্রজে চলেছেন যে?

নসী। আর ভাই! সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

হরি। কেন কি হ'য়েছে?

নসী। আজ ক'দিন হ'ল আমার ঘোড়াটী মারা গিয়াছে।

হরি। বটে! তাই পাকে।

নসী। আর ভাই! অমন ঘোড়া ত আর পাব না। বাল্পকে যে বাগে ফেরাতেম বাছা সেই বাগেই যেত। খাওয়া দাওয়ার কোন উৎপাত ছিল না। এমন সুবোধ সচ্চরিত্র আর তুমি পাবে না। ঘোড়াটী মারা গিয়ে আমায় বড়ই শোক দিয়েছে। আবার তার উপর নানা ভাবনা চিন্তে।—

হরি। কেন কেন আবার ভাবনা চিন্তে কিসের? চুপ করে রইলেন যে?—

নসী। আর বাবা! এই মেয়ের বিয়ের হাঙ্গামে পড়েছি।

হরি। আপনি ত খুব লোক দে'খ্‌ছি। একবার 'বাবা' বল্‌ছেন—একবার 'ভাই' বল্‌ছেন, এক মনিষ্যি দুই হই কেমন করে?

নসী। আরে ভাই ও যেতে দাও। বুড়ো হয়েছি, কখন কি বলি অত মনে থাকে না।

হরি।—

তুমি এসব কথায় বুড়ো হও
বুদ্ধি হয় হত,
রসের কথায় কানটি পাত
শালিক-পাখীর মত।

নসী। অ্যাঁ, আবার ও কি ?

হরি। আমার ও একটা কেমন রোগ যুগ্ এখন কি বল্‌ছিলেন বলুন।

নসী। বলি, এই মেয়ের বিয়ে গো। যত দিন না মেয়ের বিয়েটা চুক্‌ছে,তত দিন যে আর গলা থেকে কাঁটা উল্‌ছে না। পাত্র ও পেয়েছি সুবই ঠিক্ ঠাক্।

হরি। তবে আর ভাব্‌না কিসের ?

নসী। আমাদের কারখানার সাহেব বড় গোল বাধাচ্ছে।

হরি। হিঁদুর বিয়েতে সাহেব কি গোল বাধা'বে ; তার এতে অধিকার কি ?

নসি। বলে কি—এর মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেবে কি ?

হরি। কেন আপনার কন্যাটীর বয়স কত ?

নসী। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এই নয়ে পড়েছে। আরও কি বাপু রাখ্‌তে প্যারি ? কন্যে দশে পড়্‌লে পেটে কি ভাত যায় ?

হরি। সাহেব বেটা কি বলে?

নসী। সে বলে পনর বছর ষোল বছরে বে দেবে। এখন কচি মেয়ে বে কি ? নিদেন পক্ষে আরও তিন চার বছর যেতে দাও। ওগো আমরা হলেম হিঁদু আমরা কি ও সব পারি ? আমাদের দেশে ও সব কথা বল্‌লে তাকে এক ঘরে করে রাখবে। আর দেখ যা হবার নয় তা কি কখন হয়ে থাকে ?

হরি। তাই ত ! সে বেটার মা সে বেটার মাথা খাগ্। দেখতেও যেমন বাঁদর,—বুদ্ধিও তেমনি বাঁদরের মত।

নসী। আরে তা বৈ কি ভাই ! তো বেটারা থাকিস্ সাত সুমুদ্দুর তের নদী পারে। তো বেটাদের সঙ্গে আমাদের কিসে মিলবে বল্ দেখি ? দু'দিন আমাদের দেশে এসে আমাদের সব ভেদ মেরে নিয়েছে ! আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি ! ও বেটাদের দেশে হয় কি জান ? মেয়ে, কুমারী অবস্থাতেই পরপুরুষের সহবাসে থাকে ! যদি তার সঙ্গে বন্‌লো, তবেই বে কর্‌লে ; নচেৎ ছেড়ে দিয়ে আবার একটা ধর্‌লে— এই সব ব্যাপার। ঐরূপ প্রথা কে জানে 'কোট্‌সি' না ফোট্‌সি, কি বলে।

হরি। বলেন কি মশায় ! আমাদের দেশে এরূপ স্থলে ত তাকে বেশ্যা বলে, তাকে নিয়ে ত আর কেউ ঘর করে না। ছেলে মেয়ের বে ত বাপ মায় দেয়।

নসী। তাই ত আমার মাথা আর মুণ্ডু বলছি কি তোমায় ?

হরি। তা আপনি তাতে কি বলেন ?

নসী। আমি আর কি বল্‌ব ? আমি তার কথা শুনব না কি ? মরে গেলেও নয়। সে আমায় ছাড়িয়ে দেবে বলেছে। এমন ছেয়ের চাক্‌রি থাক্‌লেই কি গেলেই কি ? চাকুরির জন্য ধর্ম্ম ছেড়ে দোব ! তার চেয়ে হ'য়ে কেন ম'লুম্ না ?

হরি। সে আপনাকে ঠাট্টা করেছে।

নসী। না গো বেটা যেন ছিনে জোঁক। প্রত্যহ এই কথা নিয়ে আমার হাড়্‌টা জ্বালিয়ে খায়।

হরি। দেখুন—ধর্ম্ম থাকে ত বেটা নিপাত যাবে।

কিয়দ্দূর গিয়া নসীরাম হরিচরণকে সম্বো-

ধন করিয়া বলিল—দেখ বাবা আমি এখন আসি তবে—আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে কখন?

হরিচরণ বলিল,—"আজ্ঞে, আজ আর দেখা হবে না। আমি আজ বাড়ী যাচ্চি, অনেক দিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই।"

নসী। তোমার বিয়ে হয়েছে?

হরি। আজ্ঞে না, গরিব মানুষ টাকা কোথায় পাব?

নসী। তবু তুমি এত রসিক!

হরি। যতই হই না কেন আপনার বাটায় লাগিনে।

নসীরামের মুখে আর হাসি ধরে না। সর্ব্বস্ব দিলেও হরিচরণের ঋণ পরিশোধ হয় না। জগৎ একদিকে,—হরিচরণ একদিকে, আজ হরিচরণের মুখে নসীরামের রসিকত্ব সপ্রমাণ হইল। নসীরাম অনেক আদর অপেক্ষা করিয়া হরিচরণকে বিদায় করিয়া বাটী-অভিমুখে গমন করিল। হরিচরণও নিম্নলিখিত ছড়াটী বলিতে বলিতে, জমীদার বাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

দেখ্‌সে ভাই! কলির হাটে
সিংগি হলো ভাম্;
বেল-গাছেতে আম্ ফ'লেছে
আম-গাছেতে জাম।
দেখে শুনে ভয় লেগেছে,
গায় দিয়েছে ঘাম;
গোপাল ভাঁড়ের অন্ন গেল
রসিক "নসিরাম"!

প্রতাপ বাবুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই হরিচরণ শান্তিরামকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল "একি"! তৎপরে নমস্কারাদি করিয়া বাটীর কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিল।

শান্তিরাম বলিল—বাড়ী চল্—তোর বাপ্ তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। তোর বিয়ে উপস্থিত—

হরি। আমি কোথায় গেলুম্ তার ঠিক্ নেই আমার বিয়ে!

শান্তি। নে—নে—আর চালাকিতে কাজ নেই—তুই খুব্ চালাক্ তা আমি জানি।

হরি। কেন? আমি কিসে চালাক্ হলুম্?

শান্তি। ঘোষাল মহাশয়কে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলি যে?

হরি। চুপ্ করুন, আর ওসব কথায় কাজ নেই।

শান্তি। তবে বাবুর কাছে থেকে ছুটি নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।

হরি। আজ্ঞে—এখন কি হয়?

শান্তি। তবে, যখন হোগ্ আজই যেতে চাস্—আমি এখন আসি তবে?

হরি। আজ তাই পাকে আমার মনটা খালি বাড়ী যাই বাড়ী যাই কচ্চে!

শান্তি। কেন্—তোর আবার বাড়ী ব'লে মনে আছে?—হায়রে!

হরি। সে কি! আমার বাড়ী বলে মনে নাই, আপ্‌নাকে কে বল্লে?

শান্তি। আর ও কথায় কাজ কি? বিধেতা তোর বুক্‌টা পাথর দিয়ে গ'ড়েছে। তোর বাপ যেন তোকে মেরেছিল—তোর মা কি ক'রেছে?

হরিচরণের মুখখানি মলিন হইয়া আসিল। দুই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রুপাত

হইতে লাগিল। পরে শান্তিরামকে কহিল,—আমি আজই দেশে যাব, আপনি গিয়ে খবর দেবেন।"

শান্তিরাম বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। হরিচরণ প্রতাপ বাবুর নিকটে সমস্ত সমাচার নিবেদন করিল। প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"ভাল কথা, আজ খাওয়া দাওয়া করে বাড়ী যেও,—অবিশ্যি তোমার মা বাপ ত ভাব্‌তেই পারেন, তুমিত আর তাঁ'দের ব'লে এসো নি।"

হরিচরণ প্রতাপচন্দ্রের আদেশ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং অন্যান্য দাস দাসীদিগকে স্বীয় বাটী গমন সংবাদ প্রদান করিল। হরিচরণকে সকলেই ভাল বাসে; এই সমাচার শুনিয়া তাহারা বিষণ্ণ হইল।

আহারান্তে হরিচরণ, প্রতাপচন্দ্র, শারদাসুন্দরী ও আর আর সকলের নিকট বিদায় লইয়া বাটী গমনের উদ্যোগ করিল। কেহ বা কাপড় কেহ বা টাকা পারিতোষিক দিলেন। হরিচরণ আনন্দে নাচিতে নাচিতে স্বগৃহাভিমুখে গমন করিল।

নৌকায় পার হইয়া হরিচরণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিল কোনদিকে যাই। অবশেষে স্থির করিল, প্রথমে রতনমণিকে সংবাদ দিয়া তৎপরে পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিব। পথে যাইতে যাইতে রতনমণির গৃহ-পশ্চাতের আম্রবৃক্ষ নয়নগোচর হইল। হরিচরণ বৃক্ষতলে গিয়া দেখিল তথায় কেহই নাই।' সংবাদ দিতে হইবে হরিচরণ ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব ছড়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ভাবিয়া হরিচরণ বলিয়া উঠিল,—

চৌদ্দ বছর কাটিয়ে বনে
রাম এসেছে দেশে,
কোথায় আছিস্ মণি! চুনি!
দেখ্ বেরিয়ে এসে।
কে জানে ভাই! কেমন যে তোর
ধনুক-ভাঙ্গা পণ,
টানের চোটে ফিরে এলো
শ্রীহরি চরণ।

অনেক দিনের পর চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া রতনমণি আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাহিরে আসিল; দেখিল—হরিচরণ। রতন সমস্ত সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল বটে, কিন্তু মনে করিল হরিচরণের সহিত আর নিত্য দেখা হইবে না। যাহা হউক হরিচরণের ভাল হইলে, রতনমণি বড়ই খুসি।

হরিচরণ বলিল,—"এখন মার কাছে যাই; মা পথপানে চেয়ে আছেন।"

দুষ্ট ছেলে কষ্ট দিলে
মা কি কভু রুষ্ট হয়,
কু-সন্তান হইলা কেন
কুমাতা কদাপি নয়।

এইকথা বলিয়া নাচিতে নাচিতে হরিচরণ আপন গৃহে গমন করিল এবং পিতা ও মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া সুস্থির হইল। হরিচরণ সমস্ত কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। হরিচরণের মাতা ও পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং অনেক দিনের পর পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহারা অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"মা! বাড়ীতে এত গোল কিসের?" মাতা বলিলেন,—"তোর বিয়ে—" (ক্রমশঃ)

বসন্ত-বিরহে।

নিদয় নিদাঘে, প্রমথিত মাধব,
ধায়ল কুঞ্জ গভীরে,
ভাগে মলয়ানিল, দ্বিরেফ দুখায়িত,
বিরমিল বঞ্জু-কুটিরে।
পিক-কুল রোবত, বকুল—কদম্বে,
কুহুকুহু কঠোর নিনাদ,
রসাল কি কোলে, মুকুলিত মাধবী,
ঝুরত হি বিন্দু অবসাদ।
চম্পা গোলেলা, প্রমসিত বন্ধন,
দারুণ বিরহ কি বায়ে,
যুথি,যাতি,বেলা, সুরভিনী মালতী,
বিলপত আকুল কায়ে।
লোলহরিণী আঁখি, মুহুমুহু পেখত,
ধাবত মলিন-বয়ানে।
ঘন ঘন ছোড়ই ব্যলীক নিশাস
বিরমত বিটপী-বিতানে,
চাঁদ বিরস চিত্ত, ধূলি-ধূসরবপু
পুছতহি চতুর চকোরে,
কাঁহা মদন সখা, কাঁহা গিয়া ভাগই,
ফেলই বিরহ বিঘোরে ?
চণ্ড দিবাকর, নিথর নিকম্প,
বাসয় নিঠুর বিলাসে,
দিক দখিণাক্ষণ, শ্বাস বিমুঞ্চত,
তাপ-দহন পরকাশে।
শুষ্ক জলাশয়, ঘন অবগাহন,
বিহগ নিনাদিত ফিরে।

শ্যাম বিটপী চয়, কিশলয় কোমল,
ভায় লুলিত নতশিরে।
গগণ বিকম্পিত, জলদ নিঘোষে,
রাগ বিফল পরকাশ;
গিরিবর আনন, তড়িত কড়ার,
প্রকট বিকট কটু হাস
ধূলি পটল কভু, জগত আঁধারি,
দূর গগণ চলি যায়ে,
শ্যাম পলব চয়, মলিন বিকাশে
দারুণ দহন কি দায়ে।
ভানু অরুণ আঁখি, কমল প্রকম্পিত,
হেরি কুমুদ মৃদু হাসে,
মৃগদল কানন, বিহগ বনান্তে,
ধায়ল শরণকো আশে।
দুখভর মেদিনী, রসহীন মানস,
উরস বিদারিত ভায়ে,
শশীকর কোমল, রজনী সমাগম,
বিরমত আকুল কায়ে।
ঘন ঘন বেপথু, পনস রসালে,
রম্য দিবস পরিণাম,
গাহে বিহগ দল, রভস বিলোকন,
কোটর লভত বিরাম।
খণ্ড জলদকভু, হেরি গগণতল,
চাতক পূরত আশা,
নবীন বরখা জল, তুরিত মিটাইবে,
চিরদিন ভুক পিয়াসা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাইবেল-সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হইয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান নির্ম্মাণ করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধস্থিত জল হইতে অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন; তাহাতে সেই রূপ হইল"—আদিপুস্তক ১; ৬, ৭।

কি ভয়ানক বাল্যভাব! জল যে রূপান্তরিত হইয়া বাষ্পাকারে শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারে, এ সম্বন্ধে মোশির যদি অনুমাত্র জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর কতকটা জল উপরে রাখিবার জন্য এত বেগ পাইতে হইত না এবং তন্নিমিত্ত জলের মধ্যে বিতান অর্থাৎ আকাশের সৃষ্টি কল্পনা করিতে হইত না। মোশি যে স্থানে বসিয়া এই বিতানের সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন বোধ হয় সেখানে এক গামলা চূণের জল ছিল ও সেই চূণের জলের উপরে একটা কঠিন সর (Carbonate of lime) পড়িয়াছিল এবং সেই সরের উপরেও হয়ত কোন প্রকারে দুই চারি ফোটা জল পড়িয়াছিল। মোশি এই চূণের জলের গামলা দেখিয়াই ভাবিলেন যে, মস্তকের উপরে এই যে নীল বর্ণ আকাশ দেখা যায়, তাহা নিশ্চয়ই একটি সুপ্রশস্ত কঠিন ছাদ সেই ছাদের উপরে বিস্তর জলরাশি আছে এবং ঐ ছাদের স্থানে স্থানে দরজা (Sluicegate) আছে এবং ঐ সকল দরজা দিয়া যখন জল বাহির হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে তখনই বৃষ্টি হয়। মোশির মন যে আকাশ সম্বন্ধে এইরূপ বাল্যভাবে পূর্ণ ছিল, তাহার প্রমাণ বাইবেলেই পাওয়া যায়, যথা—"নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাবারিধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগণস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল। তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি অতিবৃষ্টি হইল"—আদিপুস্তক ৭; ১১, ১২। "এবং বারিধির উনুই ও গগণস্থ দ্বার সকল বদ্ধ এবং আকাশের অতিবৃষ্টি নিবৃত্ত হওয়াতে জল ক্রমশঃ ভূমির উপর হইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল"—আদিপুস্তক ৮; ২, ৩। পাঠকগণ! আপনারা বাইবেলের মধ্যে এই ভাবটিকে বাল্যভাব ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? এই রূপে জলের মধ্য হইতে বিতানের সৃষ্টি ও তদ্বারা জলকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ পৃথিবীতে রাখিয়া অপর ভাগ পৃথিবীর উপরে তুলিতে পরমেশ্বরের গোটা দ্বিতীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল, কারণ বিতানের সৃষ্টি না করিয়া কেবল ইচ্ছামাত্রে বা আজ্ঞামাত্রে, যে ঈশ্বর জলকে শূন্যে রাখিতে পারিলেনন না—জলের আধারের নিমিত্ত তাঁহাকে বিতান নামে

একটি সুবিস্তৃত পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হইল,—তাঁহাকে সেই সুবৃহৎ বিতান সহ অসীম জলরাশি উর্দ্ধে উঠাইবার জন্য যে অনেক গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড (Hydrolic press) গুরুভারোত্তলক কল বিশেষ, নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "পরে ঈশ্বর ঐ বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল"—আদিপুস্তক ১; ৮। এখানে বিতান ও আকাশ-মণ্ডল এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু আদি পুস্তকের ১ ম অধ্যায় ১৪ হইতে ১৮ পদের মধ্যে তিনবার বিতানকে আধার ও আকাশ মণ্ডলকে আধেয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক বিতান ও আকাশ মণ্ডলের বা ইংরাজিতে Firmament ও Heaven শব্দের প্রভেদ কি,তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত হইলেও, মোশি ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন যে, সেই পূর্ব্বোক্ত কঠিন ছাদের নাম বিতান ও তাহার উপরে আকাশ মণ্ডল, স্বর্গ বা ঈশ্বরের বাসস্থান। আকাশ-মণ্ডলের heaven এর যে দিক্‌টা পৃথিবীর দিকে আছে, সেই দিক্‌টারই নাম বিতান বা Frmament এবং বিতানের যে দিক্‌টা ঈশ্বরের দিকে আছে, সেই দিক্‌টার নাম স্বর্গ, আকাশ-মণ্ডল বা Heaven। মোশি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, ঈশ্বরের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন কি না, তাই মোশির আকাশমণ্ডল সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যে আমরা সহজে দন্তস্ফুট করিতে পারি না! "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশ-মণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে সংগৃহিত হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক, তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জল রাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; এবং ঈশ্বর তাহা উত্তম দেখিলেন। অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণকে, সবীজ ওষধিকে ও বীজসম্বলিত স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষকে ভূমির উপর উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেই রূপ হইল; অর্থাৎ ভূমিতে তৃণ, স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি বীজোৎপাদক ওষধি ও স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি বীজসম্বলিত ফলোৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকল উত্তম দেখিলেন এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল"—আদিপুস্তক—১, ৯—১৩। এই তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর দুইটি বড় বড় কর্ম্ম করিলেন—১ম, পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করণ, ২য় পৃথিবীকে উদ্ভিদ্‌ময় করণ। দ্বিতীয় দিবসে, পরমেশ্বর পৃথিবীর কতক জল উর্দ্ধে উঠাইয়া লইলেও, তৃতীয় দিবসের প্রারম্ভেও পৃথিবী যে সম্পূর্ণ জলমগ্ন ছিল, তাহা বাইবেল পাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং, তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করিলেন—কিরূপে পৃথক করিলেন মোশি তাহা অতি সামান্য ব্যাপার বোধে লিখেন নাই, কারণ মোশিও স্বয়ং ঐরূপ কর্ম্ম করিতে পারিতেন, যথা—"পরে মোশি সমুদ্রের উপর আপনহস্ত বিস্তার করিলে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা সমুদ্রেরক্ষোভ জন্মাইয়া তাহা শুষ্ক করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল"—যাত্রাপুস্তক ১৪; ১২।

সুতরাং, মোশির বিবেচনানুসারে ঈশ্বরকে যে এইরূপ কোন একটা উপায় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করিতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহনাই; কিন্তু, এই তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত যখন সূর্য্যের অস্তিত্বও নাই, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক ও নিরূপিত হয় নাই এবং বায়ুরও সৃষ্টি হয় নাই, তখন মোশি যে প্রণালীতে সমুদ্রের জল সরাইয়া দিয়াছিলেন, সে প্রণালীতে পরমেশ্বর কখনই পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করিতে পারেন নাই; কারণ তখন ঈশ্বর পূর্ব্বদিক ও বায়ু পাইবেন কোথায়? ঈশ্বর কিরূপে পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করিলেন তাহা মোশি, যে কোন কারণেই হউক, লিখেন নাই; কিন্তু এই বাইবেল-সমালোচনার পাঠকগণের ঔৎসুক্য নিবারণ জন্য, মোশির হইয়া এই পৃথক-করণ-প্রণালী আমিই এইস্থানে সংক্ষেপে বলিতেছি যথা— ঈশ্বর যখন কহিলেন, "আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক" তখনও সূর্য্য সৃষ্ট হয় নাই এবং তখনও জল অর্থে জমাট জল বা বরফ; কারণ তরল জল হইলে গড়াইয়া পড়িত, কিন্তু জল তখনও জমাট থাকাতে ঈশ্বর যেমন তাবৎ জলকে এক স্থানে সংগৃহীত হইতে বলিলেন, "তাহাতে সেইরূপ হইল" তখন ঈশ্বর মহাসমুদ্র সকল খনন করিলেন এবং ভূ-গর্ভস্থ পাথর, হাড়, ও মৃত্তিকা স্থানে স্থানে স্তূপাকার করিলেন এবং ঐ সকল স্তূপ, পাথর ও হাড়ে গঠিত হইল বলিয়া ঈশ্বর তাহাদের নাম পাথর-হাড় বা পাহাড় রাখিলেন,* যেমন "স্ত্রীলোক নর হইতে গৃহীতা বলিয়া তাহার নাম নারী হইল।" আদি পুস্তক ২; ২৩। যাহা হউক, এইবারে ঈশ্বর সেই রাশিকৃত বরফ সমুদায় দ্বারা সমুদ্রগর্ত্ত পূর্ণ করিলেন এবং সেই পঙ্কিল পৃথিবীকে সদ্য সদ্য উদ্ভিদময় করিলেন—আহা! ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! এখনও বায়ু জন্মে নাই, এখন ও সূর্য্যের অস্তিত্ব হয় নাই, তত্রাপি ঈশ্বর বায়ু ও সূর্য্যালোক ব্যতিরেকে এই পঙ্কিল পৃথিবীর উপরে সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করিলেন—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান কি না, তাই তিনি সকলই করিতে পারেন; সুতরাং এরূপ নিয়মাতীত কর্ম্ম করিতেও অবশ্য তাঁহার শক্তি আছে। এইরূপে সূর্য্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইয়া তৃতীয় দিবস গত হইলে, ঈশ্বর দেখিলেন যে, প্রত্যহ এরূপ হাতে খাটিয়া সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল করা—দিবা ও রাত্র করা, বড়ই কষ্টদায়ক—এরূপ দিবা রাত্র কলে করিতে পারিলেই বড় সুবিধা হয় এবং পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হয়;

* আপনারা, বলিতে পারেন, তখন হাড় আসিল কোথা হইতে? তাহার উত্তর আমি দিতে অবশ্য বাধ্য, যথা;—

বাইবেলে যে সৃষ্টি-বিবরণ পাঠ করি তাহার বহুকাল পূর্ব্বেও যে এই পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাণীবর্গের আবাসস্থল ছিল, তাহা বিজ্ঞান-বলে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে; সুতরাং পাথর ও হাড় দ্বারা পাহাড়ের গঠন-কার্য্য আশ্চর্য্যজ্ঞান করিবেন না। পাহাড়ের মধ্যে যে বিস্তর প্রস্তরীভূত(Stratified)অস্থি পাওয়া যায়, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

সুতরাং, তৃতীয় দিবস শেষ হইলে "ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; তাহা চিহ্ন এবং ঋতুর ও দিবসের ও বৎসরের কারণ হউক এবং পৃথিবীতে আলো করণার্থ দীপের ন্যায় আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের কর্তৃত্ব করিতে এক মহা জ্যোতিঃ, ও রাত্রির কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহজ্জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রগণকে নির্ম্মাণ করিলেন। এবং পৃথিবীতে দীপ্তিদানার্থে এবং দিবসের ও রাত্রির কর্তৃত্ব করণার্থে এবং আলো ও অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশ মণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন; এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল"। আদি পুস্তক ১; ১৪—১৯। এই মহাজ্যোতিঃ সূর্য্য যে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা বার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার গুণ বড় এবং তিন লক্ষ তেইশ হাজার গুণ ভারী—চন্দ্রের যে নিজের কোন জ্যোতিঃ নাই, সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া পৃথিবীতে জ্যোৎস্না প্রদান করে—সূর্য্য যে নিজে জ্যোতিঃ পদার্থ নহে, সূর্য্য নিজ কেন্দ্রের উপর ঘূর্ণায়মান গতি দ্বারা ইথার নামক পদার্থের সহিত সংঘর্ষণে একটি তরঙ্গ উত্থিত করিয়া ক্রমাগত তেজঃ ও জ্যোতিঃ উৎপন্ন করতঃ তেজোময় ও জ্যোতির্ম্ময় নাম ধারণ করিয়াছে নক্ষত্রগণও যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখায় তাহারা বাস্তবিক সেরূপ ক্ষুদ্র নহে, তাহাদের কোন কোনটা পৃথিবী অপেক্ষা বড় এবং কোন কোনটা আমাদের সূর্য্যের সমান বা তদপেক্ষা বড় আর সূর্য্যের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে পৃথিবী, চন্দ্র, ও গ্রহগণ যে, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না, এই সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণ বিষয়ে যদি মোশির তিলার্দ্ধ মাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে, মোশি কথনই সূর্য্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী সৃষ্টির কল্পনা করিতে পারিতেন না—তাহা হইলে, মোশি সূর্য্যকে পৃথিবীর মূল কারণ স্বরূপ জানিতেন এবং সূর্য্যকে কেবল পৃথিবীতে আলো দিবার উপকরণ একটা বৃহৎ 'ফানস' জ্ঞান করিয়া চতুর্থ দিনে তাহা আকাশ-মণ্ডলের বিতানে টাঙ্গাইতে যাইতেন না। মোশিরইবা অপরাধকি? "এ যে ঈশ্বরের বাক্য?" ঈশ্বর মোশিকে যাহা শিখাইয়াছেন মোশিত তাহাই শিখিয়াছেন। টলেমির ভ্রমাত্মক মত টলিয়া যাইবে, কোপার নিকাশ আকাশ-বিষয়ক প্রকৃত মত প্রকাশ করিবে, হার্ষোল ভূগোল হইতে খগোল মাপিয়া গণ্ডগোল তুলিবে এবং "জনৈক খ্রীষ্টিয়ান তনয়" এমন করিয়া বাইবেল সমালোচনা করিবে, ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এ সকল অগ্রে জানিতে পারিলে, মোশিকে কথনই এরূপ "ঠান্‌দিদির-গল্প" শিখাইতেন না। বাইবেলের পরমেশ্বর যে, সর্ব্বজ্ঞ তাহার কারণ তিনি সকল কার্য্যই করিয়া ভাবেন; বাইবেলেই তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ।)

জনৈক খ্রীষ্টিয়ান-তনয়।

ভ্রম সংশোধন—৪৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষ পংক্তিতে, যাত্রাপুস্তক ১৪, ১২ স্থলে, যাত্রাপুস্তক ১৪; ২১ হইবে।

'চোক গেল' পাখী।

কাননে, শাখীর অতি উচ্চ শাখে বসিয়া,
কেন পাখি! কাঁদ্ তুমি'চোক গেল'বলিয়া?
শ্যামল পলব-ছায়
লুকা'য়ে আপন কায়,
কিবা হেরি পাখি! তব জলিছে নয়ান?
ব্যাকুল অন্তর কেন ব্যথিত পরাণ?

কিবা তব চক্ষুঃশূল এ বিশাল ভুবনে?
"চোক গেল"একি ভাষা! কেন আন আননে?
সদা সুখে তুমি রও,—
কাহারো অধীন নও;
তোমার আঁখিতে ব্যথা দেয় কোন জন,
'চোক্ গেল' ব'লে কেন করিছ রোদন?

বুঝেছি বুঝেছি পাখি! কি ব্যথা ও হৃদয়ে,
'চোক গেল''চোক গেল'কেন বল কাঁদিয়ে?
হিংসা দ্বেষ গর্ব্ব মানে
উন্মত্ত মানবগণে
দুঃখ, পাপ, শোক, তাপ—ভরা এ ভুবন,
হেরিয়া জলিছে তব মানস-নয়ন।

বিচিত্র এ বিশ্ব-সৃষ্টি—তাই কি গো পাপিয়া!
শুনাও স্রষ্টারে হায়! 'চোক গেল'বলিয়া?
জগদীশ! একি দেখি?
তোমার এ সৃষ্টি?—একি!
দেখাও, দেখাও কোথা শান্তি-নিকেতন?
নহিলে যে চোক যায় পাখীর মতন।

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

বিশ্ব-নিন্দুক।

"সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

নিবাস—অমরাগড়ি, ব্রাহ্মণ-কুমার,
পরনিন্দা করা, ছিল স্বভাব তাহার।
অতি ভাল লোক যেই,তারো নিন্দা করে!
নিন্দার সময় যেন শত মুখ ধরে!
অতি সাধু, কোন জনে, প্রশংসে সবাই,
ব্রাহ্মণ, সুখ্যাতি তার করিবেক নাই!

ফল কথা,—ছিল বিশ্ব-নিন্দুক সে জন,
কাহারো সুখ্যাতি নাহি তাহার সদন।
যাহার বাটীতে হ'ত, নিমন্ত্রণ তার,
অবশ্যই, কোন দোষ, করিত সে বার!
দেখে, শুনে, দেশ শুদ্ধ, পরামর্শ আঁটি,
নিমন্ত্রণ করাইল তার, কারো বাটী।

আহারাদি আয়োজন করিল নিখুঁত,
যেন নিন্দা নাহি করে, আবাগের পুত।
নিমন্ত্রণে এল যবে ব্রাহ্মণ-কুমার,
গৃহ-স্বামী করিলেন অভ্যর্থনা তার।
পদ ধৌত করিবারে ভৃত্য দিল বারি,
দাঁড়ায় 'গামোছা' লয়ে, হয়ে আজ্ঞাকারী।
ব্রাহ্মণ বসিলে গৃহে জনেক চাকর,
বাতাস করিতে দ্বিজে আসিল সত্বর।
অন্য ভৃত্য, দ্রুতগতি সেই অবকাশে,
তমাকু সাজিয়া লয়ে, দাঁড়াইল পাশে।
কিছুক্ষণ, ধূমপান করিলে ব্রাহ্মণ,
ভোজনার্থে গৃহ-কর্ত্তা করে আকিঞ্চন।
যে সকল দ্রব্য নাহি সেই দেশে মেলে,
ব্রাহ্মণ হ'বেন তুষ্ট খেতে তাই পেলে,—
এত ভাবি ক'রেছেন, তিনি আয়োজন,
ব্রাহ্মণ প্রফুল্লমনে, করিল ভোজন।
আহারান্তে আঁচাইয়া বসিলেন ঘরে,
পাখার বাতাস ভৃত্য পুনরপি করে।
দাসী আসি, দিয়া গেল ডিপা-ভরা পান,
ডিপা খুলি, দ্বিজ-সুত, পান লয়ে খান।
পুনরপি ধূম পান করি কিছুক্ষণ,
ব্রাহ্মণ যাইতে চান নিজ নিকেতন।
প্রতিবেশী একজন বসি' ছিল ঘরে,
চায় সেই দ্বিজ-পিছু যেতে, ছাতা ধ'রে।
ব্রাহ্মণের তাহাতে আপত্তি নাহি কিছু,
ছাতা ধ'রে যেতে সে লাগিল পিছু পিছু।
ছত্রধারী কিছু দূর করিয়া গমন,
ব্রাহ্মণেরে কহিতেছে, করি সম্ভাষণ—
"কিরূপ ভোজন হেথা, হ'ল মহাশয় ?
সবিশেষ জানিবারে ইচ্ছা মোর হয়।"
সে কথায় কন তারে ব্রাহ্মণ-কুমার,—
"এত ভাল, ভাল নয়,—শুন সমাচার।"
এ কথায়, অবাক হইল ছত্র-ধারী,
নিন্দুক-চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
কিছুতেই তার কাছে, নাহিক ভালাই,
নিন্দুক-চরিত্র ভাই! বলিহারি যাই।
মন্দ হ'লে মন্দ কয়, ক্ষতি নাহি তায়,
ভাল হ'লে মন্দ কয়, লাগে বড় গায়!
যেজন পরের নিন্দা লয়ে সদা রয়,
তার সঙ্গে বাস করা কভু বিধি নয়।
শ্বাপদ-সংকুল বনে বরঞ্চ থাকিবে,
কুজনের সহ বাস তবু না করিবে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

জামাই-ষষ্ঠী।

জ্যৈষ্ঠ মাস,—কাল জামাই-ষষ্ঠী, সেন মহাশয়ের গৃহিণী বড়ই বিব্রতা—জামাই আসিবে। আজ তিনবৎসর হইল তাঁহার কন্যা বসন্তকুমারীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু, জামাতাকে 'বাটা' দেওয়া তাঁহার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এই বার সে সুবিধা হইয়াছে, সুতরাং তিনি তাহার মহৎ আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত।

বসন্তকুমারী কিশোরীমোহন সেনের কন্যা; কিশোরী বাবু জাতিতে বৈদ্য, কোম্পানির আফিসে চাকুরী করেন, অবস্থা মন্দ নহে। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম

পক্ষের স্ত্রী, দুইটি পুত্র-সন্তান রাখিয়া গত হইলে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। বসন্তকুমারী এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র কন্যা, সুতরাং অতিশয় আদরিণী।

পুত্র দুইটি বেশ লেখা-পড়া শিখিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন, চস্‌মা লইয়াছেন—দাড়ী রাখিয়াছেন এবং সভ্য-দলভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং, পৈতৃক ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের বড় একটা শ্রদ্ধা ভক্তি নাই।

এক মাত্র কন্যা বসন্তকুমারী যাহাতে চির জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারে, সেই জন্য তাহাকে একটি সৎ পাত্রে অর্পণ করা কিশোরী বাবুর ঐকান্তিক বাসনা; কিন্তু যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে, কন্যাকে কিছু লেখা পড়া শিখাইতে না পারিলে, সৎ পাত্র পাওয়া সুকঠিন, সেইজন্য ও উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের বিশেষ অনুরোধে, কিশোরীবাবু মিস্ এলিনা নাম্নী এক জন মিসনারী রমণীকে, বসন্তকুমারীর শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বসন্তকুমারী প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কথামালা,—বোধোদয়, First Book, Royal Reader ও দু'এক খানা সত্য-ধর্ম্ম পুস্তক সমাপ্ত করিলেন ও ধর্ম্ম পুস্তকের দুই চারিটা ভক্তি ও প্রেম-পূর্ণ গান গাহিতে শিক্ষা করিলেন, এ দিকে তাঁহার বয়ঃক্রম ও সপ্তম বৎসর অতিক্রম করিয়া অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিল। তখন তাঁহার জননী আমোদ আহ্লাদ করিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিশোরী বাবুও স্ত্রীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ রায়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করিলেন। এই বিবাহের সময়, কিশোরীবাবুর পুত্রদ্বয় কিশোরীবাবুকে এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু, স্ত্রীর অনুরোধ পড়িয়া কিশোরী বাবু তাঁহাদের কথায় আদৌ মনোযোগ করেন নাই।

গিরীন্দ্র বাবু একজন বর্দ্ধিষ্ঠ কবিরাজ—চতুর্দ্দিকে বেশ নাম ডাক আছে, পশার খুব জম্‌কাল, অবস্থাও খুব ভাল। গোপীনাথ বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন এবং স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন;—বয়ঃক্রম ১৯, ২০ বৎসর। গোপীনাথ অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক; তবে তাঁহার মাথাটা কিছু খারাপ, অনেকে তাঁহাকে আদ্ পাগ্‌লা বলিত। তাঁহার সহ-পাঠিরা প্রায়ই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া রাগাইয়া দিয়া মজা দেখিত। তিনি যখন রাগিতেন, তখন তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞান থাকিত না,—যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন, যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই করিতেন; কিন্তু তাঁহার রাগের স্থায়িত্ব, স্বভাবতঃ অল্প ক্ষণ মধ্যেই লোপ পাইত; আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রাগ হইলে, তিনি আত্ম-প্রশংসাটাই কিছু বেশী করিতেন। গিরীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রথম কার্য্য, জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথের বিবাহ উপলক্ষে বিলক্ষণ দশ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর, বসন্তকুমারী পিতৃ-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষাও চলিতে লাগিল। কিছু দিবস মধ্যেই গিরীন্দ্র বাবু অবগত হইলেন যে,

তাঁহার পুত্র-বধূকে মেম্ রাখিয়া লেখা পড়া শিখান হইতেছে। গিরীন্দ্র বাবু অতিশয় ধার্ম্মিক ও এক জন গোঁড়া হিন্দু, তিনি ইহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিলেন না এবং যাহাতে আর মেম রাখিয়া পুত্র-বধূকে লেখা পড়া শিখান না হয়,এই অভিপ্রায় বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট জানাইয়া পাঠাইলেন; কিন্তু,ইহাতে বিশেষ কিছু ফলোদয় হইল না, কারণ, কিশোরীবাবু বসন্তকুমারীকে মিস্ এলিনার নিকট অধ্যয়ন করিতে নিষেধ করিলেও, এলিনা এক্ষণে তাঁহার পুত্র-বধূদ্বয়েরও শিক্ষয়িত্রী-রূপে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার গতি বিধিটা প্রত্যহই বাহাল রহিল। বসন্তকুমারীর শিক্ষয়িত্রী পদচ্যুতা হইয়া এলিনা ক্ষুণ্ণমনা হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাভীষ্ট সাধনে নিরাশ হইতে পারেন নাই তিনি প্রত্যহই একবার করিয়া, বসন্তকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও চটক স্বাধীনতাবৃত বিকট স্বেচ্ছাচারীতার বীজমন্ত্র তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন।

কিছু দিবস পরে, কোন কারণ বশতঃ কিশোরীবাবুর সহিত গিরীন্দ্র বাবুর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে গিরীন্দ্র বাবু পুত্র বধূকে আপন ভবনে আনাইয়া রাখিলেন।

বসন্তকুমারী পিতৃ-গৃহে যেরূপ আদরের কন্যা ছিলেন, এক্ষণে শ্বশুরালয়ে ততোধিক আদরের বধূ হইলেন। বিশেষতঃ, তিনি রূপবতী; সুতরাং শীঘ্রই স্বামি-সোহাগিনী হইলেন। ক্রমে,তাঁহার বয়ঃক্রম দশম বৎসর উত্তীর্ণ হইল এবং ৪।৫ মাস পরেই গর্ভ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইল। পৌত্র-মুখ দর্শন করিবেন ভাবিয়া, গোপীনাথ বাবুর জনক-জননীর আনন্দের অবধি রহিল না। এদিকে, বসন্তকুমারীর জননী, কন্যা পূর্ণগর্ভবতী শুনিয়া তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার জন্য মহা কান্না-কাটি আরম্ভ করিলেন এবং একেবারে অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। কিশোরী বাবু দেখিলেন মহা বিভ্রাট্! একে তাঁহার আদরের কন্যা গর্ভবতী; তাহার উপর আবার প্রেয়সীর আবদার রক্ষা না করিলে মহা প্রলয়। সুতরাং, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া গল-লগ্নিকৃত বাসে গিরীন্দ্র বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কন্যাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিয়া প্রসব করাইবার জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গিরীন্দ্র বাবু ভাবিলেন পুত্র-বধূর এই প্রথম গর্ভ, এ সময় তাহাকে পিতা মাতার নিকট রাখাই কর্ত্তব্য; সুতরাং নিজের গরজ বুঝিয়া আর বড় একটা আপত্তি করিলেন না। বসন্তকুমারী বালিকাবস্থায় যে পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিলেন, পুনরায় গর্ভাবস্থায় তথায় আগমন করিলেন।

তিনি পিতৃ-ভবনে অগমন করিয়া, জনক জননীর চরণ বন্দন, ভ্রাতৃ-পত্নী ও প্রতিবেশিনীদিগের সহিত সাদর সম্ভাষণ ও মিস্ এলিনার সহিত অভিবাদন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। অত্যল্প দিবস পরেই বসন্তকুমারী নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। এক স্থানের দুইটি জীব দুই স্থানে পৃথক হইল দেখিয়া, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্ত ও আনন্দিত হইলেন। গিরীন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিবার জন্য পুরাতন দাস দাসীগণ দ্রুতপদে গমন করিল। বাটীতে মহা হুল-

স্থল পড়িয়া গেল—নানা ঢঙে উৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

আজ সেই পুত্রের বয়ঃক্রম আটমাস। গোপী নাথ বাবু এ পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাটী আসেন নাই ও পুত্র-মুখ দর্শন করেন নাই। এক্ষণে জামাই-ষষ্ঠী উপস্থিত দেখিয়া, কিশোরী বাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, গিরীন্দ্র বাবু ও পুত্রকে পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন; সুতরাং কিশোরী বাবুর স্ত্রী, জামাই-ষষ্ঠীর বিবিধ আয়োজনে বিশেষ রূপে বিব্রতা।

জামাই-ষষ্ঠীর দিবস গোপীনাথ বাবু প্রত্যুষে উঠিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন-পূর্ব্বক বেশ ভূষা সমাপনান্তে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। বহুকালের পর জামাই আসিয়াছে, অতএব সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সাধ্যমতে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মহা সমারোহে সমস্ত দিবা অতিবাহিত হইল।

মিস্ এলিনা যথা সময়ে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু সে দিন আর তাঁহাকে আদৌ তিষ্টিতে হয় নাই। কিশোরী বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে আসিবা মাত্র বিদায় করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহার মনে ভয় ছিল যে, জামাতা জানিতে পারিলে, আবার একটা অনর্থ পাত হইবে। ইহাতে মিস্ এলিনা আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিয়া প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কিসে বসন্তকুমারীর স্বামীর অনিষ্ট করিতে পারিবেন, প্রাণপণে সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। চেষ্টার ফলও ফলিল—নববিধানের বশবর্ত্তী হইয়াআদালত-সাহায্যে গোপীনাথের সর্ব্বনাশের উপায় স্থির করিলেন।

পরদিবস সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, কিশোরী বাবুর দ্বারদেশে দুই জন চৌকীদার ও এক জন শান্তিরক্ষকের অভ্যুদয় হইল। এই সকল লোক দেখিয়া কিছু শঙ্কিত হইয়া ব্যাপার খানা কি জানিবার জন্য, কিশোরী বাবু অগ্রসর হইলেন, এবং অবগত হইলেন, যে, কিশোরী বাবুর কন্যার সহিত তাঁহার স্বামী বলাৎকার করিয়াছে; তজ্জন্য তাহার নামে শমন আসিয়াছে,—সপ্তাহ পরে বিচার হইবে, বিচারের দিন তাহাকে পুলিষ আদালতে হাজির হইতে হইবে।

গোপীনাথ বাবু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া ভয়-বিহ্বল-চিত্তে মুখ ব্যাদান-পূর্ব্বক একটি "অ্যাঁ" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ধরিয়া নিস্পন্দ-ভাবে সেই রূপ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিলেন; অবশেষে কিশোরী বাবু ও অন্যান্য পরিজনবর্গের আশ্বাস-বাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

কিশোরী বাবুর বদনোজ্জ্বলকারী—শিক্ষিত পুত্ররত্ন দুইটি এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, বসন্তকুমারীর অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পিতাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু যেমন তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত প্রতিফলই হইয়াছে; যাহা হউক, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বরেই সভ্য-সভা অভিমুখে গমন করিলেন

এবং তথায় গিয়া ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া এ বিষয়ের একটা পরামর্শ করিতে বসিলেন।

পরামর্শে স্থির হইল যে, তাঁহাদের নৈরাকারিক ভ্রাতাগণ এই মোকদ্দমায় ভাল রূপ তদ্বির করিবেন। এবং যাহাতে বসন্তকুমারী ও কিশোরী বাবুর বাটীর অন্যান্য রমণীদিগকে প্রকাশ্য আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ তাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার অতিশয় পক্ষপাতী বিশেষতঃ কিশোরী বাবুর পুত্রদ্বয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহাদের স্ত্রীরা সভায় যাতায়াত করেন এবং ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর সহিত মিশ্রিত হইয়া পবিত্র প্রেম শিক্ষা করেন ; কিন্তু তাঁহাদের পিতা ইহার কণ্টক-স্বরূপ, তাঁহার আধিপত্য প্রযুক্ত তাঁহাদের আশালতা এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই। এক্ষণে এই সুবিধায় যদ্যপি তাঁহাদিগকে ২।৪ বার প্রকাশ্য আদালতে হাজির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের অন্তঃপুরের আবরণ ঘুচিয়া যাইবে এবং তাঁহারা সভ্যদল-ভুক্ত হইয়া ভ্রাতাদিগকে ভগিনী-প্রেম বিতরণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে শিক্ষা করিবেন। অতএব, এই অভিযোগ তাঁহাদের শাপে বর হইয়াছে।

বিচারের দিবস গোপীনাথ বাবু, তাঁহার পিতা ও অন্যান্য লোক জন সমভিব্যাহারে আদালতে আসিয়া উপনীত হইলেন। যথা সময়ে, কিশোরী বাবু ও আসিলেন, এদিকে মিস্ এলিনা এবং ভ্রাতার দল-বল ও আসিয়া জুটিল। কিশোরী বাবুর পুত্র দুইটি ও আসিলেন বটে, কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হউক বা যে কোন কারণে হউক, বিচার গৃহে প্রবেশ না করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উচ্চমঞ্চে এক জন দেশীয় বিচার-পতি মহাশয় বসিয়া আছেন, সম্মুখে শিকারের লোভে পেটুক উকীল মোক্তারগণ জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন ; আদালত ঘর লোকে লোকারণ্য। কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথ বাবুকে আসামীর কাটরার মধ্যে প্রবেশ করান হইল। গোপীনাথ বাবু একে আদ্-পাগলা লোক,—তাহাতে আবার তাঁহাকে কাট্‌রার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল দেখিয়া, তিনি ইহা অতিশয় অপমানকর বিবেচনা করিয়া একেবারে চটিয়া গেলেন ; যাহা হউক তিনি কিছু বলিলেন না—মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

সরকারী পক্ষের উকিল জেরা করিতে উঠিলেন। গোপীনাথকে হলপ পড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

তোমার নাম কি ?

গোপী। শমন দিবার সময় ত নামটি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন ; আবার জিজ্ঞাসা কেন ?

উকী। তোমার নাম কি বল।

গোপী। শ্রীগোপীনাথ রায়।

উকী। তোমার পিতার নাম কি ?

গোপী। তিনি ত এই খানেই উপস্থিত রহিয়াছেন।

উকী। উপস্থিত রহিয়াছেন কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তাঁহার নাম কি ?

গোপী। কেন আপনি কি তাঁহার নাম জানেন না?

উকী। না।

গোপী। বলেন কি! আমার পিতার নাম না জানে এমন লোক ত্রিভুবনে কে আছে?—তিনি যে জগদ্বিখ্যাত।

উকী। কিসে?

গোপী। আরে তিনি যে খুব মস্তো লোক! তাঁকে সকলেই মান্য করে। পাড়া-শুদ্ধ লোক তাঁর কথায় মরে, তাঁর কথায় বাঁচে!

উকী। ভাল তাঁর নামটি কি?

গোপী। অশেষ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাধ্যাপক, বিবিধ বৈদিকগ্রন্থ প্রণেতা কবিবর শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় কবিরাজ কুলভূষণ পিতাঠাকুর মহাশয়। আপনি আমাকে যেমন তেমন লোক মনে করিবেন না, আপনার বিবেচনা করা উচিত—এই যে, লোকটা আপনার সহিত কথা কহিতেছে এ লোকটা কে, কত বড় লোকের সন্তান!

উকীল বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"পাগল নাকি?"

গোপীনাথ বাবুর উকীল বলিলেন, "yes, my learned friend my client is some what cracked headed." গোপীনাথ বাবুর আর সহ্য হইল না তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তা' বই কি, আমাকে কাঠরার ভিতর পুরিয়া চারিদিকে খোঁচাখুঁচি করিতেছ, আর আমি হলুম cracked headed, এতে কি কখন মেজাজ ঠিক্ থাকে?"

ইতিমধ্যে ভ্রাতাদলভুক্ত কতিপয় লোক সরকারী পক্ষের উকীলের কাণে কাণে কি বলিলেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা সেই সময় উকীল বাবুর পকেটেও ভ্রমক্রমে কিছু ফেলিয়া দিয়াছিলেন। উকীল বাবু বিচারপতি মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এব্যক্তি পাগলের ভাণ করিয়া সত্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে আদালতে আনাইয়া জবান-বন্দী লওয়া আবশ্যক।" এইকথা শুনিয়া গোপীনাথ বাবুর মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"না না, তা কেন, আমিই সব বল্‌ছি"।

বিচারপতি মহাশয় বলিলেন, "অগ্রে ইহার জবানবন্দী শেষ হউক, তৎপরে আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোকদিগকে হাজির হইবার জন্য শমন বাহির করা যাইবে"। উকীল বাবু তখন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

উকী। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

গোপী। পাগল, আমি না আপনি?

উকী। কেন?

গোপী। বিবাহ না হইলে আর আমাকে এ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে কেন?

উকী। কবে বিবাহ হইয়াছে?

গোপী। কবে ঠিক মনে নাই, তিন বৎসরের কিছু বেশী হইবে।

উকী। তখন তোমার স্ত্রীর বয়স কত?

গোপী। শুনিয়াছিলাম ৮ বৎসর?

উকী। এখন কত হইবে?

গোপী। হিসাব করিয়া দেখুন না, প্রায় বার বৎসর হইবে।

উকী। প্রায় বার বৎসর অর্থাৎ বার বৎসরের কিছু কম্—এই ত?

গোপী। তা এই রকম হবে।

উকী। তুমি স্ত্রী-সহবাস করিয়াছিলে ?

গোপী। বিবাহের পর হইতেই ত স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছি।

উকী। আঃ তা কেন, বলি তুমি তাহার সহিত সহবাস করিয়াছ ?

গোপী। এই ত বলিলাম।

উকীল বাবু দেখিলেন বিভ্রাট্। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত cohabit করিয়াছ কি ?"

গোপী। তাই ভাল, এত খারাপ কথা ত বাঙ্গালায় নাই, কি করিয়া বুঝিব বলুন ! যাহোক এ কথাও কি বলিতে হইবে ?

উকী। হাঁ এই কথাই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গোপী। আপনি খুব লোক দেখ্‌ছি !

উকী। বাজে বকিও না, সত্য কথা বল।

গোপী। আরে ! বলিব কি ছাই আমার যে ছেলে হইয়াছে !

উকী। তোমার ছেলে হইয়াছে !!

গোপী। তবে আর কি বল্‌ছি মাথামুণ্ড !

উকী। তোমার ছেলে এখন কত—

বিচারপতি মহাশয় উকীলকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিয়া বলিলেন,—"আমার যাহা কিছু জানিবার, সে সমস্ত প্রমাণ হইয়াছে, আর কাহারও সাক্ষ্য সাবুদের প্রয়োজন নাই।"

এই কথা বলিয়া তিনি রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে ভাবিল—মোকদ্দমা বোধ হয় ফাঁসিয়া গেল, কিশোরী বাবু কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং ভ্রাতৃদলের বদনমণ্ডল ম্লান হইয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বিপরীত !

বিচারপতি মহাশয় রায় লেখা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন,—এ ব্যক্তি নিজমুখে আদালতে স্বীকার করিয়াছে যে, ইহার স্ত্রীর বয়ঃক্রম এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা অল্প এবং ইহার ঔরসে সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, এব্যক্তি, স্ত্রীর দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তাহার সহিত সহবাস করিয়াছে ; সুতরাং, আইনঅনুসারে এব্যক্তি 'বলাৎকার'-অপরাধে অপরাধী ; এবং যখন এই ঘোরতর বলাৎকার অপরাধের গুরুতর ফল-স্বরূপ ইহার সন্তান হইয়াছে, তখন ইহার প্রতি কখন লঘু দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না ; সুতরাং, যাবজ্জীবন দীপান্তর-বাসের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

গোপীনাথের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরীন্দ্র বাবু বিস্মিত ও চকিত হইয়া পড়িলেন এবং চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার উকীল প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু বিচারপতি মহাশয় আর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আদালত ভঙ্গ করিয়া স্বীয় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুইজন প্রহরী আসিয়া গোপীনাথ বাবুর হাত ধরিয়া হাজতে লইয়া গেল। ভ্রাতার দল মহানন্দে কোলাহল করিতে করিতে কিশোরী বাবুর পুত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া সভ্যগৃহে গমনপূর্ব্বক ধুমধাম আরম্ভ করিলেন। গিরীন্দ্র বাবু ও কিশোরী বাবু কপালে করাঘাত করিতে করিতে আদালতের বাহিরে

আসিলেন, তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন না করিয়া, কতিপয় সুদক্ষ উকীলের নিকট এই বিষয়ের একটা পরামর্শ করিবার জন্য গমন করিলেন।

মিস্ এলিনা সুযোগ বুঝিয়া একেবারে কিশোরী বাবুর বাটীতে গমন করিলেন এবং গোপনে বসন্ত-কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তোমার স্বামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে এবং তোমাকে ধরিবার জন্য ১০।১২ জন গোরা আসিতেছে; অতএব যদি পরিত্রাণ চাও, যদি এ বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আপাততঃ আমার সহিত পলাইয়া আইস, তাহার পর আমি যা হয় একটা উপায় করিব।" এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে বসন্তকুমারী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মিস্ এলিনার গাড়ীতে উঠিলেন। মিস্ এলিনা তাঁহাকে একেবারে জেনানা মিশন হাউসের মধ্যে লইয়া তুলিলেন। তৎপরে মিস্ এলিনা ও অন্যান্য কতিপয় মিষ্টভাষী মিসনরী মহিলা একত্রিত হইয়া, বসন্তকুমারীকে তাঁহার স্বামীর আশা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিবার জন্য প্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইহ জীবন আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিবার জন্য নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু বসন্তকুমারী তখন ভয়, বিস্ময় ও দুর্ভাবনায় এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর কি দুর্দ্দশা হইল, তাঁহারই বা কি হইবে, বাটীতে না জানি এতক্ষণ কি অনর্থপাত হইয়াছে, তাঁহার পলায়নেই বা সকলে কি মনে করিতেছে, এই সকল নানা চিন্তায় তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, মিস্ এলিনার সহিত পলায়ন করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি; সুতরাং, পুনরায় বাটী যাইবার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি তথায় এক দিবারাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, উক্ত সময় তিনি ক্রমাগত ক্রন্দন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এক বিন্দু জল পর্য্যন্তও পান করেন নাই!

বসন্তকুমারী যখন এলিনার সহিত পলায়ন করেন, তখন কিশোরী বাবুর একজন পরিচারিকা ইহা দেখিতে পাইয়াছিল; তৎপরে বসন্তকুমারীর অধিকক্ষণ অনুপস্থিতিতে, যখন সকলে তাহার খোঁজ করিতে লাগিল, তখন সে ইহা ব্যক্ত করিল। কিশোরী বাবু সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া প্রবোধবাক্যে কহিল,—"আপনার কোন ভাবনা নাই আমরা বসন্ত-কুমারীকে উদ্ধার করিতেছি," এই কথা বলিয়া তাঁহারা সভা-সভায় গমন করিলেন এবং তথায় সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিলেন। নৈরাকারিক ভ্রাতারা তাঁহাদের মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া খায় শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"তোমরা থাকিতে তোমাদের ভগ্নীকে

মিসনরীরা লইয়া যায়, ইহা অতিশয় লজ্জার কথা ; অতএব তাঁহাকে শীঘ্র তথা হইতে উদ্ধার করিয়া এখানে আনয়ন কর এবং ভ্রাতৃপ্রেমের অংশ-ভাগিনী হইতে ভগিনীকে শিক্ষা দাও।" ভ্রাতৃদ্বয় উত্তর করিলেন,—"তাঁহার উদ্ধার আবশ্যক হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি আমাদের সম্পর্কে ভগ্নী, সুতরাং তাঁহাকে সুসভ্যা ভগিনী করিব কিরূপে ?"

এই কথা শুনিয়া 'সমাজ-পতি' মহাশয় বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য ! তোমরা এত দিন এখানে আসিতেছ, অথচ, এখন ও তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল না ! আমাদের যে পবিত্র প্রেম ! আমাদের যে স্বাধীন প্রেম ! ইহা যে সকলেরই সহিত করিতে পারা যায়, তাহা কি তোমরা জান না ? আমাদের পবিত্র প্রেমের পবিত্র ভাব কি তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই ! যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে একবার "মরকত-রঙ্গভূমে" গিয়া "বকেশ্বর" অভিনয় দেখিয়া আইস, সেখানে পবিত্র প্রেমের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। তবে তিনি রক্ত-সংশ্রবে তোমাদের ভগ্নী বলিয়া যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহাও আমি ভঞ্জন করিয়া দিতেছি যথা—তিনি তোমাদের সহোদরা ভগ্নী নহেন, বৈমাত্রেয় ভগ্নী, সুতরাং ইহাতে তোমাদের কোন বাধা নাই।"

এই বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় দলবল সহ জেনানা মিসন্ হাউসে, উপস্থিত হইলেন এবং বসন্তকুমারীর অসম্মতিতে তাহাকে গোপনে ভুলাইয়া বাহির করিয়া আনার দরুণ নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া বসন্তকুমারীকে প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন।

মিসনরীরা প্রথমে অস্বীকার, পরে আপত্তি করিলেন,—শেষ বেগতিক দেখিয়া বসন্ত কুমারীর সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। বসন্তকুমারী জেনানা মিসন্ হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় নৈয়াকারিক ব্যারিকের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। যাহা হউক, এখানে আর তাঁহাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হয় নাই। অনতি বিলম্বেই কিশোরী বাবু তাঁহার পুত্রদ্বয়কে যৎ পরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বসন্তকুমারীকে আপন ভবনে আনয়ন করিলেন।

এই সকল সংবাদ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং গিরীন্দ্র বাবু ও সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, তিনি তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমার এই পবিত্র সোণার সংসারে এ সকল আপদ্ বিপদ্ ঘটিবার কারণ কি ? আর কিছুই নহে—এই অলক্ষণা দুঃশ্চারিণী বধূর জন্তই আমার এই সকল অনর্থপাত ঘটিতেছে, বিশেষতঃ, সে যখন জেনানা-মিসন হাউসে ম্লেচ্ছের সহিত ২৪ ঘণ্টা বাস করিয়াছিল এবং নৈয়াকারিক ব্যারাকের দল-ভুক্ত হইয়াছিল, তখন তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমার পবিত্র কুলে কলঙ্ক অর্পণ করা আর কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং, তিনি বধূকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই গিরীন্দ্র বাবু বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার দিয়া উচ্চ আদালতে মোকদ্দমার আপিল করিলেন এবং বিচারের সময় সুদক্ষ উকীল ও ব্যারিষ্টারের সাহায্যে

ভালরূপে প্রমাণ করিলেন যে, যে আইন-বশে গোপীনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হইয়াছে, তাহা বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহার সন্তান হইয়াছে, সুতরাং গোপীনাথ এই নববিধানানুসারে কথনই দণ্ডনীয় হইতে পারে না। বিচারপতি মহাশয় এই সকল বিষয় উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোপীনাথকে বেকসুর খালাস দিলেন।

গোপীনাথ বাবু আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং সেই সময় মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—আমি কত বড় লোকের পুত্র আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠান প্রায় মুখের কথা কিনা! অতঃপর, তিনি পিতার নিকট বসন্তকুমারীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ও আদেশে বসন্তকুমারীকে ত্যাগ করিলেন. কিন্তু পুত্রের মায়া কাটাইতে না পারিয়া একদা কৌশল-ক্রমে তাহাকে আপন ভবনে আনাইয়া আটক করিয়া রাখিলেন। কিছু দিবস পরে গিরীন্দ্র বাবু পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন।

বসন্তকুমারী পতি-পুত্র-লাভ-লালসায় লালায়িত হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন এবং স্বীয় দুরদৃষ্টের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সভ্যগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে টানাটানি করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতা নহেন; ভ্রাতাদ্বয়েরাও তাঁহাকে ছাড়িতে চান না; শেষ তাঁহারা বসন্ত কুমারীকে বল-পূর্ব্বক সভ্য-গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; আমার আর সহ্য হইল না, ক্রোধে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল এবং পদাঘাতে কুলাঙ্গার ভ্রাতাদ্বয়ের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য যেমন বেগে গমন করিতে যাইব, অমনি আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম—রজনী প্রভাত হইয়াছে, কোথাও কিছু নাই; কেবল স্বপ্ন মাত্র। যাহা হউক, গোপীনাথ আমার একজন বন্ধু, বিশেষতঃ গত রাত্রে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে তিনি অদ্য জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শশুর বাটী যাইবেন, সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে গমন করিলাম, দ্বারদেশে গিয়াই দেখিলাম গোপীনাথ সাজগোজ করিয়া বহির্গত হইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি গোপীনাথ!"

গোপীনাথ, হাসিতে হাসিতে "এই ভাই! শ্বশুর বাটী যাইতেছি" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া, আমার স্বপ্নটা কার্য্যেইবা পরিণত হয়, ইহা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিলাম, কারণ, কয়েক মাস গত হইল গোপীনাথের সত্য সত্যই পুত্র হইয়াছে এবং কিশোরী বাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে যে মেম্ রাখিয়া লেখা পড়া শিখান হয় ও তাঁহার পুত্র দুইটি যে সভা-দল ভুক্ত হইয়াছেন তাহাও গোপীনাথের নিকট শুনিয়াছিলাম।

বালক-বদন।

উষার ক্রোড়েতে হেরিয়া তপনে,
কমলিনী সুখ পায় বটে মনে ;
প্রদোষেতে শশী নিরখি' গগণে,
কুমুদিনী-মন-মরাল লোভে ;

সঘনে হেরিলে বালক বদন,
ততোধিক সুখে ভাসেপ্রাণ মন ;
ভুবন-ভিতরে কৌস্তভ-রতন,
কোটি চাঁদ সেই বদনে শোভে !

নির্ম্মল শরৎকালে নভঃস্থল,
বসন্তে নির্ম্মল সরসীর জল,
পূর্ণিমার শশী অতি নিরমল,
সুবিমল বটে হীরক কায় ;

ততোধিক হয় নির্ম্মল বরণ,
সরলতাধার বালকের মন,
শশী সকলঙ্ক করি দরশন,
সঘনে, আপন মূরতি চায়।

হিংসা দ্বেষ আদি কুবৃত্তি-নিচয়,
তাহার নিকটে না পায় আশ্রয়,
শত্রু, মিত্র, তথা সমভাবে রয় !
যেমন,চকোর যামিনী-কোলে ;

ভাবের ভাণ্ডার করিয়া মন্থন,
ঝরে তথা হ'তে মধুর বচন,
আধ-আধ ভাষে বদনে যখন,
মৃদু মৃদু হাসি ঈষৎ দোলে।

ভয়ঙ্কর ভোগ-তৃষ্ণা তাহে নাই,
পবিত্র আনন্দ—বিরাজে সদাই,
বিমল আনন্দ কোলে করি পাই,
যবে কথা কয় মধুর স্বরে ;

সুধা-অভিষিক্ত বালক-হৃদয়,
সত্য, শান্তি তথা ধাত্রী-ভাবে রয়,
পাপশূন্য দেহ সদানন্দময়,
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে !

আদর-সলিল করিয়া সেচন,
শত্রু যদি করে ক্রোড়েতে ধারণ,
না হয় শঙ্কিত, মানসে কখন,
বিষম বিকার না পায় স্থান ;

সে মুখের ভাষে উথলে হৃদয়,
পরাজিত তাহে গায়ক-নিচয়,
বীণার ঝঙ্কার তার সম নয়,
অথবা, পিকের মধুর গান।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

অভিনয়-সমালোচন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে "মরকত"-রঙ্গমঞ্চে অনেক দিনের পর ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-বিরচিত "কমলে কামিনী" অভিনয় দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। নাটক খানির রচনা সম্বন্ধে লেখকের যেরূপ অশেষ গুণরাশির পরিচয় পাওয়া যায়, অভিনয় কার্য্যও তদনুরূপ হইলেই বড়ই সুখের বিষয় হয়। উক্ত নাট্য সমাজ যে, তদ্বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা দর্শক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অভিনয়ের প্রথমাংশ দেখিয়া আমরা ততদূর সাফল্যের আশা করি নাই বটে, কিন্তু অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তর ক্রমান্বয়ে যতই অভিনীত হইতে লাগিল, কাল বিলুপ্ত "জাতীয় নাট্য সমাজ"-কৃত অভিনয় কার্য্য ততই আমাদিগের স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল।

শিখণ্ডী বাহনের যুগপৎ স্পর্দ্ধা ও নম্রতা, মকরকেতনের শিশুবুদ্ধি ও সরলতা, বক্রেশ্বরের বাক্‌চাতুর্য্য ও হাস্যোদ্দীপক কার্য্যকলাপ,—সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল অভিনেত্রীগণ কোন অংশেই অপ্রশংসনীয় নহে; বরং অনেকস্থলে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামীর সহিত সুশীলার কথোপকথন, সুরবালা ও রণকল্যাণীর পরস্পর ব্যঙ্গোক্তি, বৈষ্ণবীর বাক্‌পটুতা, রাজমহিষীর ঈর্ষাব্যঞ্জক আশীর্ব্বাদ, রাসমণ্ডপে সখীগণের নৃত্যগীতাদিতে, সহৃদয় মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কয়েক খানি দৃশ্যপটও বেশ সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর একটি কথা,—একস্থানে এরূপ যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয় আর কোন নাটকেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ, নাটক খানিতে যেমন হাস্য, করুণ ও বীররসের একত্র সমাবেশ লক্ষিত হয়, উক্ত নাট্যসমাজ তদনুরূপ অভিনয় করিতেও বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, দুই একটি অভিনেত্রীর শিক্ষানৈপুণ্যে, আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এবার, অভিনয়ে যে সকল সামান্য দোষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য অভিনেতাগণেরও অবিদিত নাই। আশা করি, বারান্তরে সে সমস্তই সংশোধিত হইয়া যাইবে। দর্শক-বৃন্দের যাহাতে কোনও কষ্ট না হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছিল এবং বাহিরের অন্যান্য বন্দোবস্তও সুচারুরূপ হইয়াছিল।

সঙ্গীত।

[৺আশুতোষ দে (সাতুবাবু) বিরচিত।]

দেশ-মোল্লার—যৎ।

কেও রমণী সমরে বিরাজে?
লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুর-সমাজে!
চরণ-তল বরণ
জিনি তরুণ-অরুণ
নখরে নিশাকর—
লুকাইল লাজে।
প্রপদ নীল নলিনী,
উরু রাম-রম্ভা জিনি,
কটি তটে করশ্রেণী,
কিঙ্কিনী বাজে।
নাভি সুধা-সরোবর
ত্রিবলী কি মনোহর!
পীনোন্নত পয়োধর
হৃদি' পরে সাজে।
সু-শাণ কৃপাণ করে,
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে,
বরাভয় মুণ্ডধরে,
গ্রাসে বাজি গজে।
কিবা মুণ্ড-মালা শোভা,
সুদশনা লোল-জিহ্বা,
শ্রুতি যুগে ঈশু-শিশু—
অপরূপ সাজে।
মুক্ত কুটিল কুন্তল
সুধাপানে ঢল ঢল—
অলি যেন
আশুতোষ-হৃদয়-সরোজে।

—

[৺দয়ালচাঁদ মিত্র বিরচিত।]

খট—কাওয়ালী।

দেখ, দেখ সজনি! রজনী গেল নিজ বাসে,
কুমুদি মুদিত হ'ল শতদল-দল হাসে;
'নিরখিয়া দিবাকর
সুধাহীন সুধাকর
ধায় যত মধুকর
মধুপান অভিলাষে।

যার আশে আশা করি,
সাজাইলে সহচরী
সে পোহায় বিভাবরী,
চন্দ্রাবলী-সহবাসে;

কারে কব এ লাঞ্ছনা!
শ্যামের কি বিবেচনা!
আমারে ক'রে বঞ্চনা
সে সুখ-সলিলে ভাসে!

শুনিলে বংশীর ধ্বনি,
কালা কাল নাহি গণি,
হইয়ে কুল-রমণী,
বনে আসি অনায়াসে';

তারি কি এ প্রতিফল,
আমায় ঘটিল বল!
চল চল গৃহে চল,
মিছে থাকি তার আসে।

—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা।

আষাঢ়—১২৯৮।

আষাঢ় মাসের সূচী।

নিয়মাবলী।

সুবোধিনীর আকার—রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা ৩২ পৃষ্ঠা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৸০ টাকা; অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক, শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। আবার কত সুবিধা দেখুন :—

উপহার! উপহার! উপহার!

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত ৪ খানি পুস্তক উপহার পাইবেন।

১। মানস কুসুম (কবিতাপুস্তক—৯৬ পৃষ্ঠা) ৺কালিদাস মিত্র প্রণীত।

২। ধর্ম্ম-পরীক্ষা (নাটক—৮৮ পৃষ্ঠা) শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

৩। একটি চিত্র (উপন্যাস—৪৩ পৃষ্ঠা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

A visit to Darjiling by Bhola Nath Mitter.

কলিকাতা ৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরের সুবোধিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য দুই টাকা—দ্বিতীয় বৎসরের গ্রাহকদিগের জন্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

[কলিকাতা ৩ নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট
হইতে প্রকাশিত।]

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড } আষাঢ়—১২৯৮। { তৃতীয় সংখ্যা

কিছুই নাহিক বিনাশ পাবে।

[From Tennyson's "Nothing will die."]

বহিছে তটিনী, বহিবে না আর—
নয়নের পথে?
হবে কি কখন শ্রান্ত, সমীরণ
আকাশে বহিতে?
ভাসিতে ভাসিতে বারিদ কখন
ভাসিবে না আর?
হবে কি কখন জীবের হৃদয়
নিস্পন্দ—অসাড়?
প্রকৃতি কখন বিনাশ পাবে?

পাবে না বিনাশ প্রকৃতি কখন;
বহিবে তটিনী—বহিবে পবন,
ভাসিবে নীরদ আকাশের গায়,
বহিবে শোণিত জীবের হিয়ায়,
কিছুই নাহিক বিনাশ পাবে।

জগতে কিছুই পাবে না বিনাশ,
হবে রূপান্তর অনন্ত-কালে;
এখন ধরায় শিশির-বিকাশ,
নিদাঘ, শরত, গিয়াছে চ'লে।

তাই, শুষ্ক এবে মহী-মর্ম্ম-স্থান,
আসিবে বসন্ত নবীন ভাবে;
সরস-বসন্ত,—মানস-মোহন,—
দশদিক্ ব্যাপি' বহিবে পবন,
চারিধারে ছুটে করিবে ভ্রমণ,
নূতন জীবন সকলে পাবে।

কখন পৃথিবী হয়নি সৃজিত,
কালে রূপান্তর সকলি হবে;
পাবে না পাবে না বিনাশ কখন।
বহুক রহুক তবে সমীরণ,
চিরকাল সন্ধ্যা, প্রভাত রবে।

করেনি কিছুই জনম গ্রহণ,
কাহার নাহিক হইবে মরণ,
কালে রূপান্তর সকলি হবে।

শ্রীরসময় লাহা।

সকলি আবার বিনাশ পাবে।

[From Tenhyson's "All things will die."]

এই ত চলেছে নদী, মধুর নিনাদে,
করি দরশন,
বহিতেছে, আকাশের গায়, সুবিমল—
দখিণ-পবন,
রজত জলদ-দল, করে একে একে,
ত্বরিত গমন,
নিদাঘ ঊষায় কিবা, প্রফুল্ল অন্তরে,
নাচে প্রাণিগণ!
সকলি আবার বিনাশ পাবে।

বহিবে না নীল-তরঙ্গিনী,
বহিবে না মরুত-মলয়,
ভ্রমিবে না আর কাদম্বিনী,
স্পন্দহীন হইবে হৃদয়।
সকলি আবার বিনাশ পাবে।

পাইবে বিনাশ সকলি আবার,
আসিবে না আর বসন্ত ফিরে;
হায় রে মিছার গর্ব্ব অহঙ্কার,
র'য়েছে শমন দাঁড়া'য়ে দ্বারে।

হের আমাদের আত্মীয় স্বজন,
আমোদ প্রমোদ করিছে বর্জ্জন,
মরিতে আমরা এসেছি যখন,
অবশ্য তখন মরিতে হবে।
ভীষণ—ভীষণ দীপ্ত হুতাশন,
অনন্ত চিতায় শুইব সবে!

বিলাস—সম্ভোগ হ'ল সমাপন,
জুড়া'বে না আর মোদের শ্রবণ,
বিহঙ্গ-সঙ্গীত মধুর-নিক্বণ.
গিরীন্দ্র-বিহারি-মরুত-রবে।

হের হে এদিকে ডাকিছে শমন;
নিদারুণ দশা! কহিতে বচন—
হ'তেছে রসনা বাক্‌শক্তি-হীন,
সরস-বদন, বিরস, মলিন,
সতেজ শরীর হ'তেছে বিকল,
স্থির আঁখিতারা—শোণিত শীতল,
শুন উচ্চ রোল—
"হরি হরি বোল,"
ফুল্লমনে দাও বিদায় সবে।

সকলেই জানে, ধরা পুরাতন,
কে জানে কখন হ'য়েছে সৃজন,
সময়ে আবার বিনাশ পাবে।
করুক ভ্রমণ তবে সমীরণ,
সুনীল-তরঙ্গ, তীর-প্রক্ষালন;
প্রদোষ প্রভাত অনন্ত অয়ন,
আর নাহি তুমি দেখিতে পাবে।
যা কিছু সকলি হ'য়েছে সৃজন,
আসিবে না আর ফিরে কদাচন,
সকলি আবার বিনাশ পাবে।

সম্পাদক।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অন্বেষণ।

প্রতাপচন্দ্রের মাতৃ-শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে, সে দিবস অনেক দূরদূরান্তর হইতে বহু সংখ্যক ভিখারী ও ভিখারিণীর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ভিখারিণী কোন বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করে। প্রতাপ বাবু তাহার কিয়দংশ মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি শুনিলেন একটি ভিখারিণী হাত মুখ নাড়িয়া বলিতেছে,—"কেন বল ?—ও সব আমরা ঢের দেখিছি—ঠ্যাকার—ঠ্যাকার।" আর একটি ভিখারিণী তাহাকে উত্তর দিতেছে,—"ও কথা বলিস্‌নে, সবাই কি তোদের মত অন্নকষ্টে যে, শ্রাদ্ধ বাড়ী দান সাধ্‌তে আস্‌বে,—দেখ্‌তে পাস্‌নি ছুঁড়ীর চেহারা কেমন ঢল-ঢলে, দেখ্‌লেই মনে হয় যেন কোন ভদ্র-লোকের মেয়ে।" অপর একটি ভিখারিণী বলিল,—"তা বাছা! বলা যায় কি ? কে কি পন্থায় ফির্‌ছে,—তা আমরা কেমন করে জান্‌ব ?"

প্রতাপচন্দ্র এই কথা গুলি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক এক বার তাঁহার মনে হইত, সহচরীই বা সেই ভিখারিণী; তিনি এ কথা শারদা-সুন্দরীকে বলিয়াছিলেন। সহচরীকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া অবধি শারদা-সুন্দরীরও মনে সুখ ছিল না। তিনি একবার বা মনে করিতেন, সহচরী—অসতী; কিন্তু দুইবার মনে করিতেন সহচরী—সাধ্বী। হঠাৎ এক কাষ করিয়া ফেলিয়াছেন এখন কি করেন ? মনে মনেই আপনাকে ধিক্কার দিতেন। এক্ষণে শ্যামার পত্র পাঠ করিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই সন্দেহ দূর হইল। সহচরীকে অন্বেষণ করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনিতে উভয়েই ব্যস্ত হইলেন। কেনই বা সহচরীর বিলাপ-বাক্যে কর্ণপাত করিলাম না,—কেনই বা তাহার ক্রন্দনে দ্রবীভূত হইলাম না ? কেনই বা দুই দিন দেখিয়া, তাহাকে তাড়াইলাম না ? এইরূপ নানা চিন্তায় শারদা-সুন্দরীর অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি একদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রোদন করিতে করিতে প্রতাপচন্দ্রকে বলিলেন,—"আমি তা'কে আপনার মেয়ের মত ভাল বাস্‌তেম, সে'ও আমাকে মায়ের মত ভক্তি করিত, বিধাতা আমাদের সান্তানাদি দেন নাই—সন্তানের মায়া আমরা কেমন ক'রে জান্‌ব ? কিন্তু সহচরী যে দিন অবধি আমায় ছেড়ে গিয়েছে, সে দিন অবধি আমার মনে আর এক তিল সুখ নাই। আহা! বাছা আমার কোন দোষের দোষী নয়—আমি তাকে শুধু শুধু কত যন্ত্রণা দিতেছি! আরও দেখুন

সতী সাধ্বীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অবধি প্রত্যহ একটা না একটা অমঙ্গল ঘট্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে। এই সব দেখে আমার এখন মনে হয়—মনে হয় কেন ?—আমি স্বপ্নও দেখেছি, দশভুজা আমাদের উপর রাগ ক'রেছেন, তিনি আর আমাদের পূজা নেন না। তাই বলি, যদি ভাল চান্ তবে তা'কে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনুন্।"

প্রতাপচন্দ্র শারদা-সুন্দরীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"ভাল অদ্যই আমি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতেছি—সহচরীকে যেখানে পাইবে ডাকিয়া আনিবে।" শারদা-সুন্দরী সুস্থির হইলেন। প্রতাপচন্দ্র বাহিরে গিয়া চারিদিকে চারিটি দ্বারবান প্রেরণ করিলেন; এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন—"তোমরা কেবল দেখিয়া আসিবে সহচরী কোথায় থাকেন, তোমরা তাঁহাকে কিছু বলিও না, কি জানি তিনি পাছে ভয় পান। তৎপরে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিব।" শারদা-সুন্দরী শ্রবণ করিলেন—লোক পাঠান হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রী৺দশভুজাকে পূজা মানিলেন এবং করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—"মা! আজই যেন সহচরী ফিরে আসে—মা আমি না জেনেএমন কাজ ক'রেছি—আমার অপরাধ নিও না মা!"—তিনি একবার মনে করিলেন—সে যদি অভিমান ক'রে ফিরে না আসে, তবে কি হবে? আবার ভাবিলেন—না, সহচরী সেরূপ নয়, সহচরী আমাকে ভাল জানে—সে জানে আমি তাকে মেয়ের মত ভাল বাসি, কেবল লোক-নিন্দার ভয়ে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দি'ছি। তাড়িয়ে দি'ছি—সতী-লক্ষ্মীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিছি—উঃ কি কঠিন কথা! আবার বল্‌ছি আমি তাকে মেয়ের মতন ভাল বাসি!! আমার মতন অবোধ আর কৈ আছে। লোকে ত আর আমার অন্তঃকরণের ভিতর কি হচ্ছে দেখ্‌তে যাবে না, তারা আমার কাজ দেখে কেবল হাস্‌বে, আর টীট্‌কারি দেবে। হায়! হায়! এমন কার্য্যও আমি ক'রেছি! হীরেকে কাচ ব'লে অযত্ন ক'রে ফেলে দিয়েছি! এইরূপ বিলাপ করিয়া তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

পাঠক মহাশয়! একবার এদিকে আসুন—প্রতাপচন্দ্রের বাটীর দুই ক্রোশ উত্তরে যে বনান্ত ভূমি সন্দর্শন করিতেছেন, একবার চলুন উহার মধ্যে প্রবেশ করি—প্রবেশ করিয়া দেখি সহচরীও অনঙ্গ-মোহিনী তথায় কি করিতেছেন। উষাকাল সমুপস্থিত; পক্ষিগণ আপন আপন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেছে;—সমীর-দোদুল্যমান বিটপিগণ আনন্দে ভাসমান হইতেছে; বনলতাগণ অজস্র কুসুম-রাশি বর্ষণ করিয়া জগদীশ্বরের পূজা করিতেছে; এমন সময় সহচরী কুটীর পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পাহরণে গমন করিলেন। অনঙ্গ-মোহিনী রাত্রে অনেকক্ষণ রামায়ণ পাঠ করিয়া শয়ন করিয়াছেন,—শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সহচরী কুসুম-চয়নে গমন করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং বীণা বাজাইয়া সুমধুরস্বরে প্রভাতী আলাপ করিতে লাগিলেন। অনঙ্গ-মোহিনী ললিত-রাগিণীতে গাহিলেন—

কি যে দেখিনু আমি সুখদ স্বপন মরি!
পুলকিত মন প্রাণ হেরি সে রূপ-মাধুরি।
ছিন্ন ভিন্ন ঘন-দল, হৃদয়-গগণ-তল,
হরষি কৌমুদীভাসে,চারিদিক আলো করি।
বিরহ-বিজলী-রেখা, নয়নে না যায় দেখা,
বিলাপ-অশনি-ঘোষ, শুনা নাহি যায়,—
দীর্ঘশ্বাস-প্রভঞ্জন নাহি করে বিচরণ,
সুখের মলয়ানিল বহিছে, সন্তাপ হরি!

গীত গাহিতে গাহিতে অনঙ্গ-মোহিনীর পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি পার্শ্বে বীণা রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সহচরী অঞ্চল ভরিয়া, কুসুম-চয়ন করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিবিষ্ট-চিত্তে মাল্য-রচনা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধেক পুষ্প গাঁথা হইয়াছে, এমন সময়ে অনঙ্গ-মোহিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সহচরী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আজ বুঝি সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় হ'য়েছে—"

অন। কেন সই?

সহ। তোমার এত ঘুম!

অন। কেন?—আমি কি মানুষ নই?

সহ। হ'লে বলতেম্ না।

অন। তবে আমি কি?

সহ। মানুষ ছাড়া আর কিছু।

অন। ভুত—প্রেত?

সহ। রাম! রাম!—

অন। তবে বল আমি কি?

সহ। দেবী—

অন। তুমি সই! পাগ্‌লী—

সহ। তার আর ভুল কি? এতেও যদি না হ'ব তবে আর কিসে হ'ব?

অন। বলি এত মালা গাঁথার ধুম কেন?

সহ। পূজা হ'বে।

অন। কার?

সহ। মেয়ে মানুষ আর কার পূজা ক'রেথাকে?

অন। যার'করে, সে কোথায়?

সহ। হৃদয়ে।

অন। মালা পরা'বে কেমন ক'রে?

সহ। আমি পরব—

অন। তা হলেই তাঁর পরা হবে?

সহ। কেন সই! আমি কি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ নই!

অন। অবশ্য।

সহ। তবে সই! মালা গাঁথি?

অন। না গাঁথ্‌বে কেন? তোমার পোয়া বার।

সহচরী মালা গাঁথিতে লাগিলেন। মালা গাঁথা সমাপ্ত হইলে,সহচরী অনঙ্গ-মোহিনীকে বলিলেন, "সই! আমার ত মালা গাঁথা হ'ল, ফুল অনেক বেঁচেছে, তুমিও একটি ছড়া গাঁথ—কেমন সই গাঁথ্‌বে কি? চুপ করে রইলে যে?—"

অনঙ্গ-মোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তোমার ত সই ফুল বেঁচেছে, আমি যার তরে গাঁথ্‌ব সে বেঁচে কৈ?"

সহ। যাক্ সই! ও কথায় আর কায নাই।

অন। তুমি মালা পর, আমি দেখে নয়ন সার্থক করি।

সই। এই পর্‌লেম—কেমন দেখাচ্ছে সই?

অন। ঠিক যেন—সরস্বতীর গলায় গজ-মতী হার।

সহ। না সই! তুমি বলতে পার্‌লে না—ঠিক যেন শাঁখিনীর গলায় হাড়ের মালা?

অন। ছি সই! অমন কথা কি বল্‌তে আছে, এক মাণিকের আলোতে তোমার আলো।

সহ। সই! সে আশা আমার পক্ষে দুরাশামাত্র—এখন ত অন্ধকূপে পড়ে আছি।

অন। কেঁদোনা সই! আমি কালরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—তোমার সুখের দিন উপস্থিত।
সহ। সে ত আর এ কাটামোর্ম্ম নয়।
অন। আচ্ছা সই! বাজি রাখ—
সহ। বাজি আর কি রাখ্‌ব?—আমিই তোমার—
অন। তখন কি আর আমায় মনে থাক্‌বে? ভাল সই! আমায় তখন ছেড়ে দেবে?
সহ। ছেড়ে দিব!—

যদি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব,
চরণ-নূপুর হ'য়ে চরণে বাজিব।

অন। সই অমন কথা বলো না—তুমি আমার গলার হার।
সহ। যোগ্য লোকই বটে।
অন। সই! তোমায় মালা প'রে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—
সহ। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে—
অন। অপরাধ?
সহ। আমি যদি পর্‌তেম তা হলে কি আর ভাল দেখা'ত? প'রেছে আর একজন—বুঝ্‌তে পারলে?

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় অনতিদূরে আর এক মূর্ত্তি দেখা দিল। সহচরী নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিলেন, প্রতাপচন্দ্রের দ্বারবান—দ্রুপদসিং। সহচরী প্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া, সত্বরে অঞ্চল দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিলেন। চতুর দ্রুপদসিং চিনিতে পারিয়া তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সফল প্রযত্ন হইয়াছি, ভাবিয়া দ্রুতপদে প্রভু-সন্নিধানে সংবাদ দিতে গমন করিল। অনঙ্গ-মোহিনী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তথাপি, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ! এখানেও অশান্তি!—মায়াবিনী আশার মোহিনী শক্তির ইয়ত্তা নাই!" সহচরীর অন্তঃকরণ নাচিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন।—একবার ভাবিলেন—জমীদার বাবু লোক পাঠাইয়া আমার অন্বেষণ করিতেছেন, আবার ভাবিলেন—যাহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃতা করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে আবার অন্বেষণ করিবেন কেন? যাহা হউক, তিনি অনঙ্গমোহিনীকে এবিষয়ের কিছুই জানিতে দিলেন না। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া অনঙ্গ-মোহিনী সহচরীকে বলিলেন,—"এস, আমরা স্নানে যাই।" কুটীর-দ্বার বন্ধ করিয়া উভয়েই গঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে, দ্রুপদ সিং দ্রুতপদ-সঞ্চারে গমন করিয়া প্রভু-সন্নিধানে সর্ব্বাগ্রে সহচরীর সংবাদ প্রদান করিল। দ্রুপদসিং যথাযথ বর্ণনা করিলে, প্রতাপচন্দ্র পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুরস্কার দিয়া দ্বারবানকে বিদায় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সত্বরে দুই খানি শিবিকা লইয়া আইস—আমি স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া আসিব, তুমি কেবল দূর হইতে আমাকে স্থানটি দেখাইয়া দিবে।" দ্রুপদসিং "যো হুকুম" বলিয়া প্রস্থান করিল এবং সত্বরে দুই খানি শিবিকা লইয়া আসিল। এক খানিতে প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং আরোহণ করিলেন এবং অপর খানি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দ্রুপদ সিংও শিবিকা-সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। ভারতে সতীর মান্য সর্ব্বত্র। সতীর চরণে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইলে,

সহৃদয় ব্যক্তির বক্ষঃস্থলে শেল বিদ্ধ হইয়া থাকে।

এদিকে, সহচরী ও অনঙ্গ-মোহিনী গঙ্গাস্নান করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিকরিলেন এবং বৃক্ষ-শাখায় আর্দ্রবসন মেলিয়া দিয়া, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক ভিক্ষায় গমন করিবার নিমিত্ত বেশ ভুষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুষ্ক বৃক্ষ-পত্রের মর মর শব্দে চমকিত হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পরিশেষে দেখিতে পাইলেন যে, দুই খানি পাল্‌কি আসিতেছে, সঙ্গে এক জন দ্বারবান ও আছে। অনতিবিলম্বে সহচরী সেই দ্বারবানকে চিনিতে পারিলেন এবং শিবিকা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শারদা-সুন্দরী ও অন্যান্য পুরনারীগণ কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন, পাছে কেহ দেখিতে পান, এই ভয়ে ভীত হইয়া সহচরী একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত হইলেন।

সহচরি! আর লুকাইলে কি হইবে? একবার সম্মুখে আসিয়া দেখ কে আসিয়াছেন। ঘোষবংশাবতংস মতিমান প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। সহচরি! দেখ, দেখ সেই নিরভিমান প্রতাপ-চন্দ্রের বদন-মণ্ডলে কি অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও মহানুভবতার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে! কি অমানুষিক নম্রতাই উহাতে বিরাজমান রহিয়াছে। সহচরি! তুমি সাধ্বী! সহচরি! তুমি অমূল্যরত্ন!! সুনিপুণ রত্নব্যবসায়ীর নিকটেই তোমার আদর আছে। নরাধমে তোমার মূল্য কি বুঝিবে? একবার এদিকে আইস, সমস্ত অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ কর—প্রতাপচন্দ্র কি বলিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে শিবিকাদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইল। বাহকগণ দ্রুপদসিংহের নিদেশানুক্রমে কুটীরের অদূরে শিবিকা রক্ষা করিলে, প্রতাপচন্দ্র তন্মধ্য হইতে অবতরণপূর্ব্বক সাশঙ্ক-পদবিক্ষেপে কুটীরাভিমুখে গমন করিয়া,—"কৈ মা! কোথায় গেলে?" বলিয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তদ্দর্শনে সহচরী আর থাকিতে না পারিয়া, অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সম্মুখে আগমন-পূর্ব্বক প্রতাপ-চন্দ্রকে ভূমিষ্ঠা হইয়া নমস্কার করিলেন এবং তৎপরে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং "হায়! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!" বলিয়া আপনাকে শত শত বার ধিকার প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, সহচরীকে দেখিলে এক্ষণে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমা বলিয়া ভ্রম জন্মে। প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন তাঁহার সুচিক্কণ কেশজাল এক্ষণে জটাসম্বলিত হইয়াছে, বসন্ত-কালীন নব-কিশলয়-সন্নিভ স্নিগ্ধ-শ্যাম লাবণ্য-ছটা ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে, শরীর নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রতাপচন্দ্র তাঁহার সেই ভাব দর্শনে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরিশেষে গলদশ্রুলোচনে বিনীত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"চল মা! ঘরে চল, আমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমরা না জেনে তোমার নিকটে শত অপরাধে অপরাধী হয়েছি,

তুমি সতী লক্ষ্মী। তোমাকে মাথায় ক'রে না রেখে, তুচ্ছ তাচ্ছল্য ক'রে ফেলে দিয়েছি। দেখ দেখি মা! আমরা কতদূর নির্ব্বোধ! মা! অধিক কি বলিব, তুমি আমাদের পরিত্যাগ ক'রে অবধি সংসার আর এক দিনের নিমিত্ত ভাল যায় না। দশভুজা আমাদের পূজা লন না, আমরা যেন লক্ষ্মী-ছাড়া হয়ে র'য়েছি। চল মা! আর বিলম্বে কায নাই, তোমার জন্য আমি পাল্‌কি এনেছি। উঠ মা! পালকিতে উঠ—আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমার অনেক শাস্তি হ'য়েছে।"

সহচরী প্রতাপচন্দ্রের মুখে এই সকল অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা হইলেন এবং বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনি আমার পিতামাতা, আপনি আমাকে এত ক'রে বল্‌বেন না, আপনার মুখে এমন কথা শুনলে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। আমি হতভাগিনী, জন্মে অবধি কোন সুখই পাই নাই, বিধাতা আমার প্রতি নিতান্তই বাম; আমার কপালের দোষে আমি দুঃখ পাই, আপনার দোষ কি? আপনি যখন আজ্ঞা কর্‌ছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে; কিন্তু আমার এই সঙ্গিনীটিকে কোথায় রেখে যাই। বিপদ্‌কালে ইনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন, এঁকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌ব?

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"মা! আমি অগ্রেই সেটি বিবেচনা করেছি। উনি আমার নিতান্ত অপরিচিতা নন, লোক-পরম্পরায় ওঁঁর কথা আমার শুনা আছে, আর আমি অনেকবার ওঁঁাকে দেখেছি, উনি আমাকে না চিন্‌তে পারেন, কিন্তু আমি ওঁাকে চিনি, উনি মহারাজ সিতাবরায়ের কন্যা। দ্রুপদসিং যখন আমাকে সংবাদ দেয় তখনই আমি একবার বুঝতে পেরেছিলেম। তা ওঁাকেও আমি বাড়ী নিয়ে যাব, আমার দশভুজার মন্দিরে উনি থাক্‌বেন, তাতে আর দোষ কি? সেখানে ওঁার সেবার কোন ত্রুটি হবে না।

অনঙ্গ-মোহিনী এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া একপ্রকার বিস্মিতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রতাপচন্দ্রের মুখে আত্ম-বিবরণ শ্রবণ করিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে, যদি অধমের প্রতি অনুকম্পা হয়, তবে আর আমার প্রস্তাবে অমত করবেন না, আসুন আপনিও পাল্‌কিতে উঠুন। আজ আমার শুভ-দিন।"

অনঙ্গমোহিনী সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা সম্মতা হইলেন, প্রতাপচন্দ্রের সুমধুর বিনয়-বাক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল! তিনি বীণা, কমণ্ডলু ও পুস্তক সমূহ সঙ্গে লইয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। শূন্য কুটীর তাঁহাদিগের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তরুলতাগণ শোকার্ত্ত হইল এবং বিহঙ্গমগণ বিলাপ করিতে লাগিল! সতী-তেজে সমস্ত কানন আলোকিত ছিল, এক্ষণে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। প্রতাপ-চন্দ্র দ্রুপদসিংকে আজ্ঞা করিলেন। দ্রুপদসিং শিবিকা-সমভি-

ব্যাহারে বাটী-অভিমুখে গমন করিল। প্রতাপচন্দ্র মনে মনে তাঁহাদিগের সতীত্ব ও সদাচরণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কুটীর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তি-রসের আবির্ভাব হইল। তিনি স্বীয় ভোগ-সুখকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও দুঃখের আধার জ্ঞান করিয়া শিবিকারোহণ-পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সকলেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপচন্দ্রের অনুরোধে অনঙ্গ-মোহিনীও সহচরী-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শারদা-সুন্দরী সহচরীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ পানে চাহিয়া-ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জা আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিল। তিনি অনঙ্গ-মোহিনীকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন এবং সহচরীকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। সহচরী শারদাকে নমস্কার করিলেন; তৎপরে তিনি অনঙ্গ-মোহিনীর সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন,—"মা! আপনি আসাতে আমার বাড়ী পবিত্র হইল, আপনি দয়া ক'রে এই খানেই বাস করুন, এ দেশ, সে দেশ ক'রে ঘুরে বেড়া'লে আর কি হবে মা? যে ধন হারিয়েছেন, সে ধনের আশা করা বৃথা। ইচ্ছা করেন ত দশভুজার মহলেই আপনি বাস করুন।" অনঙ্গ-মোহিনী তাহাতেই স্বীকার পাইলেন। শারদা-সুন্দরী সহচরীকে নিতান্ত মলিনা ও ও কৃশা অবলোকন করিয়া অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! আমার অপরাধ নিও না, মনে কর যখন আমি তোমার প্রতি এমন আচরণ ক'রেছিলেম, তখন আমি আমাতে ছিলেম না। দুষ্টা সরস্বতী আমার স্কন্ধে চেপেছিল। তাই মা! আমা হ'তে এমন কায হ'য়েছে।" সহচরীও অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। শারদাসুন্দরী দেখিলেন—ক্রমে পূজার সময় সমুস্থিত। তিনি পরিচারিকাকে ডাকিয়া সহচরীর বেশবিন্যাস করিয়া দিতে বলিলেন। অনঙ্গ-মোহিনী আপনবেশেই রহিলেন এবং শারদা-সুন্দরীর সহিত শ্রীশ্রী৺ দশভুজার মন্দিরে গমন করিলেন। সহচরী পরিচারিকা-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই মন্দির মধ্যে গিয়া প্রণামাদি করিয়া শারদা-সুন্দরীর নিকটে উপবেশন করিলেন। শরদা-সুন্দরী বলিলেন,—"আজ তোমার সঙ্গে আমার এক পেট কথা আছে।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

যদুনাথের প্রত্যাগমন।

অনেক দিন হইল যদুনাথ ভৃত্য ও সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে গয়া হইতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া প্রতাপচন্দ্র নিতান্ত ভাবিত হইয়া পড়িলেন। লৌহবর্ত্ম বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি হয় নাই যে, চক্ষুর নিমেষে সংবাদ আসিবে। প্রতাপচন্দ্র

একদিন বা বিরক্ত হইয়া বলেন,—"কি আশ্চর্য্য! যদুনাথের মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধ কি এখনও শেষ হয় নাই?"—আবার একদিন বা বিমর্ষ হইয়া বলেন,—"যদুনাথকে নিশ্চয় ডাকাতে মারিয়াছে।" প্রতাপচন্দ্র যাহাই মনে করুন, এ দিকে কিন্তু সমূহ বিপদ্। অনবরত পথ পর্য্যটন করিয়া যদুনাথ দিন দিন নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন; তাহাতে আবার হৈমন্তিক হিমভোগ, অপরিসিদ্ধ অন্ন ভোজন ও যথেচ্ছ অপরিমিত জলপান করিয়া তিনি এককালে উৎকট জ্বর ও কাঁশ-রোগে আক্রান্ত হইলেন। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার চলৎ-শক্তি রহিত হইল। তখন তাঁহার সঙ্গিদ্বয় তাঁহাকে ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"মহাশয়! আমাদিগের বাটী বড় অধিক দূর নয়, এখান হইতে প্রায় তিন পোয়া পথ হইবে, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা দুই ভাই আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব,—সেখানে আপনার কোনও কষ্ট হইবে না।"

যদুনাথ অগত্যা সম্মত হইলেন। সঙ্গিদ্বয় একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে আপনাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। একজন বৈদ্য আনয়ন করিতে গেলেন এবং আর একজন তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলেন। বৈদ্য আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে, তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিয়াও পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না। যদুনাথ নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। একদা মধ্যাহ্ন-কালে তিনি বস্ত্রাবৃত হইয়া নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সঙ্গিদ্বয় নিকটে উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পীড়াবশতঃ যদুনাথের সুনিদ্রা হয় নাই, অতএব তাঁহাদের সকল কথাই তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিলেন—এক ভাই বলিতেছেন, "গতিক বড় ভাল বুঝ্ছি না।"—আর একজন বলিতেছেন,—"কালে খেয়েছে, রক্ষা পাওয়া ভার, মাথায় সর্পাঘাত হ'য়েছে, কোথায় তাগা বাঁধ্‌বে? অন্য কারো সঙ্গে নয়, মহাপুরুষের সঙ্গে বাদ, তিনি ত প্রথম অনেক মাপ করিয়া ছিলেন, কেমন দুষ্ট সরস্বতী ওঁর কাঁধে চাপ্‌ল যে, উনি যা নয় তাই তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। যাই হোক্, রক্ষা পাওয়া বড়ই সুকঠিন। লোকে জেনেই আগুনে হাত দিগ্, আর না জেনেই দিগ্, হাত ত পুড়্‌বেই।"

কিয়ৎক্ষণ পরে যদুনাথ মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন উপায় কি? এখানে এমন ক'রে কতদিন চল্‌বে?" তাঁহারা বলিলেন,—"মহাশয়! ব্যস্ত হ'বেন না, কিছু চিন্তা নাই, এ ঔষধে ভাল না হয়, এখানে একজন গৃহস্থ 'মাদুলী' দেন, তাতে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুনাথ তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিলেন, অতএব শিশির-পরিষেবিত অঙ্গপুষ্টের কুহুরব যেমন শ্রুতিসুখকর হয় না, সেইরূপ তাঁহাদের নিরুৎসাহপূর্ণ প্রবোধ-বাক্য তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে

পারিল না। তিনি তাঁহাদের প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—"মহাশয়! যাহাতে আমি ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তাহাই করুন।"

পরদিবস অতি প্রত্যূষে কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত গৃহস্থের বাটী গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাদুলি আনয়ন-পূর্ব্বক যদুনাথকে পরাইয়া দিলেন। মাদুলি ধারণ হইল বটে, কিন্তু যদুনাথের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। বিশেষতঃ, এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস অতি অল্প। সম্পূর্ণ সন্দেহসত্ত্বেও, যদুনাথ সেই গৃহস্থের নিদেশানুক্রমে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মাদুলি ধারণ করিয়াই হউক আর ঔষধের বলেই হউক, কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহার পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল। মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যদুনাথ সেই গৃহস্থের সম্মান রক্ষা করিলেন এবং তিনি মূল্য লইতে অস্বীকার করিলে, যদুনাথ তাঁহার শিশু-সন্তানগণের হস্তে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। গৃহস্থ যদুনাথকে বলিয়া দিলেন,—"দেখুন মহাশয়! অন্য কোন নিয়ম পালন করুন আর নাই করুন, এক মাস কাল স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; আপনি সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।" যদুনাথ সম্মত হইলেন। গৃহস্থ আপন আবাসে চলিয়া গেল।

এইরূপে দুই চারি দিবস অতীত হইলে, যদুনাথ উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এরূপ রুগ্নাবস্থায় বিদায় দিতে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলেন। কিন্তু কি করেন, অগত্যা সম্মত হইতে হইল এবং একখানি ডুলি আনাইয়া যদুনাথকে তদুপরি আরোহণ করাইলেন। যদুনাথের ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল বটে, কিন্তু তাঁহারা আবশ্যক-বিবেচনায় আর একটি লোককে তৎসঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুগলীতে আসিয়া যদুনাথের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। এতদ্ব্যতীত বিবাহ-কাল অবধি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাবলী তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এখানে অবস্থান করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তিনি ডুলি-বাহকদিগকে সত্বরে ঘোলঘাটে ডুলি লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিলে, একজন মাঝি দৌড়িয়া আসিল এবং যদুনাথের ইঙ্গিতক্রমে সে তাঁহাকে নৌকায় আরোহণ করাইল। ডুলিবাহকগণ ও বর্দ্ধমানবাসীর ভৃত্য পুরস্কার লইয়া বিদায় হইল।

নৌকা সত্বরেই পর পারে জমীদার বাবুর বাঁধা ঘাটে গিয়া লাগিল। যদুনাথ নৌকা হইতে নামিলেন এবং সমস্ত দ্রব্যাদি একজন ভারবাহকের মস্তকে প্রদান-পূর্ব্বক ভৃত্যস্কন্ধে ভর দিয়া মন্থরগমনে জমীদার বাবুর বাটী-অভিমুখে গমন করিলেন।

যদুনাথ যখন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন প্রতাপচন্দ্র অঙ্গনস্থ গোলাপ-কুঞ্জের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। গোধূলি-প্রভাবে বা শারীরিক শীর্ণতা প্রযুক্তই হউক,

প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে গা?"

যদুনাথ কথঞ্চিৎ নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"ভৃত্য"।

প্রতা। ভৃত্য কে? যদুনাথ না কি?

যদু। আজ্ঞে—

প্রতা। একি! তোমায় এমন ধারা দেখ্ছি কেন?

যদু। পীড়া—

প্রতা। ইস্ তাই ত! একেবারে তোমায় সেরে দিয়েছে দেখ্ছি যে?

যদু। এখনও কিছু বুঝ্তে পাচ্চি না।

প্রতা। যদুনাথ! তুমি বড় দুর্ব্বল—ব'স ব'স—

প্রতাপচন্দ্রের আদেশক্রমে যদুনাথ উপবেশন করিলেন এবং যাহা না কহিলে নয়, এরূপ দুই চারিটি কথা কহিয়া তিনি ভৃত্যহস্ত অবলম্বন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সকলেই দেখিতে আসিলেন। যদুনাথ তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য নমস্কারাদি করিয়া স্বীয় কক্ষদ্বারে সমাগত হইলেন। সকলে তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যদুনাথ আপন কক্ষদ্বারে সমুপস্থিত হইলে, সহচরী আর্য্যাগণের আদেশানুক্রমে স্বামীর পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে শয্যা প্রস্তুত ছিল, যদুনাথ তদুপরি শয়ন করিলে, অর্দ্ধগুণ্ঠনবতী সহচরী তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, যেমন তাঁহার গাত্রে করামর্ষণ করিবার উদ্যোগ করিলেন, যদুনাথ অমনি তাঁহাকে শয্যা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। পতিব্রতা, স্বামীর আদেশানুমতে তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বিমর্ষভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজলক্ষ্মী নিকটেই ছিলেন, তিনি, সহচরীর এই ভাব অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া যদুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যদুনাথ! তুমি পীড়িত, বউ কেন তোমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিগ্ না,—তাতে ক্ষতি কি?"

যদু। দিদি! সেটি এখন হ'তে পারে না।

রাজ। কেন?—কি হ'য়েছে?

যদু। একটু পরে বল্‌ব।

রাজ। কেন? তোমায় কেউ কিছু ব'লেছে নাকি?

যদু। কি বল্‌বে?

রাজ। না—কিছু নয়—

যদু। আমাকে কষ্ট দেবেন না—আমি বড় অসুস্থ।

রাজ। আমি বল্‌ছিলেম্—বউ তোমার সেবা করুগ্, এমন সতীলক্ষ্মী বউ, তুমি পেয়েছ, তোমার ভাবনা কি?

যদু। সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ নাই।

রাজ। তবে কি?

যদু। এই দেখুন গলায় কি প'রেছি—

রাজ। মাদুলি দেখ্ছি যে—

যদু। এই জন্যই নিষেধ আছে; স্ত্রীলোক স্পর্শ করতে বারণ।

রাজ। এই যে পা ধুইয়ে দিলে?

যদু। সে ভুলক্রমে হ'য়েছে।

যদুনাথের ইহা মনে ছিল না। অন্যমনস্ক হইয়া সহচরীর সেবা লইয়াছেন। রাজলক্ষ্মী ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য সমুপস্থিত করিয়া দিলেন।

যদুনাথ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন—উহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে, উহাতে দোষ নাই। রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—"ভাই! তুমি অনেক দিনের পর বাড়ী এলে, দু'জনে এখন কথা বার্ত্তা কও, তাতে ত আর দোষ নাই, আমি চললেম্।" এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। ক্রমে—রজনী সমাগত হইল। সহচরী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সহচরি! তুমি এদিকে এত চতুরা, স্বামীর সহিত কেমন করিয়া কথা কহিতে হয় জান না? স্বামী তোমার পীড়িত,—না হয় সেই পীড়া-সংক্রান্তই দু'টা কথা কও, তুমি ত নিতান্ত বালিকা নও। বল, বল সহচরি! বল, আমি শিখাইয়া দিতেছি—বল,—"নাথ! তুমি কতদিন পীড়িত হইয়াছ? তোমার কি পীড়া হইয়াছে? প্রাণেশ্বর! এতদিন তোমার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ না করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! নাথ! তোমার বিরহে আমি চন্দ্রের অদর্শনে কুমুদিনীর ন্যায় মলিনা হইয়া আছি। নাথ! তুমি প্রেম-সুধা বর্ষণ করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল কর।" না—সহচরি! তুমি এসব কথা বলিতে পারিবে না। তুমি সে বিদ্যালয়ে পাঠ কর নাই। আমি শিখাইয়া দিলে কি হইবে? তুমি ত জান—ওসকল সাজান কথার কোন প্রয়োজন নাই। যদুনাথ তোমার হৃদয় জানেন, তুমিও যদুনাথের হৃদয় জান। তবে আর সাজান কথায় কায কি? বরং কাযের কথা কও এবং তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তুমিও সুস্থ থাকিতে পারিবে। সহচরি! তুমি বরং জিজ্ঞাসা কর,—"ওগো তুমি এখন কি খাবে? খই খাবে কি বাতাসা খাবে? গরম জল খাবে, কি ঠাণ্ডা জল খাবে? লেপ গায়ে দেবে, কি চাদর গায়ে দেবে?" এই সব কথা এখন জিজ্ঞাসা কর, স্বামী যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এখন প্রাণেশ্বর বা "প্রাণতম" বলিয়া ডাকিলে, মিষ্ট কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। সহচরি! তোমার সাজান কথা শিখিতে হইবে না; গুরু-স্থানে চাপল্য নিতান্ত দূষণীয়। তুমি ত আর সম্বৎ বিংশ শতাব্দীর ভোগ-বিলাসিনী রমণী নহ। ও কি সহচরি! তোমার নয়ন দেখিয়া বোধ হইতেছে—তুমি এখনই কাঁদিবে। কেন সহচরি! তুমি কাঁদিবে কেন? স্বামী ত আর তোমার মূল্যের হ্রাস করেন নাই। তুমি যে রত্ন, সেই রত্নই আছ। তবে তুমি কাঁদিবে কেন? তোমার বদন-মণ্ডল ক্রমে স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিতেছে কেন? এতদিন যে স্রোত তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইতেছিল, কোন্ পাষাণে প্রতিহত হইয়া এক্ষণে সেই প্রবাহের আকুলতা সম্পাদিত হইল? হায়! যদুনাথ! তোমায় আর কি বলিব? তুমি পীড়িত, তোমার হৃদয় গুরুভারে আঘাত। নতুবা, তোমায় দুই একটি কথা বলিতাম। বলিতাম—তুমি ঐ ঝটিকাহত শীর্ণ গণ্ডে অধিক নহে—একটি মাত্র চুম্বন প্রদান কর, একবার কেবল একবার মাত্র ঐ তরঙ্গ-বিক্ষোভিত কোমল কর-পল্লব তোমার বক্ষঃস্থলে ধারণ কর। অবলা-হৃদয় শান্ত হউক; অবলার পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু মুছিয়া

যাউক। না যদুনাথ! তুমি তাহা পারিবে না! পীড়ায় তোমার শরীর অবসন্ন—তুমি পথ-শ্রান্ত, একটু নিদ্রা যাও! সহচরী এতাবৎকাল যাহা করিয়াছেন, তাহাই করিবেন। এতদিন ত আর তুমি তাঁহার মুখ পানে চাহ নাই। সহচরীকে এতদিন যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন। যদুনাথ! তুমি মনুষ্য—ভাল, মনুষ্যই হইলে, কিন্তু সহচরী তোমায় তদপেক্ষা অধিক দেখেন। যাঁহার অনন্ত-লীলা এই দ্বাদশ বৎসর কাল তোমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই জানেন সহচরী তোমাকে স্বীয় হৃদয়-মন্দিরে কত যত্নে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সহচরীর হৃদয়—প্রয়াগ-তীর্থ, তথায় সতীত্ব ও ভক্তি,—এই উভয় স্রোত একত্র মিলিত হইয়াছে, আর তুমি যদুনাথ! তথায় অক্ষয়বটরূপে অবস্থিতি করিতেছ। সেই প্রয়াগ-তীর্থ হইতে তোমায় সমূলোৎপাটিত করা অল্প আয়াসের সাধ্য নহে।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইয়া আসিল, যদুনাথের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। দ্বাদশ-বৎসর পরস্পর কথা নাই, সহচরীও এক্ষণে প্রগল্‌ভ-বয়স্কা, লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিতেছে, কেমন করিয়া কথা কহিবেন? সহচরী দেখিলেন, এখন লজ্জা প্রকাশ করিবার সময় নহে। সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু খাবেন?" যদুনাথ বলিলেন,—"একটু জল।"—সহচরী সত্বর গমনে গঙ্গাজল আনিয়া সম্মুখে রক্ষা করিলে, যদুনাথ উহা পান করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। সহচরী নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে, যদুনাথের নিদ্রাকর্ষণ হইল। সহচরীও ভূমি-তলে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সতীত্ব একটি স্বতন্ত্র বস্তু—অমূল্য রত্ন—লক্ষ মুদ্রা তাহার কাছে কোন্ ছার!

ক্রমশঃ

বানর-বিহঙ্গম-বিবাদ।

ভাগীরথী-তীরে, এক বটবৃক্ষ'পরে
বাসা বাঁধি, নানা জাতি পাখী বাস করে।
একদিন, বর্ষাকালে শুনহ ঘটন—
ধূমল পয়োদ-মালে ছাইল গগন।
থেকে থেকে অশনির ভীষণ নির্ঘোষ,
জগ'জনে রুষি' যেন করিছে আক্রোশ!
আকাশের ভীমনাদে সবে সশঙ্কিত,
যে যার আবাস-পানে ধাইল ত্বরিত।
পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়েতে ঢুকিল,
মুষলের ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।
হেনকালে, বন হ'তে ছুটে, কপিকুলে
আশ্রয় লইল সেই বট-বৃক্ষ-মূলে।
শাখীর উপরে বসি যত পাখিগণ,
কপিগণে সম্ভাষিয়া কহিছে তখন;—
"তোমাদের কষ্ট দেখে কাঁদিতেছে হিয়া,
আহা! সবে সারা হ'লে, জলেতে ভিজিয়া।
এ জগতে হস্ত পদ আছে যাহাদের,
এত কষ্ট সহিবারে হয় কি তাদের?
তোমাদের মত হস্ত আমাদের নাই,
তবু 'বাসা' ক'রে থাকি জীবন বাঁচাই।

আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কিবা আছে ?
যত কিছু—তুলনায় ছোট তার কাছে।
পিতা, মাতা, দারা, সুত,—যাহাই বল না,
আপনার সহ কারো হয় কি তুলনা ?
রবিতাপ, বৃষ্টি—হিম পাছে গায়ে লাগে,
বাঁচিতে এ সব হ'তে বাসা চাই আগে।
এ সব করহ সহ্য গায়ের উপরে—
বাসা করিবারে তবু মন নাহি সরে।
সংসারে থাকিতে গেলে বাসস্থান চাই,—
এ কথা কি কাণে কেহ কভু শুন নাই ?
পাখী মোরা, কিন্তু, মরি 'বাসা বাসা' ক'রে,
খাই বা না খাই, থাকি বাসার ভিতরে।
কেবল, সন্ন্যাসী-জন গৃহবাসী নয়,
তবু সে, যেখানে থাকে কুঁড়ে বেঁধে রয়।
এ জগতে, গৃহ-শূন্য হ'য়ে যেই থাকে,
বিশ্বাস কাহারো কভু নাহি হয় তাকে।
দেখ দেখি, পিতা, কন্যা-সম্বন্ধ-সময়ে,
"জামাতার ঘর বাড়ী আছে কি ?" সুধয়ে।
খড়্ কুটা যেখানে যা' করি দরশন,
সকলি সঞ্চয় করি বাসার কারণ।
এ জগতে নাহি যার আপন আবাস,
সে জন মনেতে গণে সদাই হুতাশ।
নানাস্থানী হ'য়ে থাকা,—সে কি কভু ভালো ?
বুঝে দেখ, ভাই ! সবে দিয়া জ্ঞান-আলো।
সকলি ত দেখিতেছি মানুষের মত,
এই বড় খেদ হে, কেবল বুদ্ধিহত !
এরূপে ভিজিয়া জলে কেন নাশ প্রাণ ?
নিজ নিজ বাসস্থান করহ নির্ম্মাণ।"
পাখীদের উপদেশে রুষ্ট কপিকুল;
বলে,—"মোরা পক্ষিগণে করিব নির্ম্মূল।
বেড়েগেছে বেটাদের বড় অহঙ্কার,
বাসা ভেঙ্গে, এখনি, করিব চুরমার।
আমাদের ভয় ক'রে চলে সকলেই,
সে জন মরিবে, সঙ্গে লাগিবেক যেই।
বৃষ্টি পড়িতেছে এবে, থাকো চুপ্ চাপ্,
ধ'রে গেলে জল, আজি রাখে কার বাপ্।
মাথার উপরে আছে দু'টা মাথা কার ?
আমাদের সঙ্গে লেগে পেয়ে যাবে পার।
নিন্দা ক'রে বলে মোরা 'ভিজে হ'নু সারা !'
মর্ মর্, এ জলেতে যাব না'ক মারা।
মরি যদি মরিব ;—তোদের কিবা তাতে ?
যেমন ব'লেছ ফল পাবে হাতে হাতে।
একে একে, ধ'রে ধ'রে, মট্‌কিয়া ঘাড়,
ফেলে দিব ভুঁয়ে সব মারিয়া আছাড়।
বানরেরা 'বুদ্ধিহত' বুঝিবি কেমন !"
কোপে, হেন কত কথা কহে কপিগণ।
কিছুক্ষণ পরে, তবে, ধ'রে গেল জল,
মহাকোপে গাছে উঠে বলিমুখ দল।
পাখীদের যত নীড় সেই বৃক্ষে ছিল,
ভিড় করি, কপিগণ সকলি ভাঙ্গিল।
যাহাদের ধরিবারে হইল সক্ষম,
প্রাণ নষ্ট করিলেক, করিয়া বিক্রম।
মূঢ়জনে উপদেশ না হয় বিহিত,
তাহাতে অনিষ্ট বই নাহি ঘটে হিত।
বেণা-বনে মুক্তা ফেলি কিবা ফল হয় ?
মরুভূমে চাষ দিলে নাহি ফলোদয়।
জ্ঞানীজনে-উপদেশে সুনাম কিনিবে,
উপদেশ দিতে হয়, তাহাদের দিবে।
স্থূল কথা,—মূঢ়জনে বুদ্ধি দিবে যেই,
আপনার কাল ডাকি আনিবেক সেই।

রা, জী, রা।

সময়-স্রোত।

Catch then, O catch the transient hour,
Improve each moment as it flies;
Life's a short summer—man a flower—
He dies—alas! how soon he dies.

Johnson.

পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ—এইরূপে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত সময়-স্রোত চলিয়া যাইতেছে। একটানা স্রোত—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরাম চলিতেছে। আবার সংসার-তরঙ্গের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে এ স্রোতে কেহ ভাসিতেছে, কেহ ডুবিতেছে। সময়-সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া আছি, জানি না কখন স্রোতের অলক্ষিত প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইব! জানি না, কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আবার কোথায় ভাসিয়া গিয়া দাড়াইব? অনন্তময়ের এ অনন্ত-রহস্য ভেদ করা তোমার আমার কার্য্য নহে। জানিতেছি তুমি আমি দু'দিনের,—জানিতেছি এ পরিদৃশ্যমান জগতে সকলই দু'দিনের, সকলই দু'দণ্ডের, সকলই ক্ষণিকের, কিন্তু, জানিয়াও জানিতেছি না, যেন কি মুগ্ধ-মন্ত্রে মোহিত হইয়া, 'আমার আমার' করিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সংসারের এত জ্বালা-যন্ত্রণা বুক পাতিয়া সহ্য করিতেছি। চক্ষের উপর দেখিতেছি, আজ অট্টালিকায়—কাল বৃক্ষতলায়! আজ রাজা, কাল প্রজা! আজ উদ্যান, কাল—শ্মশান! আজ সব, কাল শব! আজ পরিপূর্ণ, কাল গৃহ-শূন্য! আজ সমুদ্র,—কাল মরুময়!! কিন্তু, স্রষ্টার কি অপূর্ব্ব কৌশল—ভ্রান্ত মানব বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, দেখিয়াও দেখিতেছে না! এই সংসার! এই ত সব! এর জন্য আবার এত অহঙ্কার, এর জন্য আবার এত অভিমান! সদ্য পরিমলবাহী প্রস্ফুটিত কুসুম, আশামত্ত মানব-জীবন, গর্ব্বভরা নারীর যৌবন,—সকলই দু'দণ্ডের, সকলই ক্ষণিকের! যেই কুসুম ফুটিল, সুগন্ধ ছুটিল, ভ্রমর জুটিল, মধু ফুরাইল, দু'দিনে শুকাইল! যেই মানব অহঙ্কারে উন্মত্ত হইল, সমস্ত জগৎ তুচ্ছ বোধ করিল, বীরদাপে মেদিনী কাঁপিল, আবার লীলা খেলা ফুরাইল, সময়-স্রোতে ভাসিয়া গেল, ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল,—বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিল!

যেই নারী যৌবনে পদার্পণ করিল, ধরাকে সরা জ্ঞান করিল, রূপের আগুন জ্বলিল, কত পুরুষ-পতঙ্গ সে আগুনে পুড়িয়া মরিল! আবার যেই যৌবন ফুরাইল, ভ্রমর পলাইল, রূপ শুকাইল! দু'দিনে সব ভাসিয়া গেল!—তাই সমস্তই দু'দণ্ডের, সমস্তই ক্ষণিকের,সমস্তই সময়-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কোনও বাধা মানিতেছে না, কাহারও কথা শুনিতেছে না। আমি যার জন্য কাঁদিতেছি, সেও দু'দণ্ডের! তুমি যার জন্য হাসিতেছ, সেও দু'দণ্ডের! কেহই চিরস্থায়ী নহে,—সকলই সময়-স্রোতের অস্থায়ী তরঙ্গ, এই উঠিতেছে আবার এই মিলাইতেছে! তবে বৃথা আশার আশায় ঘুরিয়া কার অন্বেষণ করিতেছি? কার জন্য কাঁদিতেছি? কার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি? কার জন্য এ শোকতাপ-পূর্ণ সংসার-সাগরে দিশেহারা হইয়া ভাসিয়াবেড়াইতেছি? কিন্তু মায়ার কি মহীয়সী-প্রভাব! আশার কি কুহকিনী শক্তি! আশায় ঘুরিব, আশায় পুড়িব,—আশায় মরিব, তবুও আশা ছাড়িব না! জানি না, কত যুগ-যুগান্তরে, কত জন্ম-মৃত্যুতে, কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে, এ আশা নিরাশ হইবে! দয়াময়! ধন্য তোমার সৃষ্টি-কৌশল! ধন্য তোমার বিশ্ব-রহস্য!!

আত্মাভিমানী মানব! তুমি জানিতেছ না যে, তুমি কত ক্ষুদ্র, তুমি কত সামান্য, তুমি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ! তুমি ভাবিতেছ—এ সংসারে তুমি চিরকালের!—তোমার মৃত্যু নাই! কিন্তু, একবার মনে করিয়া দেখ কি, ঐ স্রোত আসিতেছে, তুমি কোথায় ভাসিয়া যাইবে, জানিতে পারিবে না।

যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা রমণি! তুমি জানিতেছ না যে, তোমার গর্ব্ব দু'দিনের! তোমার গর্ব্ব দু'দণ্ডের!—কিন্তু তুমি যৌবনমদে মত্ত হইয়া, কত হতভাগ্যকে কাঁদাইতেছ, কত সাধের জীবন বিষাদ-পূর্ণ করিতেছ! কিন্তু, আবার মনে করিয়া দেখ, কার জন্য যৌবনের এত অহঙ্কার? শুধু পুরুষকে ভুলাইবার জন্যই ত? শুধু পুরুষের মনস্তুষ্টি করিবার জন্যই ত? পুরুষ না থাকিলে, তোমাদের যৌবনের আদর কে করিত? ফুলের ঘ্রাণ কেহ না লইলে, ফুলের ফুটিয়া লাভ কি?

দেবতা-পদে অঞ্জলি না দিলে ফুলের শোভা কই? প্রাণ-প্রতিমা প্রিয়তমার কবরী-শোভিত না হইলে, ফুলের শোভা কই? ফুটিল আর শুকাইল! হে যৌবন-গর্ব্বিতা-নারি! তোমাদেরও পুরুষ-বিহনে তাই! কিন্তু, একবার ভ্রমক্রমেও কি মনে করিয়া দেখ যে, এ অহঙ্কার,—এ যৌবন,—এ জীবন, সময়-স্রোতের ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র?

মানব—ঈশ্বরের ক্রীড়া-পুত্তলি, যেমন করাইতেছেন, তেমনি করিতেছি—যেমন বলাইতেছেন, তেমনি বলিতেছি;—তিনি কর্ত্তা আমরা ক্রিয়া। এই ক্রীড়ার পুতুল মানব আবার 'আমিত্ব' 'তুমিত্ব'লইয়া ব্যস্ত! জানে না, আমিই বা কার জন্য? আর তুমিই বা কার জন্য? জগতে আমার তোমার কেহই নাই—আবার আমি তুমি কাহার

নহি। আজ যাহাকে 'আমার' বলিব, কাল দেখিব সে আর এক জনের! আজ যাহাকে হৃদয়-পিঞ্জরে অতি সাবধানে পুষিয়া রাখিয়াছি, কাল দেখিব সে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে, সময়-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে! যে দাম্পত্য-প্রেম দেখিলে মনে হয়—এ ভালবাসার শেষ নাই, এ ভালবাসা অনন্ত কালের জন্য, যেন জগদীশ্বর চিরকালের জন্য এক বৃন্তে দু'টি অপূর্ব্ব কুসুম সৃষ্টি করিয়াছেন, এর যেন লয় নাই। কিন্তু সেই এত ভালবাসা, এত প্রেম, আবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়। সেই এক বৃন্তের স্ত্রীকুসুম অগ্রে ঝরিয়া পড়িলে, সময়-স্রোতে স্বামীর অন্তঃকরণ হইতে সে স্মৃতি, সে কমনীয় কান্তি, সেই গাল ভরা হাসি, সেই মধুর মূরতি, সেই অতুলনীয়া মাধুরী, সেই হৃদয় ভরা প্রেম—সমস্তই বিদূরিত হইয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না।

আজ এক জাতির অভ্যুদয়, কাল আবার সে জাতির পতন,—এইরূপ উত্থান পতনে জগৎ চলিতেছে; আবার সময়-স্রোতের অপ্রতিহত বেগে সব ভাসিয়া যাইতেছে, জানি না, এত জানিয়াও, এত বুঝিয়াও, মানুষ কেন মানুষকে ঘৃণা করে? এক জন কেন আর এক জনকে পদ-দলিত করে? কেন জগৎ হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ? কেন জগৎ পাপের নিলয়? কেন জগতে এত অত্যাচার, এত অবিচার,—এত স্বার্থপরতা? যিনি এ সমুদয় যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, যিনি সংসার-সমুদ্রের প্রবল ঝঞ্চাবাতের মধ্যে পড়িয়াও, নিজে অটল অবস্থায় আছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই মহৎ, তিনিই প্রকৃত 'মনুষ্য' নামের বাচ্য।

ধনী ধন উপার্জ্জনে রত, তাহাদের আশার তৃপ্তি নাই, যতই ধন বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাহারা প্রবল আশার কুহকে মুগ্ধ হইতেছে, আবার ততই অত্যাচারী, ততই পাপী হইতেছে। ধন-তৃষ্ণা মিটাইতে কত কত দীন দুঃখীর সর্ব্বনাশ করিতেছে; বিলাসিতার চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য কত জীব জন্তুর অকাল মৃত্যু হইতেছে;—এই সামান্য পার্থিব সুখের অন্বেষণে তাহারা ঘুরিতেছে, কিন্তু এ সুখ, এ বিলাস কত ক্ষণের জন্য? আবার যে ধন সঞ্চয় করিতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইল, তাহা হয় ত কুপুত্রের হস্তে পড়িয়া দুই দিনে উড়িয়া গেল! জগতে এ দৃশ্য দুর্লভ নহে। তাই বলি, এ পরিদৃশ্যমান জগতে সকলই দু'দণ্ডের, সকলই ক্ষণিকের! সকলই সময়-স্রোতের ভাসিয়া যাইতেছে, কিছুরই চিহ্ন থাকিতেছে না। যেই উত্থান, সেই পতন; যেই জীবন, সেই মরণ; অতএব, বৃথা আশায় উন্মত্ত হইয়া, বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকিও না, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা কর। যে কতক্ষণের জন্য এ সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিতে আসিয়াছ, সে কতক্ষণ সৎকার্য্যে ব্যয় কর। জানিও, তুমি আমি কিছুই চিরদিনের নহে,—কেবল 'তিনিত্ব'ই চিরদিনের।

শ্রীদেবপ্রসন্ন ঘোষ।

দশহরা।

"বিষ্ণুপাদার্ঘ সংভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।
ধর্ম্মদ্রবীতিবিখ্যাতে পাপংমে হর জাহ্নবি ॥"

প্রভাত হইল শুক্লা-নবমী রজনী,
নবরাগে সমুদিত হ'ল দিনমণি।
সুখদা দশমী আজি পুণ্য দশহরা,
সরাগে পূজহ গঙ্গা—সর্ব্বপাপ হরা।
ত্রিগুণ-ধারিণী মাতা ত্রিপথ-বাহিনী,
ত্রিদিবে ধরিলা দেবী নাম 'মন্দাকিনী'।
জীবের তারণ হেতু মর্ত্ত্যে 'ভাগীরথী,'
পাতালে ধরিলা মাতা নাম 'ভোগবতী'।
শেষ কি করিবে শেষ অশেষ মহিমা,
পুরাণ-কীর্ত্তন-কুণ্ঠ অনন্ত গরিমা।

দেখহ বঙ্গের যত পুরনারীগণ,
এক মহোৎসবে আজি হ'য়েছে মগন।
কেহবা বাছিছে দুর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল,
পবিত্র পাত্রেতে কেহ সাজাইছে ফুল।
কেহ ঘসে সযতনে শীতল চন্দন,
কেহ করে সকৌতুকে হরিদ্রা পেষণ।
কেহবা তুলসী তুলে অতুল উল্লাস,
হৃদয়ে বহিছে প্রেম-পবিত্র-বাতাস।
ধূপ, দীপ, গন্ধ আদি করে আয়োজন,
নানাবিধ ফল মূল কে করে বর্ণন?

নিদাঘের প্রিয় ফল,—সুমিষ্ট রসাল,—
পনস সুবর্ণ বর্ণে আলো করে থাল।
তর্ম্মুঝ, খর্জ্জুর, ফুটী, রম্ভা, আনারস,
জাম, লীচু, জাম্রুল খাইতে সুরস।
দশ ফলে দশহরা-পূজার বিধান,
কতেক মিষ্টান্ন তায়, কে করে বাখান?
ছানা, চিনি, নবনীত, মিছিরি সন্দেশ,
বর্ণন করিব কত, বর্ণনা অশেষ।
এইরূপ নানা দ্রব্যে পূর্ণ করি থাল,
গঙ্গার কূলেতে যায়, সকাল সকাল।

কেহবা পরায় মায়ে কমলের মালা,
কেহবা চম্পক, কেহ যুঁই জাতি বেলা।
কেহ দেয় করবীর, শেফালী, টগর,
কেহ বা তুলসী, বিল্ব সবার উপর।
পেষিত হরিদ্রা কিবা মিশাইয়ে ক্ষীরে,
সযতনে ঢালে কেহ গাঙ্গিনীর নীরে।
নারিকেল জলে কেহ মিশায়ে শর্করা,
যথাশক্তি পূজে মায়ে যার যেই ধারা।
যাহা ইচ্ছা দাও ভাই! যেবা মনে লয়,
ভকতি সবার গোড়া আর কিছু নয়।

ধ্বনিল দুন্দভী কিবা, মধুর-নিস্বন,
বাজিল কাঁসর, ঘণ্টা মঙ্গল-বাদন।
দ্বিজ-মুখে সমীরিত প্রণব-সঙ্গীত,
শুনিয়ে অন্তরে মাতা হন হরষিত।
লইয়ে ভক্তের পূজা,—ভক্তের আরতি,
মকর-বাহনে দেবী যান দ্রুতগতি।
শ্বেতাঙ্গে সহস্র রাকা প্রকাশে প্রচুর,
তুলিল সলিল-বাস, তরঙ্গ-কর্ব্বুর।
মুকুট-মাণিক্য-মাঝে, ঝলসে ভাস্কর,
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মময়ী চলিলা সত্বর।

আজি দিবা স্নান, দানে অশেষ সুফল,
দশবিধ পাপক্ষয়,—এ কথা নিশ্চল।
গ্রহণ অদত্ত বস্তু, অবৈধ হিংসন,
পরদার, কর্কশতা, কৈতব-বচন,—
খলতা, প্রলাপ, চৌর্য্য, চিন্তা, পরদ্বেষ,
মিথ্যা বিষয়েতে সদা মনের নিবেশ।
এই সব পাপ হ'তে হইবে উদ্ধার,
স্নানেতে অশেষ ফল অদ্ভুত ব্যাপার।
ভক্তিভরে কর সবে গঙ্গার অর্চ্চনা,
ত্বরিতে ঘুচিয়ে যাবে ভবের যন্ত্রণা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাইবেল-সমালোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্দ্ধে আকাশ মণ্ডলের বিতানের দিকে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমি প্রভৃতি যে যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল আকীর্ণ আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষী সকলের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন। এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।"

[আদি পুস্তক ১;২০—২৩।]

মোশি, মৎস্য ও পক্ষিজাতীর মধ্যে কতকগুলি শরীরগত ও প্রকৃতিগত ঐক্য লক্ষ্য করিয়া মৎস্য ও পক্ষীকে এক শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করিয়া, একই দিবসেই উভয় জাতীয় জীবের সৃষ্টিকল্পনা করিয়াছিলেন। মোশি ভাবিয়াছিলেন,—মৎস্য যেমন অবলম্বন ব্যতিরেকে জলের মধ্যে সাঁতার দেয় পক্ষীও তদ্রূপ অবলম্বন ব্যতিরেকে বাতাসে সাঁতার দেয়, সুতরাং মৎস্য ও পক্ষী একজাতীয়—মৎস্য অণ্ডজ পক্ষীও অণ্ডজ, সুতরাং মৎস্য ও পক্ষী এক জাতীয়। মৎস্যের যেমন ডানা ও আঁইস আছে, পক্ষীরও তদ্রূপ পক্ষ ও পালক আছে, সুতরাং মৎস্য ও পক্ষী একজাতীয়—মৎস্য যেমন গিলিয়া খায়, পক্ষীও তেমনি গিলিয়া খায়, সুতরাং মৎস্য ও পক্ষী এক জাতীয়; অতএব মোশির বিবেচনা-অনুসারে পরমেশ্বরকে একই দিবসে মৎস্য ও পক্ষীর সৃষ্টি করিতে হইল। পৃথিবী মৎস্যজাতীয় জীবের বাসোপযোগী হইতে যে সময়, ও পৃথিবীর যে যে অবস্থা প্রয়োজনীয়, ইহা পক্ষিগণের বাসোপযোগী হইতে যে তদপেক্ষা আরও অধিক সময় ও পরিবর্ত্তিত অবস্থার প্রয়োজন, তাহা মোশির মনে আদৌ উদয় হয় নাই—কালে যে বিজ্ঞানের বলে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়ঃক্রম নির্ণয় করিবেন, মৎস্য ও পক্ষী যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন-জাতীয় জীব ইহা প্রমাণিত হইবে এবং ভূগর্ভের যে সকল স্তরে পক্ষীজাতীয় জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাহার অনেক নিম্নস্তর হইতে জলচর জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সকল বাহির হইয়া, খেচর প্রাণিবর্গের অস্তিত্বের অনেক সহস্রবৎসর পূর্ব্বে জলচর প্রাণিবর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ করিবে, মোশি বোধ হয় ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা এ সকল বিষয় জানিতে পারেন নাই, এই জন্যই তিনি ঈশ্বর-দত্ত ধর্ম্ম-পুস্তকের মধ্যে এ প্রকার

অসঙ্গত ও ভ্রমাত্মক কথা লিখিয়াছেন। মোশি সৃষ্টির বিবরণ লিখিতে গিয়া যখন সূর্য্যের অস্তিত্বের পূর্ব্বে পৃথিবীকে অস্তিত্ব দিয়া এবং চতুর্থ দিবসে সূর্য্যকে আকাশ-মণ্ডলের বিতানে টাঙ্গাইয়া দিয়া 'বিছ্‌মোল্লায় গলদ্‌' করিয়াছেন এবং নিজের পাগ্‌লামির পরিচয় দিয়াছেন, তখন মোশিকে যে প্রতিপদেই 'উছুট্‌' খাইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মোশির কল্পনা-অনুসারে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক্‌ করিয়া, সেই দিনেই সেই পঙ্কিল পৃথিবীকে উদ্ভিদ্‌ময় করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ দিবসে সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্য পঞ্চম দিবস। শিশু-সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী এক দিনে শুষ্ক ও কঠিন হওয়া কখনই সম্ভব নহে। পঙ্কিল পৃথিবী-পৃষ্ঠে তৃণ ও বৃক্ষ সকলের মূল এখনও নিতান্ত আল্‌গা রহিয়াছে; এত আল্‌গা যে,বাতাস লাগিলে সেই বৃক্ষ সকল উপাড়িয়া যাইতে পারে, সেই ভয়ে ঈশ্বর অদ্যাপি বায়ুর সৃষ্টি করেন নাই। এমন সময়ে ঈশ্বর যদি হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র ও ঘোটক প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ভূচর জীবদিগকে সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে, তাহারা নিশ্চয়ই পঙ্কমধ্যে একেবারে নিমগ্ন হইত অথবা তৃণ ও বৃক্ষের পত্র সকল ভক্ষণ করিতে গিয়া অদৃঢ়মূল বৃক্ষ ও তৃণ সকলকে সমূলোৎপাটিত করিয়া ফেলিত। মোশি এই আশঙ্কাতেই পঞ্চম দিবসে ভূচর প্রাণিবর্গের সৃষ্টির কল্পনা করিতে পারেন নাই, পৃথিবীকে শুষ্ক ও কঠিন করিবার জন্য আরও এক দিবস বিলম্ব করিলেন এবং অদ্য কেবল জলচর জঙ্গম অর্থাৎ চরিষ্ণু প্রাণিবর্গের সৃষ্টি করিয়া জল প্রাণিময় করিলেন (মোশি কখন অচরিষ্ণু প্রাণী অর্থাৎ পুরুভুজ দেখেন নাই) এবং আকাশের বিতানের দিকে পক্ষিগণকে উড্ডীয়মান্‌ করিলেন—রাজহংস, পাতিহংস, পেরু, কুক্কুট, গিনীফাউল্‌, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণও চাতকের ন্যায় আকাশে উড়িতে লাগিল! পরে ঈশ্বর ঐ সকল প্রাণীকে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন—পরমেশ্বর ঐ সকল প্রাণীকে যে একেবারে যুবক ও যুবতী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই, নচেৎ তাহারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হওয়া দূরে থাকুক, মাতার যত্ন ও সাবধানতা-অভাবে অনেক মৎস্য ও জলজন্তুর বংশ লোপ পাইত এবং পক্ষিগণ সৃষ্ট হইয়া পালকের অভাবে আকাশে উড্ডীয়মান্‌ থাকিতে না পারিয়া, ঢিব্‌ঢাব্‌ ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক, ঈশ্বর যে এ পর্য্যন্ত বায়ুর সৃষ্টি করিলেন না,পক্ষিগণ উড্ডীয়মান্‌ হইল কিসে! ঈশ্বর অদ্য এই পঞ্চম দিবস পর্য্যন্ত কেবল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব্যোম—এই চারিটি ভূত লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছেন, পঞ্চম ভূতের অর্থাৎ মরুতের সৃষ্টি অদ্যাপি করিলেন না—মোশির বিবেচনায় বোধ হয় বায়ুটা অসৃষ্ট বা অপদার্থ অথবা অনাদি !!

"অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমিতে নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি গ্রাম্য পশু ও সরীসৃপ জীব ও বনপশু উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। এই রূপে ঈশ্বর স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি বনপশু

ও স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ জীবগণকে নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি, তাহারা সমুদ্রের মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং পশুগণের এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ফলতঃ ঈশ্বর কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর এবং সমুদ্রের মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীব জন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।"

[আদিপুস্তক ১; ২৪—২৮।]

অদ্য চারি দিন হইল পৃথিবীর জল ও স্থল পৃথক করা হইয়াছে এবং তিন দিন হইল সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং পৃথিবী অনেকটা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং ঈশ্বর পৃথিবীকে অদ্য প্রাণিময় করিলেন। অদ্য পৃথিবী অনেকটা শুষ্ক হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ প্রাণি-দের দেহভার বহনোপযোগী এখনও হয় নাই; সেই জন্য হস্তী, জলহস্তী, গণ্ডার ও মহিষ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন্তু সকল পঙ্কমধ্যে মগ্ন হইতে লাগিল—ঈশ্বর দেখিলেন মহাবিপদ্, সুতরাং তিনি ঐ রূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবদিগকে মাথা ও নাসিকা ভাসা-ইয়া রাখিয়া সন্তরণ অভ্যাস করিতে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা ভারী হও-য়াতে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মাথা ও নাসিকা কোন মতে ভাসাইয়া রাখিতে পারিল না, তখন ঈশ্বর হস্তীর নাসিকা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাহাতেই হস্তির নাসিকা বৃদ্ধি হইয়া 'শুণ্ড' হইল। এইরূপে কতকগুলি স্থলচর প্রাণী কর্দ্দমে ও জলে চরিতে লাগিল এবং পৃথিবী আরও শুষ্ক ও কঠিন হইয়া তাহাদের ভার-বহনোপযোগী হইলে, তাহারা কখন বা জলে কখন বা স্থলে বাস করাতে 'উভচর' নাম প্রাপ্ত হইল। আর এই সমস্ত জীব জন্তু স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি হইল অর্থাৎ হস্তী, হস্তিজাতীয় ও বানর, বানরজাতীয়ই হইল—মোশির এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ লিখিয়া ধর্ম্ম-পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যায় না—মোশি, বোধ হয়, ঈশ্বরকে একজন সুনিপুণ কারিকর প্রমাণ করিবার জন্যই, পুনঃ পুনঃ ঐরূপ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর কখন হাতী গড়িতে মশা, বা ভেক গড়িতে মহিষ গড়েন নাই অথবা বোধ হয় যে, কলিযুগে ডারুইন্ নামে এক জন অবতার হইয়া ক্ষুদ্র গেঁড়ী হইতে শঙ্খের, ছুঁচা হইতে শূকরের, শূকর হইতে হস্তীর এবং বানর হইতে নরের ক্রমোন্নতিরূপ সৃষ্টি কল্পনা করিবে, মোশি তাহা ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা জ্ঞাত হইয়া লোকদিগকে সাবধান করিবার জন্য পুনঃপুনঃ লিখিয়াছেন "স্ব স্ব জাত্যনুযায়ি;" যাহা হউক

ঈশ্বর তাঁহার কৃত বস্তু ও প্রাণী সকলের প্রতি যখন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, উঃ আমি অদ্বিতীয় কারিকর! আমার শিল্প-চাতুর্য্যের ইয়ত্তা কে করিতে পারে?—আমার নিজের একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ইডেন গার্ডনে স্থাপন করিয়া দিলে, আমি চিরস্মরণীয় হইতে পারি—কিন্তু আমার একার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, আমার সঙ্গী আর দুইটি ঈশ্বর আমার প্রতি ঈর্ষা করিতে পারেন; সুতরাং, ঈশ্বর আর দুইজন ঈশ্বরকে একটি 'মিটিং'এ আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি।" পরে যখন ঈশ্বর-ত্রয়ের তাহাই মত হইল, তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকায় ধূলিতে আদমকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাশারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য জীবময় প্রাণী হইল। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্ব দিক্‌স্থ এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।" [আদি পুস্তক ২; ৭,৮।]

আমরা বাইবেল হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, ঈশ্বর নিরাকার নহেন—কারণ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের যদি এক খানি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে যে, প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্‌কে যে কখন দেখে নাই, সে যেমন সেই প্রতিমূর্ত্তি খানি দেখিয়া বলিতে পারে যে, প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সের আকার এই রূপ,—তেমনি আমরা ঈশ্বরকে কখন না দেখিলেও, যখন বাইবেলে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে যে, "ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন।" তখন, ঈশ্বর যে ঠিক্ মনুষ্যের আকার-অবয়ব বিশিষ্ট, তাহা আমরাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ঈশ্বর মনুষ্যকে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; নচেৎ মোশি কেবল মনুষ্য-সৃষ্টির বেলায় পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া সৃষ্টির কথা কেন লিখিলেন? আর বাইবেল হইতে আমরা আর একটি চমৎকার শিক্ষা এই পাই যে, মনুষ্য ঈশ্বর-জাতীয় প্রাণী—কারণ, ঈশ্বর মনুষ্যকে নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সকল প্রকার প্রাণী সৃষ্টি-কালে তিনি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জাতি-অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই কথা বাইবেলে লেখে; কিন্তু—মনুষ্যসৃষ্টির বেলায় মোশি সে কথার কোনই উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইতে আশীর্ব্বাদ করিলেন (কেবল যীশুখ্রীষ্ট, সাধু পৌল, রোমানকাথলিক, পুরোহিতগণ প্রভৃতি কতকগুলি লোকের ভাগ্যে এ আশীর্ব্বাদ ঘটে নাই।) এবং পৃথিবীর তাবৎ জীবজন্তুদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়া পৃথিবীর উপর ছাড়িয়া দিলেন; ঈশ্বর যে মনুষ্যকে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ, ঈশ্বরের সেই আশীর্ব্বাদ, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী সকলকেই সর্ব্বদা শশব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের মধ্যেও ইহার বিস্তর জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, যাহা যথাসময়ে যথা স্থানে

দেখাইব, এখানে কেবল পাঠকদিগের কৌতুহল নিবারণের জন্য দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—"অব্রামের ভার্য্যা সারী নিরপত্যা ছিল, এবং মিস্রীয়হাগার নামে তাহার এক দাসী ছিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিল, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি তুমি আমার এই দাসীর কাছে গমন কর; কি জানি, ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন অব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইল।" [আদি পুস্তক ১৬, ১,২।]

"অপর তাঁহার (লোটের) জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদেব পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই। আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাহার সহিত শয়ন করি, তাহাতে পিতার বংশ রক্ষা করিব। * * * *

[আদি পুস্তক ১৯; ৩১—৩৬।]

আর ঈশ্বর প্রাণী সকলকে বশীভূত করিতে এবং তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে মনুষ্যকে যে অধিকার দিয়াছিলেন, তাহারও শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—ঈশ্বর হবাকে (ইভকে) সে অধিকারে বঞ্চিত করিয়া জগৎসংসারকে পাপে ডুবাইলেন।

[আদিপুস্তক ৩; ১—১৩।]

"ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ আমি ভূতলে স্থিত যাবতীয় সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে এবং ভূচর যাবতীয় পশু ও খেচর যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ঔষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেই রূপ হইল। পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলই অতি উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"

[আদি পুস্তক ১; ২৯—৩১।]

আমরা এই কয়েকটি পদ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ পাই যে, ঈশ্বর কুম্ভীর, মকর, সিংহ, ব্যাঘ্র ও বাজ,—ঈগল প্রভৃতি জলচর, ভূচর ও খেচর হিংস্র প্রাণিদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা কখনই নহেন—তাহাদিগের অবশ্য স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন—ঈশ্বর যদি ঐ হিংস্র প্রাণিদিগকে সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে, মোশি যখন ঈশ্বরের আত্মার আবেশে যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টির বিবরণ লিখিলেন, তখন এই হিংস্রজীবদের নাম বা জাতি একবারও উল্লেখ করেন নাই কেন? এবং যখন মনুষ্য ও অন্যান্য সর্ব্বজাতীয় প্রাণীর খাদ্য নির্ণয় করিয়া দিলেন, তখন হিংস্রপ্রাণিদের আহারীয় সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া দিলেন না কেন?—মোশি সিংহ ব্যাঘ্রদিগেরও খাদ্যের জন্য হরিৎ ঔষধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন নাকি? ঈশ্বর মোশির দ্বারা হিংস্র প্রাণিদের সৃষ্টিবিবরণ বা তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে কিছুই লিখাইলেন না,—ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, ঈশ্বর তাহাদের স্রষ্টা নহেন—বোধ হয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার চিরশত্রু শয়তান ঐ সকল হিংস্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এইখানে সৃষ্টির বিবরণ শেষ করিলাম; ইচ্ছা আছে, আগামী মাসে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ হইতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব।

জনৈক খ্রীষ্টিয়ান তনয়।

প্রক্ষালন।

—০০০—

এই দারুণ নিদাঘ বড়ই প্রচণ্ড কাল। মহারুদ্ররূপে ভগবান্ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড নিরন্তর তির্য্যক্‌ভাবে প্রকৃতির উপর অজস্র তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতেছেন। প্রকৃতি অচল অসাড় নিস্তব্ধ ও স্পন্দনহীন। পবনদেব ভাস্করের ক্রোধানল দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া,কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন! স্থাবর তরুকুল বার্ত্তাবহের কি হইল, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া, নানাবিধ অশুভ-কল্পনা করিয়া, একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। কোমল স্বভাব, সঙ্গীতজ্ঞ বিহঙ্গমেরা জলাশয়ের অদূরস্থিত লতাগৃহে সুখোপবেশন করিয়া, গ্রীষ্মোষ্মাজনিত শ্রমাপনোদনের সঙ্গে সঙ্গে ললিতভাবে, চতুর্দ্দিকে মার্দব মাধুর্য্য ছড়াইয়া রহঃ সুখালাপ করিতেছে। বীরপ্রকৃতিক হস্তী গণ্ডার মহিষাদি পশু সকল হ্রদ-তটিনী-তড়াগাদি দুর্গাশ্রয়ে থাকিয়া, নিরাতঙ্কে ও নিরুদ্বিগ্নে সময়াতিবাহন করিতেছে।

পথ, ঘাট, মাঠ, সকল ধূধূ জ্বলিতেছে, মন হুহু করিতেছে,—প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে; তথাপি, মানবগণ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, পলায়ন-পর পবনের আহ্বানার্থে 'বীজন সঞ্চালন করিয়া সঙ্কেত করিতেছে।

ভীষণ তরঙ্গযুক্ত ও প্রবল বাত্যাবিক্ষোভিত বলিয়া যে জীবসমুদ্র কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অনুমিত হইতেছিল, সর্ব্বত্র প্রসারিত, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড প্রভাকর-রশ্মি-প্রভাবে এককালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! বলুন দেখি,পাঠক মহাশয়! এমন নিদারুণ নিদাঘের রমণীয় অপরাহ্ন-সময়ে সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া প্রক্ষালন করা, কিরূপ শান্তিপ্রদ ও মনোমুগ্ধকারী!

শরীরে সমস্ত দিন ঘর্ম্ম হইয়া, যে ক্লেদ উপচিত হয়, তাহা মনকে বড়ই খিন্ন ও উদ্বিগ্ন করে; এই কারণ যখন সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া আসিলে প্রকৃতি শান্তির সোপানে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন সেই সকল সঞ্চিত ক্লেদ ধৌত করিয়া দূর করিলে, মনে সারাদিনের পর একটু আরাম বোধ হইতে থাকে; সেই আরামবোধ অনির্ব্বচনীয় ও বড়ই প্রীতিকর।

বাহ্য বিষয়ের সহিত প্রতিনিয়ত সম্পর্ক হেতু পরিণামশীল শরীরের উপর নিরন্তরই ক্লেদ পড়ে, কখনই ক্লেদ পড়ার বিরাম নাই এই সকল ক্লেদ শরীরেরই পরিণতি; শরীরের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অনবরতই শারীরিক যন্ত্রাদি ও আহারীয় পদার্থাদির বিকৃতি জন্মে। ঐ সকল বিকৃতি বাহিরে আসিয়াই, ক্লেদ-রূপে পরিণত হইয়া শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া, উদ্বেগজনক হইয়া উঠে এবং শীঘ্র শীঘ্র ধৌত করিয়া না ফেলিলে, শরীরের উপর সঞ্চিত হইয়া, অতিশয় কষ্টদায়ক নানাবিধ পীড়ার কারণ হইয়া উঠে।

অপর পক্ষে ক্লেদ সকল দেহাভ্যন্তরে রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা জন্মিয়া থাকে বলিয়া এবং শরীর রক্ষার জন্য (শরীরের তাপ-শক্তি

রক্ষার জন্য) রাসায়নিক কার্য্য প্রয়োজনীয়। বলিয়া, ইহা বলা যাইতে পারে যে, শরীর রক্ষা করিতে গেলে, শরীরে ক্লেদ অবশ্যই জন্মিবে; কোন রূপেই তাহার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে,—ক্লেদ শরীরেরই পরিণতি। একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্য হেতু শরীরের ক্লেদও বর্জ্জনীয়; অতএব, ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শরীর থাকিতে গেলে ক্লেদ অনিবার্য্য ও স্বভাবতঃ জন্মিবে এবং শরীর রক্ষা করিতে গেলে, শরীরের ক্লেদ-রাশিও সযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আরও শারীরিক ক্লেদ শারীরিক ধর্ম্মবশতঃ জন্মে, কিন্তু তাহার দূরীকরণক্লেশও চেষ্টা সাধ্য—সহজে দূরীভূত হয় না।

পরিণামশীল পদার্থ মাত্রেরই ঐ দশা। 'পরিণামশীল' বলিলে, উহাই উপলব্ধি হয়। উত্তম হইতে অধম,—অধম হইতে উত্তম হওয়াই ত পরিণামশীলতার পরিচয়। আমরা যে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারাও সকলে পরিণামশীল। পূর্ব্বে শারীরিক ক্লেদের বিষয় কিছু বলা হইয়াছে, এক্ষণে মানসিক ক্লেদের বিষয় কিছু বলা যাউক।

শারীরিক, মানসিক বলিয়া, প্রভেদ থাকিলেও, উহাদের ক্লেদত্ব-বিষয়ে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ, বাহ্যজগতের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু যেমন শারীরিক ক্লেদের আবির্ভাব হয়, তেমনই বাহ্য জগতের সহিত মনেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হেতু মানসিক ক্লেদেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। মানসিক ক্লেদ, উদ্বোধিত মনের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সকলের ঘোর স্বার্থপরতা, কপটতা ও মিথ্যাচারিতা। সকল জীবই ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বার্থপরায়ণ এবং সকল জীবকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের স্বার্থ ন্যূনাধিক পরিমাণে নষ্ট করিতেও দেখা গিয়া থাকে।

জীবসকল এইরূপে শারীরিক ও মানসিক ক্লেদরাশি দ্বারা সর্ব্বদাই পরিলিপ্ত হইতেছে,—নিরন্তরই আধিদৈবিক আধি-ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপ দ্বারা দহ্যমান হইতেছে। যিনি জানেন তিনি নিরন্তরই দ্বিবিধ ক্লেদরাশি প্রক্ষালন করিয়া শরীর ও মনকে পরিষ্কার ও পবিত্র করিতেছেন, আর যে মূর্খ উপেক্ষা করিয়া অলসভাবে কালযাপন করিতেছে, সে হতভাগ্যের ক্লেদরাশি সঞ্চিত হইয়া, শরীর ও মনকে ক্রমে ক্রমে রাশীকৃতরূপে সজ্জিত ক্লেদরাশির মধ্যে প্রোথিত করিয়া, ক্ষণমাত্র সুখাশয়ের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছে; তাহার সকল সুখ, সকল শান্তি,—সকল আশা ভরসা, সকল বিশ্বাস, বিলোপ করিয়া দিতেছে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ও মানসিক ক্লেদরাশি নিরন্তর প্রক্ষালন করিয়া ফেলাই, জীবের অতি আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। শারীরিক ক্লেদরাশি কিরূপে ধৌত করিতে হয়, তাহা আপামর সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু মানসিক ক্লেদ, ধৌত-করণ বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু, মানসিক ক্লেদ শারীরিক ক্লেদ অপেক্ষা সহস্রগুণে আতঙ্কজনক; শারীরিক ক্লেদ জমিয়া গেলে, চেষ্টা করিয়া

তাহা প্রক্ষালন করা যাইতে পারে; কেন না, শারীরিক মলের দ্বারা মনের বড় একটা ক্ষমতার লোপ হয় না। কিন্তু, মানসিক মল জমিতে দিলে, মনের সকল শক্তিই লোপ পাইয়া থাকে; মন আর নড়িতে পারে না, সকল চেষ্টা-বিরহিত হইয়া নিজের উদ্ধার করিতে একান্তই পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু,মনী অতিশয় সুখাভিলাষী; সে কাযে কাযেই কোনরূপ চেষ্টা করিয়া আপনাকে ক্লেশদিতে চাহে না, প্রবল দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যায়, সে সেইদিকেই যায়,—প্রবল পরাক্রান্ত অসৎ প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করা ত দূরের কথা।

কেহ কেহ বলেন,—"কুভাব, কদভিপ্রায়ই যখন আভ্যন্তরিক মল, তখন, সুভাব সদভিপ্রায় দ্বারাই উহারা প্রক্ষালিত হইতে পারে; অর্থাৎ যে সময়ে, কুভাব, কদভিপ্রায় সকল অন্তকরণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন সেই স্থানে সুভাব, সদভিপ্রায় সকল উত্থাপন করিলেই, আভ্যন্তরিক কলুষ বিধৌত হইয়া যাইতে পারে।" কিন্তু ইহাঁদের বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, কুভাব কদভিপ্রায়-সমূহ আবির্ভাব হইলেই, সুভাব সদভিপ্রায় সকল, কিরূপে সঞ্জাত হইতে পারিবে? মনের ইচ্ছায় সুভাব সদভিপ্রায় জন্মিবে না, সুভাব সদভিপ্রায়ের বিকাশ জন্য, মনকে অনেক গুলি কার্য্য করিতে হইবে—নানা উপায় সন্ধান করিতে হইবে।

উক্ত মতাবলম্বীরা বলেন,—"পূর্ব্ব হইতেই মনকে রীতিমত শিক্ষিত করিতে হইবে; নচেৎ কার্য্যকালে মন কিছুই করিতে পারিবে না"—কিন্তু, কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এবং সে শিক্ষা কেমন করিয়াই বা দিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ না থাকা প্রযুক্ত, আমরা আপাততঃ উক্ত মত ত্যাগ করিয়া, মানসিক মল কিরূপে দূর করা যায়, তাহা অন্যত্র অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করি।

খ্রীষ্টিয়ান্‌শাস্ত্রে উপদেশ দেয় যে, "অনুতাপ দ্বারাই পাপের প্রক্ষালন হয়," অর্থাৎ অনুতাপ করিলে, ক্রমে পাপের প্রতি চিত্তের বিরাগ জন্মে, পাপ করিতে অনিচ্ছা হয় ও মনে অনুতাপ করিবার পর বিমল শান্তি উপস্থিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই,—জীবের পাপ যখন অনবরতই ঘটিতেছে,—যখন পাপের হাত হইতে কখন এড়ান নাই, তখন পাপ প্রক্ষালনার্থে অনুতাপও অবশ্যই অনবরত করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,—অনুতাপ বড়ই কষ্টকর বলিয়া,সর্ব্বদা সুখেপ্সু মনে তাহার আবির্ভাব বড় দুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্যই হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, পাপ করিয়া যাহাদের হৃদয় বড়ই কঠোর হইয়াছে, অনুতাপ যাহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, তাহারা কেমন করিয়া অনুতাপ করিবে? সুতরাং, অনুতাপ, সকলের পাপ প্রক্ষালন করিতে পারে না। এই হেতু বাইবেলের উক্তমত ভ্রমপরিপূর্ণ। অনুতাপের উপর যে প্রথম দোষ দেওয়া গিয়াছে, তাহার উত্তরে খ্রীষ্টানেরা বলিতে পারেন যে, "যেমন সকল সময় গাত্রে মল সঞ্চিত হইলেও, সকল সময়ে প্রক্ষালনের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ মনের মল, সকল সময়ে সঞ্চিত হইলেও, কয়েকবার মাত্র অনুতাপ করিলেই হইল।"

ইহার উপর বক্তব্য এই যে, আমরা যত পাপ করি, অনুতাপ করিবার সময় সে সকল স্মরণ রাখিতে হইবে; কেন না, অনুতাপ বলিতে এই বুঝায় যে, 'আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি, আমার কষ্টের অবসান করুন, আমি এমন দুষ্কর্ম্ম আর করিব না।' ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, দুষ্কর্ম্ম বা পাপ সংঘের স্মরণ রাখিতেই হইবে, আরও, পাপকর্ম্ম করার অব্যবহিত পরেই অনুতাপ, উৎপন্ন হইয়া থাকে—অতএব, যাহারা কম পাপ করে, অনুতাপের যদি মল ধৌত করিবার ক্ষমতা থাকে, অনুতাপ তাহাদের মল ধৌত করিতে পারে বটে, কিন্তু সকলের পারে না,—পরন্তু, বলিতে গেলে অনুতাপই আন্তরিক মলের বাহ্য পরিণাম; যেমন স্বেদ শারীরিক ক্লেদের বাহ্য পরিণাম। ইহাদের সৌসাদৃশ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাই এই:—

যেমন ঘর্ম্ম নির্গমনে, প্রবল গ্রীষ্মোষ্মাজনিত দারুণ ক্লেশের কথঞ্চিৎ উপশম উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ পাপাত্মা পাপদগ্ধ হৃদয়ের কথঞ্চিৎ শান্তি, অনুতাপ দ্বারা হইয়া থাকে; এবং ঘর্ম্ম যদি সঞ্চিত হইয়া প্রক্ষালিত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশরীর যেমন খেদযুক্ত অবসন্ন ও সর্ব্বদাই অসুখবোধ হয়, সেইরূপ অনুতাপকে প্রক্ষালন করিয়া দূর না করিলে, মন ও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং উহারা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া অশান্তির আলয় হইয়া থাকে। আরও অনুতাপ দ্বারা পাপ প্রভৃতি যে প্রথম প্রথম একটু একটু বিরাগ জন্মিয়া থাকে, অনুতাপে সন্দেহমান অন্তঃকরণেরও অনুতাপের উপর ক্রমশঃ গাঢ়রূপে বিরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ও মন অনুতাপশূন্য হইবার চেষ্টা পায় এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনুতাপ নষ্ট হইয়া যায়।

এক্ষণে দেখা গেল যে, অনুতাপের শক্তি বড়ই কম—তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অনুতাপ মানবকে 'চিয়াইয়া' দেয়, মানব তখন বুঝিতে পারে যে, সে পাপ করিয়াছে ও তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। কিন্তু, নিজে পাপ ধৌত করিতে পারে না, অনুতাপ মানবকে পাপ ধৌত করিবার জন্য উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায় মাত্র।

'আত্মনিবেদন' বলিয়া আর একটি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কাহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। খ্রীষ্টানেরা বলেন,—"ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে, যেহেতু তাঁহার বিরুদ্ধেই আমরা পাপ করিতেছি।" ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন কিরূপে সম্ভবে?—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিবেন—"ঈশ্বর পরম পুরুষ এবং সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।" কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইলেও, আত্মনিবেদনকারী, ঈশ্বর যে তাহার কাছেই আছেন, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবে; ও মনে দৃঢ়কল্পনা করিতে পারিবে যে, ঈশ্বর তাহার নিকটে থাকিয়া তাহার সমস্ত আবেদন শুনিতেছেন। কিন্তু এইরূপ উপলব্ধি কাল্পনিক, মনে করিয়া লওয়া মাত্র, প্রকৃত উপলব্ধি নহে। আরও সে কতদূর—পর্য্যন্ত আত্মনিবেদন করিবে,—আত্মনিবেদন কতদূরে শেষ হইবে, তাহার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হইল কি না, সে

কিরূপে বুঝিবে? আপনাকেই কল্পনা করিয়াই শেষ করিতে হইবে। আরও এইরূপ আত্মনিবেদন কেবল পাপের স্মরণ করিয়া অনুতাপ করা মাত্র এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করিতেছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। বাস্তবিকই খৃষ্টানেরা এইরূপই করিয়া থাকে, তাঁহারা দুই চারিটী পাপ স্মরণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বাক্যে মাত্র অনুতাপ করিয়া,—(বাক্যে মাত্র, কেন না, পাপ করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুতাপ যেরূপ তীক্ষ্ণ ও তীব্র থাকে, শেষে সেরূপ থাকে না এবং ক্রমে বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়—অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, কোন ব্যক্তির নিকট অনুতাপ করিলে, তিনি যদি অনুতাপের বিষয়ীভূত পাপের গুরুত্ব দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে, অনুতাপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে বটে এবং হৃদয়েও পাপের জন্য সন্তাপ হয়; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ করিবার কালে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?) অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ের সান্ত্বনার্থে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতা কল্পনা করিয়া, ঈশ্বর যেন সান্ত্বনা দিতেছেন এই ভাণ করিয়া (prayer) ভজনার অন্তে (Amen) অর্থাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া থাকে।

অহো! কি আশ্চর্য্য আত্মপ্রতারণা! কি বিড়ম্বনা!! ইহাতে কি কখনও আন্তরিক মল ধৌত হইতে পারে? ভণ্ড প্রতারক খৃষ্টান্! তুমি বলিতে পার ধৌত হইবে না কেন? কিন্তু আমরা আর তোমার ঐ অমূলক প্রশ্নের অপেক্ষা করিতেছি না, কেন না সহৃদয় মাত্রেই বুঝিবেন, ধৌত হইতে পারিবে না। বুঝিবেন,—চোর চুরি করিয়া ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করিয়া 'Amen' বলিয়া ঈশ্বরের প্রসাদলাভ হইয়াছে, মনে করিয়াও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, সে কি বিচারিত হইয়া কারাগারে কঠোর যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে? 'আত্মনিবেদন' একটি উপায় বটে; কিন্তু কাহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে—এমন কে আছেন যিনি আমার 'আত্মনিবেদন' গ্রহণ করিয়া আমার কলুষরাশি বিধৌত করিয়া আমাকে পরম আপ্যায়িত ও পবিত্র করিতে সমর্থ?

তিনি অবশ্যই নররূপী পরমেশ্বর—অশরণের শরণ, ভয়ত্রাতা,—বিপদহর্ত্তা শ্রীশ্রীগুরুদেব। তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন করিলে, অবশ্যই সকল স্মৃত পাপের শান্তি হইবে এবং তিনিই সান্ত্বনা দিয়া, প্রাণের আগুন নিবাইয়া প্রাণ শীতল করিবেন। ঈশ্বরের নিকট নিবেদনে যে সকল আপত্তি দেখান গিয়াছে, গুরুদেবের নিকট নিবেদনে তাহার কোনও আপত্তিই টিকিবে না।

কিন্তু কেহ কেহ বলিবে, "যে গুরু পরমেশ্বর-স্বরূপ কিসে?" আমরা তাহাদিগকে বলি যে, আপাততঃ তাহারা ততদূর বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, ইহাও তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, পরম সুহৃৎকে আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে, যথার্থই অনুপম শান্তি পাওয়া যায়—আর ইহাও কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই যে, গুরুদেবের তুল্য আত্মার হিতকারী পরম সুহৃৎ আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং, ইহাও স্বীকার্য্য যে, কাল্পনিক ঈশ্বরের নিকট 'আত্মনিবেদন' করিয়া মনে প্রবোধ দেওয়া গোছ কাল্পনিক শান্তিলাভ

করিয়াছি, বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট 'আত্মনিবেদন' শত সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ও শান্তিদায়ক।

উপসংহারে ব্যক্তব্য এই যে, আত্মনিবেদনে আমার চিত্তে জাগরূক কতিপয় মাত্র প্রধান প্রধান পাপের শান্তি হইয়া থাকে; কিন্তু আমি যে অহরহঃ অনবরতই পাপ করিতেছি, তাহার প্রক্ষালন কোথায় হয়? শাস্ত্রে সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, হোম, যাগ,—যজ্ঞ, তপ, দান, যোগ, সাধন ভজন প্রভৃতির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আভ্যন্তরিক মলের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে—কিন্তু, ঐ সকল বড় জটিল, দুর্ব্বোধ্য বলিয়া কেবল শাস্ত্র দর্শনে উহার বিধান হইতে কখনই পারে না, উহার বিধানও গুরুদেবের দ্বারা পাত্রাপাত্র ভেদে নিরূপিত হইয়া থাকে।

অতএব, দেখা গেল, যে মানসিক মল নাশের জন্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-শরণ নিতান্তই প্রয়োজনীয়। গুরুরূপ-কল্পবৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া তদুপদিষ্ট আদেশাবলী প্রতিপালন দ্বারা, প্রতিনিয়তই আভ্যন্তরিক মলধৌত করা জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয়। এই ঘোর সংসারে গুরুপাদপদ্ম-সহায়শূন্য হইয়া কোনমতেই অপবিত্রতা ও কলুষতাশূন্য হইয়া জীবিত থাকিতে পারা যায় না—যখন প্রতিনিয়তই পাপ করিতে হইতেছে, তখন প্রতিনিয়তই গুরুর চরণ-তরীর আবশ্যক।

মাসিক সংবাদ।



পার্ণেলের নাম জগদ্বিখ্যাত। ইনি "Uncrowned king of Ireland" অর্থাৎ আয়র্লণ্ডের অনভিষিক্ত নরপতি। আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র-করণ প্রস্তাবের ইনি প্রধান পরিপোষক। ইনি এক জন মহাসভার সভ্য। ইহাঁর জন্য প্রত্যেক আয়র্লণ্ডবাসী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত; বাস্তবিক ইনি রাজা না হইয়াও, রাজা; ইহাঁর বাগ্মীতা শক্তি অসাধারণ। ওসিয়া ইহাঁর পরম বন্ধু; সুতরাং বন্ধুত্বের বিমল সুধাপান করাইবার জন্য ও বন্ধুত্বের অকৃত্রিম নিদর্শন সন্দর্শন করাইবার জন্য ওসিয়া-পত্নীর সহিত মহাত্মা পার্ণেল গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হন ও বন্ধুর অনুপস্থিতিতে বন্ধু-পত্নীগৃহে আসিয়া অভিন্ন-হৃদয়তা সপ্রমাণ জন্য বন্ধু-পত্নী সহ প্রেমালাপ (ভ্রাতা-ভগিনী-প্রেম!) ও কখন কখন যামিনী যাপন করিতেন। ঘটনা প্রকাশ হওয়ায়, ওসিয়া আদালত সাহায্যে পত্নী পরিত্যাগে উদ্যত; শ্রাদ্ধ এখনও গড়ায় নাই! যবনিকা পতনের পূর্ব্বে শেষ অঙ্কের অভিনয় এখনও বাকি। পাঠক! তুমি কি মনে করিতেছ যে, এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় পার্ণেলের মান সম্ভ্রম্ নষ্ট হইয়াছে? কিছু না, কিছু না! পার্ণেলের প্রভাব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ; এখনও সেই প্রতিপত্তি,—সেই মান সম্ভ্রম্, সেই ক্ষমতা বিস্তার!

পার্ণেল এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া, চুপি চুপি ওসিয়া-পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে কোনরূপ উৎসবাদি ক্রিয়া হয় নাই। উপপতি এক্ষণে পতি হইল, উপসর্গ বিলুপ্ত হইল—সভ্য-সমাজেও আদর বাড়িল। ধন্য বিলাতী-সমাজ! ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজকে ছাঁচে না ঢালিলে, সমাজ সংস্কারকদিগের 'মান সম্ভ্রম' অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিরূপে?

***

কাপ্তেন ভার্ণের কীর্ত্তি-কলাপ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। ইহার বিচার শেষ হইয়াছে। ইনি যে কেবল পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন,তাহা নহে ; স্ত্রী-সত্ব-সংরক্ষিণী সভার (Vigilant committee for the protection of the women) সম্পাদক ; কিন্তু হইলে কি হইবে ? যে খানে স্ত্রী-স্বাধীনতা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত, সে স্থানে যে সম্পাদকের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি ? ভার্ণে স্বদোষ প্রক্ষালন-লালসায় স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলেও, বিচারে তাঁহার সবিশেষ অপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায়, বৎসরেকের জন্ম সপরিশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি ফুটন্ত-বালা-সম্ভোগের পরিবর্ত্তে প্রাণান্ত-কারা-বিভোগে কালাতিপাত করিতেছেন। ভার্ণের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। পার্ণেল ! তুমিই যথার্থ প্রেমিক বন্ধু ! তুমিই ধন্য !!

***

লর্ড কনিমারা অভিজাত সন্তান। ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন মান্দ্রাজের শাসন-কর্ত্তারূপে। ইনি বিবাহিত,—কিন্তু শাসন কার্য্য-পরিশ্রমালোড়িত-মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য গৃহিণীর পরিবর্ত্তে ইনি গৃহিণী-পরিচর্য্যা-নিযুক্তা মনোমোহিনী দাসীর সহিত নির্জ্জনে প্রেমালাপ করিতেন, ধরা পড়ায় শাসন-রজ্জু অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইনি এক্ষণে বিলাতে। ডাইভোর্সের কথা চলিতে ছিল, কিন্তু কি হইয়াছে জানি না।

***

পাঠক ! বিলাতি সমাজ-চিত্র দেখিলেন কেমন ? শিক্ষাপ্রদ কি ? হা অদৃষ্ট ! এই সকল মহাপুরুষ হিন্দু-সমাজে সংস্কার না করিলে, আমাদের আর মুক্তির উপায় কোথায় ? কোন কোন সমাজ সংস্কারক সুধন্য পুরুষ সহবাস-সম্মতি-বিধি উলঙ্ঘন-কারী দিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার জন্য Vigilant committeeর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এ সভার সংস্থাপন করিতে হইলে, সংস্কারক-সম্প্রদায়েরমধ্যে মহাত্মা ভার্ণের সমকক্ষ সম্পাদকের বোধ হয় প্রয়োজন; নহিলে পশ্চাত্যানুকরণ হইবে কিরূপে ?

***

'সহবাস-সম্মতি'র আইন ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সাক্ষরিত হইয়া এতদিন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল। আইন খানি হইয়াছে আমরা বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করি বলিয়া। আমাদের প্রকৃতি এমনি জঘন্য ও আমরা এত অসভ্য যে,বালিকা স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্টকে আমাদের উপর আইন-বাণ বর্ষণ করিতে হইল। আমরা পরাধীন ; সুতরাং আমরা অসভ্য; আর স্বাধীন সুসভ্য বিলাতি সমাজ বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচারে আমাদের সহিত তুলনায় কিরূপ, তাহা আমাদের দেখাইবার আবশ্যক নাই; তবে, বিলাতবাসী মহাত্মা পিন্‌কট সাহেব কি বলিতেছেন দেখুন—

"আমরা যে দেশের সংস্কার করিতে যাইতেছি, তথায় আটাইশ বৎসরের মধ্যে বিশ কোটীর অধিক অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র দুইটি বালিকার প্রতি অত্যাচার সাধারণ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ অন্যান্য ঘটনার কথা কল্পনা করিয়া লইলেও, তাঁহাদের সংখ্যা যে, কখনই অধিক হইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। ইহার সহিত মিঃ ম্যাকনারণ প্রায় ১১কোটী লোকের আবাস-ভূমি ইংলণ্ডের যে ১১ টি প্রধান নগরের হিসাব দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিয়া দেখুন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, কেবল ১৮৮৯ সালে ঐ সকল স্থানে অনধিক ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকার প্রতি অত্যাচারের ২৬ টি ঘটনা উপস্থিত হইয়া ছিল। ইহা ত মন্দের ভাল। আবার দেখুন,—এই সকল স্থলে ৬৪টি সতীত্ব-নাশের ইচ্ছায় আক্রমণ হইয়াছিল! তাহার মধ্যে আবার ৩৮টি সভ্যতার কেন্দ্র লণ্ডন-নগরে ঘটিয়াছিল। এক দিকে সমস্ত ভারতে ২৮ বৎসর কালের মধ্যে দুইটি ঘটনা,—অন্যদিকে

ইংলণ্ডের কিয়দংশ মাত্রে কেবল মাত্র এক বৎসরের ৯০টি ঘটনা ইহার সহিত পতি পত্নী-ত্যাগের মোকদ্দমার সংখ্যা যোগদিলে আমাদের কি হিন্দু দিগের নিকট সুনীতির বক্তৃতা দেয়া কর্ত্তব্য ?”

এই ত গেল বালিকা স্ত্রীর উপর অত্যাচারের কথা। আমরা স্ত্রীকে ভালবাসিতে জানি না পরাধীন বলিয়া ; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ভালরূপ বুঝেন, সুসভ্য প্রেমিক ইংরাজ ; কারণ, ইঁহারা স্বাধীন। সম্প্রতি কেণ্টুকি প্রদেশের অন্তর্গত কোভিংটন নগরে ‘এসক্রফট’ নামক একটি ইংরাজ স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা দেখাইয়াছেন। ইনি নাকি ঘোড়া ক্রয় করিবার জন্য টাকা চান, স্ত্রী কিন্তু বহু আয়াসোপার্জ্জিত সেই অর্থে স্বীয় ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া ছিলেন, সুতরাং টাকা দিতে অস্বীকার করিয়া ছিলেন, তাঁহার অপরাধ এই। এই অপরাধে প্রেমিক হৃদয় উথলিয়া উঠিল— তিনি আর ভালবাসার পুরস্কার না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্ত্রীকে উলঙ্গ করিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধে ও মস্তক নিম্নে রাখিয়া লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিয়া, অনাহারে প্রায় চারিদিন ঝুলাইয়া রাখিলেন। কন্যা “মর্লিয়ন্ ক্রফট্‌কে” বাটীতে প্রবেশ করিতে পিতা এস্‌ক্রফট্ সাহেব বিশেষরূপে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, “তোমার মাতাকে চাবুক মারা হইয়াছে, আর মদ্য পান করিয়া আসিয়া তাহার জীবন নাশ করিব।” মার্লিয়ন্ ক্রফট্ পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন যে, রক্তাক্ত কলেবরে মাতা পূর্ব্বোক্তরূপে ঝুলিতেছেন। প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গকে কন্যা ডাকিতে যান। ইতিমধ্যে এস্‌ক্রফট্ সাহেব চম্পট দেন। এস্‌ক্রফট্ পত্নী এক্ষণে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ৩।৪ দিন এরূপ অনাহারে থাকিয়া মৃতপ্রায়। গোখাদকের প্রাণ বড়ই কঠিন !!

৺কালিদাস মিত্র।

—•—

সহৃদয় গ্রাহক পাঠক মহোদয়গণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ‘সুবোধিনী’র আজি বড়ই দুর্দ্দিন সমুপস্থিত। যাঁহার স্নেহ চক্ষে সংবর্দ্ধিতা হইয়া সুবোধিনী এতাবৎকাল আনন্দবিবর্দ্ধিতা হইয়া আসিতেছিল, যিনি অনবরত পরিশ্রম সহকারে ইহাকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধারণের লোচনানন্দ-দায়িনী করিয়া তুলিয়াছেন, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ইহার সেই প্রতিপালয়িতা মাননীয় মদগ্রজ বাবু কালিদাস মিত্র গত ২৪ এ আষাঢ়, মঙ্গলবার, রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় অকালে চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি ইহার ভরণপোষণের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়া কেমন করিয়া তদীয় গুরুভার বহন করিব, সেই চিন্তায় অধীর হইয়াছি। তথাপি জ্যেষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তদীয় কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিবার জন্য ব্রতী হইতে হইল। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট সবিনয় নিবেদন এই, আপনারা যদি নিজ নিজ কার্য্য গুণে ইহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে কৃপণতা না করেন, তাহা হইলে, আমি কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইব, এরূপ আশা করিতে পারি। এই সংখ্যার প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য তিনিই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা তাঁহারই সম্পাদিত। একান্ত অনুগত—

শ্রীভোলানাথ মিত্র।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের
ভ্রাতা
শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ—১২৯৮।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	দাদা! তুমি কোথায় আছ?	সম্পাদক ...	৯৭
২।	অন্তিম-মিলন ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন ...	৯৯
৩।	চলিলে কোথায়? ..	শ্রীরসময় লাহা ...	১০৫
৪।	আমাদের অবনতি ...	৺কালিদাস মিত্র ...	১০৬
৫।	গৃহস্থের একাদশী ...	* * * ...	১০৯
৬।	বাইবেল-সমালোচনা	* * * ...	১১৩
৭।	এসব না সহা যায়! ...	শ্রীরাধাজীবন রায় ...	১১৬
৮।	জমীন্দারী-পঞ্চায়ত	* * *	১১৭
৯।	শোক-সংবাদ ...	শ্রীরাধাজীবন রায় ...	১২৫



Calcutta:
Printed & Published by S. C. Sen, at the
GREAT TOWN PRESS.
No. 163, Musjeedbari Street.
1891.

বিশেষ-দ্রষ্টব্য।

'সুবোধিনী'র সম্পাদন-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে বলিয়া আমাদিগের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল লাহা, এম এ, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে সুবোধিনীর সহকারী-সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীভোলানাথ মিত্র,

সুবোধিনী-সম্পাদক ও সত্বাধিকারী।

নিয়মাবলী।

১। সুবোধিনী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে এক সংখ্যা করিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

২। সুবোধিনীর অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা চারিখানি পুস্তক উপহার পাইবেন। উপহার প্রার্থিগণকে পুস্তক পাঠাইবার ব্যয়াদির জন্য অতিরিক্ত চারি আনা দিতে হইবে অর্থাৎ ১৸৹ টাকা পাঠাইলে, উপহার পুস্তক ও এক বৎসর সুবোধিনী নিয়মিতরূপে পাইবেন। উপহার পুস্তক যথাঃ—

(ক) মানস-কুসুম (কবিতা-পুস্তক ৯৬ পৃষ্ঠা) ৺কালিদাস মিত্র প্রণীত।

(খ) ধর্ম্ম-পরীক্ষা (নাটক ৮৮ পৃষ্ঠা) শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

(গ) একটী চিত্র (উপন্যাস ৪৩ পৃষ্ঠা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

(ঘ) A Visit to Darjeeling by Bhola Nath Mitra.

৪। সুবোধিনী সর্ব্বত্র ডাকযোগে প্রেরিত হয়;—অতএব যদি কেহ কোনও মাসের সুবোধিনী নিয়মিত মাসের মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে, তিনি তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। ইহার পর, আর আমরা দায়ী থাকিব না।

৫। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী থাকিবেন,—সম্পাদক বা প্রিণ্টার দায়ী নহেন।

৬। সুবোধিনীর প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ✓০ আনা।

৭। সুবোধিনীতে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি লাইন ।০ আনা।

৮। সুবোধিনী-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি-পত্র ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট,
সিমুলিয়া—কলিকাতা।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।
সুবোধিনী-সম্পাদক।

[প্রথম বৎসরের সুবোধিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য—দুই টাকা। দ্বিতীয় বৎসর গ্রাহকের জন্য ১৷৹ মাত্র]

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। } শ্রাবণ—১২৯৮। { চতুর্থ সংখ্যা।

দাদা! তুমি কোথায় আছ?

বিষাদে গরজে ঘন প্রাবিট্-গগণে।
বিষাদে ঝরিছে অশ্রু নিবাশ-নয়নে,
বিষাদে সকলি ঢাকা,
বিষাদ হৃদয়ে আঁকা,
বিষণ্ণ সকলে দেখ তোমাব কাবণ,
কোথায় গিয়েছ দাদা! বল না এখন?

আব কি হবে না দেখা সহিতে তোমাব,
কহিবারে দুটো কথা পাব না কি আব?
এমন জানিলে পবে,
রাখিতাম হৃদে ধ'রে,
হেরিতাম অনিমিকে ও চাঁদবদন,
এস দাদা! একবাব দেহ দরশন।

তোমার বিরহ-শোকে কাঁদিছে হৃদয়,
কেমনে হইলে তুমি এমনি নিদয়?
ভুলিলে সকল মায়া,
ভুলিলে জননী,—জায়া,
ভুলিলে জনক, ভ্রাতা, জন্মের মতন,
এস দাদা! একবার করি আলিঙ্গন।

তোমার যে প্রিয় সুত প্রাণের পুতলি,
যাহারে রাখিতে সদা স্নেহেতে আগুলি,
দিয়ে গেলে কার করে,
কে তাবে যতন করে?
চাহিলে তাহার পানে ফেটে যায় বুক,
কেমনে হইলে তুমি সে ধনে বিমুখ?

কিহেতু ত্যজিলে মোরে কোন অভিমানে?
কি দোষ করেছি আমি তোমার চরণে?
এবার আইলে পরে,
সাধিব চরণ ধরে,
যতনে আদেশ তব করিব পালন,
বাঁধিব প্রেমের ডোরে হৃদয়ের ধন।

কত যে বাসিতে ভাল কি কহিব আর,
জনমে পারিব আমি সুধিতে সে ধার?
তোমার সমান স্নেহ
আর কি করিবে কেহ?
'দাদা' ব'লে কার কাছে দাঁড়াইব আর?
শুনিব অমিয়-মাখা বচন তোমার?

তোমার যে স্নেহময়ী দুখিনী জননী,
কাঁদিছেন, দিবানিশি লুটা'য়ে ধরণী,
জনক পাগল প্রায়,
পরাণ ফাটিয়ে যায়,
"শুনিয়ে তাঁহার সেই বিলাপ-বচন
কোথা গেল **কালিদাস** হৃদয়ের ধন?"

তোমার যে প্রিয়তমা প্রাণের রমণী
ভাসিছে নয়ন-নীরে—দিবস রজনী।
কার কুমন্ত্রণা পেলে,
কোথায় পলা'য়ে গেলে?
আর কি তাহারে তুমি বাসিবে না ভালো?
আর কি আঁধার ঘর হইবে না আলো?

আছিল পিতার দেখ সুখের সংসার,
কেমনে চলিয়া গেলে করিয়ে আঁধার
শোক-অশ্রু বিসর্জ্জনে,
যদি পায় হারাধনে,
তা'হলে জগতে বল কিবা অসম্ভব?
সুখেতে জীবন-কাল যাপিত মানব।

তুমি ত জানিতে ভাই! বিধির সৃজনে
বিরহে দহিতে হয় দারুণ দহনে;
হৃদয়েতে দাগা দিয়ে,
তবে কেন চলে গিয়ে,
অকারণে দিলে ব্যথা সকলের প্রাণে?
কি হেতু দহিলে সবে বিরহের বাণে?

তোমার সে "সুবোধিনী"-দুহিতা-রতন,
সাজায়েছ দিয়ে যায় নানা আভরণ,
তাহারে বিঘোরে ফেলে
কোথায় পলা'য়ে গেলে?
কেমনে পালিব তায়, ভাবি তাই মনে,
শিশু আমি, গুরুভার বহিব কেমনে?

প্রাণের "অক্ষয়" তব আর "রসময়",
তোমার বিহনে আজি ব্যথিত-হৃদয়।
হায় এত দিনে তাঁরা
হ'লেন বান্ধব হারা:
বিষাদে বিকল চিত সে "রাধাজীবন",
এঁরা যে আছিল তব হৃদয়ের ধন।

এদের হেরিলে তব প্রমত্ত-হৃদয়,
উল্লাসে নাচিত যেন মহোৎসবময়।
নিত্য নব কাব্য-সুধা
প্রদানে হরিত ক্ষুধা!
নিত্য কত হাসি খুসি, আমোদ প্রমোদ,
সে সব ঘুচিয়ে গেছে জনমেরি শোধ।

বিশুষ্ক জীবন-বৃন্ত বিহীন-কুসুম,
নির্ব্বাপিত প্রেম-অগ্নি উঠিতেছে ধুম,
সিঞ্চিলে প্রবোধবারি,
স্বথলে প্রবল ভারি,
বিচিত্র বিধির খেলা কে করে বর্ণন?
আকাশ-কুসুম সম আশার ছলন।

নহ তুমি অল্পভোগী—সুখী মাত্র তুমি,
ছার বলি ত্যজিয়াছ এই মরুভূমি।
মায়া মরিচীকা-বশে,
মজিয়ে কুসঙ্গ-রসে,
যাপিতে হ'লনা দিন বিপদ ব্যসনে,
ছিলে শুধু সদালাপ, সুধার অশনে,

কি বলে প্রবোধ দিব মানসে আমার?
বিলাপ, প্রলাপ শুধু হইয়াছে সার,
কালের করাল-কোলে,
শুয়ে আছ কুতূহলে,
হাসিছ মৃদুল—হেরি আমাদের ভ্রম,
হেরিছ বিলাপ সার—সার পরিশ্রম,

বিধি-লিপি বল ভাই। কে করে খণ্ডন,
অবশ্য ঘটিবে যাহা ললাট লিখন।
জেনে শুনে তবু বলি,
কোথায় গিয়াছ চলি
এস দাদা! একবার দেহ আলিঙ্গন
শুনিয়ে বচন-সুধা যুড়াক্ শ্রবণ।

স্বর্গের বিহঙ্গ তুমি গেলে স্বর্গপুর,
নিমেষে যাতনা জ্বালা করিয়াছ দুর
কি হেতু দু'দিন তরে,
এসেছিলে এই পুরে?
কি হেতু কাঁদায়ে গেলে আত্ম পরিজন?
যাহোক্ কুশলে থাক,—এই নিবেদন।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

অম্বিক বাবু যে পত্র লইয়া নৈহাটী গমন করিয়াছিলেন, গিরিবালা প্রথমতঃ সে বিষয় কাহাকেও জানিতে দেন নাই। একদিন তিনি মাতার নিকটে বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলেন। হৈমবতী ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া গিরিবালাকে বলিলেন,—"আবাগি! চুপ কর, কর্ত্তা একথা শুন্‌লে আর রক্ষা থাকবে না, অম্বিককেও কাট্‌বে তোকেও কাট্‌বে। গিরিবালা সেই অবধি আর ও সকল কথা মুখে আনিত না।

যতদিন যাইতে লাগিল, চণ্ডীচরণের ক্ষতস্থান আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, ক্রমে ঘা বাড়িয়া গিয়া তাঁহার যন্ত্রণার এক শেষ হইয়া উঠিল। একদিন হৈমবতী নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছেন, এমন সময় চণ্ডীচরণ রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন,—মা! আমি বুঝি আর এ যাত্রায় রক্ষা পাব না।" মাতা বলিলেন,—"ছি বাবা! ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে! তুমি ভাল হও, মা কালিকে সোণার জিব্ গড়িয়ে দিব।" চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"মা! আমি যদি তখন তোমার কথা শুন্‌তেম, তাহ'লে আর এমন যন্ত্রণা পেয়ে মর্‌তেম্ না; আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলাম, সেই জন্যেই এত ভোগ ভুগ্‌ছি।"

হৈমবতী বলিলেন,—"যা হবার হয়েছে, সে ত আর আমার মনে নেই বাবা! এখন তুমি আমার আরাম হয়ে উঠলে এযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই। বাবা চণ্ডি! তুই যে দুখিনীর ধন, অন্ধের নয়ন, তুই বৈ আর আমার কে আছে বল দেখি? তুই যে

অবধি পড়েছিস্ সেই অবধি যে আর আমার আহার নিদ্রা নাই। আমি যেন দিন্‌কের দিন পাগলের মত হয়ে যাচ্চি। কর্ত্তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে ধমক্ দিয়ে হাঁকিয়ে দেন, বলেন—'কি কর্‌ব, তা আমি কি জানি! তুই বুঝ্‌গে আর তোর চণ্ডে বুঝ্‌গে।' তাঁরও এখন মতিচ্ছন্ন হয়েছে, তাঁর কথা ধরে ব'সে থাকলে আর কি হবে বাবা! আর আমি মেয়েমানুষ, কতদূর করে উঠ্‌তে পারি বাবা! সে দিন সে তোকে মার্‌বার জন্যে লাঠি ওছালে, আমি কাছে ছিলাম, তাই চুল চাপা দিয়ে আঁচল চাপা দিয়ে, দু'ঘা মার খেয়ে তোকে বাঁচালেম। আর দেখ্ তাঁরও মেজাজের ঠিক নাই! তা নইলে দেখ্ তুই এমন হয়ে পড়েছিস্, তোকে আবার তেড়ে মার্‌তে আসে! যা হোক্ বাবা! ভগবান্ আমাদের বড় ফেরে ফেলেছে, কবে যে বাবা! এ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাব, তা'ত বল্‌তে পারিনে। জগদীশ্বর! তোমার মনে যা আছে তাই হ'বে!"

এই বলিয়া হৈমবতী রোদন করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"মা কাঁদ কেন? কাঁদ্‌লে আর কি হবে মা! যা হয়ে গেছে তার আর চারা নাই। এখন তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল, যেন তিনি আমাকে সেই মোহন্তর কাছ থেকে ওষুধ এনে দেন, সে মোহন্তর ওষুধ যেন কথা কয়, সেই ওষুধ দিলে অতি শীঘ্রই আরাম হবে। বাবার যে মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, তার আর ভুল কি! তুমি চেষ্টা ক'রে আমার বাঁচাও। আমার অপরাধ নিও না মা?"

চণ্ডীচরণের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া হৈমবতীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। নয়ন হইতে অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুত-পদ-সঞ্চারে দামোদরের নিকট গমন করিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। দামোদর বাবু জামতার সহিত কোন বিষয়কর্ম্ম লইয়া কথা বার্ত্তায় ব্যাপৃত। এমন সময় রোরুদ্যমানা হৈমবতী সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হ্যাগা! তুমি একেবারে বয়ে গিয়েছ না কি! তোমার বুড়ো বয়েসে মতিচ্ছন্ন হয়েছে না কি! তোমার এত সাধের চণ্ডী যে ভুগে ভুগে সারা হলো, তা কি তুমি একবার দেখ্‌বে না? এক কাজ যেন করেই ফেলেছে, এখন তাকে ওষুধ পালা দিয়ে আরাম ত কর্‌তে হবে—না তাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌বে তা আমায় বল? তোমাকে কোন কথা বল্‌তে এলে তুমি হাঁকিয়ে দাও, তবে এ সব কাজ আমা হ'তে হবে নাকি? তুমি ত আর কিছুই দেখ না!

দামো। আমি দেখি না ত কে দেখে?

হৈম। আহা! তুমি যা দেখ্‌চ, এমন দেখা শত্তুরেও দেখে না।

দামো। ওর অদৃষ্টে ভোগ আছে, আমি কি কর্‌তে পারি।

হৈম। চেষ্টা ত কর্‌তে হবে, তার পর যা কপালে আছে, তাই হবে।

দামো। আমি অমন ছেলে চাইনে, ও মরে গেলে আমার হাড় জুড়ায়।

হৈম। তোমার কি মুখের কথা! কথাগুলো শুন্‌লে যে সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়।

দামো। শুন্‌তে ভাল না লাগে, এখান থেকে চলে যাও।

হৈম। তা আমি যাচ্চি, কিন্তু কাল তুমি সেই মোহন্তর কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবে বল?

দামো। কে মোহন্ত, কোথায় থাকে! সে আমি জানিনে।

হৈম। তবে আমি মোহন্তকে খুঁজ্‌তে যাব বটে।

দামো। দেখ তোমার কপালে মার আছে,—এই ব'লে দিলুম্।

হৈম। তাতে ত আর কসুর নাই—না হয় মার খা তুচ্চার।

দামো। চ'লে যাও এখান থেকে, তোমার লক্ষণ আমি ভাল দেখ্‌ছিনে।

হৈম। আমি যাব না, তুমি মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল।

এই কথা শুনিয়া দামোদর বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং হৈমবতীকে মারিতে উদ্যত হইয়া যেমন বেগে উঠিবেন, অম্বিক বাবু অমনি তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। অম্বিক বাবু হৈমবতীকে বলিলেন,—"আপনি কেন ওঁকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছেন, চলে যান আপনার কাযে। আপনি যখন তখন কর্ত্তাকে এমন করে জ্বালাতন করেন কেন?

হৈম। কি বল্লে—জ্বালাতন করি কেন! আমার ছেলে মরে আমি চুপ্ করে থা'কৃব?

অম্বি। ওগো ও সব ছেলে মর্‌বার ছেলে নয়—ও সব ভুঁইফোঁড়্ ছেলে, শাপে আছ্‌ড়ালেও মরে না!

হৈম। তুমি পর—পরের মতন কথা কইলে। তোমার কিসে দরদ হবে!

অম্বি। আমি ঢের করেছি। এমন কোন জামাই কখন করে না।

হৈম। তা যদি বল, আমিও তোমার ঢের করেছি।

অম্বি। আমার মতন উপকারী আপনাদের কেও নাই।

হৈম। হাঁ—তা নইলে বা নৈহাটীতে আগে থা'কৃতে খবর দিয়ে আমার ছেলেকে দয় মজাবে কেন?

অম্বি। কে তোমার নৈহাটীতে খবর দিয়েছে?

হৈম। এই তুমি—তুমি, আবার কে?

অম্বি। তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে—তুমি জাননা।

হৈম। সে দুধের মেয়ে, সে কি জানে?

অম্বি। না—কিছু জানে না।

হৈম। তুমি পর, পরের মতনই তোমার ব্যাভার হবে। আমার ছেলের ওপর তোমার দরদ্ হবে কেন?

অম্বি। বলি—বেদরদের কাজটা কি করা হ'য়েছে?

হৈম। দরদ থাকৃলে ওষুধ এনে দিতে।

অম্বি। আমি ওসব জানিনে—'যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়্‌সির কাট্‌না কামাই।'

হৈম। তাই ত—আমি আর বল্‌ছি কি! তুমি ও সব জানবে কেন? চণ্ডে ম'লে তোমারই ত রাজত্বি।

অম্বি। দেখ ও সব কথা যদি ফের বল, তা হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।

হৈম। ওরে বাপ রে! তেজ দেখ একবার! যত বড় মুখ, তত বড় কথা!

"তোমাদের কাজ তোমরা বোঝগে" বলিয়া অম্বিকবাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। গিরিবালা নীরব। অম্বিকবাবু কিয়ৎক্ষণ এ পাশ ওপাশ করিয়া নিদ্রা গেলেন! গিরিবালা দেখিল—স্বামী অদ্য আর কথা কহিবেন না, অগত্যা তিনি নিদ্রা গেলেন।

হৈমবতী যখন অম্বিকবাবুর সহিত বিবাদ করিতেছিলেন, দামোদর বাবু সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হৈম! নৈহাটীতে কিসের খবর!

হৈম। ও কিছু নয়—রাত হয়েছে এখন ঘুমোও, আমি চণ্ডীর কাছে যাই।

দামো। তবু—শুনিই না, কিছু নয় আর কেমন করে?

হৈম। সে কাল বল্‌ব, এখন তুমি ঘুমাও, কাল আবার ভোরে ভোরে উঠে বাছার জন্যে ওষুধ আন্‌তে যাবে।

দামো। তুমি আমায় বল্‌বে না বটে?

হৈম। তোমাকে বল্‌ব না ত কাকে বল্‌ব?

দামো। তবে এত ন্যাকামী হচ্ছে কেন?

হৈমবতীর অন্তর কাঁপিতে লাগিল। তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাগের মাথায় কি সর্ব্বনাশ করিলাম! তিনি স্বামীর স্বভাব ভালরূপ জানেন। লোকে বলিয়া থাকে "সাপের লেখা, বাঘের দেখা"; দামোদরের খর্পর তদপেক্ষা অধিক। হৈমবতী বলিলেন,"তোমার গিরিবালা সহচরীকে একখান পত্র লিখেছিল, তাই অম্বিক সেই খানি নৈহাটীতে পৌঁছে দিয়েছিল, শুন্‌লে?"

দামো। তাতে তোমার ছেলে দয় মজ্‌ল কেমন ক'রে?

হৈম। তা এত দূর হবে তা গিরিবালা জান্‌বে কেমন ক'রে?

দামো। তোমার কথাগুলো আমাকে বড় গোলমেলে ঠেক্‌ছে, সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোবে না, তা আমি জানি।

হৈম। তা আমি কি কর্‌ব বল? আমার হ'য়েছে সব দিকেই বিষম জ্বালা—মা গঙ্গা একটু স্থান দেন ত হাড়্‌টা জুড়ায়।

দামো। তোমার নাকী কান্না রাখ—আমি সব বুঝেছি। কাল গিরিকেও দেখ্‌ব, আর ঐ অমে বেটাকেও দেখ্‌ব। দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ ঘরে পুষে রেখেছি। অমার মত আহাম্মক আর কে আছে? কাল একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে জল গ্রহণ কর্‌ব।

হৈমবতী দেখিলেন বিষম বিভ্রাট। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"আমি কি কর্‌ব? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ কর্‌বে এখন—আপনার পায়ে আপনি কুড়ুলের চোপ্‌ মার্‌লে, আমি কি কর্‌তে পারি?

দামো। যাও যাও, তুমি চণ্ডের কাছে যাও, আমি একটু ঘুমুই।

হৈমবতী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া চণ্ডীচরণের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন

চণ্ডী একটু নিদ্রা গিয়াছেন। হৈমবতী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিঃশব্দে সিন্দুক খুলিলেন এবং তন্মধ্য হইতে গিরিবালার গহনার বাক্স ও অম্বিক বাবুর দলিল দস্তাবেজের তাড়াটি বাহির করিলেন এবং তৎপরে পুনরায় সিন্দুক বন্ধ করিয়া ঐগুলি হস্তে লইয়া গিরিবালার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে দুই তিনবার করাঘাত করাতে অম্বিক বাবু উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। অম্বিক দেখিলেন, হৈমবতী। লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্‌ছেন?"

হৈম। আর বাবা! সর্ব্বনাশ করেছি? এখন উপায় কি?

অম্বি। কেন?—কি হ'য়েছে?

হৈম। আজি রাত্রি পোহাতে না পোহাতে—পলাও।

অম্বিক। বলেন কি?

হৈম। এই নাও গহনার বাক্স, এই নাও দলিলের তাড়া।

অম্বিক। তা ত নিলেম্—তার পর?

হৈম। গিরিবালাকে জাগাও।

অম্বি। সে কি দুজনেই?

হৈম। কথা কয়োনা চুপ্ কর—যা বলি শুনে যাও।

উভয়ে কথা-বার্ত্তায় গিরিবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাত্রিও বড় অধিক নাই। শীঘ্রই হৈমবতী রোদন করিতে করিতে গিরিবালার মুখ চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন—"মা! সোণার লক্ষ্মি! আয় মা একবার জন্মের মতন কোলে করি। তুই আমায় ছেড়ে গেলে আর কি আমি বাঁচ্‌ব? কি ক'র্‌ব মা! আপনার 'সর্ব্বনাশ আপনি ক'রেছি। তোমার শ্বশুরের সোণার সংসার তোমার সেখানে কিছুরই অভাব নেই মা! তবে বুকের ভিতরটা আমার অন্ধকার করে যাচ্ছিস্, এই আমার দুঃখু! সুখ সমিন্ধের যেতিস্ মনের সাধে তোকে খাওয়াতেম, কাপড় দিতেম, গয়না দিতেম, তুইও হাস্‌তে খেল্‌তে যেতিস্ আমারও মনটায় অহ্লাদ হতো, তা মা! সেইটিই হলোনা। বেঁচে থাকি তা হলে আবার আন্‌ব, কর্ত্তার রাগ পড়ুক্, তার পর আবার অম্বিকও আস্‌বে তুই আস্‌বি।

গিরিবালা রোদন করিতে লাগিলেন। অম্বিকের ভয়ের সঞ্চার হইল। রাত্রি অবসান প্রায় দেখিয়া উভয়ে হৈমবতীকে প্রণাম করিলেন। হৈমবতী বলিলেন,—"দেখো বাবা! দেখো মা! খুব সাবধান, একবারেই বাড়ী যেও, থেমোনা। উভয়েই খিড়্‌কি দ্বার দিয়া বিদায় হইলেন, অপর কেহই জানিতে পারিল না। উভয়ে বিদায় হইলে, হৈমবতী নিঃশব্দে দামোদরের কক্ষে প্রবেশ করিলেন দেখিলেন দামোদর নিদ্রিত, নাসিকাধ্বনিতে গৃহটি কম্পমান হইতেছে। হৈমবতীও তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন।

এদিকে অম্বিকবাবু পত্নী সমভিব্যাহারে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পদব্রজে গমন করিয়া উষাকালে ফরাশডাঙ্গায় সমুপস্থিত হইলেন। সেখানে অম্বিকবাবুর বিষয় খায় কে? কেবল দামোদরের কৌশলে তাঁহাকে "ঘরজামাই" সূচক পদবী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বাটীর সম্মুখে গিয়া দ্বারদেশে করাঘাত করিতেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভৃত্য তাঁহাদিগকে এই অসময়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত

হইল। অম্বিকবাবুর নেত্র-ভঙ্গিতে সে আর কথা কহিল না। অম্বিকবাবুর পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। আহার করিয়া ভুলিয়া যান, মানুষ চিনিতে অক্ষম—কেবল সহধর্ম্মিণীর অচলা ভক্তি ও অবিশ্রান্ত সেবায় এতাবৎকাল এই দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিতেছেন। অম্বিকবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সমস্ত বিষয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। অম্বিকবাবুর শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি-নিবন্ধন বাটীর সকলেই অসন্তুষ্ট! কি করিবেন? অম্বিকবাবুর উভয় সঙ্কট। এক্ষণে বধূ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বাটীতে আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই সুস্থ হইলেন। অম্বিকবাবু সস্ত্রিক পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চরণ বন্দনা করিয়া বাটীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলন।

এদিকে রজনী প্রভাত হইলে, দামোদর গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলেন—হৈমবতী তখনও নিদ্রিতা। ভার্য্যা যে কপট-নিদ্রায় অভিভূতা, দামোদর তাহা স্বীয় কুটবুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলেন না। রজনীযোগে যে সকল কথা-বার্ত্তায় দামোদরের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহারে জানাইলেন। দামোদর হৈমবতীকে প্রশ্ন করিতে না করিতেই, একটি পরিচারিকা শশব্যস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! খিড় কির দরজা খোলা কেন? দিদিমণিকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনে, জামাই বাবুকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনে—"

দামো। অ্যাঁ! অ্যাঁ! সে কি! সে কি!

হৈম। কোথায়—এই খানেই আছে, খুজে দেখনা।

দাসী। খুঁজে না দেখেই কি দৌড়ে জিগেস্ কর্‌তে এসেছি!

দামো। পালিয়েছে—পালিয়েছে।

হৈম। তোমার এক কথা! পালাবে কেন?

দামো। আমি বল্‌ছি—পালিয়েছে।

হৈম। আচ্ছা—আমি দেখছি।

হৈমবতী দাসী সমভিব্যাহারে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, সত্য বটে। হৈমবতী যে এই ব্যাপারের মূল, দাসী তাহা কেমন করিয়া জানিবে! তিনি উচ্চৈঃস্বরে কপট-ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দামোদর সর্ব্বনাশ ভাবিলেন। শিকার পলাইল—কি হইবে! দামোদর শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা গাঁটিসব পরে গিয়েছে নাকি?" দামোদরের অজ্ঞাতসারে অম্বিকবাবু গহনার বাক্স ও দলিলের তাড়াটি হৈমবতীর নিকটে রাখিয়াছিলেন। হৈমবতী বলিলেন, "সমস্ত তারই কাছে ছিল, সেই জানে কি করেছে"। দামোদর বলিলেন,—"যাগ্ চুলোয় যাগ্।"

দেখিতে দেখিতে দামোদরের সংসার কি হইয়া গেল। দিন কতক কাল সুখ ভোগ করিলে কি হইবে! পরিশেষে পরিতাপ ও কষ্ট ভোগই দুষ্কর্ম্মের চরম ফল। গৃহিণী পতিব্রতা কিন্তু স্বামীর দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন তাঁহার সহিত কপট ভাবে সম্মিলিতা, পুত্র একে দুর্ব্বৃত্ত তাহাতে আবার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, পুত্রবধূ কলঙ্কিনী কন্যা ও জামাতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, ইহা

অপেক্ষা অধিক আর কি হইবে? দামোদরের পরোপকারাদি সদ্গুণ ছিল বটে, কিন্তু গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রদান করিলে আর কি হইবে! যাহাই হউক, দামোদর এক্ষণে "ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা স্বগৃহ চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।" (ক্রমশঃ)

চলিলে কোথায়?

প্রিয়—প্রিয়তম তুমি—চলিলে কোথায়?
সখা প্রাণসম তুমি প'লালে কোথায়?
মিত্র কালিদাস মম লুকা'লে কোথায়?
আর কি গো এ জগতে পাব না তোমায়?
অকালে তোমারে সখা, আমরা সকলে হায়!
হারাইনু অদৃষ্টের দোষে;
জানিনা জানিনা সখা আরো কি ললাটে আছে,
জানি না যে কি ঘটিবে শেষে।
কঠিন জগত এ যে,—বড়ই কঠোর ঠাঁই—
নহে ইহা সুখের আগার;
নহিলে কি প্রাণসখা হইয়ে আমার তুমি
দিতে হৃদে যাতনা অপার!
পবিত্র হৃদয় তব, বড়ই নির্ম্মল আহা!
সারল্যের সদা অধিষ্ঠান;
হ'য়েছি মিলিত সখা, যখনি তোমার সনে
পরিতৃপ্ত হইত পরাণ।
হইলে মিলিত দোঁহে, কহিতে কতই কথা,
কিছু নাহি রাখিতে গোপনে।
উল্লাসে ভাসিত হৃদি, প্রশংসা করিলে কেহ
আমাদের 'সুবোধিনী'-ধনে।
গুণবান্ পুত্র তুমি, জনক জননী তব
সুখে ছিলা সুখের সংসারে;
কি অনল জ্বালাইয়া গেলে তাঁহাদের প্রাণে,
ডুবাইয়া শোক-পারাবারে।
কাহার নিকটে রেখে, কি করিয়া গেলে তায়
জীবন সর্ব্বস্ব তুমি যার!
জনম-দুখিনী সতী, অনাথিনী তোমা বিনে
কে মুছা'বে নয়ন-আসার।
জ্বলন্ত অনল মম জ্বলিছে হৃদয় তার
কে নিবাবে বল্ল সে অনল?
রেখে গেছ পুত্র বটে, জ্বলন্ত পাবকে তার
সে যেন গো একবিন্দু জল!!
চাহিলে সে শিশু-পানে, অভাগিনী জননীর
শোকোচ্ছ্বাস উঠে উথলিয়া!
আদরিণী 'সুবোধিনী' তনয়া তোমার সখা
কার কাছে গেলে গো ফেলিয়া?
'উমা-সুন্দরী'র ব্যথা ভুলেছিলে এককালে
সাধের এ 'সুবোধিনী' পেয়ে;
তোমার বিহনে হায়! 'সুবোধিনী' কচি মেয়ে
বাঁচিবে গো কার মুখ চেয়ে?
প্রথম উদ্যমে রচি, "মানস-কুসুম"-কাব্য,
দিয়ে ছিলে সবে উপহার;
কানন-কুসুম সম মানস-মোহন আহা!
স্নিগ্ধ-বাসে প্রাণ মাতোয়ার!!
সদ্গুণে ভূষিত ছিলে, ধর্ম্মপরায়ণ তুমি
মিষ্টভাষে তুষিতে সবায়;
পিতৃ-মাতৃভক্তি তব হেরিয়া আমরা সবে
ভাবিতাম আদর্শ তোমায়।
স্বদেশ-হিতৈষী ছিলে, হইতে প্রধান তুমি;
চলে গেলে—বয়স নবীন!
ঘোষিবে তোমার কীর্ত্তি তোমারি এ 'সুবোধিনী'
জগতে রহিবে যত দিন।

শ্রীরসময় লাহা।

আমাদের অবনতি।

(লেখক—৺ কালিদাস মিত্র।)

আজ আমাদের এ দশা কেন? আজ আমাদের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছেন না ও তাঁহারা ক্রমশঃ ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইতেছেন, ইহার কারণ কি? আজ আমরা একমুষ্টি অন্নের জন্য পরদ্বারে ভিক্ষুকের বেশে পর্য্যটন করিতেছি কেন? আমাদের শরীরে বল নাই—অন্তরে দৃঢ়তা নাই—কার্য্যে অধ্যবসায় নাই এবং ভবিষ্যতে লক্ষ্য নাই, ইহার কারণ কি? আমরা কি মনুষ্য নহি? আমাদের শরীর কি রক্ত মাংসে গঠিত নহে? আমাদের হৃদয়ে কি ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভ, মান, অপমান ও হিতাহিত জ্ঞান নাই? সকলই আছে, তবে আমাদের এ দশা কেন?

আমরা ভারতবাসী। যে ভারতবাসী-দিগের সুখ, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, কীর্ত্তিকলাপ ও উচ্চশিক্ষা এক সময়ে সমগ্র জগতের আদর্শ-স্থল ছিল, আমরা তাঁহাদিগেরই বংশধর। যে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া ইউরোপবাসীরা ইহাকে 'সুবর্ণ-দেশ' বলিয়া অনুমান করিত, আমরা সেই ভারতবর্ষের অধিবাসী। তবে আমাদের এ অবনতির কারণ কি?

হিন্দুশাস্ত্র অতিশয় পুরাতন। উহা যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময় হিন্দুদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল এবং হিন্দুশাস্ত্র সেই সময়ে দেশ কাল ও পাত্রের উপযোগী করিয়া বিরচিত হইয়া-ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সামাজিক ও সাংসা-রিক ক্রিয়াকলাপ-সকল বিষয়েরই অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্র সেইরূপই আছে, সুতরাং হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পুরাতন হিন্দুশাস্ত্রের কেমন করিয়া সম্যক্‌রূপ ঐক্য হইবে?

আমি সুস্থ শরীরে যে সকল খাদ্য অতি-শয় মুখপ্রিয় ও সুখাদ্য বলিয়া তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া থাকি, আমি পীড়িত হইলে, সেই সকল খাদ্যে আমার রুচি হয় না অর্থাৎ সেই সকল খাদ্য আমার পীড়িত ও বিকৃত অবস্থায় অতিশয় অপ্রিয় ও অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব, বর্ত্তমান কালে বহু-পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত অবস্থা-প্রযুক্ত অনেকে যে পবিত্র সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করিতে অক্ষম হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদির এরূপ পরি-বর্ত্তন হইবারই বা কারণ কি?

হিন্দুশাস্ত্র যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, সে সময় এদেশে অহিন্দু ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর বাস অতি অল্প ছিল। তখন দেশে হিন্দু রাজা ছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্ম-রক্ষক ছিলেন; তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষকও ছিল এবং তাহারা আশৈশব ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইতেন। কিন্তু এখন—এখন সব একাকার! এখন বিধর্ম্মী এবং যবনে দেশ পরি-পূর্ণ, এখন যবন আমাদের রাজা, যবন আমা-দের ধর্ম্মরক্ষক এবং যবন আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; আমরা এক্ষণে যবনের শিষ্য

—যবনের দাস। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষক নাই, অধর্ম্মের শাসন নাই! অধিকন্তু, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পরামর্শ-দাতার ও অন্য ধর্ম্মে আশক্তি জন্মাইবার প্রলোভনের অভাব নাই। আমরা এক্ষণে অশৈশব বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেছি, জাতীয় ভাষার আদর নাই; জ্ঞানোদয় হইতে বিজাতীয় রীতি নীতি শিক্ষা করিতেছি, দেশীয় রীতি নীতির প্রতি লক্ষ্য নাই এবং অহরহঃ বিজাতীয়দিগের সহবাসে ও আজ্ঞাধীনে থাকিয়া বিজাতীয় আচার ব্যাবহার অনুকরণ করিতেছি—অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত স্বদেশের অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য চাকচিক্যশালী ক্ষণভঙ্গুর বিজাতীয় সুখের আশায় ধাবিত হইতেছি! যে ব্রাহ্মণ জাতি দেবমধ্যে পরিগণিত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রালোচনা, বেদ অধ্যয়ন যাঁহাদের আচরণীয় ও কেবল মাত্র কার্য্য, এক্ষণে তাঁহাদের দ্বারা অতিশয় নীচ কার্য্যও সাধিত হইতেছে! যে ক্ষত্রিয়দিগের অতুল সাহস পরাক্রমের বিষয় পাঠ করিলে, আজও আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ অসি-চালনার পরিবর্ত্তে মসি-চালনায় তদ্গদচিত্তে ব্যাপৃত! এবং, বিদেশীয়গণের অতিশয় নীচ বংশজ ব্যক্তিরও লোহিত আস্যের কুটিল ভ্রূকুটি-ভঙ্গি-ভয়ে সতত সশঙ্কিত!

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা করিতেন; আমাদের শাস্ত্র সকল তাঁহাদের দ্বারাই প্রণীত। তাঁহারা বিরলে বসিয়া চিন্তা ও স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনা করিতেন। তাঁহাদিগকে অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইত না। যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হয়, রাজা সে বিষয়ে সতত সতর্ক থাকিতেন। তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কোন বস্তুরই তিনি অভাব রাখিতেন না; সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে সাধারণের মঙ্গল-কামনায় স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু, এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিবেন, না রাজ-সহোদর মিউনিসিপ্যালিটির করাল হস্ত হইতে তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর জমীগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখিবেন? আমাদের রক্ষক নাই। যিনি আমাদের রাজা, আমাদের ধর্ম্মের উপর তাঁহার আস্থা নাই, তিনি ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এক্ষণে কাহাকেই বা 'ধর্ম্মাবতার' বলিয়া সম্বোধন করি?

হায়! হিন্দুধর্ম্মের উপর কি পর্য্যন্ত অত্যাচার না সাধিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের রাজত্বের প্রারম্ভে কত শত লোক ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, আবার কত শত অত্যাচার-প্রপীড়িত লোক প্রাণদায়ে অন্য ধর্ম্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে সে সকল অত্যাচার উৎপীড়ন নাই বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।

মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মভুক্ত করিত, ইংরাজ অধিকারে কোন সময়ে যে তাহার উদ্যোগ হইয়াছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই, এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়—

"The ravings of fanatics or charlatans from the pulpit may be unworthy of notice; but the heads of the Evangelical party have announced as their

principle for the Government of Hindoos and Mahomedans, that no school be supported by public money in which the Bile is not taught, and by necessary consequence that no public employment be given to any but real or pretended Christians."

[*Foot-note Page 18, on "Liberty" by J. S. Mill People's Edition.*

যাহা হউক, ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু ইঁহারা বক্তৃতা দিয়া মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রলোভন দেখাইয়া বিবিধ কৌশলে ফুস্‌লাইয়া স্বাভিষ্ট-সিদ্ধির পন্থায় ফিরিতেছেন।

হায়! ভারতভূমি! যদি তুমি সমস্ত ভূমণ্ডলের গর্ব্ব-স্বরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী ও রত্ন-গর্ভা না হইতে, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভারতবর্ষের অসাধারণ ধনরত্নের বিষয় শ্রবণ করিয়া জগৎ শুদ্ধ সকলেই ইহাকে স্ব স্ব ভোগে আনিবার জন্য লোলুপ! মুসলমান, মোগল,—পাঠান, গ্রীক, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি কত প্রকার জাতি আসিয়া ইহার প্রতি কত উপদ্রবই না করিয়াছে। এক্ষণে ইহা ইংরাজের অধীন। মুসলমানেরা বহু-দিন ব্যাপিয়া ভারতের উপর আধিপত্য করিয়াছে এবং অনেক প্রকার অত্যাচারও করিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজ ভারতের অধিপতি, ইঁহারা সুসভ্য, সুতরাং বাহ্যিক সৌজন্য ও সভ্যতার আদর্শ দেখাইয়া শাসন করিতেছেন। অত্যাচার উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অল্প হইতেছে, অধিবাসিগণ অন্যান্য বিজেতাদিগের অপেক্ষা ইঁহাদের শাসনাধীনে নিঃশঙ্ক চিত্তে কাল যাপন করিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের অভিসন্ধি সকল পরিপূর্ণ হইতেছে এবং ভারত ও মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

ইংরাজী-শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে কি বিষময় কলই ফলিতেছে! ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচলিত রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয়দিগের বিষম বিষময় পথে অগ্রসর হইতেছি। ইংরাজের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা ক্রমাগত বিপথগামী হইয়া, আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহার এমন কি কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত হারাইতেছি। ইংরাজের সহবাসে আমাদের জাতীয় গৌরব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। যে সকল সদ্গুণ ও সুনীতি-প্রভাবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ তৎকালীন সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের যশঃ প্রভা অদ্যাবধি ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত রহিয়াছে এবং যে সকল মহাত্মাদিগের নামে আজ পর্য্যন্ত আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয় ও আমরা জগতের শ্রেষ্ঠতম বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে ও ইংরাজের সহিত ঘনিষ্টতায় আজ আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণের সে সমস্ত সদ্গুণ ও সুনীতি, কুসংস্কারাপন্ন কুনীতি-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নামে পরিচয় দিতেও অপমান বোধ করিয়া থাকি।

যে পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ জন্য আজও হিন্দু-গৌরব দেদীপ্যমান রহিয়াছে, ইংরাজের সহবাসে এক্ষণে আমরা তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি। আমরা এক্ষণে এতদূর স্বার্থপর হইয়াছি যে, স্ত্রী পুত্র লইয়া

বাস করাও সময়ে সময়ে আমাদের বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য উৎসব ও পর্ব্বোপলক্ষে পূর্ব্বে সকলেই যেরূপ আনন্দে উন্মত্ত হইত, বর্ত্তমান অবস্থায় সে রূপ আমোদ আহ্লাদের কণামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সুখ সন্তোষ হিন্দুদিগের প্রত্যেক গৃহে বিরাজমান থাকিত, আজ সে সুখ সন্তোষের লেশ মাত্র নাই; বরং অসুখ ও অশান্তি গৃহে গৃহে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। পূর্ব্বে আমরা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতাম, পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী ছিলাম এবং পরস্পরের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতাম। কিন্তু এক্ষণে আমাদের সে সমস্ত ভাব লোপ পাইতেছে।

সমাজবন্ধন এমনি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে অমারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছি। আমরা এক্ষণে আপনা লইয়া ব্যস্ত। শত শত বর্ষ ধরিয়া বিজাতি-পদ-বিদলিত হইয়া আমাদের সাহস উদ্যম সকলই গিয়াছে! ক্রীত দাসের পুত্র আজন্ম পিতৃ মাতৃ আচরিত দাসত্ব বৃত্তির অনুকরণ করিয়া থাকে, স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার স্পৃহা তাহার অল্পই হইয়া থাকে। আমাদের জীবনের উদ্যমই এক্ষণে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমরা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছি। বলিতে কি, এক্ষণে আমাদের জীবনে আদৌ মনুষ্যত্ব নাই। অতএব, আমরা যে দিন দিন অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছি,—ইহা বলা বাহুল্য।

গৃহস্থের একাদশী। *

কলির প্রাদুর্ভাবে 'একাদশী'-ব্রত সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে। যদি কেহ একাদশীতে উপবাস করি বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার নিশ্চিত সময় নাই—বয়স নিয়ম নাই, এই বিপরীত সমাজে দিগ্‌দর্শন করাইবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সাচ পরযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ"।
[তিথিতত্ত্ব।

সেই একাদশী যুগ্ম হেতু পরযুক্তা অর্থাৎ দ্বাদশী যুক্তাই গ্রহণযোগ্য। এই একাদশীতিথি সকল তিথি হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে সকল জাতিরই উপবাস করা কর্ত্তব্য। যথাঃ—

"নিত্যমেতদব্রতং নাম কর্ত্তব্যং সর্ব্ববর্ণিকৈঃ।
বাঞ্ছাদ্‌ভিঃ সর্ব্বদা সদ্‌ভিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ম্‌।
নভোক্তব্যং নভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥"
[একাদশীতত্ত্ব।

সর্ব্বদা সকল বর্ণের এই ব্রত করা কর্ত্তব্য। পুরুষার্থ চতুষ্টয় অর্থাৎ ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ-বাঞ্ছাশীল সাধু হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে কখনও ভোজন করিবে না—করিবে না।

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥"
[ভবিষ্যপুরাণ।

* এইটি মেদিনীপুর জেলার তাজপুর জাতি-নির্দ্ধারিণী সভার গ্রন্থসংগ্রাহক ও শ্যামগঞ্জ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক কবিরত্নোপাধিক শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দাস মহাশয় গৃহস্থদিগের একাদশী-সম্বন্ধে ভ্রমসংশোধন জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যাদি বলিয়া যে কোন পাপ, আছে, তাহারা সকলেই হরিরাসরে অন্নে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্নের লক্ষণ এই :—

"তণ্ডুলমাবহ্নি সংযোগাৎ ক্ষার যোগেন পিষ্টকং।
ফলন্ত্রিতয় সংযোগাদন্ন মেত্যভিধীয়তে ॥"

[স্মৃতিঃ।

তণ্ডুল অর্থাৎ চাউল, জল ও অগ্নি-সংযোগ দ্বারা পিষ্টক" লবণ সংযোগদ্বারা ফল ত্রিতয় অর্থাৎ জল, অগ্নি ও লবণ সংযোগদ্বারা অন্ন হয়। একাদশীতে এই অন্নই নিষেধ। অতএব, সদাকালই উপবাস করিবে। উপবাস-দিনের নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনেক আছে, তাহা বৃহদ্গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এস্থলে অল্পমাত্র দেখান যাইতেছে :—

"উপবাসঃ প্রণশ্যেত দিবাস্বাপাক্ষ মৈথুনৈঃ।
অত্যয়ে চাম্বুপানে চ নোপবাসঃ প্রণশ্যতি ॥"

[দেবল একাদশীতত্ত্ব।

দিবানিদ্রা ও দ্যূতক্রীড়া ও মৈথুন দ্বারা উপবাস নষ্ট হয়; কিন্তু, প্রাণনাশ-সম্ভাবনায় আহারে ও জলপানে উপবাস বিনাশ পায় না। মৈথুনদ্বারা বিশেষ ব্রত নষ্ট ও পাপ-সঞ্চার হয়। মৈথুন আট প্রকার :—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ ॥
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
অনুরাগাৎ কৃতঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকং ॥"

[দক্ষশ্রাদ্ধ তত্ত্ব।

স্ত্রীলোকের নাম বা আকৃতি, কি তদ্বিষয়ক কাণ্ড মনে করা, অন্যজনের নিকট বলা, পরিহাস, উত্তমরূপে দর্শন, গোপনে কথা বলা, কর্ম্মমানস, কর্ম্ম দৃঢ়ীকরণৌৎসুক্য এবং কর্ম্মনিষ্পত্তি, এই মৈথুনের আটটি অঙ্গ। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—"প্রীতি হেতু ইহার কোনও একটি করিলেও ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধক হয়। একাদশীর উপবাস গৃহস্থমাত্রেরই করা উচিত।

"গৃহস্থো ব্রহ্মচারীচ আহিতাগ্নিস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥"

[অগ্নিপুরাণ।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না।

"অষ্টাব্দা দধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতি বৎসরঃ।
ভুঙ্ক্তে যো মানবো মোহাৎ একাদশ্যাং সপাপকৃৎ।"

[স্মৃতি-একাদশী।

মনুষ্য আট বৎসর হইতে যে পর্য্যন্ত আশী বৎসর পূর্ণ না হয়, তাহার মধ্যে যে মনুষ্য মোহপ্রযুক্ত একাদশীতে ভোজন করে, সে সমস্ত পাপ করিয়া থাকে। যদি কেহ উপবাস করিতে সমর্থ না হয়, তবে কিঞ্চিৎ লঘু ভক্ষ্য আহার করিবে।

"উপবাস নিষেধেতু কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
নদুষ্যেত্তুপবাসেন উপবাস ফলং লভেৎ ॥"

[বায়ুপুরাণ।

উপবাসে অসমর্থ হইলে, কিঞ্চিদ্ভক্ষ্য কল্পনা করিবে। তাহাতে দোষযুক্ত হইবে না, অবশ্য উপবাসফল লাভ করিবে। উপবাসের অনুকল্প দ্রব্য এই :—

"মূলং ফলং পয়স্তোয় মুপভোগ্যং ভবেৎ শুভং।
নত্বেব ভোজনং কৈশ্চি দেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিং ॥"

[নারদীয় তিথিতত্ত্ব।

ফল, মূল, দুগ্ধ, জল,—ইহা শুভ উপভোগ্য হয়। কেহ একাদশীতে অনুকল্পাতিরিক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে বলেন নাই। একাদশী দিনে ফল মূলাদি যাহা আহার করিবে, তাহা তুলসীযুক্ত করিবে। যথা :—

"তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা,
স্নানং ন তদ্ যত্তুলসীং বিনা কৃতং।
ভুক্তং ন তদ্ যত্তুলসী বিবর্জ্জিতং।
পীতং ন তদ্ যত্তুলসী বিবর্জ্জিতং ॥"
[একাদশীতত্ত্ব।

তুলসী ব্যতীত পূজাও স্নান হয় না; তুলসী-বিহীন ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুকল্প দ্রব্য ভোজনের সময় রাত্রি। যথা :—

"নক্তং হবিষ্যান্ন মনোদনন্বা,
ফলং তিলাক্ষীর যথাম্বুচাজ্যং।
যৎপঞ্চগব্যং যদি বা হথবায়ুঃ,
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তয়ঞ্চ ॥"
[বায়ুপুরাণ।

রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন বা অন্ন ভিন্ন দ্রব্য (চিপিটকাদি) বা ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা উষ্ণ দুগ্ধের বায়ু ভক্ষণ করিবে। এই নয় প্রকার অনুকল্পের মধ্যে ক্রমানুসারে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। এই নক্তের সামান্যার্থ রাত্রি, কিন্তু ব্যক্তি ভেদে বিশেষ আছে :—

"নক্ষত্র দর্শনান্নক্তং গৃহস্থেন বিধীয়তে।
যতের্দ্দিনাষ্টমে ভাগে রাত্রৌতস্য নিষেধনং ॥"
[মৎস্যপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্য।

গৃহস্থগণ নক্ষত্র দর্শনের পর, নক্তকাল জানিবে। ঐ সময়ে অনুকল্প দ্রব্য ভোজন করিবে। আর যতি, ব্রহ্মচারী ও বিধবা ইহাদের দিবার অষ্টমভাগে নক্তকাল। সেই সময় ইহারা অনুকল্প ভোজন করিবে। রাত্রিতে যতির নিষেধ হইয়াছে। এইরূপে নক্তকাল দুই ভাগে বিভক্ত,—দিবা নক্ত ও নিশা নক্ত।

"দিবানক্তন্তৎপ্রোক্ত মন্তিমে ঘটিকাদ্বয়ে।
নিশানক্তন্ত বিজ্ঞেয়ং যামার্দ্ধে প্রথমে সদা ॥
[মার্কণ্ডেয়ঃ।

দিবার অন্তিম দুই ঘণ্টাকাল দিবানক্ত। আর রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধ নিশানক্ত জানিবে। এইরূপে নক্তভেদে গৃহস্থ ব্রহ্মচারিগণ অনুকল্পভোজন করিবে। অনুকল্পভোজন সর্ব্বকাল চলিবে; কিন্তু চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে তিনটিতে চলিবে না। তজ্জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং সমর্পয়েৎ ॥"
[তিথিতত্ত্ব।

আমার শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে, ফলমূল-জলাহারিগণ, আমার হৃদয়ে শেল সমর্পণ করে। একাদশীতে উপবাস করিলে, সূতকাদি অশৌচ বাধক হয় না।

"সূতকেমৃতকে বাপি অন্যস্মিন্ বাপ্যশৌচকে।
সর্ব্বথা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রেয়মাত্মনঃ।"
[ভবিষ্যোত্তর পদ্মপুরাণয়োঃ।

আত্মার শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জননাশৌচে মৃতাশৌচে বা অন্যস্মিন অশৌচে অর্থাৎ কালাশৌচ, ক্ষতাশৌচ, প্রায়শ্চিত্তার্হ কার্য্যে সর্ব্বথা একাদশীতে উপবাস করিবে। কখন ত্যাগ করিবে না। এই নিয়মানুসারে গৃহস্থ ও ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমিগণ উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে। পুত্রবান্ গৃহস্থের

পক্ষে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী-সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আছে ঃ—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
বনস্থ যতিধর্ম্মোঽয়ং শুক্লামেব সদা গৃহী॥"

[গোভিল-একাদশীতত্ত্ব।

উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না। বনস্থ যতির এই ধর্ম্ম। গৃহীর সর্ব্বদাই শুক্লাগ্রাহ্য। পূর্ব্বে গৃহস্থের উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস বিধান করিয়া, পরে শুক্লার বিধান দেখাইতেছেন। তাহার কারণ, পুত্রবান্ গৃহীর কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবার অধিকার নাই। যথা:—

"আদিত্যেঽহনি সংক্রান্ত্যামসিতেকাদশী দিনে।
ব্যতিপাতে কৃতে শ্রাদ্ধে পুত্রীনোপবসেদ্গৃহী॥"

[ব্রহ্মপুরাণ।

রবিবার সংক্রান্তিতে, কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে, ব্যতিপাত-যোগে বা শ্রাদ্ধ করিয়া উপবাস করিবে না।

"ইন্দুক্ষয়েঽর্ক সংক্রান্ত্যামেকাদশ্যাং সিতেতরে
উপবাসং ন কুর্ব্বীত পুত্র বন্ধু ধন ক্ষয়াৎ।"

[বায়ুপুরাণ।

অমাবস্যায়, রবিবার সংক্রান্তিতে, কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীতে পুত্রবান্ গৃহী পুত্র বন্ধু ধনক্ষয় হেতু উপবাস করিবে না।

"একাদশীষু কৃষ্ণাসু রবি সংক্রমণে তথা।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেচ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥"

[ব্রহ্মপুরাণ।

রবিবার সংক্রান্তি, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেও পুত্রবান্ গৃহী উপবাস করিবে না। এইরূপ পুত্রবান্ গৃহীর কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং আরও বলিয়াছেন ঃ—

"শুক্লামেব সদাগৃহী।"

[ইতি হেমাদ্রিধৃত।

পুত্রবান্ গৃহী শুক্লপক্ষেই উপবাস করিবে, কৃষ্ণপক্ষে উপবাস করিবে না। তাহাতে বিশেষ এই ঃ—

"শয়নী বোধনী মধ্যে যাকৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যাকৃষ্ণা কদাচন॥"

[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

শয়ন হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত যে কয়েকটি কৃষ্ণ একাদশী তাহাই পুত্রবান্ গৃহীর উপবাসের যোগ্য। অন্য কৃষ্ণাএকাদশী কদাচ উপবাসের যোগ্য নহে।

"উপবাসাসমর্থশ্চেদেকং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
তাবদ্ধনানি বাদদ্যাৎ যদ্‌ভুক্তং দ্বিগুণং ভবেৎ॥"

[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

যদি উপবাসে অসমর্থ হয়, তবে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে বা যাহা স্বয়ং আহার করিবে, তাহার দ্বিগুণ দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিবে। অতএব, পুত্র-বন্ধু-ধনাকাঙ্ক্ষী গৃহস্থ শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিবে। চাতুর্ম্মাস্য ভিন্ন কৃষ্ণ একাদশীতে উপবাস করিবে না, তাৎপর্য্য পূর্ব্বে হরিবাসরে অন্ন পাপ বলিয়াছেন, এখন সামান্য অন্নমাত্র দ্রব্য আহার না করিয়া, লুচি প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিবে, উপবাস বা অনুকল্পদ্বারা উপবাস স্বীকার করিবে না। কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ আছে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুড়্যা।

বাইবেল-সমালোচনা।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম।

যীশু-খ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে কেবল মথি ও লূকের লিখিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াই আলোচনা করিতে হয়; কারণ মথি মাক, লূক ও যোহন যে চারি জন যীশু-খ্রীষ্টের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে মার্ক ও যোহন যীশুর জন্মবৃত্তান্ত কিছুই লিখেন নাই। এক্ষণে দেখা যাঁক, মথি ও লূক যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত কিরূপে জানিলেন এবং তাঁহাদের লিখিত ইতিহাস কত দূর বিশ্বাসযোগ্য।

মথি ও লূক কি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে যীশু-খ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন বা যোষেফ ও মরিয়মের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া লিখিয়াছিলেন কিম্বা যীশু স্বয়ং তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত মথি ও লূকের কাণে কাণে বলিয়াছিলেন অথবা নানাপ্রকার জনশ্রুতি শুনিয়া, মথি ও লূক আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে কল্পনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। খ্রীষ্টভক্ত মাত্রেরই বিশ্বাস যে, মথি ও লূক ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যেই যীশু-খ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, ধর্ম্মপুস্তকে খ্রীষ্টের জন্ম-সম্বন্ধে ভাববাদীদের গ্রন্থে যেরূপ লিখিত ছিল ও যিহুদিদের মনে যেরূপ বিশ্বাস ছিল, অর্থাৎ খ্রীষ্ট নারীর বংশে জন্মিবেন, এবং যিহুদার, অব্রাহামের ও দায়ূদের বংশে জন্মিবেন, এই যে সকল ভাব-বাণী ভাববাদীদের গ্রন্থে যদ্রূপ লিখিত ছিল এবং যিহুদিরা যদ্রূপ বিশ্বাস করিত, তদ্রূপ কুমারি মরিয়মের পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে সেই খ্রীষ্ট বালীয়া প্রমাণ করিবার জন্য, মথি ও লূক যীশুখ্রীষ্টকে যিহুদার অব্রাহামের ও দায়ূদের কুলোদ্ভব প্রমাণ করিতে গিয়া যেরূপ আসলে ভুল করিয়াছেন ও আপন আপন মূর্খতার পরি-চয় দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, মথি ও লূক যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত লিখি-বার সময়ে ঈশ্বরের আত্মা হইতে এক বিন্দু বিসর্গ সাহায্য পান নাই। মথি ও লূক যীশুখ্রীষ্টকে যিহুদার, অব্রাহামের ও দায়ূদের বংশজাত প্রমাণ করিতে গিয়া যেরূপ নিজ নিজ মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য এই স্থানে প্রত্যেকের সুসমাচার-অনু-সারে অব্রাহাম হইতে যীশু পর্য্যন্ত বংশাবলি তুলনা করিয়া দেখাইতে বাধ্য হইলাম। পাঠক-গণ! বিরক্ত না হইয়া একটু ধৈর্য্যবলম্বনপূর্ব্বক মনোযোগের সহিত পর পৃষ্ঠায় পড়িয়া দেখুন।

অব্রাহাম হইতে যীশুখ্রীষ্ট পর্য্যন্ত বংশাবলি—

লুকের মতে— (লুক ৩; ২৩—৩৪)	মথির মতে— (মথি ১, ১—১৭)	লুকের মতে— (লুক ৩; ২৩—৩৪)	মথির মতে— (মথি ১; ১—১৭)
১ অব্রাহাম	১ অব্রাহাম	২৯ এর	২৯ শল্টীয়েল
২ ইস্‌হাক	২ ইস্‌হাক	৩০ ইল্‌মোদম্	৩০ সরুব্বাবিল
৩ যাকোব্	৩ যাকোব্	৩১ কোষম্	৩১ অবীহূদ
৪ যিহূদা	৪ যিহূদা	৩২ অদ্দী	৩২ ইলিয়াহকীম্
৫ পেরস্	৫ পেরস্	৩৩ মল্কি	৩৩ আসোর
৬ হিষ্রোণ্	৬ হিষ্রোণ্	৩৪ নেরি	৩৪ সাদক্
৭ আরাম্	৭ অরাম	৩৫ শল্টীয়েল্	৩৫ আখীম
৮ অম্মীনাদব্	৮ অম্মীনাদব্	৩৬ সরুব্বাবিল	৩৬ ইলীহূদ
৯ নহশোন্	৯ নহশোন্	৩৭ রিষা	৩৭ ইলিয়াসর
১০ সল্‌মোন্	১০ সল্‌মোন্	৩৮ যোহানা	৩৮ মত্তন
১১ বোয়স্	১১ বোয়স্	৩৯ যূদা	৩৯ যাকোব
১২ ওবেদ্	১২ ওবেদ্	৪০ যোষেফ	৪০ যোষেফ
১৩ যিষয়	১৩ যিষয়	৪১ শিমিয়ি	৪১ যীশু
১৪ দায়ূদ	১৪ দায়ূদ	৪২ মত্তথিয়	
১৫ নাথন্	১৫ শলোমন	৪৩ মাট্	
১৬ মত্তত্ত	১৬ রহবিয়ম	৪৪ নগি	
১৭ মৈনন	১৭ অবিয়	৪৫ ইষ্‌লি	
১৮ মিলেয়া	১৮ আসা	৪৬ নহূম্	
১৯ ইলিয়াকীম্	১৯ যিহোশাফট্	৪৭ আমোস্	
২০ যোনন্	২০ যোরাম	৪৮ মত্তথিয়	
২১ যোষেফ্	২১ উষিয়	৪৯ যোষেফ্	
২২ যূদা	২২ যোথম্	৫০ যান্ন	
২৩ শিমিয়োন্	২৩ আহস্	৫১ মল্কি	
২৪ লেবি	২৪ হিষ্কিয়	৫২ লেবি	
২৫ মত্তৎ	২৫ মনঃশি	৫৩ মত্তৎ	
২৬ যোরীম	২৬ আমোন্	৫৪ এলি	
২৭ ইলীয়েষর	২৭ যোশিয়	৫৫ যোষেফ্	
২৮ যোশি	২৮ যিহোয়াখীন	৫৬ যীশু	

মথি ও লূক দুই জনেই যদি এক ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে এই বংশাবলি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে, উভয়ের লেখার ঐক্য থাকিত; কিন্তু তাঁহাদের লেখার অনৈক কত দূর একবার দেখুন—মথি লিখিয়াছেন, অব্রাহাম হইতে ৪০ পুরুষ পরে যীশু জন্মিয়াছিলেন এবং যীশু একচত্তারিংশৎ পুরুষ ছিলেন; লূক লিখিয়াছেন, অব্রাহাম হইতে ৫৫ পুরুষ পরে যীশু জন্মিয়াছিলেন এবং তিনি ষড়পঞ্চশৎ পুরুষ ছিলেন। মথি দেখাইয়াছেন, দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশে যীশু জন্মিয়াছিলেন, এবং তিনি যোষেফের পুত্র; লূক দেখাইয়াছেন, দায়ূদের অন্য পুত্র নাথনের বংশে যীশু জন্মিয়াছিলেন, তত্রাপি তিনি সেই একই যোষেকের পুত্র। (শলোমন ও নাথন যে এক ব্যক্তির নাম নহে, তাহা বাইবেলেই প্রমান পাওয়া যায়; যথা—"যিরুশালেমে তাঁহার (দায়ূদের) যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম শম্মুয় ও শোবব্ ও নাথন্ ও শলোমন্ ও যিভর ও ইলীশূয় ও নেফগ্ ও যাফিয় ও ইলীশামা ও ইলিয়াদা ও ইলীফেলট।" ২য় শমূয়েল ৫; ১৪—১৬। নাথন ও শলোমনকে দুই বিভিন্ন সহোদর বলিয়া ১ বংশাবলির ৩; ৫ পদেও দেখান হইয়াছে) মথি দেখাইয়াছেন, যীশুর পিতামোহের নাম যাকোব * প্রপিতামোহের নাম মত্তন ও বৃদ্ধ প্রপিতামোহের নাম ইলিয়াসর। লূক দেখাইয়াছেন, যীশুর পিতামোহের নাম এলি, * প্রপিতামোহের নাম মত্তৎ ও বৃদ্ধপ্রপিতামোহের নাম লেবি। মথি ও লূক উভয়েই যীশুকে অব্রহোমের ও দায়ূদের বংশজাত প্রমাণ করিতে গিয়া, যীশুর মাতার স্বামী যোষেফকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালীতে অব্রাহামের ও দায়ূদের বংশজাত বলিয়া দেখাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যোষেকের সঙ্গে যে, যীশুর কোন রক্ত-সম্পর্ক ছিল না, মথি ও লূক তাহাও দেখাইতে ছাড়েন নাই। যথা—"পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রভুর দূতের আজ্ঞামত কর্ম্ম করত আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল; কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে আপন প্রথম জাত পুত্র প্রসব না করিল তাবৎ যোষেফ তাহার পরিচয় লইল না।" (অর্থাৎ তাহার স্ত্রীমরিয়মের সহিত সহবাস করিল

* বাইবেলের কোন টীকাকার বলেন, যোষেফের পিতার দুই নাম ছিল, তন্মধ্যে মথি একটি নাম লিখিয়াছিল ও লূক অন্যটি লিখিয়াছেন; সুতরাং যাকোব ও এলি একই ব্যক্তির নাম। কিন্তু মথির মতে যখন যাকোব দায়ূদের পুত্র শলোমনের সন্তান ও লূকের মতে এলি দায়ূদের অন্য পুত্র নাথনের সন্তান, তখন যাকোব ও এলি কখনই এক ব্যক্তির নাম হইতে পারে না। আর কোন টীকাকার বলেন, যিহুদিদের মধ্যে, স্বামীর মৃত্যুর পরে, দেবরকে বিবাহ করিবার প্রথা ছিল, এবং যাকোব ও এলি দুই সহোদর ভ্রাতা এবং সপতি ছিলেন; সুতরাং যোষেফকে কেহবা আকোবের পুত্র বলিত আর কেহবা এলির পুত্র বলিত। কিন্তু তাহাতেও উপরের আপত্তি হইতে পারে; তাহা ছাড়া যিহুদিদের মধ্যে যদিও দেবর-বিবাহেব প্রথা ছিল বটে, তত্রাপি স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের ঔরসে কোন সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান তাহার জনকের নামে বিখ্যাত হইত না; কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতের নামেই বিখ্যাত হইত, বাইবেলেই তাহার প্রমাণ আছে; অতএব, প্রমাণ হইতেছে যে, যাকোবের পুত্র যোষেফ ও এলির পুত্র যোষেফ এক ব্যক্তি নহে।

না) ; মথি ১; ২৪, ২৫। "তাহাতে দূত তাহাকে কহিলেন, ও গো মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ তুমি গর্ভিনী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা ও তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা। * * * * * *। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, ইহা কিসে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না" (অর্থাৎ আমি তো পুরুষ সহবাস করি নাই)। লূক ১;৩১—৩৫। অতএব, যীশু যে অব্রাহামের ও দায়ুদের বংশজাত তাহা মথি বা লূক কাহারই প্রমাণ সিদ্ধ হইল না ; অথচ কুমারী মরিয়ম, যিনি যীশুর গর্ভধারিণী ও যাহার সহিত যীশুর সাক্ষাৎ রক্তসম্পর্ক, সেই কুমারী মরিয়মকে যিহুদয়, অব্রাহামে বা দায়ুদের বংশজাতা বলিয়া প্রমাণ করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই, অথবা মরিয়মকে যোষেফের ভগিনী বা সমবংশীয়া বলিয়া শাস্ত্রে কোন স্থানে উল্লেখ নাই ; বরং যীশুর মাতা মরিয়ম যে যিহুদার অন্য ভ্রাতা লেবির বংশজাতা ছিলেন তাহা লূক ১, ৫, ৬, ৩৬, ৩৯, ৪০ ও ৫৬ পদ, এবং ১ বংশাবলি ৬:১—৩ ও ৪৯ পদ পড়িলে অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। শ্রীষ্টভক্ত শ্রীষ্টিয়ান্‌দিগকে এই বার হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, যীশুকে যিহুদা, অব্রাহাম ও দায়ুদের বংশজাত প্রমাণ করিবার জন্য মথি ও লূক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে লেখা নহে, না হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বয়ং ঈশ্বরও এই সকল ভ্রান্তির অধীন, তাহা না হইলে, এক ঈশ্বর একই ব্যক্তির বংশাবলি এবং একই ব্যক্তির জন্মবৃত্তান্ত মথি ও লূক দুইজনকে এত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবে লিখাইলেন কেন? অথবা বলিতে হইবে যে, মথি ও লূক যে সুসমাচার লিখিয়াছিলেন, কোন ধূর্ত্ত ও শঠ ব্যক্তি মথি ও লূকের সেই সুসমাচারের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া বাইবেলের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছে এবং মথি ও লূক যে সুসমাচার লিখিয়াছিলেন, তাহা কোনও সময়ে কোনও প্রকারে কোন ব্যক্তির দ্বারা লোপ পাইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্‌-তনয়।

এ সব না সহা যায়!

(১)

ধরাধামে ধনিগণ অত্যাচার-পরবশ,
সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে যদি হয় অপযশ ;
পণ্ডিত হইয়া নাহি শাস্ত্রালাপে দেয় মন,
নীচলোক সম হয় ব্রাহ্মণের আচরণ ;—
লক্ষপতি হ'য়ে, নাহি ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয় করে,
পরের অনিষ্টে রত স্বার্থ-সাধনের তরে!
শঠের চাতুর্য্যে প'ড়ে সাধুজন কষ্ট পায়,
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায়!

(২)

সহোদরে সহোদরে দ্বন্দ্ব,—প্রীতি নাহি মনে,
আর্ত্তের রোদন-স্বর ধনী নাহি শুনে কাণে;
সুমন্দ মলয়-বায়ু পন্নগেতে করে পান,
রসিকা রমণী-রত্ন অরসিকে সম্প্রদান ;—

অতি তিক্ত ভেষজের অনুপান হয় মধু,
সংসারেতে লজ্জাহীনা—দুশ্চারিণী কুলবধূ ;
বিশাল অবনি-মাঝে অপণ্ডিত যশ পায়,
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায় !

(৩)

রূপসী কামিনী-কণ্ঠে কঠোর কর্কশ স্বর,
তপনেরে গ্রাসে কেতু, রাহু গ্রাসে শশধর ;
নির্গন্ধ কিংশুক-পুষ্প—কণ্টক গোলাপ-ডালে,
সুপুরুষ মূর্খ হয়, বায়স পিকেরে পালে ;—
বালিকা-বিধবা-কন্যা—পুত্র বেশ্যাগৃহে রয়,
মুখরা প্রখরা নারী, গুরুজনে নাহি ভয় ;
ভ্রাতা 'এপ্রেন্টিস্' খাটে, শ্যালক চাকুরী পায়!
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায় !

(৪)

পরমন্দ-অভিলাষী অসতের অভ্যুদয়,
শত্রু মোকদ্দমা জিতে—মানী পরাধীন রয়;
অকালে বিনাশ পায় একমাত্র বংশধর,
নৃপতি-সভায় সুধী নাহি পায় সমাদর ;—
শ্বশুর শাশুড়ী সব !—পিতা মাতা গলগ্রহ,
সদা বাদ-বিসম্বাদ প্রতিবেশিগণ সহ ;
শ্বাপদ-বেষ্টিত বনে পিকবর গান গায়,
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায় !

(৫)

নির্গুণ ভগিনীপতি—মদ্যপ জামাতা ঘরে,
ভৃত্যজন অপচয়ী, সমান উত্তর করে ;
সন্ন্যাসীর ভেক ধ'রে পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত রয়,
বিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে বিশ্বাস-ঘাতক হয় ;—
অতিশয় নিঃস্ব হ'য়ে চলে, ধনাঢ্যের চালে,
ধ'রে বসে শত মুখ যেন ! পরনিন্দাকালে ;
আপন হকের ধন বার ভূতে লুটে খায়,
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায় !

(৬)

গুরুজন প্রতি সদা কর্কশ বচন কহে,
উন্নতি হইবে কিসে, তাহে আস্থাবান্ নহে ;
গুপ্ত কথা হইতেছে, সেখানে দাঁড়ায় গিয়া,
শেষেতে নিরাশ করে, কোন জনে আশা দিয়া ;
কথা কহিবার আগে আপনিই হাস্য করে,
জগ'জনে তুচ্ছ করে আপনার তেজ-ভরে ;
আপন যশের কথা আপনারি মুখে গায়,
হৃদয়ের শেল সম,—এ সব না সহা যায় !

শ্রীরাধাজীবন রায়।

জমীন্দারী-পঞ্চায়ত।

"জমীন্দারী-পঞ্চায়ত" নামে বঙ্গদেশে দেড়-বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান রাজা, জমীন্দার ও দেশহিতৈষী মহোদয়-গণের যত্নে এই সভা প্রতিপালিত ও রক্ষিত। আপাততঃ সমগ্র বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ লইয়া পঞ্চায়তের কার্য্য আরম্ভ হইবে, এবং আবশ্যক হইলে, অধিকার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।"

এই সভার উদ্দেশ্য পাঁচ প্রকার :—

(ক) বিবাদ-মীমাংসা।

(খ) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব-সংস্থাপন।

(গ) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি।

(ঘ) কৃষি-সম্পত্তির এবং ভূম্যধিকারী বর্গের অবস্থার উন্নতি।

(ঙ) ভূম্যধিকারী বর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা।

রাজধানী কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে সভার প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে। এই প্রধান পঞ্চায়ত-সভায় সাধারণ তত্বাবধানে, জমীন্দারী-পঞ্চায়তের কার্য্যক্ষেত্রের অন্তর্গত স্থান সকলে, যথাসম্ভব আদর্শ-সভা স্থাপিত হইবে।

আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে পঞ্চায়ত-প্রথা প্রচলিত আছে। অধুনা অনেকস্থলেই পঞ্চায়ত-প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং অত্যল্প স্থলেই পঞ্চায়ত-প্রথা অবিকৃতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই পঞ্চায়ত-প্রথা কি, অনেকেই জানিবার জন্ত উৎসুক হইতে পারেন; তাঁহাদের কৌতুহল নিবারণার্থে আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে উহার বিষয় বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃকই তত্তৎ গ্রামের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। রাজকর-নির্দ্ধারণ, তৎসংগ্রহ, শান্তিরক্ষা, বিবাদ-নিষ্পত্তি, পূর্ত্তকার্য্য, রথ্যানির্ম্মাণ প্রভৃতি দেশের যাবতীয় রাজকীয়, সামাজিক, পারিবারিক;——মিউনিসিপ্যালিটি-সম্পর্কীয় ব্যাপারমাত্রেরই এই গ্রাম্য-সমিতি কর্ত্তৃক সুনিষ্পাদিত হইত। ইহাতে দেশের রাজার অনেক পরিশ্রম, ব্যয় ও দায়িত্বের লাঘব হইত; অথচ, গ্রামকার্য্যে অতি সহজে নির্ব্বিবাদে সুমীমাংসিত হইত। কখনও কখনও দুই একটি গ্রাম্যবিষয় মীমাংসার জন্ত রাজা মহাশয়ের কর্ণগোচর হইত বটে, কিন্তু ঐ দুই একটি স্থল ব্যতীত তিনি গ্রামের বিষয়ে একরূপ নিশ্চিন্তই থাকিতেন।

ঐ গ্রাম্যসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহকারীরা সকলেই পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ যাহারা সকলেই একবংশ-সম্ভূত, অথবা একবংশীয় এইরূপ একজন অপরজনকে বিশ্বাস করিত। অধুনাও আমাদের দেশে দেখা গিয়া থাকে যে, প্রতিবাসী ভিন্নজাতীয় হইলেও এবং জাতিভেদ-প্রথা পল্লীগ্রামে প্রবলভাবে অবস্থান করিলেও, একজন অপর জনের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া থাকে এবং সেই সম্পর্কানুযায়ী কার্য্যও করিয়া থাকে। অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানাদি, অন্ন ভোজনাদি জাতিভ্রংশকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না,—একথা বলাই বাহুল্য।

এখন ইহা বলা অবশ্য বাহুল্য যে, প্রকৃতই হউক বা 'পাতান'ই হউক (কিন্তু পাতান কেহই বিবেচনা করিত না) এইরূপ পারিবারিক সম্বন্ধ হইতে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয় ও সদ্ভাব জন্মিয়া থাকে। আরও ইহা বলা বাহুল্য যে, যেখানে এইরূপ ভক্তি-স্নেহাদির উপর এইরূপ গ্রাম্যসমিতি বা পঞ্চায়ত-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে ইহার স্থায়িত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপী;—বলিতে কি আমাদের দেশে কত রাষ্ট্র বিপ্লব, কত ধর্ম্ম-বিপ্লব, কত দেশ-বিপ্লব, কত সমাজ-বিপ্লব হইয়া গেল, তথাপি, স্থানে স্থানে (পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক) এইরূপ গ্রাম্যসমিতি, সময়কে জয় করিয়া

অক্ষুণ্ণ ও পূর্ব্ববৎ ভাবেই রহিয়াছে। বস্তুতঃ, যে কোন বিষয় অনুরাগাদি ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। দেখ না কেন, যে ধর্ম্মের জন্য অনেকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই ধর্ম্মের শক্তি কি?—ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস, আচার্য্যগণের প্রতি ভক্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে আনুরক্তি, স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি স্নেহ ও মমতা,—ইহারাই ধর্ম্মের প্রধান শরীর-রক্ষক, প্রতিপালক ও পরিপোষক। আর যে দেশাচারের এত প্রবল-শক্তি অবলোকন করিতেছ, তাহারই বা কারণ কি? তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক পবিত্রতার—পাপশূন্যতার প্রগাঢ় স্মৃতি ও বিশ্বাস; তাঁহাদের প্রতি সেই স্মৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ; আর আমরা সেই সকল পূজ্যপাদ প্রাতঃস্মরণীয়গণের বংশধর বলিয়া আমাদিগের আত্মশ্লাঘা আত্মগৌরব ও আত্মমর্য্যাদা।

এক্ষণে দেখা যাউক, জমীদারী পঞ্চায়ত সভার সংগঠন-প্রণালী কিরূপ। ইহা অবশ্যই পারিবারিক সম্বন্ধে সংগঠিত নহে, ইহা, নির্ব্বাচন-নির্ব্বাচিত ভূম্যধিকারীর ন্যূনকল্পে বার্ষিক পঞ্চদশ টাকা চাঁদা দানের উপর সংস্থাপিত। অতএব ইহার সংগঠন, প্রাচীন গ্রাম্য-সমিতির বা পঞ্চায়তের সংগঠন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সভ্যগণের সভার সহিত সম্পর্ক, লাভালাভের খাতা ধরিয়া; যদি সভায় যোগ দিলে লাভ হইবে, এইরূপ কেহ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিবেন। আবার কেহ অলাভ হইতেছে দেখিয়া কিছু দিন সভ্য থাকিয়া সভার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবেন। ইহাতে সভ্যগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য-সমিতির অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেরূপ সদ্ভাব দেখা গিয়াছে, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, ইঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন লাভ লোকসান লইয়া ব্যস্ত এবং স্বার্থ-সাধনে যত্নশীল। ইহা ত হইবেই, কেননা জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভা কেবল বিষয়ী লোকদিগের বিষয়াদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে। আর ইহা কে না জানে যে, বিষয় সম্বন্ধ ব্যাপারমাত্রই স্বার্থভাবে পরিপূর্ণ? আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, এইরূপ সভা দ্বারা জমীদার-মহলে বিদ্বেষ ভাব বাড়িয়া উঠিবে এবং কাহারও সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্মিবে না, তবে, এইরূপ সভার স্থায়িত্বের দীর্ঘকাল ব্যাপিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ করি। হইতে পারে যে, এই সভা দ্বারা উত্তমরূপে প্রত্যেক জমীদারেরই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে। (যদিও অনেক স্থলে অনেকের স্বার্থরক্ষা পরোক্ষভাবে হইয়াও তাঁহাদের মনোমত হইবে না এবং অন্যান্য স্থলে তাঁহাদের ইচ্ছার বিপরীত হইয়া তাঁহাদের মনোমালিন্যের কারণ হইতে পারে; কেননা দশজনের বিবেচনায় যাহা আমার বিষয়ে ভাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা কি যথার্থ আমার অভিমত স্বার্থ? তাহা ত আমার স্বার্থ নহে।) যদি এরূপ হয়, তবে সভা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকানেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের উপরও অনেকটা আশা করা

যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ,—সালিশী-বিভাগ, বড়ই সুপ্রণালীতে সংগঠিত হইয়াছে কিন্তু তথাপি আশঙ্কা হয়, এই সভায় সভ্যগণের প্রত্যেকের—সম্পূর্ণ না হউক—প্রধানতঃ নিজ স্বার্থের উপর দৃষ্টি থাকিবে বলিয়া। সে যাহা হউক, ইহার স্থায়িত্ব বিচারের স্থল না হইয়া পরীক্ষা স্থানীয় হইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অনেকানেক সভা ত অনেককাল স্থায়ী হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহার উত্তর এই,—সেই সকল সভা কিরূপ সংগঠিত তাহা দেখিতে হইবে এবং আরও সেই সকল সভা যখন প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন যেরূপ যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল, কিছুকাল পরেও কি তাহারা সেইরূপ পরিচালিত হইতেছে—সেই সকল সভা কি মৃতপ্রায়, নির্জীব হইয়া পড়ে নাই? এস্থলে Joint Stock বা সম্ভূয়-সমুত্থানের কথা উত্থাপন করিও না, কেননা উহার লাভ লোকসানের হিসাব এক বিষয়ে নিরূপিত হয় ও সেই নিয়ম সাধারণের সহজে বোধগম্য হয়। যে বেশী দিয়াছে, সে বেশী পায়, যে কম দিয়াছে সেও অনুপাতানুসারে (Ratio) কম পায়; আর এইরূপ গণনা-প্রণালী গাণিতিক উপায়ে সম্পন্ন হয় বলিয়া কাহারও কোন দ্বৈধ জন্মে না। অপর পক্ষে, পরস্পরের নানাবিষয়িণী (দেওয়ানী সম্বন্ধীয়) স্বার্থ নিরূপণ করা নানাবিধ প্রণালীতে হইবে এবং এইরূপ সভা কর্তৃক উভয়েরই যাহা ভাল বিবেচিত হইবে, তাহাই নিষ্পত্তি হইবে; কিন্তু তাহা উভয়ের বা কাহারও ভাল না লাগিতে পারে।

এক্ষণে এই সভার উদ্দেশ্য-বিষয় কিছু বলা যাউক।

(ক) বিবাদ-মীমাংসা

কিরূপে বিবাদ মীমাংসিত হইবে, এবং বিবাদ মীমাংসিত হইবে কিরূপ তাহা জমিদারী পঞ্চায়ত পত্রিকায় সালিসি বিভাগের সংগঠন ও সালিসি-কার্য্য-বিধিতে সুচারুরূপে ও অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

বিবাদ-মীমাংসায় আমাদের যে কত টাকার আদালতে শ্রাদ্ধ হয় ও কত সময়ের অপচয় হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ অবস্থায় পঞ্চায়ত-সভায় যেরূপ বিবাদ মীমাংসার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের বড়ই শ্রেয়ঃ হইবে। অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে সুবিচারের সম্যক্ সম্ভাবনা।

কিন্তু এরূপ হইলেও ঈদৃশ সুবিচার, পক্ষগণকে কিরূপে বাধ্য করিবে? আরও অনেকে (বিশেষতঃ দেওয়ানী-আদালতে) আপনার 'গোঁ' ছাড়িতে চাহে না, অনেকে সভার বিচার-শক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিবে কি না—সন্দেহ।

সভার বিচার-বিষয়ে যাহাদের আদৌ আস্থা নাই, তাহারা অবশ্য আদালতে বিচারপ্রার্থী হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু, যাহারা আপনাদের গোঁ ছাড়িবে না, তাহারা ঐ সভার বিচারের সময় মধ্যস্থ-নির্ব্বাচন-পরিশ্রম জন্য এবং ৫৲ হইতে ১০০৲ মধ্যে গচ্ছিত 'ফী'র জন্য ভুগিয়া আদালতে বিচারপ্রার্থী হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু পক্ষগণ সম্মত হইলেও তাহাদের বাধ্য করা যাইবে কিরূপে? রাজ-শক্তি, না সমাজ-শক্তি, না নৈতিক-শক্তি

না ধর্ম্ম-শক্তি, কোন্ শক্তিদ্বারা পক্ষগণ বাধ্য হইবে? যদি বল 'ফী' গচ্ছিত হইলেই বাধ্য করা হইল, কিন্তু (যদিও কেহ কেহ অনন্যগতি হইয়া তাহাতে বাধ্য হয়) তাহা হইলে, উক্ত সভার উপর অনেকের ঘৃণা হইবে; কেননা তাহারা মনে করিবে যে, তাহাদের অগ্রে টাকা লইয়া বাধ্য করা হইল এবং তাহারা ঐরূপ কথা রটাইয়া দিবে; যদি ও ঈদৃশ রটনায় অনেকে প্রতিবাদ করিবে বটে, কিন্তু প্রতিবাদকারী-দিগের মধ্যেও, অনেকেই প্রয়োজন হইলে, সভার নিকটে বিচার-প্রার্থনা-বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইবে। কেননা, তাহারা প্রতিবাদ করিয়াছিল এই বলিয়া যে, যখন তোমরা সম্মত হইয়াছ, তখন কেন তদনুরূপ কার্য্য করিবে না? কিন্তু তাহারা ইহা বলিয়া ত প্রতিবাদ করে নাই যে, ঐ সভার বিচার বড়ই ন্যায্য ও সুসঙ্গত হইয়াছে। যদি ঐরূপ ঘৃণা জন্মে, তাহা হইলে, সভার প্রথম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। যাহা হউক, সভা যত দূর কৃতকার্য্য হয়, তাহাও অবশ্য পরীক্ষাস্থানীয়। বিশেষ, গবর্ণমেণ্টের যখন দেওয়ানি মোকদ্দমায় অনেক লাভ হয়, তখন এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ-নিষ্পত্তি-বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

(খ) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব-সংস্থাপন।

উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও কার্য্যে পরিণত হইলে, অতি সুফল-প্রসূ হইবে; কিন্তু সভা ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাও ফল না দেখিয়া নিরূপণ করিতে পারা যাইবে না; কেননা সদ্ভাব মৌখিক না করিয়া কার্য্যতঃ করিতে গেলে, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ এরূপভাবে জড়িত করিতে হইবে যে, একের স্বার্থ-সিদ্ধি অপরের বিরুদ্ধ না হইয়া সম্পন্ন হইতে পারিবে।

জমীদার, পত্তনিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা পরস্পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে, আইনের বলে প্রতি-নিবৃত্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে জমীদার, পত্তনি-দার প্রভৃতিরা একজন হীনবল বা বিপদগ্রস্ত হইলে, অপরে তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করে। এরূপ অবস্থায়, পঞ্চায়ত-সভা মধ্যস্থ হইয়া সদ্ভাব-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিলে, বাস্তবিকই অনেক মঙ্গল হয়। কিন্তু, যাহারা এইরূপ সুযোগ পাইয়া সর্ব্বনাশ-সাধনে সমুদ্যত হয়, তাহারা বাস্তবিকই অতি-শয় নিষ্ঠুর, ক—পট, দুর্দ্দান্ত ও দস্যুস্বভাব। তাহারা সম্ভবতঃ, মধ্যস্থতা মানিবে না, তবে কোনও কোনও স্থলে ঐরূপ পশুপ্রকৃতিক-লোকেরা আপনাদের দুরভিসন্ধি গোপন নাই,—প্রচারিত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া অভীষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইতেও পারে;—কিন্তু তাহাও সদ্ভাব-সংস্থাপনের ফলরূপে ঘটিল না—তাহা ভয়ে—আশঙ্কায় ঘটিল।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপনের প্রচারও অতি বিরল হইবার সম্ভাবনা—কেননা অসদ্ভাব, কলহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা প্রায়ই অসৎ লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। অসৎকে সদুপদেশ দানে সৎ করা, বড়ই কঠিন ব্যাপার এবং অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও ঐরূপ সংঘটন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে পরস্পরের পরস্পরের প্রতি অসদ্ব্যবহার অর্থমূলক।

অর্থমূলক ব্যাপার মাত্রই ক্রুদ্ধকথার উপদেশে মীমাংসিত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না—'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না'—তবে যদি এমন বল যে, যে স্থলে ভূম্যধিকারীতে ও প্রজাতে অসদ্ভাব নাই, সেই স্থানে আমরা সদ্ভাব সংস্থাপন করিব এবং ঐরূপ সদ্ভাব-সংস্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ ভূম্যধিকারী ও ঐরূপ প্রজার মধ্যে সদ্ভাব হইলে, ইহারা একীভূত হইয়া অসদ্ব্যবহার-দমনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবে, কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, অর্থ-সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারে 'আঁতে ঘা' না পড়িলে, কেহ কেবল সদ্ভাবের খাতিরে অর্থব্যয় করিয়া সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হয় না, নিরপেক্ষ থাকিতেই ভাল বাসে।

(গ) জমীন্দারী কার্য্য-প্রণালীর উন্নতি।

জমিদারী কার্য্য-প্রণালীতে অনেক বিশৃঙ্খল দেখা গিয়া থাকে। অনেক সময়ে, অধিক লোকের দ্বারা অনিয়মিত রূপে এবং অধিক অর্থব্যয়ে জমীন্দারী-কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। নানা গোল-যোগ, বিবাদ, বিসম্বাদ,—দাঙ্গা, হাঙ্গামা হিসাবাদি জমীর মীমাংসাদি বিষয়ে গোলযোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। উপযুক্ত ন্যায়বান্, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, মনস্বী, ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীর অসদ্ভাব প্রায় সর্ব্বত্রই।

ভাল ভাল কর্ম্মচারীর নিয়োগ ও কার্য্য-প্রণালীর সুশৃঙ্খলার জন্য তাবৎ বন্দোবস্ত নানা স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জমীন্দারী-কার্য্য দর্শন করিয়া; তন্ন তন্ন বুঝিয়া অনেক অধ্য-বসায়, পরিশ্রম ও বুদ্ধির ফলে, জমীদার-সভা অবগত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সুপরামর্শ ও সদুপদেশ গ্রাহ্য হইবার পক্ষে বড়ই সঙ্কট, ভয়াবহ অন্তরায় সকল আছে—প্রায় সকল স্থলেই জমীদারী কর্ম্মচারিগণ প্রভুর চক্ষে ধূলি দিয়া এরূপ ভাবে কার্য্য করেন যে, তাঁহাদের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে জমীদারের মনে কোনও রূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অনেক জমীদার জমীদারী-কার্য্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা বিলাসী,—কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে, নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের দক্ষতা-বিষয়ে সন্দেহ হওয়া ও না হওয়া, উভয়ই অমূলক—সুবুদ্ধি দিবার লোক হইল বটে, কিন্তু, সুবুদ্ধি-গ্রহণের লোক ত পাওয়া চাই। আর দুই চারিটি জমীদারের চৈতন্যোদয় হইলে ত অত বড় সভার করণীয় কার্য্য করা হইল না; অতএব দুই চারিটির কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।

এরূপ বলা যাইতে পারে যে, দুইচারিটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া ক্রমে অনেক হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু তাহা বহু সময়সাপেক্ষ ও বহু অধ্য-বসায়ের ফল। আমাদের দেশে ইংরাজী-বিদ্যার প্রচলন, মেডিকেল্‌কলেজ সংস্থাপন করিয়া উদ্দেশ্য-বিষয়ে কৃতকার্য্যতা বড় অল্প সময়ে হয় নাই; অথচ, এই দুই বিষয়েই রাজ-শক্তি আগাগোড়া প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল।

(ঘ) কৃষি-সম্পত্তি এবং ভূম্যধিকারী-বর্গের অবস্থার উন্নতি।

কৃষি-সম্পত্তির উন্নতি-বিষয়ে নিম্নলিখিত উপায় কয়েকটি মোটামুটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। উন্নত উপায়ে (বিলাতী) কৃষি-কার্য্যের প্রচলন।

২। লাভজনক শিল্পকার্য্যে বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের কৃষিকার্য্য।

৩। পতিত জমীর আবাদ।

৪। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য খাল জলাশয়াদি খনন।

৫। অর্থ কর্জ্জরূপে বা সত্ব-পরিত্যাগপূর্ব্বক দান।

৬। অনাবৃষ্টি,অতিবৃষ্টি,—পঙ্গপাল ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতি হইতে নিবারণ।

প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা জমীর অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা জানা প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। জমীর উৎপাদিকা-শক্তির তাহাতে কি পরিমাণে হ্রাস হয়, তাহা বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়োক্ত উপায় দ্বারা দিন দিন খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইবে; আপাততঃ দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অকস্মাৎ খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘ্যতা দেশের লোকের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর ও অসহনীয় হইবে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। দ্বিতীয়োক্ত উপায় প্রবর্ত্তন করিতে গেলে, ইহা জানা আপাততঃ আবশ্যক হইবে যে, কত পরিমাণ জমীতে আহার্য্য পদার্থের চাষ করিলে, দেশে অন্নকষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা জানা অতীব কঠিন ব্যাপার হইবে।

তৃতীয়োক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইলে, অনেক বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিতে হইবে; তাহাতে গবাদি পশুর অনেক আহার নষ্ট করা হইবে। আরণ্য গো ঘোটকাদি জন্তুদিগের তিরোভাব হইলে,তল্লাভ বড় সুবিধাজনক হইবে না; আরও অরণ্যের দ্বারা প্রকৃতির অনেক হিতসাধনও হইয়া থাকে;—অতএব, তৃতীয়োক্ত উপায় অবলম্বনে, এই সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

চতুর্থোক্ত উপায় অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু, ইহাতেও দেখা কর্ত্তব্য যে, খাল খনন করিয়া যেন অতিরিক্ত জল নিকাশিত করিয়া মূল নদীর মোহানা বন্ধ করা না হয়; ওরূপ করিলে অনেক নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। খাল খনন করিয়া নদী বন্ধ করিলে, অপেক্ষাকৃত অধিকতর মঙ্গল সাধন হইবে,এই বিষয় স্থির করা সহজ নহে, মানববুদ্ধির পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

পঞ্চমোক্ত উপায় পঞ্চায়ত-সভায় আর্থিক অবস্থার ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ষষ্ঠোক্ত উপায়ও পঞ্চায়ত-সভার ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ভূম্যধিকারী বর্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতি।

১। কৃষিসম্পত্তির উন্নতি করিয়া খাজনা বৃদ্ধি।

২। খাজনা আদায় না হইলে, আদায়কার্য্যে সহায়তা।

৩। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট দিনে দেয় রাজস্ব দাখিল-করা-বিষয়ে সাহায্য।

৪। বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি।

মোটামুটি এই কয়েকটি উপায় দ্বারা আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে; প্রথম ও চতুর্থোক্ত উপায়দ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়োক্ত উপায় অবলম্বনে অল্পবিস্তর গবর্ণমেণ্টের সহিত সঙ্ঘর্ষ ঘটিবে; আরও অনেকস্থলে অর্থ ব্যয় করিতে ও হইবে।

ভূম্যধিকারী বর্গের নৈতিক অবস্থার উন্নতি।

এই বিষয় বড়ই বিবেচ্য; কেননা নৈতিক উন্নতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; নৈতিক উন্নতির শিক্ষা দানার্থে শিক্ষক পছন্দ করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার হইবে আর নৈতিক শিক্ষা কিরূপে বিতরিত হইলে, শিক্ষার্থীদিগের গ্রাহ্য হইয়া করণীয় ও আচরণীয় হইবে, তাহাও বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। আমাদের নৈতিক উন্নতি ধর্ম্মোন্নতিরই চিরঅনুচর,—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি—

ইহা লাভ করিতে হইলে, পঞ্চায়ত-সভার যে সকল উদ্দেশ্য আছে, তাহা সাধন করিতে হইবে;—পঞ্চায়ত-সভা যদি আপন উদ্দেশ্য সাধনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে, ইহা লাভ হইবে। পঞ্চায়ত-সভার মূল উদ্দেশ্যই জমীদারমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করা; অতএব, পঞ্চায়ত-সভা উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে অর্থাৎ প্রতিনিধি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিলে, বাস্তবিকই ভূসত্বাধিকারীদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা হইল—তাঁহাদের রাজনৈতিক অবস্থায় উন্নতি করা হইল। কিন্তু, এরূপ শক্তি লাভ গবর্ণমেণ্টের ভাল লাগিবে না।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি।

বিদ্যাশিক্ষা অধিক বয়স্ক ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে হওয়া একরূপ অসম্ভব। পঞ্চায়তসভার উদ্দেশ্য বোধ হয় কেবলই পার্থিব উন্নতি লইয়া, পারলৌকিক উন্নতি লইয়া নহে—এই জন্যই ধর্ম্ম-বিষয়ে উন্নতির কথার আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

(ঙ) ভূম্যধিকারীবর্গের সন্ততিগণের অবস্থাপোযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ভূসত্বাধিকারী সন্ততিদিগের শিক্ষাবিষয়ে Court of Wards Act. & Minor's Act আছে, অতএব তাহাদের অবস্থোপযোগী শিক্ষাদান করিতে হইলে, উক্ত দুইটি আইন মান্য করিয়া চলিতে হইবে; তাহা হইলে, আইনের হাত এড়াইয়া কার্য্য করিতে গেলে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে; বোধ হয় অধিকসংখ্যক শিক্ষণীয় ভূসত্বাধিকারী সন্ততি জুটিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কি বিদ্যা, কতদূর কি বিষয় শিক্ষাদান কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, যেন ধর্ম্ম-বিষয়ে সম্পূর্ণ মতি রাখিয়া ভূমিসংক্রান্ত-বিষয়ে শিক্ষাদান হয়।

আমরা সমালোচনার জন্য জমীন্দার পঞ্চায়ত-সভার মুখপাত্র স্বরূপ-নব-প্রকাশিত 'জমিন্দারী-পঞ্চায়ত' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ও শ্রাবণ] প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার স্থানাভাব, আগামী বারে ইহার বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শোক-সংবাদ।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বঙ্গের বড়ই দুর্দ্দিন। বঙ্গের আকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১১ই শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ১০টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী, তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক এই হতভাগ্য বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে আর জন্মে নাই। সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, হিন্দী ও উর্দ্দু—সকল ভাষাতেই তিনি নিজ অধ্যবসায়-গুণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই বিশাল বঙ্গদেশে এমন কেহ একজনও আর দেখিতে পাইতেছি না, যিনি তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারেন। তিনি নিজগুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "শুঁড়ো" নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে তাঁহার হাতে খড়ি হয়। অতি শৈশব-কাল হইতেই তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮।৯ বৎসর, তিনি পাথুরিয়া ঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজী-স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তিনি তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গোবিন্দচন্দ্র বসাক-প্রতিষ্ঠিত "অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ একাডিমী" নামক যে ইংরেজী-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতেই ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিদ্যালয়ে তাঁহাকে অধিক দিন পাঠ করিতে হয় নাই; তাহার কারণ, তাঁহার কোনও আত্মীয় এই সময়ে খ্রীষ্টিয়ান্ হয়েন। দেশময় তখন রাষ্ট্র যে,—"ইংরেজী পড়িলে খ্রীষ্টিয়ান্ হয়।" এই সংবাদ-শ্রবণে তাঁহার পিতা জন্মেজয় অত্যন্ত ভীত হইলেন। পাছে তিনিও ঐরূপ খ্রীষ্টিয়ান্ হন ভাবিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে এ বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তা' বলিয়াই তিনি পুত্রের পাঠ বন্ধ করিয়া দেন নাই; কেমারণ নামক একজন ইংরেজকে তাঁহার প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারই নিকট তিনি ইংরেজী-ভাষা বিশদরূপে শিক্ষা করেন।

১৪ বৎসর বয়েসের সময় তিনি কয়েক মাস জ্বর ও প্লীহা-রোগে ভুগিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি মেডিকেল্ কলেজে ভর্ত্তি হন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে বিলাতে পাঠাইয়া উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী করিতে অভিলাষ করেন; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেজয় ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে যে, কেবল বিদ্যালয় ছাড়াইলেন তাহা নহে, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এইখানেই তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্র-অধ্যয়ন শেষ হইল।

ইহার পরেই, তাঁহার আইন-অধ্যয়নের ইচ্ছা বলবতী হইল। পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া মনোযোগের সহিত আইন-পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু শুনা যায়, সেবার নাকি প্রশ্ন-পত্র চুরি হইয়াছিল বলিয়া কাহারও পরীক্ষা গ্রাহ্য হইল না। আবার পরীক্ষা দিবার কথা হইল, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল আর পরীক্ষা দিলেন না। এইখানেই তাঁহার আইন-পড়া শেষ হইল। ইহার পর পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে তিনি—লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি ও উর্দ্দু-ভাষা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি এসিয়া-

টিক সোসাইটির এসিট্যাণ্ট-সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান্ হন এবং সেখান হইতে যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, তাহাতে তিনি বিবিধ পুরাতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৫ বৎসর পরে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক পত্র বাহির করেন। ঐ পত্র ৮।৯ বৎসর কাল চলিয়াছিল। তাহার পর "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক আর একখানি পত্রও বাহির করেন; ইহাও ৫ বৎসর কাল চলিয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক তিনি নাবালক জমীদার-সন্তানদিগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার ১০ বৎসর পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে L. L. D. উপাধিলাভ করেন এবং পর বৎসরেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি "রায়-বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রাজা" ও C. I. E. উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগৎ-মাঝে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। "বুদ্ধ-গয়া," "ললিত-বিস্তর" ও "পাতঞ্জলী যোগ-শাস্ত্র"—তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ক্রমে তাঁহার যশঃ-সৌরভ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে ব্যাপিয়া পড়িল। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আষ্ট্রিয়া, ইটালী, আমেরিকা, জার্ম্মানী, হঙ্গেরী,—ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের সভার সভ্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন, তিনি ব্রিটিস-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের একজন প্রধান পরিচালক ছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে শমন-সদৃশ জ্ঞান করিত। কেননা যখন তিনি তীব্র ভাষায় তাহাদিগের অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতেন, তখন তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিবার সম্যক্ সম্ভাবনা হইত! দুষ্টেরা তাঁহার শাসনে সৎ হইয়া গিয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে তিনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত-মণ্ডলী আজ তাঁহার জন্য অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন। তাঁহার অমায়িকতা, সত্যপ্রিয়তা,—মিষ্টভাষিতা স্মরণ করিয়া জগতের সকলেই আজ হাহাকার করিতেছে।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শোকের উপর শোক। মঙ্গলবার ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি সার্দ্ধ ২ ঘটিকার সময় নির্ম্মল নীলগগণে সহসা বজ্রাঘাত হইল; সুমেরুশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল; আকাশ হইতে পূর্ণচন্দ্র খসিল;—বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন। ১৪ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতঃকালে, কলিকাতার নিমতলার ঘাটে যে পবিত্র দেহ পুড়িয়াছে, কত কাল হইল ভারতের কোনও শ্মশানে পুড়ে নাই। স্রবন্তী ভাগীরথী সেদিন যে ভস্মরাশি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন, আজ কতকাল হইল, পুণ্য-সলিলার পবিত্র স্রোতে সেরূপ ভস্ম মিশায় নাই। পাষাণ-হৃদয় কাল চিরদুঃখিনী ভারত-মাতার ক্রোড় হইতে যে রত্ন অপহরণ করিয়াছে, কত কাল হইল সেরূপ রত্ন কাল-কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই। আজ সূর্য্যদেব চিরতরে ভারত-গগণ হইতে অস্তমিত হইলেন; আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে হাহাকার—আবাল বৃদ্ধ বনিতা (কে তাঁহাকে জানিত না?), সকলেই আজ তাঁহার শোকে ম্রিয়মান। দীন-দরিদ্রগণ আজ সত্য সত্যই পিতৃ-মাতৃ-হীন হইল; তাহাদের করুণ রোদন-স্বরে ভারত-গগণ ছাইল। বলিতে কি,—বঙ্গের আজ যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, আমাদের

বিশ্বাস,—এ দুর্দ্দিন যুগ-যুগান্তরেও ঘুচিবে না।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১২ই আশ্বিন মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ-গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতায় ১০৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং, পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার তাঁহার কোনও উপায় ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন পঞ্চম বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রাম্য-পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। গ্রাম্য-পাঠশালা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায়। দেশে থাকিলে লেখাপড়া উত্তমরূপ হইবে না ভাবিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং একটী পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন; তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র। কিন্তু স্বল্প দিনেই পীড়িত হইয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আইসেন এবং এবারে সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি হন।

এই সময়ে তাঁহাকে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। তিনি একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং একখানি সামান্য উত্তরীয় গায়ে দিয়া শুধু পায়ে কলেজে যাইতেন। এত দুঃখ পাইয়াও ঈশ্বরচন্দ্র কাহারও নিকটে একদিনের জন্যও একটী পয়সার সাহায্য চান নাই! ১৬।১৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। আন্তরিক পাঠানুরাগ-বশতঃ এবং অবিচলিত অধ্যবসায়ে, ঈশ্বরচন্দ্র বিংশতি বৎসর বয়সেই সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইহা দেখিয়াই সংস্কৃত-কলেজের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রদান করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হন। সিবিলিয়ানগণ এই কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের পাঠার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে "বসুদেব-চরিত" নামক একখানি বাঙ্গালা-পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার পরেই হিন্দি 'বেতাল পচিসী' হইতে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামক পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে সংস্কৃত-কলেজের এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর কর্ম্ম খালি হওয়ায়, তিনি উক্তপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার বনি-বনাও না হওয়ায়, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আসেন এবং ৮০৲ টাকা বেতনে হেড ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস"—"জীবন-চরিত" ও "বোধোদয়" প্রকাশিত হয় এবং তৎপর বৎসর ৯০৲ টাকা বেতনে তিনি একজন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। "উপক্রমণিকা ব্যাকরণ" ও "কৌমুদী ব্যাকরণ" (তিন ভাগ) এই সময়েই প্রকাশিত হয়।

১৮৫৪ খৃঃ তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকাদিপ্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলন-জন্য যত্নবান্ হন। ইহাতেই তিনি সাধারণের অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতবাসীগণ তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন—ইহাতে একদিনের জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তাঁহার প্রার্থনায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক উক্ত আইন পাস হয়—"এই একটী কাযেই, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়, তাঁহাকে কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিয়াছিল।"

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পঞ্চশত টাকা বেতনে স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রদান করেন। কিন্তু ইহাও তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একদা তিনি স্কুল-পরিদর্শনের "রিপোর্ট" শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা ইয়ং সাহেবের

নিকট প্রেরণ করেন। ইয়ং তাঁহাকে তাঁহার কোনও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলেন—বিদ্যাসাগর তাহা করেন নাই। ইয়ং সাহেব বলিলেন,—"তোমাকে করিতেই হইবে।" তিনি আর কোনও কথা না বলিয়া বাম হস্তে একটু কাগজ লইয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া ইয়ংএর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"কেমন খুসী হইয়াছেন?"

ধন্য তাঁর তেজস্বীতা! এক কথায় পঞ্চশত টাকার চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার সন্তোষের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন একথা অতিরঞ্জিত নহে। স্থানভাবে একটিমাত্র ঘটনা বলিতেছি—ইটি তাহার অসাধারণ মাতৃভক্তির পরিচায়ক।

যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম করেন, তাঁহার তৃতীয় সহোদরের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। এ সম্বন্ধে তাহার জননী তাহাকে পত্র লিখিলে, তিনি যাইবার জন্য ব্যাকুল হন এবং কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে এই বিষয় জানান। মার্শাল সাহেব তাহার নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে পড়ার ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে ছুটী দিতে রাজি হইলেন না। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"সামান্য চাকুরীর জন্য আমি মা'র অশ্রুজল সহ্য করিতে পারিব না।" তাঁহার এই তেজস্বীতা সম্বন্ধে আমরা পাঠকগণকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—যে চাকুরী তিনি পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই তখন তাহার পরিবারবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। মার্শাল সাহেব তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া, যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়া ছুটী দিয়াছিলেন।

বীরসিংহ-গ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বর্ষাকাল—আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে মাতৃপদ-দর্শন-লালসায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্ব প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া, সন্তরণে আষাঢ়ের একটানা দামোদর পার হইয়া পরদিন রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় তিনি বাটী পৌঁছিলেন। দেখিলেন, তাহার জননী তাঁহার না আসার দরুণ মনের দুঃখে বিবাহ-আনন্দোৎসবে যোগদান না করিয়া, নিরাহারে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমি-শয্যায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে 'মা! মা! এই আমি এসেছি' বলিয়া মাতার নিকট দ্রুত পদে গমন করিলেন। মাতাও আবেগভরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। তাহার পরে, মাতা ও পুত্রে এক সঙ্গে ভোজন করিলেন।

বঙ্গদেশে বিলাতী বিদ্যাবিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন বোধ হয় এমন আর কেহই করেন নাই। মেট্রোপালিটন ইনষ্টিটিউসন (প্রথমে যাহার নাম ট্রেনিং একাডেমি ছিল) তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি। 'প্রথম ভাগ,' 'দ্বিতীয় ভাগ,' 'তৃতীয় ভাগ,' 'কথামালা' ও 'সীতার বনবাস' বঙ্গদেশে চিরদিন তাহার নাম ঘোষণা করিবে। তাহার দয়া, সৌজন্যতা, সহৃদয়তা, অহঙ্কার শূন্যতা, সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব,—ভালবাসা স্মরণ করিয়া বঙ্গবাসী তাহার জন্য চিরদিন কাঁদিবে।

১৮ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু স্বদেশহিতৈষী সুবিখ্যাত বাবসতের কালীকৃষ্ণ বাবুও পরলোক গমন করিয়াছেন। স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে আমরা তাহার জীবনী প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের

ভ্রাতা

শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা।

ভাদ্র—১২৯৮।



Calcutta:

Printed by S. C. Sen. at the

GREAT TOWN PRESS.

No. 163, Musjeedbari Street,

1891.

সুবোধিনী-সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত।

"SHUBODHINI"—A monthly magazine in Bengali. Unlike other Bengali magazines which are not very particular in point of regularity, this periodical has been very steadily coming out every month, and we are glad to state that we have in hand the complete set for the Bengali year ending Chaitra last. We note its decided improvement every month. Some of the articles and poems of the last 3 issues are excellent. We wish it a long life and every success——PEOPLE, May 9 1891.

"SHUBODHINI"—Is the name of a Bengali periodical that I have received for review. It is a smartly written paper, but there is some roome for Improvement——INDIAN PLANTER'S GAZETTE, June 3 1891.

সুবোধিনী—(মাসিক-পত্রিকা)। দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ হইল, এখন এ পত্রিকার সমালোচনায় সাহস করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারি। "দোলযাত্রা" প্রবন্ধে বেশ একটু ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গেল। দোলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি পরিপাটি। "দার্জ্জিলিঙ্ ভ্রমণ-কারীর পত্র" প্রস্তাবটিও মন্দ হয় নাই। 'পাষণ্ড দলনে' বাস্তবিকই পাষণ্ডগণের দলন হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।——নবযুগ, ১৮ই বৈশাখ, ১২৯৮।

সুবোধিনী।—এখানি মাসিকপত্রিকা। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ১২৯৮ বৈশাখ আমরা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম—ইহার লেখায় বেশ ভাবুকতা আছে। গবেষণারও গভীর উচ্ছাস আছে। ভাষার উদ্বোধিনী শক্তি আছে। স্থানে স্থানে সম্পাদকের ধর্ম্মানুরাগ অধ্যবসায়ের চিহ্ন আছে। তবে পত্রিকার পরিমাণ অনুসারে লিখিত "বিষয়" বড় বেশী হইয়াছে। ইহার দীর্ঘ জীবন আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—দিনাজপুর পত্রিকা, জৈষ্ঠ ১২৯৮।

সুবোধিনী নাম্নী মাসিক পত্রিকা আমরা নিয়মিত পাইতেছি। এই মাসিক পত্রিকা খানি দুই বৎসরে পদার্পণ করিল। উপযুক্ত লেখকগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মাসিক পত্রিকা-মহলে যেরূপ জন্ম মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, তাহাতে সুবোধিনী আজিও জীবিত আছে, ইহাতেই ইহার কার্য্য তৎপরতার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

—কাশীপুর নিবাসী, আষাঢ় ১২৯৮।

সুবোধিনী। শ্রাবণ মাসের সুবোধিনী আমরা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের ভ্রাতা শ্রীভোলানাথ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। সুবোধিনীর গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই সরস ও ভাবব্যঞ্জক। উপন্যাসের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল ও অতিরঞ্জন দোষ বিবর্জ্জিত। জনৈক খ্রীষ্টিয়ান-তনয়-কৃত বাইবেল-সমালোচনাটিও অতি পরিপাটী। ফলতঃ এরূপ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত মাসিক পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

—বঙ্গনিবাসী, ২৬এ ভাদ্র, ১২৯৮।

সুবোধিনী। মাসিক পত্রিকা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি। সাহিত্যের আলোচনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হইল। কাগজ খানিতে নবীন ও প্রবীণ অনেকগুলি সুলেখকের লেখা থাকে। ইহার ছাপা ও কাগজটিও ভাল। পত্রিকাখানি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।——চিত্রদর্শন।

সুবোধিনী—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী—হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় গদ্য-পদ্য প্রবন্ধ-সম্বলিত। বঙ্গীয় স্বভাষানুরাগী পাঠকদিগের নিকট সাদরে গৃহীত হইতে দেখলে আমরা সুখী হইব।—সঙ্গিনী, কার্ত্তিক ১২৯৭।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। } ভাদ্র—১২৯৮। { পঞ্চম সংখ্যা।

কেন লিখেছিলে?

সখা হে তোমার এই ছিল মনে
হেরি জগতের ফুল্ল প্রাণিগণে
কেন লিখেছিলে, বল হে কেমনে?—
"সকলি আবার বিনাশ পাবে।"
কেন লিখেছিলে সখা হে আমার—
"সকলি বিনাশ পাইবে আবার"
জেনেছিলে বুঝি এ জগতে আর
রহিবে না তুমি চলিয়া যাবে!
তাই কি লিখিলে করিয়া এমন
"বিলাস-সম্ভোগ হ'ল সমাপন,
জুড়া'বে না আর কূজনে শ্রবণ
গিরীন্দ্রবিহারী মরুত-রবে।"
ভুগিলে অন্তিমে লিখেছ যেমন,—
"নিদারুণ দশা—ডাকিছে শমন—
হ'তেছে রসনা বাক্‌শক্তিহীন
সরস বদন, বিরস—মলিন;
সতেজ শরীর হ'তেছে বিকল,
স্থির আঁখি-তারা—শোণিত শীতল
শুন উচ্চরোল,—"হরি হরি বোল"
ফুল্লমনে দাও বিদায় সবে।"
ওকি সখা ওকি কোন প্রাণে হায়!
"ফুল্লমনে" দিব "বিদায়" তোমায়!
সখা কালিদাস যাও হে কোথায়?
বিষাদ-সাগরে ডুবা'য়ে সবে।

কাযেও করিলে লিখিলে যেমন
দেখাইলে ভাল—ফুটিল নয়ন,—
"ভীষণ—ভীষণ দীপ্ত হুতাশন
জ্বলন্ত-চিতায় শুইব সবে।"
বুঝেছিলে সখা বুঝিনি তখন,
বুঝাইলে ভাল দিলে হে চেতন—
"মরিতে আমরা এসেছি যখন
অবশ্য তখন মরিতে হবে।"
হের হে তোমার আত্মীয় স্বজন
আমোদ প্রমোদ ক'রেছে বর্জ্জন
শোক-পারাবারে হ'য়েছে মগন
অকালে তোমায় হা'রায়ে সবে।
তোমার বিহনে উদ্যমবিহীন
শরীর দুর্ব্বল-মন স্ফূর্ত্তিহীন
অসার সংসার—সকলি মলিন
বিষাদে সকলি র'য়েছে ডুবে।
হেরিতেছি শুধু ফেলিয়া নিশ্বাস
জ্বলন্ত-অক্ষরে র'য়েছ প্রকাশ
শেষ লেখা লিখে গেছে কালিদাস,—
"সকলি আবার বিনাশ পাবে।"

শ্রীরসময় লাহা।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

পূর্ব্বকালে ভারতীয় শ্মশান-ক্ষেত্রে মণি-পরীক্ষার নিমিত্ত একখানি সুপ্রসস্ত নিকষ-পাষাণ প্রোথিত ছিল। কতদিন পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মা-কর্ত্তৃক এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নির্ণয় নাই। আদি কবি ভগবান্ বাল্মিকী এই অদ্ভুত পাষাণের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং মহর্ষি বেদব্যাসও ইহার মহিয়সী-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। তখন আর কেমন করিয়া আমরা ইহা নির্ণয় করিতে পারি, কতদিন পূর্ব্বে এই নিকষ-পাষাণ অস্মদ্দেশীয় শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রোথিত হইয়াছিল। বৈদূর্য্য, কৌস্তভ, কহিনুর, স্যমন্তক, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি সকল প্রকার মহামূল্য রত্নমণি এই পাষাণে অভ্রান্তরূপে পরীক্ষিত হইত। কিন্তু হায়! কালের গতিতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাবে কিঞ্চিদূনষষ্টি সম্বৎসর অতীত হইতে চলিল, উহার শুভ সংস্থিতি বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনিতে পাই, ৺রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এক পরামর্শ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভুজবলে এই পাষাণ উত্তোলিত করিয়া কাল-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কি ইষ্টাপত্তি হইয়াছে" বলিতে পারি না, কিন্তু মণি-পরীক্ষা কার্য্য বন্ধ হয় নাই। পাঠক মহাশয়! এখন বলিতে পারেন, এই পাষাণ খানির নাম কি? ইহার নাম "সহমরণ-বিধি।" যে ভারতের শিরায় শিরায় প্রচণ্ড সতী-তেজ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, যে ভারতের শীর্ষ-চূড়ায় "সতী" এই শব্দটি জলন্ত-অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে এবং যে গৌরব-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া ভারত-মাতা অদ্যাবধি সমগ্র ভূমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী বলিয়া পরিগণিতা, সেই ভারতে—সেই সোণার ভারতে, কি বিধি-বিপর্য্যয় বদ্ধমূল বৈধকার্য্য বিলোপ প্রাপ্ত হইতে পারে?

রজনী প্রভাত হইলে, প্রতাপচন্দ্র দেশস্থ সমস্ত বৈদ্যদিগকে সম্বাদ দিলেন। বেলা অধিক হইতে না হইতেই সকলে জমীদার বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন, প্রতাপ বাবু সকলকেই রোগীর গৃহে লইয়া গেলেন। সকলে একত্র পরামর্শ করিয়া ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু সকলেরই মুখ শুষ্ক, নৈরাশ্যের দুরপনেয় কালিমা তাঁহাদের বদন-মণ্ডলে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাহিরে লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন দেখিলেন?" সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"ঔষধ ত দেওয়া গেল, এখন ভগবানের হাত।" কথার ভাব গতিকে প্রতাপচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, কি কুক্ষণে যে যদুনাথ গয়া যাত্রা করিলেন,

যাত্রাকালে কোন পিশাচ তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল, তিনি কাহারও কোপে পড়িলেন বা তীর্থস্থানে কোন অপরাধ করিলেন, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে প্রতাপচন্দ্রের প্রশান্ত-হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি বৈদ্যদিগকে প্রত্যহ আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন। প্রতাপচন্দ্র একাকী আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া যদুনাথের গুণরাশি স্মরণ করিতে করিতে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তিও অন্তরের অন্ধকার ভেদ করিয়া উঁকি মারিতে লাগিল—তিনি আর হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, যদুনাথ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, যদুনাথকে হারাইতে হইবে, এতদিন একত্র সহবাসে প্রগাঢ় একটা মমতাও জন্মিয়া গিয়াছে, সেই মমতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া যদুনাথ পলায়ন করিবে, ইহা কি প্রাণে সহ্য হয়?

গৃহদ্বার খুলিয়া গেল, অন্ধকার গগনের জ্যোৎস্না-স্বরূপা, মরুভূমির জলাশয়রূপা এবং জীর্ণারণ্যের কুসুম-স্বরূপা কমলায়তলোচনা শারদাসুন্দরী আসিয়া দেখা দিলেন। প্রতাপচন্দ্র ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পারিলেন না। স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া শারদাসুন্দরী তাঁহার পদপ্রান্তে মৌনভাবে উপবেশন করিলেন। মনেমনে জানিতে পারিলেন—সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া স্বামীর নেত্রজল মুছাইয়া দিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কবিরাজেরা কি বলিলেন?"

প্রতা। অবস্থা বড় ভাল নয়।

শার। উপায়?

প্রতা। উপায়? মা দশভুজার মনে যা' আছে তাই হবে।

শার। এর উপর কথা কি আছে?

প্রতা। তুমি আমি ভেবে আর কি কর্‌ব?

শার। ঔষধ কেমন দিয়েছেন?

প্রতা। ঔষধ চূড়ান্তই দেওয়া হ'য়েছে, পরমায়ু পরম ঔষধ।

শার। তাই ত—সহচরীর দশা কি হবে?

প্রতা। তাঁর অদৃষ্টটা অতি মন্দ। সুখ কা'কে বলে তিনি জানিলেন না।

শার। মনে ক'রেছিলেম,—এইবার সহচরীর স্বামী ঘরে এলো, সহচরীর দুঃখ ঘুচলো: তা না হয়ে বিপরীত!

প্রতা। অদৃষ্ট-লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে?

শার। দেখুন,—চেষ্টা করুন, যতদিন শ্বাস, ততদিন আশ।

প্রতা। আশার ত কোন চিহ্ন দেখি না—এ বৎসর যে আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর যাচ্চে। মাতৃ-বিয়োগ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, উপদ্রব, অপঘাত-মৃত্যু, যা কখনও এ বাড়ীতে হয় নি—সমস্তই ঘটেছে।

শার। সময় যখন মন্দ পড়ে, তখন একটা কিছু ছল ছুতো পেলেই মন্দটাই আগে ঘটে।

প্রতা। বল্‌তে পারি না, অদৃষ্টে আরও কি আছে। ঈশ্বর না করুন, যদুনাথের কিছু ভাল মন্দ হ'লে ত আমি কাণা হয়ে যাব।

শার। এখন অত ভাববেন না। মায়ের

মনে যা আছে, তাই হবে। স্নান আহ্নিকের সময় হলো।

প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন, বেলা অধিক হইয়াছে, উঠিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। শারদাসুন্দরীও আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

পূজা, অতিথি-সেবা, কাঙ্গালী-বিদায়,—দৈনন্দিন কার্য্য সমস্তই সমাপ্ত হইল। ক্রমে সকলের আহারাদি হইয়া গেল। বেলা তিন প্রহর অতীত হইতে চলিল। শারদাসুন্দরী সহচরীকে আহার করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, সহচরী কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে যে দারুণ অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে জঠরাগ্নি কি করিতে পারে? গত রজনী হইতেই সহচরী নিরম্বু আছেন।

সহচরী জন্মদুখিনী। স্বামী-সুখ কাহাকে বলে, তাহা জানে না, এখন সেই স্বামীকে নিকটে পাইয়া কাঙ্গালিনী যেন কি নিধি পাইয়াছে। স্বামীর মুখ-পানে অনবরতই চাহিয়া আছে আর একএকবার মনে করিতেছে,—নিধি বুঝি হাতছাড়া হয়। নিধি ত সহচরীর হাতে কখনও স্থায়ী হয় না। সহচরীর মনে বিশেষ যন্ত্রণা, স্বামীর অঙ্গস্পর্শ করিতে পাইতেছেন না! স্পর্শ করিতে পাইলে মনের সাধে পদসেবা করিতে পারিতেন, হাত বুলাইয়া যদুনাথের তাপিত অঙ্গ শীতল করিতে পারিতেন। বিধাতা নাকি সহচরীকে কণামাত্র সুখও অনুভব করিতে দিবেন না, সেই জন্য কৌশলক্রমে ইহাতেও বঞ্চিত করিয়াছেন! যাহাই হউক, সহচরি! নয়নে নয়নে রাখিও; বল্লভকে নয়ন-ছাড়া করিও না। প্রেক্ষণে যদি অন্তর্জ্বালা নিবারণ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, অধিক আশা করিও না। সহচরি! তুমি কি জান না কমলিনী দিবাকরের মুখ দেখিয়া, দিবাকরের কিরণ পাইয়াই প্রস্ফুটিতা হইয়া থাকে, উচ্চ আশা করে না; তুমি কি জাননা কুমুদিনীরও সেই গতি? তবে কেন দুঃখ পাও, তবে কেন উত্তাপব্যঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ কর? যার যতটুকু সুখের সীমা, সে ততটুকুই পাইবে, অধিক কোথা হইতে আসিবে? সহচরি! তুমি কি জান না কত লোকে নদীকূলে বসিয়া পিপাসায় কাতর হয়? মনে করিয়া লও, তোমারও যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। কি করিবে বল? কেহ যে অল্প আয়াসেই সুবর্ণ-খনি আবিস্কার করিতে পারে, কেহবা চিরকাল পরিশ্রম করিয়াও একমুষ্টি কপর্দ্দকও উত্তোলন করিতে পারে না। অদৃষ্ট ত কাহারও করায়ত্ত নহে; তোমার অবস্থা বর্ণনা করিতে আমার কষ্ট বোধ হয়, ইচ্ছা হয় কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লিখি। কি করিব? শাদার পিঠে কালী দিয়া ত আর মিথ্যা কথা লিখিতে পারিব না।

ক্রমে প্রদোষকাল সমুপস্থিত হইল, দিনমণি অস্তাচলে শিখরদেশ অবলম্বন করিলেন। ক্রমে রজনী সমাগত হইল। কোথা দিয়া দিন যাইতেছে,—রাত যাইতেছে, সহচরী কিছুই অনুভব করিতেছেন না। সহচরী বেহুঁস, সহচরীতে সহচরী নাই! যদুনাথ যেমন পীড়িত, সহচরী ততোধিক। যদুনাথ কিছুই আহার করেন না, সহচরীও নিরম্বু, যদুনাথ এক শয্যায় আবদ্ধ, সহচরীও কোন্ নয়? সংসার কি বিচিত্র বন্ধনেই আবদ্ধ! বলিহারি!

রজনী ক্রমে গভীরা হইয়া আসিল। যাঁহারা গৃহমধ্যে ছিলেন, যতুনাথ ক্ষীণকণ্ঠে অথচ সম্পূর্ণ সংজ্ঞা-সহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "রাত অধিক হ'য়েছে, আপনারা শয়ন করুন গে; আমি একটু ভাল আছি।" সকলে জানিয়াছিলেন—যতুনাথ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি, তাঁহার মুখে এই সম্বন্ধযুক্ত-বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সহচরীকে যথাবিধি উপদেশ দিয়া স্ব স্ব শয়ন-কক্ষে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গৃহদ্বার খুলিয়া গেল;—অনঙ্গমোহিনী প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সহচরীর রাত্রি জাগরণের সঙ্গিনী যুটিল;—অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া শয়নার্থ গমন করিলেন। অনঙ্গমোহিনী সহচরীকে বলিলেন,—"সই! একটু নিদ্রা যাও, আমি জাগিয়া থাকি—" সহচরী বলিলেন,—"ঘুম আসিবে না, তুমি ঘুমাও, তুমি আমার কাছে থাকিলে আমার অনেক ভরসা—"

দুই একটী কথা কহিতে কহিতে অনঙ্গমোহিনী নিদ্রাভিভূতা হইলেন। সহচরী দেখিলেন অনঙ্গ নিদ্রিতা। সহচরী মনে করিলেন, দিবসে লোকের সম্মুখে স্বামীর মুখারবিন্দ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে পারি না, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্তও সে সুযোগ ঘটিয়া উঠে না, তবে অনঙ্গমোহিনী এই সময় নিদ্রা গিয়াছেন, এই অবসরে একবার দেখিয়া লই। এই ভাবিয়া সহচরী নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে যতুনাথের শয্যার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কি দেখিলেন?—দেখিলেন—নির্ব্বাপিত দীপের ন্যায়, প্রভাত-প্রাপ্ত শশাঙ্কের ন্যায়, বীচি-বিরহিত বাপীর ন্যায়, স্বামী শয্যোপরি শয়ান রহিয়াছেন; নয়ন অর্দ্ধ-নিমীলিত, কনিনিকা স্থির, অঙ্গ স্পন্দ রহিত। সহচরী ভাবিলেন—স্বামী নিদ্রা গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিরাশ অন্তঃকরণ তাহা বলিল না। নাসিকা-সন্নিকটে হস্ত লইয়া দেখিলেন, নিশ্বাস পড়ে না, প্রাণবায়ু তিরোহিত হইয়াছে! সহচরী নিশ্চিন্ত হইলেন, জানিলেন এইবার দুঃখের দুর্জ্জয়ব্রত উদ্‌যাপিত হইল, জানিলেন এইবার তরঙ্গ-সঙ্কুল হৃদয়ের শান্তি সম্পাদিত হইল, এইবার জ্বলন্ত অনলে জল পড়িল। আর চিন্তা নাই, আর দুঃখ নাই, আর আশার প্রলোভন নাই—দ্বাদশ বার্ষিকী তপস্যার ফল বিধাতা ভালরূপই বিধান করিয়াছেন। সহচরী জানিলেন হৃদয়-কৌটার যে রত্ন সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছিল, আজি তাহা মায়াবলে অপহৃত হইয়াছে! কৌটা উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কিন্তু গুরুত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি তিনপ্রহর অতীত হইল। সহচরী দেখিলেন অনঙ্গ বেশ নিদ্রা যাইতেছেন। এইবার সহচরী স্বামী-অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিলেন; হস্ত কাঁপিল, কিন্তু সভয়ে সরিয়া আসিল না। বিধাতার নিষেধবাক্য সহচরীর বিলক্ষণ মনে ছিল,—জীবন্ত স্বামীর অঙ্গে হাত দিতে নাই। সহচরীকে সরলা পাইয়া বিধাতা দুর্ব্বহভার বহন করাইয়া লইয়াছেন,—বিধাতার কঠোর ক্রীড়া সহচরীতেই সুন্দর সমাহিত হইয়াছে। সহচরী স্বামী-অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন অঙ্গ পাষাণবৎ শীতল; তাই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা-সম্পাদনার্থ মহামূল্য একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু

তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। হায়! সেই অশ্রু-বিন্দু সহচরীর নয়ন-প্রান্ত হইতে বিগলিত হইয়াছে। পাঠক! এমন বিবেচনা করিবেন না যে, উহা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত উষ্ণতা বিলুপ্ত করিয়া, সমস্ত শিরা, সমস্ত ধমনীর শীতলতা সম্পাদন করিয়া, অন্তর ভেদ করিয়া, নয়ন-পথ দিয়া বিগলিত হইয়াছে। ঐ অশ্রুর মূল্য অনেক, উহা কেন পড়িল সহচরী তাহা জানেন না, তাঁহার অন্তরাত্মাই জানেন, অন্তরাত্মাই বলিতে পারেন কেন পড়িল।

কৈ? সহচরী! তোমার নয়নে আর জল নাই কেন? একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়াই ফুরাইয়া গেল? আর আর সকলে ত কত কাঁদে, কত হা হুতাশ করে,—তুমি কেন তাহা করিবে না? তুমি কি জগৎ-ছাড়া? বুঝিলাম, তুমি জগৎ-ছাড়া; তাহা না হইলে, তোমার অবস্থা কাহারও সহিত মিলে না কেন? ওকি! ওকি! সহচরি! তুমি প্রদীপের নিকট গমন করিতেছ কেন? তোমার অভিসন্ধি যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না! অনঙ্গমোহিনী নিদ্রিতা, তুমি তাঁহার মুখের দিকে বার বার সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ কেন? অনঙ্গকে এখন এত ভয় কেন? বুঝিয়াছি, অনঙ্গমোহিনীর অবিচলিত সুনিদ্রা তোমার এখন আবশ্যক হইয়াছে। আহা! আহা! সহচরি! স্বর্ণ-প্রতিমে! এমন কাজ করিওনা, যাহা করিতেছ, তাহা দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, নয়ন আপনা আপনিই মুদ্রিত হইয়া যায়। আহা! সহচরি! তোমার চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলী অনলে দগ্ধ করিও না, ক্ষান্ত হও, সহচরি! ক্ষান্ত হও! তুমি শুনিবে না আমি জানি। সতীগণ এই নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করেন না তাহা আমি জানি, তুমি সতীর অগ্রগণ্যা—তুমি শুনিবে! অসম্ভব।

সহচরী অবিকৃত-বদনে অবিচলিত ধৈর্য্য-সহকারে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী দগ্ধ করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। অনঙ্গমোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, অনঙ্গ দেখিলেন যাহা বিধাতার মনে ছিল, তাহা হইয়াছে। সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। সহচরী স্থিরনেত্রে পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় মৃত স্বামীর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন। অনঙ্গ দেখিলেন, সহচরী স্বীয় অঙ্গুলী দগ্ধ করিয়াছেন। অনঙ্গ কিয়ৎক্ষণ সহচরীর দিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে শারদাসুন্দরীর নিকট দ্রুতপদে গমন করিলেন। শারদাসুন্দরী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেই শশব্যস্তে আগমন করিলেন। দেখিলেন, সহচরীর সকল ভাবনা দূর হইয়াছে—সকল জ্বালা—যন্ত্রণা নিবারণ হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে প্রতাপচন্দ্র দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন, ক্রমে বাটীর আর আর সকলেই আসিল।

প্রতাপচন্দ্র কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—"হায়! এতদিনে আমি বন্ধু হারাইলাম। এতদিনে আমি নিঃসহায় হইলাম। যদুনাথ! এই তোমার মনে ছিল! তবে কি নিমিত্ত অগ্র হইতে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলে? কি জন্যই বা আমায় প্রবল আশায় আশ্বাসিত করিয়াছিলে? একবার উঠ সখে! তোমার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া লই; তুমি গয়া হইতে ফিরিয়া

আসিলে, তোমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহা হয় নাই।” এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া প্রতাপচন্দ্র অশ্রু-বিমোচন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, প্রতাপচন্দ্র প্রথম যৌবন হইতেই যদুনাথের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন—একটা অকৃত্রিম ভালবাসা উভয়ের হৃদয়কে সুদৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। সেই দুশ্ছেদ্য পাশ ছিন্ন করিয়া যদুনাথ চলিলেন। ইহা দুই এক মাসের নিমিত্ত গয়াযাত্রা নহে, ইহা অনন্ত-বিদায়! অনন্ত কাল—স্রোত বহিয়া যাইবে, কিন্তু সেই যদুনাথ আর এই প্রতাপচন্দ্র আর মিলিবে না।

সকলেই বিমর্ষ। বিশেষতঃ, সহচরীর দশা দেখিয়া সকলেই অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। সকলে শোক-বিহ্বল হইলে চলিবে না, এ বড় বিষম কাল, এসময় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকেও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া বিদায় দিতে হয় এবং পবিত্রকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা-সহকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, গোময়ে গৃহ পরিস্কৃত করিতে হয়। প্রতাপচন্দ্রের বন্ধু বান্ধবগণ বদ্ধ পরিকর হইয়া যদুনাথকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিলেন, সহচরীর সর্ব্বস্ব ধন অপহৃত হইল! সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সহচরীও চলিলেন। সহচরীর চক্ষে জল নাই।

গঙ্গা অতি নিকট। মুহূর্ত্ত মাত্রেই সকলেই তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহ তীরে সংরক্ষিত হইল। সহচরী মৃত পতির চরণ-যুগল ধারণপূর্ব্বক ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপচন্দ্রের আদেশ-ক্রমে সকলেই ইন্ধনাদি সংগ্রহ করিল। চিতা সজ্জিত হইল, শব চিতায় শায়িত হইল, সহচরী মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া স্বামীমুখে অগ্নি প্রদান করিবার পূর্ব্বে সকলের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সকলে সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিষেধ করিতে লাগিল। প্রতাপচন্দ্রও নিষেধ করিলেন; কিন্তু, সহচরীর অটল প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল না।

সহচরীর এই মহোৎসবের সংবাদ বাটীতে প্রেরণ করা হইল। রোরুদ্যমানা শারদাসুন্দরী অনঙ্গমোহিনী ও অন্যান্য পুরমহিলাগণ শিবিকারোহণে সমাগত হইলেন। সকলে সহচরীকে অশেষ বিধানে বুঝাইলেন, কিন্তু, সহচরী কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কোম্পানী-বাহাদুরের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—“তুমি যে সহমরণে যাইবে, তাহার পরীক্ষা দাও।” অবগুণ্ঠনবতী সহচরী কথা না কহিয়া স্বীয় দগ্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুলি সর্ব্বসমক্ষে উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। সকলে বিস্মিত হইল। কোম্পানী-বাহাদুরের লোক ফিরিয়া গেল।

প্রতাপচন্দ্র অগত্যা সহমরণের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সংবাদ শুনিয়া চতুর্ব্বর্ণের লোক তথায় সমবেত হইল। সহচরী ব্রাহ্মণদিগকে প্রণামাদি করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিলেন। সজল-নয়নে শারদাসুন্দরী স্বহস্তে সহচরীকে সিন্দূর ও অলক্তকরাগে বিভূষিত করিয়া, শঙ্খ ও নববস্ত্রাদি পরাইয়া দিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন,—“সাধ্বি! জন্ম জন্ম স্বামীসোহাগিনী হও।” তৎপরে সহচরী কপর্দ্দক ও লাজমুষ্টি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ

করিতে লাগিলেন, সতীগণ সযত্নে উহা কুড়াইয়া লইলেন।

ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল,—লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সহচরী স্বামীদেহ চন্দন-চর্চ্চিত এবং নববস্ত্র ও পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করিলেন এবং তৎপরে মুখে অগ্নি প্রদান করিয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন।

আজি সহচরীর "অন্তিম-মিলন"; আজি সহচরীর সতীত্ব ব্রতের উদ্যাপন। ধন্য সহচরি! ধন্য! তোমার মত কঠোর তপস্যা কে করিতে পারে? ধন্যা তুমি—তুমি সতীগণের আদর্শ-স্বরূপা,—অগ্রগণ্যা।

ধূমায়িত চিতা ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সহচরী অবিচলিতচিত্তে, অকম্পিত চরণে, চিতায় আরোহণ করিয়া স্বামী-অঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে উভয় অঙ্গই অনলগ্রস্ত হইল। সহচরী হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিল, সেই চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলি তখনও বিঘূর্ণিত হইতেছে। সকলে দেখিল,—সহচরীর বদন তখনও অবিকৃত। আহা! কি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান! কি বিষম নির্ম্মায়িকতার পরিচয়! "সহচরী সংসার-অরণ্যের অযত্ন-সম্ভূতা বনলতা; কিন্তু রমণীগণের অসতীত্ব-ব্যাধির মহৌষধি। সহচরী সামান্য মৃত্তিকায় সমুদ্ভূতা সত্য, কিন্তু, পরীক্ষায় অমূল্য হীরক মণি সপ্রমাণিতা।

অনঙ্গ অনিমিষ নয়নে দেখিলেন, সহচরীর স্বর্ণকায় ভস্মসাৎ হইল। ভাবিলেন, সহচরী এক দফা নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু আমার এই অনন্ত চিন্তানল কবে আর নির্ব্বাপিত হইবে? বুধগণ বলিয়াছেন,—

"চিতা চিন্তা দ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।"

কথা মিথ্যা নয়। বলিতে কি, অনঙ্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। পাঠক! এই স্থানে কবির কয়েকটী অবিনশ্বর, পংক্তি স্মরণ হইল:—

"দলিতং হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধাতুন ভিদ্যতে,
বহতি বিকলঃ কায়োমোহংন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ,
প্রহরতি বিধিমর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

অনঙ্গের আজি সেই দশা সমুপস্থিত। সহচরীর অঙ্গ দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ হইল। রূপসীর রূপের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। প্রতাপচন্দ্রের আদেশ-ক্রমে চিতা নির্ব্বাপিত হইল। সমুজ্জ্বল শশ্মান-বদন কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। অনঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া শারদাসুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইলেন এবং তৎপরে সিন্ধু ভৈরবী রাগিণীতে বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিলেন:—

'সতী'র মহিমা আমি কেমনে বর্ণিব বল?
সংসার পঙ্কিল জলে সতীপ্রেম-শতদল॥
কি মধুর সুধা-হাসি, সরস কৌমুদী-রাশি,
নিরখিলে মুখশশী, চিত হয় সুবিমল।
রমণীর শিরোমণি, বিমল প্রেমের খনি,
সৃজিলেন পদ্মযোনি, স্বভাব-সুন্দর ফল।
উজল নয়ন-আগে, প্রবল শমন ভাগে,
পতিপদ হৃদে জাগে, পরশে অনল জল।

গীত গাইয়া অনঙ্গ অশ্রু-বিমোচন করিতে লাগিলেন, সকলেই রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সহচরীর সহমরণ-সংবাদ গিরিবালা কিছু দিন পরে লোক-পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। তাহাতে তিনি নিতান্ত ব্যথিতা ও শোকবিহ্বলা হইয়া পড়েন। গিরিবালার একান্ত ইচ্ছা ছিল সহচরী স্বামী-সহবাসে কেমন আছেন, একদিন গিয়া দেখিয়া আসি-বেন, কিন্তু তিনি অকস্মাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকল আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। পরে সহচরীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন-স্বরূপ এক খানি প্রস্তর-ফলক নির্ম্মাণ করাইয়া উদ্যা-নস্থ তুলসী-কুঞ্জে সংস্থাপন-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সমাপ্ত।

তবু কেন সেই গান!

কি জানি রে অকস্মাৎ
পুনঃ বহুদিন পরে!
কে তুলিল কোলাহল
আমার নিস্তব্ধ ঘরে?
নিবা'য়ে শান্তির আলো
সাধের কুটিরে মোর
কে দিল ঢালিয়া আজি
অশান্তি আঁধার ঘোর!
পুন শুনিলাম কেন
সেই গান পুরাতন!
আবার ডুবিল কেন
পুরাতনে এ নূতন!
বর্ত্তমান ঘুমায়েছে
অতীতের ক্রোড়'পরে।
ভবিষ্য-কল্পনা-ছবি
মিশে গেছে দূরান্তরে!
স্বপন ঢাকিল আসি
আমার এ জাগরণে,
সত্য লুকাইল গিয়ে
কল্পনার আবরণে॥

আবার বাজিল কাণে
সেই পুরাতন গান।
নূতন গানের মাঝে
পাগল করিল প্রাণ।
আবার গাইছে কে গো
সেই গান—সেই স্বরে?
যদিও এসেছি ছেড়ে
সেই গান বহু দূরে!
কেন সে স্বপ্নের খেলা
জাগ্রত পরাণে মোর!
কেন সেই অমানিশা
যদিও হ'য়েছে ভোর!
সেই গান, সেই স্বর
ফুরায়েছে সেই তান,
আবার বাজিল কাণে
তবু কেন সেই গান?

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ
বি এ, বি এল্,

জমীন্দারী-পঞ্চায়ত পত্রিকা।

জমীন্দারী-পঞ্চায়ত—মাসিক পত্রিকা, প্রতি মাসে প্রকাশিত—জমীন্দারী-পঞ্চায়ত সভার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

গতবারে আমরা ইহার আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়াছি; এক্ষণে ইহার বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। পত্রিকা-খানি আকারে প্রকারে,ছাপায় কাগজে সকল রকমেই অত্যুৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ, পত্রিকা খানির আকৃতি দেখিলেই মনে হয় জমীন্দারী সভার পত্রিকাই বটে।

পত্রিকাখানি যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলে সমাজের সমধিক উপকারের সম্ভা-বনা। এখানি যেমন জমীন্দার-সভার মুখ-পাত্র পত্রিকা, তেমনই কৃতবিদ্য জমীন্দারী মহোদয়গণও ইহার লেখক। এই জমীন্দার পত্রিকার জমীন্দার লেখকের দ্বারা জমীন্দারী কার্য্যকলাপ যেমন বিশদরূপে বর্ণিত হইয়া ভূম্যধিকারী বর্গের উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবে, সেইরূপ ইহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিষয়ে কৃষক দ্বারা লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে, কৃষিকার্য্যেরও সমধিক উপকার করিতে পারিবে। শিক্ষানবীশ কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়ন-পূর্ব্বক কৃষক না হইয়া কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা-প্রদানে কখনই সফল-প্রযত্ন হইতে পারিবেন না। আমা-দের বিবেচনায় যতদিন এ অভাব মোচন না হইবে, ততদিন পঞ্চায়তপত্রিকা সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

আষাঢ় মাসের পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ আছে, প্রথমটী পঞ্চায়ত-প্রথা; দ্বিতীয়টী কৃতবিদ্য ও কৃষি।

"পঞ্চায়ত-প্রথা" প্রবন্ধটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, ইহাতে লেখকের বহু গ্রন্থালোচনা ও স্বীয় অভিপ্রায়ানুযায়ী বিন্যাস করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে; প্রবন্ধের গুণ ভাগের বিষয়ই সমধিক, কিন্তু দুই এক স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে—

১। প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—"বিবাদ হইতে বিচারের উৎপত্তি--বিচার হইতে ধর্ম্মের স্থিতি; কাযে কাযে বিবাদরূপ তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতেই যে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল উৎসটি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে।"

লেখকের ইহা কি উদ্দেশ্য যে, বিবাদ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি? কিন্তু বোধ হয় তাহা নহে; তাহা যদি হইবে, তাহা হইলে বলা হয়, যেখানে বিবাদ নাই, সেখানে ধর্ম্মও নাই—তবে বোধ হয় ধর্ম্মের মূল উৎস, ব্যবহারিক, সামাজিক, সমাজে থাকিতে গেলে যে ধর্ম্ম পালনীয়, সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

২। "লোকেরা অন্তঃকরণের মধ্যে যে সকল মূলগত বিশ্বাস দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম।"—ধর্ম্ম কি কেবল বিশ্বাস মানসিক অবস্থা মাত্র ইহার কি স্বাতন্ত্র্য নাই —এই বিশ্বাসেরই বা মূল কি?

৩। পারমার্থিক ধর্ম্ম (Religion) ব্যবহারিক ধর্ম্ম (Morality) বাস্তবিকই আমাদের মরালিটী Religion ছাড়া নহে।

৪। "স্বভাবের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলিই ধর্ম্মের বীজ"—অর্থবোধ বড়ই দুরূহ—এই কথাটী প্রমাণ করাও সহজ নহে। স্বভাবের স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলি কি,—ধর্ম্ম বলিতে কি ব্যবহারিক ধর্ম্ম—সত্যগুলি ধর্ম্মের বীজ কিরূপে?

৫। "মুসলমান রাজ্যশাসন সময়ে দেশের চিরপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থা অনুসারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় নাই।"

এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য নহে, মুসলমানগণের বিলাসিতা অনভিজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতার জন্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই বটে, কিন্তু যে স্থলে মুসলমানগণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন সেই খানেই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যায়। পঞ্চায়ত-প্রথা ভাঙ্গিয়া ফেলাই মুসলমানগণের উদ্দেশ্য ছিল, তবে তাহারা বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।—আমাদের বাঙ্গালা দেশে মুসলমানেরা কিয়ৎ পরিমাণে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমাদের বাঙ্গালা দেশে পঞ্চায়ত-প্রথা তাদৃশ প্রবল নহে, ইহার অন্যান্য কারণও আছে, কিন্তু উল্লিখিত কারণও একটী—Phillip's Land Tenure দেখ।

মুসলমানদের বিচারকার্য্যে দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ-বিষয়ে দ্বিতীয় কারণ ব্যক্ত হইয়াছে যে,"তাহারা এ দেশের অধিবাসী হইয়াছিল।" কিন্তু বক্তব্য এই অধিবাসী হইয়াছিল বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে,তাহাদের এদেশ ভাল লাগিয়াছিল বা অন্য কোন কারণে তাহারা এদেশের অধিবাসী হইয়াছিল; কিন্তু ইহা বুঝায় না যে, তাহারা এ দেশের সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বা আমাদের হিন্দু-সমাজ মুসলমানদিগকে আপন সমাজে স্থান দিয়াছিল, যদ্দ্বারা তাহারা আমাদের পঞ্চায়ত-বিচারের অধীন হইয়াছিল।

৬। "এই অবধি (মুসলমানদের সময়াবধি) এ দেশে পঞ্চায়তী-প্রথার প্রচার হইল।" এ কথাটি সত্য নহে, কেন না পঞ্চায়তী-প্রথা হিন্দু সময় হইতেই বহুল প্রচলিত, অক্ষুন্ন প্রচলিত ছিল, বরং মুসলমান-সময়ে কিছু ব্যাহত হইয়াছিল আরও লেখক পূর্ব্বে বলিয়াছেন মুসলমান সময়ে হিন্দু-বিচার-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল; অতএব এস্থলে তাঁহার কথার সামঞ্জস্য হইতেছে না—আর একটা অসামঞ্জস্য প্রবন্ধের চতুর্থ পৃষ্ঠার ১ম প্যারাগ্রাফে লিখিত বিষয়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের।

এই কয়েকটী স্থল ব্যতীত এ প্রবন্ধটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—কৃতবিদ্য ও কৃষি। যদিও লেখক সাধারণতঃ ভারতবাসী মাত্রেরই উদর-সমস্যা মীমাংসার জন্য, প্রথমতঃ অতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কৃতবিদ্যগণের উদর-সমস্যা মীমাংসা। "কৃতবিদ্যগণের কৃষিকার্য্য দেশ কাল ও পাত্রের, উপযোগী," এইরূপ তিনি লিখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, এদেশ কৃষির উপযোগী এবং কৃষিও এদেশের উপযোগী; কেন না কৃষিদ্বারা জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই লাভবান্।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে,এদেশে কৃষির বিস্তর

প্রচলন আছে, তখন আর বাড়াইয়া লাভ কি? আরও কৃষিকার্য্যের জন্য কৃতবিদ্যেরা নূতন জমি কোথায় পাইবেন? এ দেশ যেমন কৃষির উপযোগী দেশে কৃষিকার্য্যেরও তেমনই প্রচলন আছে; আরও কৃতবিদ্যগণ শিল্প ব্যবসয়াদি অবলম্বন করুন না কেন, গবর্ণ-মেণ্ট এবং জমীদার উভয়েই লাভবান্ হইবেন, অধিকন্তু কৃতবিদ্যেরাও লাভবান্ হইবেন। শিল্পব্যবসায়ে, যৌথ-কারবারে, বিস্তর প্রতিবন্ধকতা আছে, লেখক তাহা দেখাইয়াছেন সত্য; কিন্তু কৃষিকার্য্যেও প্রতিবন্ধকতা আছে; তবে কিছু কম, আর বেশী। আরও আমাদের দেশে কেবল কৃষি-দ্বারা সুবিধা হইবে না—সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতিও চাই, আজকাল যেমন নানাদিকে নানা খরচ, তাহাতে কেবল কৃষি-দ্বারা সচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে।

কৃতবিদ্যের কৃষি-অবলম্বন বর্ত্তমান কালের উপযোগী—প্রমাণের জন্য লেখক দেখাইতেছেন—(১) শিল্পাদিতে বিলাতি-বণিকের প্রতিযোগিতা, কৃষিতে কিন্তু তাহা নাই।

কিন্তু কৃষিতেও কৃতবিদ্যগণকে পর-স্পরের মধ্যে এবং স্বদেশী কৃষক দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, কোন কার্য্যই প্রতিযোগিতা ভিন্ন সম্ভবে না। যেখানে অন্ততঃ দুইজনে এক কার্য্য করে সেখানেও প্রতিযোগিতা কম নহে।

(২) কৃষি অল্প টাকায় হয়, শিল্পাদি অল্প টাকায় হয় না।

কিন্তু, যৌথদ্বারাও অনেক টাকা তোলা যাইতে পারে; যেখানে না পারা যায় সেখানে না হয় অগত্যা কৃষিই অবলম্বনীয়। যৌথকারবারে আর একটী দোষ—কল কার-খানা করিয়া কার্য্য করা; কেননা কল কারখা-নার দ্বারা অনেক লোকের পরিশ্রম অল্প লোকে করে সত্য বটে,—কিন্তু যৌথকার্য্য কেন অনেক অংশে লওয়া হউক না, তাহাতে অনেকেই লাভের অংশ পাইবেন। এই-রূপে নানাপ্রকারের কারবার খুলিলেও চলিতে পারে; তবে একটা কথা যৌথ-কারবার খোলা যায় কি প্রকারে? সকলেই কি সম্মত হইবেন? কিন্তু অপর পক্ষে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে কৃষকের অন্নমারা যাইবে, না হয় কৃতবিদ্যের কিছু হইবে না, আর এক কথা অত জমীও পাওয়া দুর্ল্লভ।

"কৃতবিদ্যগণ যে কৃষির উপযুক্ত তাহার প্রধান কারণ—তাঁহাদের অভাব।" একথাটা সত্য; কিন্তু এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, কৃতবিদ্যগণ অর্থো-পার্জ্জনের পাত্র, কেননা তাঁহাদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অভাব মোচন করিতে হইবে; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র পথ কৃষি নহে। চাকুরী আছে, ওকালতী আছে, ডাক্তারী আছে, শিল্প আছে, ব্যবসা আছে, অন্যান্য নানাপ্রকার উপায় আছে, তবে কৃষিও একটা বটে।

লেখক বলিয়াছেন, 'অভাব আবিষ্ক্রিয়ার জননী।' তা ভাল কৃষিকর্ম্মই কি এক আবিষ্ক্রিয়া হইল, কৃতবিদ্যকে ছাড়িয়া দিউন তিনি আবি-ষ্ক্রিয়া করুন, ধরিয়া বাঁধিয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে কি হইবে! যাঁহার যে দিকে সুবিধা, তিনি তাহাই করিবেন, কৃতবিদ্য মহলে কান্নাহাটী পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু নিজেরাই

তাহার উপায় করিবে। বিবেচনার বিষয় দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট অকৃতবিদ্য—তাহাদের সংখ্যা কৃতবিদ্যের শতগুণ বা সহস্রগুণ হইবে।

(২) কৃষি, কৃতবিদ্যের দ্বারা লাভবান্ হইবে অর্থাৎ তাঁহারা কৃষির অন্তরায় দূর করিবেন, উন্নত প্রণালীতে কৃষিদিবেন ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এ জিনিষ পুঁইতে নাই, ওরূপ সার দিতে নাই, ইত্যাদিরূপ বলিবেন না ইত্যাদি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই কৃতবিদ্য কৃষি বিদ্যাতে কৃতবিদ্য নহেন; তিনি কিরূপে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিতে পারিবেন। কুসংস্কারেই বল আর যাই বল, বশবর্ত্তী না হইয়া "গোঁয়ারতুমি" করিয়া বসিবে।

অবশেষে কৃতবিদ্যাগণকে চাষা নাম গ্রহণ করাইতে সম্মত করিবার জন্য প্ররোচনা দেখান হইয়াছে—"চাষাকে ভাল কথায় আর্য্য বলে" এই বলিয়া; ভাল জিজ্ঞাসা করি এরূপ প্ররোচনা না দিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা যদি লেখক মহাশয় কৃতবিদ্যগণের অগ্রণী হইয়া কুসংস্কার কাটাইয়া আলু ও গাজর পুঁতিতেন বা যদি পুঁতিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বড় উপকার হইত।

দ্বিতীয় সংখ্যা—শ্রাবণ।

এই সংখ্যায় পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। যথা:—

জমীন্দারী বাণিজ্যপদ্ধতি। "আমাদের দেশের লোকে বাণিজ্য ব্যবসায় অপেক্ষা ভূসম্পত্তি বিষয়ে ভাল বুঝেন। কিন্তু "প্রণালী পদ্ধতি ভাল না থাকায় কি কৃষি, কি জমীন্দারী, সকল কার্য্যেরই এত দুর্গতি।"

জিজ্ঞাস্য—"প্রণালী-পদ্ধতি" ভাল না থাকিলে বুঝা যাইবে কি প্রকারে? হয় ত লিখিবার প্রণালী-পদ্ধতি এরূপ নহে, যদ্দ্বারা বাহিরের লোক সহজে সর্ব্ববিষয় বুঝিতে পারে, অথবা সে গুলি হয় ত লিখিবার আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়ই না (অলস্য করিয়া না লিখিয়া ফেলিয়া রাখিবার কথা বলিতেছি না।) তাহারা ভিন্ন প্রণালীতে অভ্যস্ত; সেই আবহকাল প্রচলিত প্রণালী-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এতাবৎকাল সুনিয়মে কার্য্যসম্পাদন করিয়া আসিতেছে এবং সেই প্রণালীপদ্ধতির নিয়ম সঙ্কেত মানিয়া আসিয়া অল্পের মধ্যে কায সারিতেছে।

"ক্ষুদ্র জমীন্দার হাঁটুজলে ডুবিয়া মরেন।" অনেক কারণে ডুবিয়া মরিতে পারেন বটে, কিন্তু জমীন্দারী কার্য্যপদ্ধতির দোষে ডুবিয়া মরেন যদি এরূপ বলা হয় তাহা হইলে তাহার উত্তর জমীন্দার ক্ষুদ্রই হউন আর বৃহৎই হউন, জমীন্দারী কার্য্য আর রাজকার্য্য দুইই সমান এবং দুইই গলায় গলায় একগলা জলে। সামান্য গৃহস্থ যে প্রত্যহ অতি সামান্য উপায় করিয়া খায়, সে কি সমস্ত রাজ্য পরিচালনকারী রাজমন্ত্রীর অপেক্ষা কম বিব্রত?

এই প্রবন্ধে নূতন জমীন্দারী ক্রয় করিলে বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইলে, এবং পূর্ব্বাধিকারীর কাগজপত্র ও কতক কর্ম্মচারী না পাইলে কি প্রণালীপদ্ধতি কর্ত্তব্য তাহাই দেখান হইয়াছে, এই সকল উপদেশগুলি অতিশয় সারগর্ভ বটে; তবে যাহারা জমীন্দারী-কার্য্য কিছুই বোঝে না, তাহাদের পক্ষেই বিশেষ উপকারী।

"খাজানা-আদায় অপেক্ষা খাজানা প্রদান জমীদারের পক্ষে অধিকতর গুরুতর বিষয়,

কেননা নির্দ্দিষ্ট দিনে না দিলে বিষয় সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়।" আমরা বলি, খাজনা আদায়ই অধিক গুরুতর বিষয়, ইহার জন্য অনেক কর্ম্মচারী রাখিতে হয় ও অনেক সময় অতিবাহিত হয়, আর খাজনা তামাদি হইল কিনা, তাহার জন্য চিন্তিতও থাকিতে হয়,এবং আদালতে ঘন ঘন মোকদ্দমা করিতে হয়—এমন কি জমীন্দারী কার্য্যের অধিকাংশই (প্রায় সমস্তই) খাজনা আদায় লইয়া। খাজনা প্রদানের জন্য চিন্তিত থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু খাজনা আদায় না হইলে, প্রদান করা যাইতে পারে না। যদি বলেন কোন জমীন্দারের অন্য প্রকার উপায়ে অর্থের আগম হইয়া থাকে। কিন্তু ওরূপ স্থলে খাজনা প্রদানের কোনই চিন্তা নাই, ঐ অন্যোপায় লব্ধ অর্থ দ্বারাই প্রদান হইতে পারে। পরিশেষে ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজ কার্য্যের আদর্শে জমীন্দারী-কার্য্য নির্ব্বাহ-বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। খাজানা নগদ টাকায় লওয়া ভাল। (শস্যের দ্বারা আদায় করিলে জমীন্দারী-কার্য্য ব্যবসায় বিশেষ) "সেরেস্তা সংগঠন" এই বিষয়েও দুই চারিটী কথা বলা হইয়াছে।

"কার্য্যের শ্রেণী-বিভাগ কর্ত্তব্য। কেননা তাহা হইলে যেমন সহজে ও অল্প সময়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।"

এ বিষয়ে আমাদেরও ঐ মত, কিন্তু জমীন্দারী-সেরেস্তার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ১৫টী বিভাগ বা সেরেস্তা গঠন করিতে বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে, বিভাগগুলি বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য শাসন বিষয়ের জন্য স্থাপিত বিভাগ (Department) সকলের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। বক্তব্য এই,রাজ্যশাসন কার্য্য মুসলমানেরাও করিয়াছেন এবং হিন্দুরাও করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্বাদর্শেই জমীন্দারী-কার্য্য প্রণালীও চলিতেছে ও কার্য্য বিভাগ সংগঠিত হইয়াছে এবং আমাদের বিবেচনায় জমীন্দারী-কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে উক্তাদর্শই প্রচুর ও উপযোগী, বিশেষ উক্তাদর্শ আমাদের দেশীয় এবং লোকেরাও উহাতে অভ্যস্ত—আরও কার্য্যের অতিশয় ভাগ করা ভাল নহে। ইংরাজ রাজত্বে জমীন্দারী বিষয়ে অনেক নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সকল পরিবর্ত্তন যাহাদের পরিবর্ত্তে হইয়াছে,তাহাদেরই সম প্রকৃতির। তখনও জরিপ ছিল, নগদ টাকায় খাজানা আদায়ও ছিল, খাজানা প্রদানও ছিল, মোকদ্দমাও ছিল, সর্ব্ব রকমই ছিল, অধিকন্তু ফৌজদারী বিচার ভার পর্য্যন্ত ছিল, তখনও ত চলিত।

লেখক শেষে স্বীকার করিয়াছেন যে, পনেরটী সেরেস্তা সংস্থাপন করিতে সকল জমীন্দার পারেন না, কিন্তু আমরা বলি পনেরটী সেরেস্তা করিয়া, অধিক কর্ম্মচারী, অধিক কাগজ-পত্র এবং এক বিষয়েরই অনেক কাগজ পত্র করিবার প্রয়োজন নাই, হিসাব ইহাতে বেশী পরিষ্কার হইতে পারে, বটে, কিন্তু হিসাব-পত্র দেখা অধিক সময় সাপেক্ষ, অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং একটী ভুল বাহির হইলে সকল খাতারই তলব হইতে পারে,—আর জমীন্দারী-কার্য্য বাহিরের লোক নাই বুঝিল, নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা

(অবশ্য বিশ্বাসী হওয়া চাই) বুঝিলেই হইল।

. রেলওয়ের সুবন্দোবস্তের বিষয় বলা হইয়াছে, ইহার অধিক আয় ও অধিক সংখ্যক লোক লইয়া সম্বন্ধ, এ বিষয়ে বলা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, রেলওয়ে অপেক্ষা জমীন্দারী-কার্য্য কি অধিকতর কঠিন ব্যাপার নহে? হিসাবপত্র পরিষ্কার থাকিলেও তাহা মিলাইয়া দেখা সহজ কার্য্য নহে, আর তাহার জন্য কত অর্থেরই ব্যয় এবং কত লোকেরই নিয়োগ করা হয়। একটি প্রজাকে লইয়া যে, কত হাঙ্গামা ভুগিতে হয়, তাহার সহিত সহস্র রেলওয়ে যাত্রীর হাঙ্গামার কি তুলনা হইতে পারে? রেলওয়ে অনেক লোক লইয়া, অনেক অর্থ লইয়া কার্য্য বটে, কিন্তু রাজকার্য্যের ন্যায় জটিল কার্য্য নহে, ক্ষুদ্র বা বৃহতই হউক, জমীন্দারী-কার্য্য রেলওয়ের ন্যায় ব্যবসায়ী কার্য্য নহে, এক প্রকার রাজকার্য্য বটে, একথা লেখক মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব অধিক লেখা বাহুল্য।

"প্রকৃত কৃষি-উন্নতি।" প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া একমাত্র কৃষিকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, কৃষিতে লোকের লাভ নাই, কেননা কৃষিকার্য্য উন্নত প্রণালীতে নহে, এই জন্য অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না, আবার উৎপন্ন বৃদ্ধি করিলেই লাভ হয় না, কেননা অন্য স্থানের আমদানি সস্তা-জিনিসই লোকে ক্রয় করিবে (বিলাতী উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে)। এদেশী বর্ত্তমান কৃষিকার্য্যে যে, লাভ নাই, তাহার প্রমাণ কৃষকদের অবস্থা।

ইহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, কৃষকদিগকে শিল্প সহকারী ফসলের চাষ-শিক্ষা দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ত সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাহাতে হইবে না, জমীন্দারবর্গ, ধনিগণ এবং পঞ্চায়ত সভাকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে হইবে।

দেশের অধিকাংশই কৃষক; তাহাদের কষ্ট দূর হইলেই দেশের উন্নতি হইল। ধান্য গমাদির চাষ ছাড়িয়া দিতেও বলা হইয়াছে। পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, দেশে শিল্প ও কল কারখানা যত বৃদ্ধি পাইবে, পৃথিবীর ভার তত হ্রাস হইবে।

লেখকের মত জমীন্দারী-পঞ্চায়ত-পত্রিকার অপর লেখকের মতের সহিত এক নহে। শতকরা ৯০ জন কৃষক, এ কথা প্রমাণ্য। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া কৃষি কার্য্য করে, কৃষিতে লাভ নাই একথা ঠিক নহে, কেননা উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয় না—যাহা বলা হইয়াছে—সেই উন্নত প্রণালী আমাদের দেশে খাটে কি না, তাহা বিবেচিত হয় নাই, বাষ্পের সাহায্যে লাঙ্গল দেওয়া ত এদেশে খাটেনা, আর নাই বা উন্নত প্রণালীতে হইল, উৎপন্ন দ্রব্য যখন অল্প আয়াসে এরূপ প্রস্তুত হয়, যে অন্যদেশ আমাদের সহিত 'টক্কর' দিতে পারে না, তখন উন্নত প্রণালীর আবশ্যক কি? লেখক ত বলিয়াছেন, "উৎপন্ন বৃদ্ধি করিলেই লাভ হয় না, দ্রব্যের মূল্যের উপর, সুলভতা মহার্ঘতার উপর লাভ লোকসান হইয়া থাকে, অতএব এ বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য।

কৃষকদের দুরবস্থা—তাঁহার বর্ত্তমান কৃষি-কার্য্যে লাভ নাই ইহার প্রমাণ নহে। তাহাদের দুরবস্থা অনেক কারণে। অতিরিক্ত খাজনা, মেলেরিয়া জ্বর-জ্বালা প্রভৃতি, মদ্যাসক্তি, সময়ে সময়ে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা,—পঙ্গপাল প্রভৃতি (এগুলি শিল্পের সহকারী ফসল চাসেরও অপকারী বটে) অতিরিক্ত রপ্তানীর দ্বারা দ্রব্যের মহার্ঘতা, কৃষক পুত্রদের বিলাসিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি —এই গুলির দ্বারা অনিষ্ট নিবারণের উপায় করিলে, বর্ত্তমান কৃষি-পদ্ধতির দ্বারা লাভ হইতে পারে—

শিল্পের সহকারী ফসলের চাষ ধান্যগমাদি নিত্য-আহার্য্য দ্রব্যের চাষের বদলে করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে নিত্য আহার্য্য পদার্থ অতি মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইবে, ক্রমে অন্যদেশ হইতে সস্তায় (যাহা এক্ষণে আমাদের অতি মহার্ঘ হইতেও মহার্ঘ) খাদ্যদ্রব্য এখানে আমদানি হইয়া আমাদের (যাহারা সমস্ত পৃথিবীর আহার যোগাইয়া থাকে) জঠর-জ্বালা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিবে। ইহা ভাল যে, দেশে খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ না হইয়া যদি শিল্পসহকারীরা ফসলের চাষ করা যায়। (আপাততঃ যতদিন না দেশে বহুল অর্থের শিল্প, ফসলের দ্বারা সমাগম হয়, ততদিন মহার্ঘ্যার 'রেট' বর্ত্তমান মহার্ঘ্যের 'রেটে' ধরিতে হইবে) যে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে; আমাদের দেশে (শুদ্ধ আমাদের দেশ নহে) বিলাতবাসী ও অন্যান্য দেশেরও আহার যোগাইতে হইবে—এবং এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সচেষ্টও থাকিবেন। কাযে কাযে গবর্ণমেণ্ট শিল্প-সহকারী ফসলের চাষের বিষয়ে (অধিক আয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও) অধিক মনোযোগ দিতে পারিবেন না। শিল্প ও কল কারখানার দ্বারা পৃথিবীর অনেক ভার কমে, একথাটী প্রমাণ করা চাই। কল কারখানা দ্বারা অল্পলোকেরই বহুল অর্থ হইতে পারে, শ্রমজীবির দল মারা পড়ে, বিলাতই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আর যাহারা খাটিয়া খুটিয়া খাইতে পারে, তাহাদের খাটুনীর স্থলে বড়ই সংকীর্ণ করা হইবে, শ্রমজীবি-দলের খাটিবার শক্তির কি আর ব্যবহার করিতে হইবে না? বিনা ব্যবহারে মরিচা পাড়াইয়া রাখিতে হইবে, ঐ শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য কিকরা হইবে—ও ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার না হইলে, উহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইবে। হইতে পারে, ঐ শক্তি পঞ্চভূতের শক্তিতে মিশাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহা ত ভাল নহে। যখন প্রকৃতির ছড়ান শক্তি গুলির সমবেত করিয়া প্রবল-শক্তি উৎপাদন করিবার জন্য কল, কারখানা করিতেছ, তখন দলবদ্ধ শ্রমজীবির যে নৈসর্গিক শক্তি তাহার ব্যবহার কেন পরিত্যাগ কর।

কৃষক। (২) "স্বর্ণভূমি" যদি বুঝি, তাহা হইলে, কৃষিকার্য্যের চেয়ে মহান্ কার্য্য পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।"

কিন্তু বুঝিতে গেলে, সকল কার্য্যই মহান্, সমাজ-শরীরের কৃষিই বল, শিল্পই বল, ব্যবসায়ই বল, সামাজিক-শাসনই বল, মন্ত্রীত্বই বল, যাহা কিছুই বল না কেন, সকলই সমান, একটী একরূপ যেমন সমাজের উপকার করে, অন্যটী অন্যরূপেও সেইরূপ উপকার করিয়া থাকে। হইতে পারে কতকগুলি কার্য্য সভ্যতা বৃদ্ধির

জন্য; সমাজ তাহা ছাড়া ও জীবিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার মূলে সমাজ রক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। যেমন ব্যবসায়, বিস্তৃত বহির্বাণিজ্য সমাজের অতি প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের জন্য না হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বাণিজ্য না থাকিলে সমাজ চলে না।

লেখক পরিশেষে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য আর চলে না এরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু একথা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করা উচিত; নতুবা ফাঁকা কথায় কায হইবে না। তিনি কেবল বলিয়াছেন দেশ নীরস শুষ্ক ও কঠিন (এই তিনটীই একার্থ-বোধক) হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় উর্ব্বর, অনুধর ও ফলবান্ বলিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—ভূমি যে দিন দিন নিস্তেজ, অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহার দূরীকরণ করিতে হইবে। এ উপদেশ শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু দূরীকরণ করিতে গেলে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতি অনেক অনুসন্ধান করিয়া ও তন্ন তন্ন জানিয়া কার্য্য করাই আমাদের অত্যন্ত বিবেচনা সঙ্গত—কেন না, আমাদের প্রাচীন উপদেশ, সত্বর বিশেষ ফল দেখাইতে, না পারিলেও, বিদেশ হইতে আমদানী উপদেশ অপেক্ষা, পরিণামে যে অধিক ফলোদয়িক হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা "সূচনা" এবং "উদ্ভিদ শরীর" এই দুই প্রবন্ধাংশে লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ; বিশেষ "উদ্ভিদ্ শরীরের" প্রবন্ধাংশের শেষে যে কয়টী কথা স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন, অনেকে অবগত থাকিলেও তাহা বড়ই প্রয়োজনীয় উপদেশ।

জমীন্দার ও রাইয়ত।—এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য জমীন্দার ও রাইয়তের স্বার্থে কোন বৈষম্য নাই; জমীন্দারের স্বার্থ রাইয়তের স্বার্থের বিরোধী নহে এবং রাইয়তের স্বার্থ জমীন্দারের স্বার্থের বিরোধী নহে। স্বার্থ-বৈষম্য পাশ্চাত্য সাম্যনীতির আবিষ্কৃত চস্‌মা পরিয়া দেখিলেই বোধ হয় বৈষম্য,—জমীন্দার ধনী ও রাইয়ত দরিদ্র। লেখক বলিয়াছেন, ওরূপ বৈষম্য স্বাভাবিক কারণে এবং চিরকালই পৃথিবীতে এইরূপ থাকিবে; এ বিষয়ে লেখকের সহিত আমাদেরও একমত। স্বার্থ-বৈষম্য নাই ইহার যুক্তি (১) যদি স্বার্থ বৈষম্য হইত, তাহাহইলে একের যাহাতে লক্ষ্মীশ্রী অন্যের তাহাতে অলক্ষ্মী-শ্রী। জমীন্দার ও রাইয়ত উভয়েরই ভূমির সহিত সম্বন্ধ, অথচ ভূমির উন্নতিতে উভয়েরই উন্নতি।

(২) যদি একের উন্নতি হয়, তাহাতে অন্যের স্বার্থবিরোধ হয় না—প্রজা অর্থশালী হইলে, বা জমীন্দার অর্থশালী হইলে, ভূমির উন্নতি করিয়া, পরিণামে একে অপরের উন্নতি করিতে পারেন, আর একের উন্নতি হইলে অন্যের অপকার কিছুই নাই।

কিন্তু কথা এই, এইরূপ হইলেই ভাল হয়; কার্য্যতঃ পরস্পরের স্বার্থ পরস্পরের বিরোধী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। জমীন্দার খাজনা বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত, প্রজা খাজনা দিতে গোলযোগ করে; যাহা হউক এইরূপ উপদেশমত কায করিলেই জমীন্দার ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল, কিন্তু নানাবিধ কারণে যে ভূমির সহিত জমীন্দার ও প্রজা উভয়েরই সম্বন্ধ, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; সুতরাং খাজনা হ্রাস বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা পাইতে

হয়, এবং এরূপস্থল বিচার-সাপেক্ষ বলিয়া পরস্পরে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আপোষে মিটাইলেই ভাল হয়। যাহা হউক জমীন্দার ও রাইয়ত উভয়ের মনোগত স্বার্থ পরস্পর বিপরীতই বটে; তবে বুঝিয়া দেখিতে গেলে এরূপ না হওয়াই উচিত। কিন্তু যে কোন সভ্য দেশই দেখনা কেন,রাজকোষে অর্থের প্রয়োজন হইলে, তদ্দেশবাসী প্রজারা কি স্বেচ্ছায় সহজে নূতন করস্থাপনে বাধ্য হইতে চায়? আবার রাজকোষ অর্থ-পরিপূর্ণ থাকিলে, দেয় কোন কর রাজকর্ম্মচারীরা কি উঠাইয়া থাকেন? কেবল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলিলে কার্য্য হইবে না, মনের ভাব ও অবস্থার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতেও হইবে।

'পঞ্চায়ত-পত্রিকার' স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র সন্দিহান নহি; বিশেষতঃ, এই পত্রিকা খানি স্বদেশে-হিত-সাধনে সক্ষম হইবে, এই আশায় প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার প্রবন্ধ-সমুহের সংক্ষিপ্ত-সমালোচনায় স্বল্পকলেবরা সুবোধিনীতে বহুল স্থান প্রদত্ত হইয়াছে।

তাঁতীর চাষ-করা।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত্ বুনে,
কাল কর্‌লে এঁড়ে গরু কিনে!

চম্পক-নগরে ধাম, রামকৃষ্ণ দাস নাম,
তাঁতী-পুত্র, তাঁত্ বুনে খায়;—
হাত ভাল ব'লে তার, যুটে ঢের খরিদ্দার,
শ্রমী বড়, দশ টাকা পায়।

সংসারেতে কষ্ট নাই, পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভাই,
সকলেই আছে বর্ত্তমান—
লক্ষ্মী র'ন তার বাটী, জানে না ঝগড়া-ঝাঁটি,
লোক খাঁটি, দেশে খ্যাতবান্।

তাঁতী, পরিশ্রম-গুণে, একাকী যা বস্ত্র বুনে,
চারি জনে সে কায না পারে;
মাসে আট যোড়া পড়ে, চারি টাকা ধরি গড়ে,
একুনে, বত্রিশ টাকা মারে।

শস্তাগণ্ডা পাড়াগাঁয়ে, চাল ভাল এ উপায়ে,
দশ টাকা হাতেও হইল;
এক দিন তাঁতী-সুত, পিতৃ-আজ্ঞা-বশীভূত,
কোন স্থানে গমন করিল।

স্বকার্য্য সাধিয়া তাঁতী, ফুলা'য়ে বুকের ছাতি,
ফিরে যবে আপন ভবন;
আসে সেই মাঠ দিয়া, শস্যচয় নিরখিয়া,—
পুলকে পূরিল তার মন।

ভাবে মনে তাঁতীজন, "বড় সুখী চাষাগণ,
ক্ষেত্র-জাত দ্রব্য অজচ্ছল!
যত পারে, খায় তত, বিক্রয়ে বা লাভ কত,
শ্রমী সবে, পায় শ্রম-ফল।

"কি সব বলিষ্ঠ দেহ! রুগ্ন নহে দেখি কেহ,
হাসি লেগে সকলের মুখে;—
কারো মনে নাহি কষ্ট,মুখ দেখে বুঝি স্পষ্ট—
শ্রম করে সব মন সুখে।

"তাঁত্ বুনে সুখ নাই, চাষবাসে যদি যাই,
হয় তবে, উন্নতি-সাধন;
নূতন খাটুনি-চোটে, শরীরটা সেরে ওঠে,
বল হয়, দসির মতন!

"চাষ ক'রে সুখে থাকা, শস্য বেচে হয় টাকা,
সকল রকমে সুখ হয় !
চাষে ইচ্ছা গেল মোর, দেখিনা কপালজোর!"
বাড়ী এল, প্রফুল্ল-হৃদয়।

কহিছে জনক-প্রতি, "চাষেতে হ'য়েছে মতি,
মতামত শুনি আপনার ?"
দেখিয়া পুত্রের ঝোঁক, কহে সেই, "হয় হোক্,
নাহি ইথে আপত্তি আমার।"

তখন তাঁতীর সুত, কার্য্য করে মনঃপূত,
মাকু আদি ফেলিল বেচিয়া ;
লাঙ্গল করিল ক্রয়, —অন্য দ্রব্য সমুদয়,
চাষাদের নিকটে জানিয়া।

বলদ দু'ঘোড়া আর, আশী টাকা পড়ে তার,
জমী কিনে চাষ আরম্ভিল ;
যে রৌদ্র কাটায় কাঠে, সেই রৌদ্রে পুড়ি মাঠে,
তাঁতীজন ব্যারামে পড়িল।

চাষকরা গেল ঘুরে, আপ্‌শোষে মরে ঝুরে,
বলে, "বাবা, তাঁত্-বুনা ভাল !
এখন পেলাম-টের, লোকসান হ'ল ঢের,
উন্নতির সে আশা ফুরা'ল।"

ভাসিয়া বিষাদ-নীরে, সে তাঁতী স্বকার্য্যে ফিরে,
ক্রীত দ্রব্য ক্ষতিতে বেচিয়া !—
ঘটনার মর্ম্ম যাহা, সুধীগণে কহি তাহা,
শুন সবে, মনোযোগ দিয়া।

যার কায তারে সাজে, আনাড়ী পরের কাযে,
হ'তে হয়, আছে ভাই, স্থির ;
বুঝে সুঝে কার্য্যকারী, সেই বুদ্ধিমান্ ভারি,
ধীরবুদ্ধি,—মূল উন্নতির।

না করিয়া বিবেচনা, কার্য্য করে যেই জনা,
বিদ্ধ হয় অনুতাপ-শরে ;
সব দিক হয় নষ্ট,— মনে পায় মহাকষ্ট ;
হীন যারা, এসে নিন্দা করে।

জগতে নির্ব্বোধ যেই, তাঁতী-দশা পায় সেই,
খোয়াইয়া ব্যবসা আপন !
যেকাযে যে পোক্ত থাকে, সেই কাযসাজে তাকে,
ছাড়িলে তা, অসুখ-কারণ।

গর্দ্দভেতে মোট বহে, ঘোড়ার সে কায নহে,
বলদ—চাষের কাযে ভালো ;
তাঁতী যে—বুনিবে বস্ত্র, পাঠান ধরিবে 'অস্ত্র',
বুঝ সবে, দিয়া জ্ঞান-আলো।

ধরি পেশা আপনার, বুদ্ধিবলে কার্য্য যার,
সংসারে, উন্নতি হয় তারি ;
ধোপা যদি ধোপা থাকে, কেবা নিন্দা করে তাকে
নিজ পেশা ছাড়া—বকমারী।

নিজের হাড়ীর হাল, লোকে দেয় গালাগাল,
লাঞ্ছনা—গঞ্জনা কত আর !
দেখিয়া ছুটুক্‌নেশা, রাখি সবে নিজ পেশা,
গলে পর, প্রশংসার হার।

বুঝ, প্রবন্ধের মর্ম্ম, নাড়ী-টেপা বৈদ্য-কর্ম্ম ;
সে কাজ কি ব্রাহ্মণের সাজে ?
উড়ে যদি পাল্কী বহে, কভু নিন্দনীয় নহে ;
কভু শোভে কেরাণীর কাযে ?

দেখে মনে বড় খেদ, শূদ্রগণ পড়ে বেদ !
চতুষ্পাঠী-অধ্যাপক—চাষা !!
কায়েৎ আড়তধারী, পুরুষ-সভায় নারী !
দেখে, মুখে নাহি সরে ভাষা।

শোভা যার আবরণে, সে পরপুরুষ সনে
হাস্যালাপ করে মন সুখে !
কালে কালে হ'ল কিবা, রজনী কি হ'ল দিবা !
দেখে, প্রাণ জ্বলে মনোদুখে।

কারে বা এ দুঃখ বলি ? চারিদিকে শত্রু বলী,
ভেড়ে আসে হাতে নিয়ে লাঠী ;
কেবা কার দুঃখ ভাবে, শেষ কি প্রাণ টা যাবে ?
মিছে ভেবে, দেহ হ'ল মাটী !
কড়া লাগে উপদেশ, জন্মে তায় হিংসা দ্বেষ,
হিতবাক্যে বিপরীত ফল !
প্রশ্রয় যে দিবে পাপে, পুড়িবে সে মনস্তাপে,
অবশেষ, যাবে রসাতল !
পড়িয়াছে কলি ঘোর, ধর্ম্মের কাহিনী চোর,
শুনিয়াছে কবে ? শুনি হেন !
কার্য্য করে যে যেমন, ফল ভোগে সে তেমন,
আমি ব'লে, দোষী হই কেন ?

শ্রীরাধাজীবন রায়।

রঙ্গ-ভূমি।

বিগত ১৩ ই ভাদ্রের সঞ্জীবনী-পত্রিকায়, কলিকাতার দেশীয় নট্যশালা-বিষয়ক একটী মন্তব্য পাঠ করিয়া যুগপৎ দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। নাট্যশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে দেশের কি ক্ষতি হইয়াছে এবং সঞ্জীবনী দেশীয় নাট্যশালা-সমূহের প্রতি এরূপ রোষ-কষায়িত-লোচনে দৃষ্টিপাত করেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে, নাট্যশালার দোষগুণ একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পার্থিব পদার্থ মাত্রেই, দোষ গুণ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। নাট্যশালাও এই সাধারণ নিয়মের অধীন ; নাট্যশালা যে, একবারেই দোষ-সংস্পর্শশূন্য, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে, ইহাতে অনেক গুণও আছে ;—নাট্য-শালা একটী উজ্জল দর্পণ-স্বরূপ। দেশীয় সমাজের অবিকল প্রতিবিম্ব ঐ দর্পণে প্রতিফলিত হয় ; সুতরাং সমাজ ঐ দর্পণে স্বকীয় আকারগত কিছু দোষ সন্দর্শন করিলে, অনায়াসেই তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। মনুষ্যগণ দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের পর, নাট্যশালার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ জনিত স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারেন এবং ধর্ম্মমূলক নাট্যগীতি-সমূহের অভিনয়-সন্দর্শন করিয়া, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষতা-সাধন করিতে পারেন। 'সীতার বনবাস', 'বুদ্ধদেব', 'আদর্শ-সতী', 'নল-দময়ন্তী', 'দক্ষ-যজ্ঞ', 'নন্দবিদায়', 'প্রভাস-মিলন', 'চৈতন্য-লীলা', 'গোপী-গোষ্ঠ', 'পূর্ণচন্দ্র' প্রভৃতি নাটক-সমূহের অভিনয় সন্দর্শন করিলে, কোন্ পাষণ্ডের প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত এবং অন্তরাত্মা প্রেমরসে পরিপ্লুত না হয় ? নাট্যশালায়, দেশীয় চিত্র ও অন্যান্য শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন করে এবং নাট্যশালায় লোক-বিশেষের হৃদয় নিমীলিত কবিত্ব-প্রসূনের বিকাশ-সাধন করে। নাট্যশালার সহিত সম্পর্ক না থাকিলে, কবিকুলতিলক সেক্ষপিয়র বোধ হয় ইহজগতে অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না ;

এবং অস্মদেশীয় গীতি-কাব্য লেখকেরাও তাঁহাদিগের সুমধুর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইতেন না। বর্ত্তমান নাট্যশালার অভিনয় গুণে। দীনবন্ধুর নাটক-নিচয়, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'রাজা বসন্তরায়' (বৌঠাকুরাণীর হাট) ও অন্যান্য লেখকের নাটকাদি সর্ব্বজন সমাদৃত ও উক্ত কবিগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। নাট্যশালার আরও অনেক গুণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্যভয়ে প্রধান গুলির উল্লেখ করিয়া বিরত হইলাম। এক্ষণে, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন—যে নাট্যশালা সমাজ-সংস্কারক, শ্রমাপনোদক বিশুদ্ধ আমোদ-দায়ক, এবং যাহা শিল্পবিদ্যা ও কবিত্ব-শক্তির প্রস্ফুরক তাহা কত দূর নিন্দার্হ হইতে পারে। নাট্যশালার দোষ গুলি অশেষ গুণাকর শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায় সকলের উপেক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। তবে যে বিষয় হউক না অসদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলেই, দোষের কথা হইয়া পড়ে। নাট্যশালায় কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বিষয়ের অভিনয় হইলেই দোষ। অশ্লীল পুস্তক-পাঠ করাই গর্হিত কর্ম্ম ; নতুবা পুস্তক-পাঠ দোষের বিষয় নহে। সীতার বনবাস, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, পূর্ণচন্দ্র, নন্দবিদায় প্রভৃতি পুস্তক সমূহ যে নাট্যশালায় অভিনীত হয়, সে নাট্যশালার প্রতি দোষারোপ করা কত দূর ন্যায়-সঙ্গত বলিতে পারি না।

বারাঙ্গনা-দ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভিনয় দেখান, বিসদৃশ কার্য্য বটে ; কিন্তু তাহা অপরিহার্য্য। নাট্যশালায় পুরুষজাতি-দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় হইলে, অভিনয় যথাযথ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া অসম্ভব, ইহা কে না স্বীকার করিবে? সুতরাং স্ত্রীজাতি দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় হওয়া আবশ্যক। তথাপি যদি পুরুষ-জাতির দ্বারা স্ত্রীচরিত্রাভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীচরিত্রাভিনয়ের জন্য কতকগুলি বালকের এক বারে পরকাল নষ্ট করিতে হয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ; কারণ, পরিণতবয়স্ক পুরুষের দ্বারা স্ত্রীচরিত্রাভিনয় একেবারে অসম্ভব। এরূপ স্থলে উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া ও স্ত্রীচরিত্রাভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীনতার জন্য বারাঙ্গনা দ্বারাই অভিনেত্রীর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বালকদিগের পরকাল নষ্ট করা অপেক্ষা এ প্রথা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা নাই। আমাদের দেশের সৎস্বভাব-সম্পন্না ভদ্র মহিলাগণ সর্ব্বদাই অবগুণ্ঠনবতী ; লজ্জাই তাঁহাদের একমাত্র ভূষণ ; তাঁহারা যখন স্বপরিবারস্থ পুরুষগণের নিকট মুখাবরণ উন্মোচন করিতে লজ্জায় মৃতকল্পা হন, তখন যে তাঁহারা রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের অভিনয় করিতে স্বীকার করিবেন, ইহা দুরাশা মাত্র। অগত্যা নাট্যশালায় বারাঙ্গনাদিগের দ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইয়া থাকে। যদি সঞ্জীবনী অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাঙ্গালাদেশের হিন্দু অথবা অন্য কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত কতক গুলি ভদ্র মহিলাকে দেখাইয়া দিতে পারেন যে, তাঁহারা নাট্যশালায় আসিয়া অভিনয় করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাহইলে যথার্থই রঙ্গভূমির পবিত্রতা সাধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশ-হিতৈষীতার

সমধিক পরিচয় দেওয়া হয় ; কিন্তু, আমাদের বোধ হয়, হিন্দু-সম্প্রদায় অন্বেষণ করিলে সঞ্জীবনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না,অন্য কোনও সম্প্রদায় হইতে ভদ্র মহিলা নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন, 'অনেক যুবক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে যাইয়া এই সকল বারাঙ্গনার হাব ভাবে ভুলিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করেন' ; কিন্তু সঞ্জীবনীর এরূপ উক্তি অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। যে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র যুবক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে যান, অভিনয়-কালে অভিনীত পুস্তকের দোষ গুণের বিচারেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, বারাঙ্গনাদিগের হাব ভাবের প্রতি মনোযোগ দিবার তাঁহার অবকাশ থাকে না। তিনি কখন অভিনয়-কৌশলে মুগ্ধ হন, কখন বা পুস্তকের রচনা-লালিত্যে বিমোহিত হইয়া পড়েন। বরাঙ্গনাদিগের হাব ভাব লক্ষ্য করিতে তাঁহার আর সময় থাকে না। ইন্দ্রিয়-সংযমের ক্ষমতাও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে। অপিচ, অভিনেত্রীগণ, যখন যে চরিত্রের অভিনয়-কার্য্যে নিয়োজিত, তখন সেই চরিত্রের সম্যক প্রস্ফুরণ জন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয় ; সেসময়ে হাব ভাব দেখাইবার অবসর পাওয়া তাহাদিগের পক্ষে বড়ই দুরূহ।

যে সকল নীচপ্রকৃতি—অশিক্ষিত ব্যক্তি, কেবল পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নিরন্তর সমুৎসুক, তাহারা রঙ্গালয়ে কেন, সর্ব্বত্রই, এমন কি ধর্ম্ম-সমাজেও সমাগতা রমণীজনের রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, চরিত্র কলুষিত করিতে পারে। তবে কি রমণীজনপূর্ণ ধর্ম্মসমাজে যাওয়াও নিষিদ্ধ ? এ স্থলে আমরা একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পরিলাম না। কোন স্থলে মহাভারত-কথা হইতেছিল। কথক-মহাশয় যত্ন-সহকারে নানা উপদেশ-পূর্ণ পবিত্র মহাভারত-কথা শুনাইতে ছিলেন। একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মহাভারত-কথা শুনিতে আসিত। এক দিন কোন প্রতিবেশিনী ঐ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি মহাভারত শুনিয়া কি উপদেশ পাইয়াছ ?" স্ত্রীলোক অম্লানবদনে উত্তর করিল,—"কেন,মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে,—পঞ্চস্বামী গ্রহণ করিতে পারা যায় ; দ্রৌপদীরও পঞ্চস্বামী ছিল।" এক্ষণে, পাঠক মহাশয় দেখুন, মহাভারত হইতে ঐ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক কিরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছে!! তাই বলিতেছিলাম,দুশ্চরিত্র লোকে উত্তম বস্তুকেও মন্দ চক্ষে দেখে, আর সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি মন্দ বস্তুকেও উত্তম চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তবে আর রঙ্গালয়ে বারবনিতার দোষ কি ? যদি দোষের মূলে কুঠারঘাত করিতে হয়, তবে বারবনিতাগণকে কলিকাতা হইতে দূরীভূত করাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরতর উপায়। সঞ্জীবনীর নিম্নলিখিত কবিতাটী স্মরণ করা উচিত—

"মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।
সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পার্থিব সমুদয় বিষয় দোষ-গুণ-পূর্ণ। রঙ্গালয়ে বারবনিতা-দ্বারা অভিনয়-প্রথা দোষসঙ্কুল সন্দেহ নাই ; কিন্তু, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই, এরূপ

নহে। অনেকে কেবল বারবনিতাগণের নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্তই নরকের জলন্ত-চিত্র-স্বরূপ মহা পাপময় বেশ্যালয়ে যাইতে চাহেন; কিন্তু নাট্যশালা হইতেই তাঁহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং আর তাঁহাদিগকে পাপের চরম-সীমায় পদার্পণ করিতে হয় না। আবার নাট্যশালার বৃত্তিভোগী হইয়া অনেক বেশ্যারও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অনেক বেশ্যা আছে, যাহারা দারিদ্র্য-বশতঃ জঠরানলের প্রবলতম তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। নাট্যশালা হইতে নিয়মিতরূপ মাসিক বৃত্তি পাইলে, ইহাদের জঘন্যবৃত্তি পরিত্যাগ করাও অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের অথবা সমাজ-ভুক্ত কোন সম্প্রদায়ের কোন দোষ থাকিলে, নাট্যশালায় ব্যঙ্গচ্ছলে সেই দোষের অভিনয় হয়। তাহাতে উপকার ব্যতিরেকে অপকার নাই; কারণ, যে সম্প্রদায়ের দোষ ব্যঙ্গ-চ্ছলে অভিনীত হয়, সেই সম্প্রদায় সাবধানতা-সহকারে সেই দোষ সংশোধন করিতে পারেন। এ বিষয়ে সমাজ অথবা সম্প্রদায়-বিশেষ নাট্যশালার নিকট সম্যক্ ঋণী। নাট্যশালা বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গ করে না, কেবল সম্প্রদায় সমূহের দোষ সংশোধনরূপ সুমহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াই এরূপ করিয়া থাকেন। রঙ্গালয়ে কেবল সম্প্রদায়-বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তক অভিনীত হয়; এই অভি-যোগ যে কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। যে সকল নাটক বা প্রহসন আজকাল রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ করিলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও কুরীতি-জনিত যে সকল দোষ আমাদের সমাজে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিতেছে, তাহা সংশোধন করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। 'বঙ্কেশ্বর', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'তাজ্জব-ব্যাপার', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'ঘটক-বিদায়' প্রভৃতি প্রহসন গুলি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহারা যে সমাজের উপকার সাধনে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা দর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা, ইংরাজানুকরণ, পাশ্চত্য-সভ্যতার পোষকতা হেতু দেশীয় সামাজিক-রীতি-নীতি-আচার-ভ্রষ্টতা জনিত সমাজে যে সকল বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা এই পুস্তক গুলিতে স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্য, ঐ প্রহসন গুলির প্রত্যেক চরিত্রে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। তবে কেন সঞ্জীবনী সম্প্রদায় বিশেষের উপর নাট্যশালার বিদ্বেষবুদ্ধির দোষারোপ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি নাট্যশালার বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে, সঞ্জীবনী দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আর একটা কথা, সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন, নাট্যশালা ধর্ম্মের ভণ্ডাম করিয়া থাকেন। সঞ্জীবনী কিরূপে জানিলেন নাট্যশালা ধর্ম্মের ভণ্ডাম করে?—অর্থাৎ তথায় প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিরাজিত নাই। সঞ্জীবনীর ইহা সুপ্রমাণ করা আবশ্যক। কাহারও প্রতি দোষারোপ করিতে হইলে, যুক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই দোষ প্রমাণ করা চাই, নতুবা বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে? কে তাহা বিশ্বাস

করিবে? নাট্যশালা ধর্ম্ম-পুস্তকাভিনয়ে দর্শকের মনে ধর্ম্মভাব আনিয়া দেয় মাত্র; ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবে. ইহা অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণের অভিপ্রেত নহে। যখন যে চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়, তখন সেই প্রকৃতির ভাব, দর্শকের মনে আনিয়া দেওয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের করণীয় কার্য্য। কি স্বদেশীয়. কি ইউরোপীয়, সকল নাট্যশালার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তখন ভণ্ডামী—বলিতে চাও কিরূপে? বাহিরে যাহারা উপদেশ-দানে, বক্তৃতাপ্রদানে, ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া আপনাদিগকে'ধর্ম্মাবতার' বলিয়া সমাজে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, অথচ যাহাদের অভ্যন্তরিক কাণ্ড প্রজ্বলিত নরক-কুণ্ড অপেক্ষাও ভয়াবহ, তাহারাই প্রকৃত ভণ্ড ও তাহাদের কার্য্যই প্রকৃত ভণ্ডামী। বরং সাধারণের চোক ফুটাইবার জন্য নাট্যশালায় ঐরূপ ভণ্ডামীর জলন্ত-চিত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে; সুতরাং নাট্যশালা স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্যেই সর্ব্বদা ব্রতী।

এক্ষণে, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, সঞ্জীবনী নট্যশালার প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা কতদূর ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। যদি যুক্তিসঙ্গত বোধ না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই নাট্যশালার প্রতি কোন গূঢ় বিদ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া সঞ্জীবনী এরূপ সাধুজনবিগর্হিত অযৌক্তিক মন্তব্য প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন—ইহার কোন ভুল নাই।

শ্রী:—

কহ্লার-কুসুম।

কে তুমি কার কামিনী, দিন যামিনী,
কাটাও সরোবরে?
খেয়েছ লাজের মাথা, তাই কি হেথা,
ভাস্‌ছ আমোদ ভরে?
দেখনা পঙ্কজিনী, বাসর-মণি
অস্ত গেছে ব'লে,
রয়েছ মলিন মুখে, মনের দুখে
চায় না বদন তুলে।
এদিকে উদয় শশী, পরাণ খুসি,
পতির সমাগমে,
আমোদে কুমুদ-কলি, নয়ন মেলি,
দেখ্‌ছ সসম্ভ্রমে,
এমতি জগৎ মাঝে, যতই সাজে,
নারী পতিপ্রাণা,
সবারি সরম আছে, ঘেঁস্‌লে কাছে,
লাজে ম্রিয়মানা।
তুমি যে লজ্জাহীনা, দিক্‌বসনা,
তোমার সম কেবা?
সহজে হাস্যমুখে, মনের সুখে,
সবার কর সেবা।
ছি ছি ছি কুসুম তোমার, দেখে ব্যাভার,
কুলের কুল-নারী,
নামায়ে বদনখানি, আড়নয়নি,
দিচ্ছে টিটিকারি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাইবেল-সমালোচনা।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মথি ও লূক যে যোষেফ, মরিয়ম, কিম্বা যীশুর নিকটে, যীশুর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের সুসমাচার লিখিয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহারও কোন প্রমাণ নাই; সুতরাং আমরাই বা সেরূপ বিশ্বাস করিব কেন? মথি ও লূক যদি ঈশ্বরের আত্মার আবেশে না লিখিয়া থাকেন এবং যদি যোষেফ, মরিয়ম বা যীশুর নিকটে শুনিয়াও না লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই যীশুর জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। এক্ষণে দেখা উচিত যে, জনশ্রুতি কতদূর সত্য ও এই জনশ্রুতির মূলে কে কে ছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যেই বা কে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

জনশ্রুতি কতদূর সত্য হয়?—সংসারে একটা অসাধারণ বা মহৎ ঘটনা ঘটিলে কিম্বা এক জন অসাধারণ বা মহৎ ব্যক্তির আগমনে, সংসারের লোকের স্বভাব এই যে, কতকগুলি লোক সেই ঘটনার বা ব্যক্তির স্বপক্ষ, আর কতকগুলি লোক সেই ঘটনায় বা ব্যক্তির বিপক্ষ হইয়া, প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ পক্ষকে বলবৎ করিবার জন্য নানা প্রকার প্রমাণ-উদ্ভাবন করতঃ প্রমাণগুলিকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। মথি ১০; ৩ পড়িলে জানা যায় যে, মথি একজন করগ্রাহক ছিলেন। সে সময়ের করগ্রাহকগণ তাহাদের বাক্‌পটুতা, শঠতা ও স্বার্থপরতার জন্য যে বিখ্যাত ও সাধারণের ঘৃণার ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল, তাহা মথি ১১; ১৯ পড়িলে জানা যায়। সেই মথি যীশুর একজন শিষ্য এবং প্রেরিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং মথি খ্রীষ্টের পক্ষে নিজমত বলবৎ করিবার জন্য খ্রীষ্টের জন্মসম্বন্ধে স্বপক্ষ জনশ্রুতির উপরে স্বীয় কল্পিত প্রমাণ উদ্ভাবন ও সেই সকল প্রমাণ অলঙ্কৃত করণে যে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; আর লূক একজন পণ্ডিত, চিকিৎসক ও চিত্রকর ছিলেন; এবং তিনিও যীশুর একজন শিষ্য হইয়াছিলেন। গুরুর দোষ ও নিন্দা আচ্ছাদন করিয়া অলঙ্কার সহ তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে শিষ্যমাত্রেরই স্বভাব; লূক যে সে স্বভাব-বিরুদ্ধ শিষ্য ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং লূকও আপন গুরু যীশুকে বাড়াইয়া ঈশ্বরত্ব দিবার জন্য জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-প্রাবল্যে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া লূক ১; ১—৩ পড়িলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সেই সময়ে যীশুর সেবকদিগের মধ্যে যীশুর বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল বিষয় সুনিশ্চিতরূপে প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ যীশুর সেবকদের মধ্যে যীশুর সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি ছিল,

লূক সেই সকলের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সুসমাচার লিখিয়াছিলেন। সুতরাং, লূকের সুসমাচারের মধ্যে অনেক প্রমাদ ও অলঙ্কৃত মিথ্যা গল্প থাকিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জনশ্রুতির মূলে কে কে ছিলেন?—যীশুর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে কিছু জনশ্রুতি ছিল, তাহার মূল যীশুর মাতা মরিয়ম, সখরিয়ের স্ত্রী ইলীশাবেৎ, সখরিয় এবং মরিয়মের স্বামী যোষেফ। মরিয়মের সহিত যোষেফের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে পবিত্র-আত্মা মরিয়মের উপরে নামিয়া আসাতেই হউক, (লূক ১ ; ৩৫) বা দ্রাক্ষারস পান করিয়া মরিয়মের মত্ততার অজ্ঞানাবস্থাতে অজ্ঞাতসারে মরিয়মের উপর অপর কোন মনুষ্য নামিয়া আসাতেই হউক, অথবা যোষেফের দ্রাক্ষারস পানে মত্ততার অজ্ঞানাবস্থাতে যোষেফের অজ্ঞাতসারে যোষেফের উপর মরিয়মের জ্ঞাতসারে উঠিয়া যাওয়াতেই হউক, * মরিয়মের যে গর্ভ হইয়াছিল, তাহা মরিয়ম ভিন্ন প্রথমে আর কেহই জানিত না ; এবং গাব্রিয়েল দূতও নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কুমারী অবস্থায় গর্ভের সংবাদ তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেন নাই, এই জন্য জনশ্রুতির মূলে মরিয়ম প্রথম।

(মরিয়মের গর্ভবার্ত্তা কি সত্য সত্যই গাব্রিয়েল দূত আসিয়া মরয়িমকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, কিম্বা মরিয়ম তাঁহার গর্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া গাব্রিয়েল দূতের দোহাই দিয়া স্বয়ং ঐরূপ রটাইয়াছিলেন, অথবা মরিয়ম তাঁহার গর্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্তা অনুভব করিয়া সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাঁহার জ্ঞাতি ইলীশাবেৎ ও সখরিয়ের নিকটে যাওয়াতে ইলীশাবেৎ ও সখরিয় মরিয়মকে ঐরূপ কৌশল-জনক গল্প রটাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে। দূত যেমন মরিয়মকে দর্শন দিয়া তাঁহার গর্ভসংবাদ তাঁহাকেই দিয়াছিলেন, যদি সেই সময়ে যোষেফকে ও প্রতিবাসী আরও দুই চারি জনকে দর্শন দিয়া সেই সমাচার জ্ঞাত

* পাঠকগণ! পাপীদিগের মধ্যে দ্রাক্ষারস-পানে বা সুরাপানে স্ত্রীলোকের মত্ততার অজ্ঞানাবস্থাতে স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে সহবাস ও গর্ভধারণ বিচিত্র ব্যাপার নহে ; কিন্তু যোষেফ বা মরিয়মের ন্যায় সাধু ও সাধ্বীর ঐরূপ মত্ততার অজ্ঞানাবস্থা বিশেষতঃ যোষেফের মত্ততার অজ্ঞানাবস্থাতে যোষেফের অজ্ঞাতসারে যোষেফের সহিত মরিয়মের সহবাস ও গর্ভধারণ নিতান্ত অসম্ভব এবং গাঁজাখুরী কথা বলিয়া আপনারা আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন, সেই জন্য বাইবেল হইতে দুইটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতে বাধ্য হইলাম, যথা—(১ম) পূর্ব্বকালে অতি সাধু ব্যক্তিও সুরাপানে এরূপ উন্মত্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেন যে, কেহ সে সময়ে তাঁহার নিকটে আসিলে বা তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিলেও তিনি জানিতে পারিতেন না, তাহার দৃষ্টান্ত সাধু নোহ ও তাঁহার তিন পুত্র,—আদিপুস্তক ৯ ; ৮—২৩। (২য়) পূর্ব্বকালে অতি সাধু ব্যক্তিও সুরাপানে এরূপ উন্মত্ত ও অজ্ঞান হইতেন যে, সেই সময়ে কোন স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত গর্ভধারণোপযোগী সহবাস পর্য্যন্ত করিয়া গেলেও তিনি কিছুই জানিতে পারিতেন না, তাহার দৃষ্টান্ত সাধু লোট ও তাহার দুই কন্যা।—আদিপুস্তক ১৯ ; ৩০—৩৭।

করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে মরিয়মের চরিত্রে সন্দেহ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে যোষেফেরও দ্বিধা জন্মিত না, এবং যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও পাপীদের ত্রাণ-কর্ত্তা বলিয়া প্রমাণ করিতে যীশুর শিষ্যদিগকে এত বেগ পাইতে হইত না এবং যে পরিত্রাণ-কার্য্য সাধন করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকে অবতার হইতে হইয়াছিল, তাহাও অতি সহজে হইত।)

জনশ্রুতির মূলে সখরিয়ের স্ত্রী ইলীশাবেৎ দ্বিতীয়; যেহেতু লূক ১; ৩৯ পড়িয়া বুঝা যায় যে, মরিয়ম আপনাকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়াই গাত্রোত্থান করিয়া নাসরৎ হইতে যিরূশালেমে তাঁহার জ্ঞাতি ইলীশাবেতের নিকট ত্বরায় গমন করিয়াছিলেন, ও ইলীশাবেৎকে অবশ্যই তাঁহার গর্ভের বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছিলেন, কারণ তিনমাস কাল ইলীশাবেতের বাটীতেই বাস করিয়া, পরে নিজবাটীতে ফিরিয়া আসেন। মরিয়মের বাসস্থান নাসরৎ হইতে যিরূশালেমের ব্যবধান প্রায় ৮০ মাইল।

মরিয়মের গর্ভের বিষয়, যোষেফ বা অপর কোন ব্যক্তি জানিবার পূর্ব্বে ইলীশাবেৎ জানিতে পারিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত জনশ্রুতির মূলে ইলীশাবেৎ দ্বিতীয়। সখরিয় ও ইলীশাবেতের বাটীতে যখন কুমারী মরিয়ম কাঁচা গর্ভাবস্থায় তিন মাস ছিলেন, তখন সখরিয়, মরিয়মের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার স্ত্রীর নিকটেও নিশ্চয় সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত জনশ্রুতির মূলে সখরিয় তৃতীয়। আর মরিয়ম তিন মাসের গর্ভাবস্থায় তাঁহার জ্ঞাতি ইলীশাবেতের বাটী হইতে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলে, যোষেফ তাঁহাকে গর্ভবতী বুঝিয়া তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন, এই জন্য জনশ্রুতির মূলে যোষেফ চতুর্থ। জনশ্রুতির মূলে যে চারিজনকে দেখাইলাম, তাহাদের প্রত্যেকে কে কি প্রকার অবস্থার ও প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং কাহার কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

প্রথমে যীশুর মাতা পূজনীয়া কুমারী মরিয়ম—(ক) মরিয়ম যখন যোষেফের সহিত বাকদত্তা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা ছিলেন কি না, এবং নাসরতে যেখানে মরিয়ম সেই সময়ে বাস করিতেন, সে স্থানে মরিয়মের আর কোন আত্মীয় স্বজন বাস করিতেন কি না? (খ) মরিয়ম যে গৃহে বাস করিতেন সে গৃহে মরিয়ম ভিন্ন আর কেহ বাস করিতেন কি না? (গ) মরিয়ম লেখাপড়া জানিতেন কিনা? (ঘ) মরিয়মের ভরণ পোষণ কিরূপে নির্ব্বাহ হইত? (ঙ) সে সময়ে মরিয়মের বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল? (চ) মরিয়ম গর্ভবতী হইবার কতদিন পূর্ব্ব হইতে যোষেফের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন? (ছ) যোষেফের সহিত মরিয়মের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্ব হইতে উঁহাদের পরস্পর আলাপ পরিচয় ছিল কি না? (জ) বিবাহের পূর্ব্বে মরিয়ম একাকিনী যোষেফের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিতেন কি না, একাকিনী যোষেফের সহিত কোন স্থানে যাইতেন কিনা? (ঝ) মরিয়ম সুরাপান করিতেন কি না? এবং (ঞ) মরিয়ম

পর্দ্দানসিন্ কুলবালা ছিলেন, অথবা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের ন্যায় পদব্রজে মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, বেড়াইতেন? এই সকল অতি প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় স্পষ্টরূপে শাস্ত্রে কিছুই লেখা নাই—শাস্ত্র হইতে আমরা যতটুকু আভাস ও ইঙ্গিত পাইয়াছি, এবং তাহার উপরে আমাদের ন্যায়, যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রয়োগদ্বারা যতদূর স্থির করিতে পারি তাহাতে প্রতীয়মান হয়;—

(ক) কুমারী মরিয়ম যখন যোষেফের সহিত বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না এবং তাঁহার ভ্রাতা, ভগ্নী বা আত্মীয়বর্গ কেহই ছিলেন না, অন্ততঃ তাঁহারা কেহ মরিয়মের নিকটে থাকিতেন না—থাকিলে, শাস্ত্রে তাঁহাদের কথা কোন স্থানে না কোন স্থানে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ থাকিত। যোহনের ১৯ অধ্যায় ২৫ পদে, যীশুর ক্রুশে হত হওন কালিন, ক্লোপার(Cleopha's)স্ত্রী মরিয়ম নাম্নী এক জন স্ত্রীলোক যীশুর মাতার ভগ্নী বলিয়া যদিও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা ঐ এক মাত্র স্থানে, আর তিনি যীশুর মাতার সহোদরা বা জ্ঞাতি-ভগ্নী ছিলেন অথবা কোন প্রকার পাতান ভগ্নী ছিলেন শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই—দুই জনেরই নাম মরিয়ম হওয়াতে এবং তাঁহাদের একজনকে অন্যজন হইতে প্রভেদ করিবার জন্য তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে কোন বিশেষণ পদ না থাকাতে, তাঁহারা যে সহোদরা ভগ্নী না হইয়া 'মিৎভগ্নী' ছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভব।

মরিয়মের বাটীতে তাঁহার কোন আত্মীয় থাকিলে, মরিয়মের নিকটে যে গাব্রিয়েল দূত আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাটীর কেহ না কেহ দেখিতে পাইতেন, অন্ততঃ মরিয়মের ও দূতের কথোপকথন শুনিতেও পাইতেন, তাহা হইলে মরিয়ম দূতের দর্শন পাইবার পরে গাত্রোত্থান করিয়া ত্বরায় সখরিয়ের বাটীতে না যাইয়া অগ্রে বাটীর অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিকট দূতের দর্শন-বৃত্তান্ত বলিতেন, তাঁহাহইলে, মরিয়ম অমন যুবতী অবস্থায় যখন প্রায় ৮০ মাইল দূরে তাঁহার ইলীশাবেতের বাটীতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোন একজন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথা লূক নিশ্চয়ই লিখিতেন, তাহা হইলে, আগস্ত কৈসরের আজ্ঞানুসারে যখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র লোকদের নাম লিখিয়া দিতে হইয়াছিল, এবং যোষেফ ও মরিয়ম তাঁহাদের নাম লিখাইয়া দিবার নিমিত্ত নাসরৎ হইতে বেৎলাহমে গিয়াছিলেন, তখন মরিয়ম পূর্ণগর্ভা ছিলেন; সুতরাং সেরূপ অবস্থায় যোষেফ ভিন্ন আর কোন আত্মীয় মরিয়মের সঙ্গে থাকিতেন, এবং তাহা হইলে, নবপ্রসূত শিশু যীশুকে লইয়া মরিয়ম ও তাঁহার স্বামী যোষেফ যখন বেৎলেহম হইতে মিশরে পলায়ন করেন (মথি ২; ১৪) তখনও মরিয়মের অন্য কোন আত্মীয় মরিয়মের ও যোষেফের সঙ্গে যাওয়ার বিষয়, শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিত। কিন্তু মরিয়মের কোন আত্মীয়ের কথা যখন এরূপ কোন স্থানেও উল্লেখ নাই তখন স্বীকার করিতে হইতেছে যে **মরিয়মের গর্ভ হওন কালীন তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি কোন আত্মীয়ই জীবিত ছিল না—থাকিলেও, মরিয়ম কোন আত্মীয়ের নিকটে থাকিতেন না।**

ক্রমশঃ

শোক-সংবাদ।

স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র।

ভারত-গগন হইতে আবার একটি নক্ষত্র খসিয়াছে ;—১৮ই শ্রাবণ, রবিবার প্রত্যুষে বারাসত-নিবাসী মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্র ৭০ বৎসর বয়সে অনন্তধামে নীত হইয়াছেন। একে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভাবে, দুই দিক হইতে দুইটি তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপর আবার এই নূতন শোক!—জানি না, আমাদের অদৃষ্টে আরও কি আছে! নিদারুণ নিয়তি-পেষিত আমরা—আমাদের দুঃখের অন্ত নাই। দুঃখিনী বঙ্গমাতা যে, উপর্য্যুপরি এত শোক পাইবেন, তাহা আমরা স্বপনেও ভাবি নাই। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই,—কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না।

কালীকৃষ্ণ বাবু সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন না ;—অলক্ষ্যভাবে পরোপকারে তাঁহার মহজ্জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল—পরোপকারই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত।—যে তাঁহাকে জানিত, সে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত।

তিনি 'হোমিওপ্যাথিক' চিকিৎসক ছিলেন। রোগিগণের প্রতি তাঁহার দয়ার বিষয় শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয় ; তিনি রোগিগণের বাটী গমন করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন, স্বহস্তে ঔষধ সেবন করাইতেন এবং নিজ বাটী হইতে পথ্য লইয়া যোগাইতেন। কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিলে, তাঁহার আর চিত্তের শান্তি থাকিত না।—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে নিজের ক্ষমতোপযোগী সাহায্য করিয়া, পরিশেষে, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণের নিকটে তাহাদিগের জন্য অর্থ-ভিক্ষা করিয়া প্রেরণ করিতেন। পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, নিজের শরীর অসুস্থ থাকিলেও, তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। বাটীর ভৃত্যগণ-সম্বন্ধেও তাঁহার ভিন্নভাব ছিল না।

ভারতবর্ষের মধ্যে বারাসতেই সর্ব্ব প্রথমে 'বালিকা-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় ;—দেশীয় বালিকাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করাই উক্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কালীকৃষ্ণ বাবুর দ্বারাই এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। আমরা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, বারাসতের লোকেরা তাঁহার স্মরণার্থে তত্রস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম "কালীকৃষ্ণ মিত্রের বালিকা-বিদ্যালয়" দিয়াছেন।

তিনি সকলকেই ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা-প্রদান করিতেন। কেহ মন্দ কর্ম্ম করিলে, তাহাকে ভৎসনা করিতেন এবং ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা তদনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়, বিধিমতে তাহারই চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার নিজের যাহা আয় ছিল, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণোপযোগীমাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট তিনি গরীবদিগকে বিতরণ করিতেন। পরিচ্ছদ

সম্বন্ধে—তিনি কখনও মূল্যবান্ বস্ত্র পরিধান করেন নাই; আহার-সম্বন্ধে,তিনি নিরামিষাশী ছিলেন।

তাঁহার জীবদ্দশায়, বিদ্যালয়ে তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল; কিন্তু, তাহাতে তিনি সম্মতি-প্রদান করেন নাই। তিনি আদৌ আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। তিনি পরোপকার করিতেন, অথচ, কাহাকেও তাহা জানিতে দিতেন না! তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহার বড়ই সৌহার্দ্দ্য ছিল। আমরা শুনিয়াছি, একবার তাঁহার বড় ব্যারাম হয়। ডাক্তারেরা বলেন যে,—"তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রাখিতে পারিলে, তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত সময়ে তাঁহাকে অনবরত মনোহর গল্প শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করতঃ তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। এমন না হ'লে আর বন্ধু!

আমরা কালীকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। মরণ জগতের নিয়ম, তাহা আমরা জানি;—তবে, আমাদের দেশ মরণেরই রাজত্ব—যেমন যায় তেমন আর জন্মিতে দেখি না; তাই, আমরা আজ কালীকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতে এত হাহাকার করিতেছি।

মা! বঙ্গভূমি, কবে তুমি আবার কালীকৃষ্ণের মত সুসন্তান প্রসব করিবে?

শ্রীরাধাজীবন রায়।

মাসিক সংবাদ।

বিলাত-ফেরৎ বাবুরা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাবুদ্ধি-পরিপূর্ণ বই নাই; বিশেষতঃ, বাঙ্গালা বইগুলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ বিভাগের বলবতী বিদ্যার বহির্ভূত। এই জন্য ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পুস্তক প্রবেশের পথ রোধ করিয়া, মাতৃভাষার সুগম উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে, ইহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তও বিলাত-ফেরৎ ছিলেন, পূর্ব্বে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহারও বীতরাগ ছিল—পাশ্চাত্য-শিক্ষায় প্রাণপণ যত্ন ছিল; কিন্তু কালে যখন তিনি স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন—বুঝিতে পারিলেন যে, মাতৃভাষার ন্যায় উজ্জ্বল রত্ন আর নাই,—তখন তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; শেষ বঙ্গভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপিকায়, মনঃ,

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥"

বঙ্গের বিলাত-ফেরৎ বিচেতন বাবুদের এ বেজায় বুদ্ধির নিসূদন, মধুসূদনের দৃষ্টান্তে হইবে কি ?

***

ময়মনসিংহে বঙ্গেশ্বরের আগমন-কালে, সায়াহ্ণে-ভোজনে, যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তিকে কিছু জলযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইনি একজন সুশিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ইনি বিনীতভাবে উত্তর দেন যে 'আমি কিছুই খাইব না।' তখন আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি 'চা' পান করিতে ইচ্ছুক কি না ? তিনি স্পষ্টই বলিলেন 'না।' তখন সাহেব সাতিশয় সন্তোষ-সহকারে বলিলেন,—"আমি আপনার কথায় পরিতুষ্ট হইলাম। অনুরোধে পড়িয়া যাহারা 'চা' পান করে, তাহারাই ক্রমে সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়।'

লাট-প্রসাদ-ভোজী তোষামোদ-প্রিয়গণ এ দৃষ্টান্তে সংশোধিত হইতে পারিবেন কি ?

***

ঢাকার বর্ত্তমান ডেপুটী মেজিষ্টর বাবুর চাল চলন সাহেবী ধরণের। সম্প্রতি একটী মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবার জন্য দায়রায় গিয়াছিলেন। সেখানে সম্পূর্ণ সাহেবী চালে 'হ্যাট' খুলিয়া, ইংরাজীতেই 'হলফ' পড়িতে সুরু করেন। জজ সাহেব তাঁহার ধরণ ধারণ দেখিয়া জাতি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি অগত্যা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন জজ বাহাদুর তাঁহাকে বাঙ্গালায় 'হলফ' পড়াইতে বাধ্য করেন। যাহা হউক, এই ডেপুটী বাবুর কল্যাণে—অনুকরণপ্রিয় অচেতন বাবুগণের চৈতন্য লাভ হইলেই মঙ্গল।

***

আমরা যেমন ইউরোপ-ভূমিকে পাশ্চাত্য ভূমি বলিয়া থাকি, বিলাত বাসীরাও সেইরূপ আমাদের ভারতবর্ষকে প্রাচ্যভূমি বলিয়া থাকেন। বিলাতে ওকিং নগরে Oriental Congress অর্থাৎ 'প্রাচ্য-সমিতি'র অধিবেশন হইয়াছে ; প্রাচ্য-ভূমির সভ্যতা, শিক্ষা, মহত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনাই, এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ; প্রধান উদ্যোগী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ডাক্তার লিনটার বিদেশী বিধর্ম্মী হইয়াও সোণার ভারতকে যে কি চক্ষে দেখেন, তাহা উক্ত সমিতির অধিবেশনোপলক্ষে সভ্যগণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মত যে,—"প্রাচ্য-বিদ্যা সংরক্ষণোপযুক্ত। প্রাচ্য-বিদ্যা অনন্ত রত্নের আকর-স্বরূপ। কাল-প্রভাবে প্রাচ্যভূমি এখন ইউরোপীয়-ভাবে গঠিত হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুধাবন না করিলে, প্রাচ্য-বিদ্যার অমূল্য উজ্জ্বল রত্ন-সমূহ জগতে আবার বিভাসিত হইবে ; তখন জ্ঞানীমাত্রেই প্রাচ্য-বিজ্ঞানের গুণে মুগ্ধ হইবেন আর আমাদের কৃত্রিম জীবন প্রাচ্য জীবনের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃত তত্ত্বসমূহ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে। প্রাচ্য—চিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যয়নে তখন ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ, প্রকৃত চিকিৎসাতত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। প্রাচ্য ভূমের সাংসারিক নিয়মাদি, সকল সামাজিক অবস্থার একমাত্র অবলম্বনীয়।"

কৃতবিদ্য স্বদেশ-ভক্ত বলিয়া যে সকল ভারতবাসী গরিমায় 'গরগর' করেন, একবার যদি তাঁহারা লিটনারের ন্যায় ভারতভূমির প্রতি সুদৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে স্বদেশের পরমোপকার সাধন করা হয়।

বিলাতে শবদাহ-প্রথার প্রচলন হইতেছে, আমাদের দেশে যে সকল সভ্য সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের দল, সুসভ্য দেশ প্রচলিত কবর প্রথার প্রকৃষ্টতা দর্শাইতে চান, এখন তাহাদিগের পূজ্য পাশ্চাত্য-গুরুগণ শবদাহ প্রথাকে প্রকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এতাবৎকাল বিলাতে দেশাচারের প্রবল প্রতিবন্ধকতা ও গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ২১৪টি শবদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। শুনিতে পাই, এক্ষণ হইতে সংক্রামক রোগে যাহাদিগের মৃত্যু হইবে, তাহাদিগকে দাহ করিতে হইবে। বিলাতী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদিগের মত যে, 'মৃত দেহ প্রোথিত হইলে মৃত ব্যক্তির ব্যাধিজাত কীটানু পরিব্যাপ্ত হইয়া জল, বায়ু ও ভূতলকে দূষিত করিয়া দেশের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া থাকে।' জাপানবাসীরা চির-প্রচলিত শবদাহ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া, পাশ্চাত্যানুকরণে মজিয়া কবর-প্রথা প্রচলন করিয়াছিল, এক্ষণে অপকারিতার ফলভোগ করিয়া দাহ প্রথার পুনঃ প্রচলন করিয়াছে। হিন্দুর আবহমান প্রচলিত শবদাহ-প্রথার প্রকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলাতবাসীরা যে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া এক্ষণ হইতে পাশ্চাত্যানুকরণ প্রিয়েরা অন্ধ হইয়া হিন্দুর সকল প্রথার অপকারিতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট না হইলেই ভাল।

***

হিলসা-থানার এলাকাস্থিত বিহার মহকুমার কোন গ্রামে একটী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী সহমরণে যাইবার জন্য অনেক আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু সতীর এ প্রস্তাবে কেহই সম্মত হয় নাই। যথাকালে পতিদেহ শশ্মানে নীত ও চিতায় শায়িত হইল; চিতায় অগ্নি প্রদান করা হইল; প্রদীপ্ত হুতাশন-সাহায্যে চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অমনি কোথা হইতে সেই সতী বিদ্যুৎবেগে আসিয়া ভীষণ চিতানলে প্রবেশ করিল; শ্মশান-ক্ষেত্রে আর এক দৃশ্য সমুপস্থিত হইল; সকলেই শশব্যস্ত, শেষ অর্দ্ধদগ্ধা সজীব সতীদেহ বলপূর্ব্বক বাহির করা হইল। পরদিন ব্রাহ্মণপত্নীর মৃত্যু হইল। সাধ্বীর সহগমনে কেহই বাধা দিতে পারিল না। ইংরাজের প্রবল আইন, সহগামিনী সতীর ভ্রূক্ষেপেও আইসে না।

***

ইংরাজরাজ এক্ষণে কাবুলের আমীর ও তুরস্কের সুলতান এই দুই যবন শক্তি লইয়া বড়ই বিব্রত। এই শক্তিদ্বয়কে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য রুষ সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কাবুলের আমীর রুষ-ঋক্ষের সহিত মিলিত হইলে বা তাহার সহিত কোন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, বৃটিশ সিংহের মহা বিপদ। তাই ইংরাজরাজ, আফগান-আমীর আব্‌দার রহমনের 'অবদার' রক্ষণার্থ সতত শশব্যস্ত। ওদিকে ইউরোপে আবার তুর্ক, সুলতান, রুষ ও ফরাসীর মোহে মোহিত হইয়া ইংরাজকে মিশর ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন বা রুস রণতরীদিগকে ডার্ডেনেলিস প্রণালী অবাধে অতিক্রম করিতে দেন, তাহা হইলে সুয়েজে ইংরাজ-প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবে; সুতরাং ইংরাজ-রাজনীতিজ্ঞেরা বড়ই চিন্তিত।

***

রুষ গবর্ণমেন্ট সুয়েজ-খালের বিক্রেয় অংশগুলি ক্রয় করিতেছেন; সম্প্রতি কয়েকখানি রুষ রণতরী ডার্ডেনেলিস্ প্রণালী দিয়া যাতায়াত করাতে ইউরোপে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন। এডেনবন্দর সুরক্ষিত করা হইতেছে। বিলাত হইতে আট শত গোলন্দাজ সৈন্য তথায় যাইতেছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের

ভ্রাতা

শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন—১২৯৮।



Calcutta:

Printed & Published by S. C. Sen, at the

GREAT TOWN PRESS.

No. 163, Musjeedbari Street,

1891.

নিয়মাবলী।

১। সুবোধিনী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে এক সংখ্যা করিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

২। সুবোধিনীর অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা চারিখানি পুস্তক উপহার পাইবেন। উপহার প্রার্থিগণকে পুস্তক পাঠাইবার ব্যয়াদির জন্য অতিরিক্ত চারি আনা দিতে হইবে অর্থাৎ ১৸৹ টাকা পাঠাইলে, উপহার পুস্তক ও এক বৎসর সুবোধিনী নিয়মিতরূপে পাইবেন। উপহার পুস্তক যথাঃ—

(ক) মানস-কুসুম (কবিতা-পুস্তক ৯৬ পৃষ্ঠা) ৺কালিদাস মিত্র প্রণীত।

(খ) ধর্ম্ম-পরীক্ষা (নাটক ৮৮ পৃষ্ঠা) শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

(গ) একটী চিত্র (উপন্যাস ৩৪ পৃষ্ঠা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

(ঘ) A Visit to Darjeeling by Bhola Nath Mitra.

৪। সুবোধিনী সর্ব্বত্র ডাকযোগে প্রেরিত হয়;—অতএব যদি কেহ কোনও মাসের সুবোধিনী নিয়মিত মাসের মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে, তিনি তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। ইহার পর, আমরা আর দায়ী থাকিব না।

৫। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী থাকিবেন,—সম্পাদক বা প্রিন্টার দায়ী নহেন।

৬। সুবোধিনীর প্রতিসংখ্যার নগদ মূল্য ৵৹ আনা।

৭। সুবোধিনীতে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি লাইন ।৹ আনা।

৮। সুবোধিনী-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি-পত্র ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাইবেন।

৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
সিমুলিয়া—কলিকাতা।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।
সুবোধিনী-সম্পাদক।

[প্রথম বৎসরে সুবোধিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য—দুইটাকা। দ্বিতীয় বৎসর গ্রাহকের জন্য ১৷৹ মাত্র]

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। আশ্বিন—১২৯৮। ষষ্ঠ সংখ্যা।

শরতে সারদা।

কেন আজি আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
আনন্দের মহা কোলাহল;
বিষণ্ণ বদনে মৃদুহাস,
কোথা গেল শোক-অশ্রুজল?
ঘনঘটা নিবিড় কালিমা,
জন্মশোধ হ'ল অবসান?
এতদিনে বিষাদের সীমা—
লঙ্ঘিয়া, পাইলে পরিত্রাণ?

পূরব গগনে হের একবার
ঊষার কনক-কিরণ রেখা;
শোভে স্তরে স্তরে স্বর্ণকায় মেঘ,
সুনীল গগনে র'য়েছে লেখা।
প্রভাত-বিহগ প্রফুল্ল অন্তরে
গাহিছে মধুর ললিত গান;
তরুর ভূষণ তরুণ প্রসূন
একে একে সবে খুলিছে প্রাণ।

তটিনী তড়াগ পূর্ণ কানে কান্
শ্যামল স্বভাব-শোভা;
বিকচ-বিমল কোমল কমল,
তরুণ অরুণ-আভা।
ভ্রমর-গুঞ্জনে, প্রেম-আলাপনে,
ঢালে পরিমল-যশ;
হের আনন্দের—মহা কোলাহলে
পূরিয়াছে, দিক্ দশ!!

এত দিনে বরষার হ'ল অবসান—
সুখময় শরত-বিকাশ;
বিষণ্ণ বঙ্গের হৃদে,—আনন্দের গান—
উঠিতেছে আনন্দ-উচ্ছ্বাস;
আনন্দদায়িনী দেবী জগতজননী—
এসেছেন বঙ্গের আলয়;
পূজিতে জননীপদ সবে ভক্তিভরে,
হইয়াছে প্রফুল্ল হৃদয়।

তাই কি এ আনন্দ উচ্ছ্বাস!
আনন্দের সদা কোলাহল!
সবার বদনে মৃদুহাস,
নাহি আর শোক-অশ্রুজল!
ঘনঘটা নিবিড় কালিমা,
জন্মশোধ হ'ল অবসান!
এত দিনে বিষাদের সীমা,
লঙ্ঘিয়া, পাইলে পরিত্রাণ!!

তাই কি গো শরতের, সুনীল আকাশে ভেসে,
হাসে শশী সুমধুর;
নিরানন্দ বঙ্গভূমি, তাই কি হ'য়েছে আজি,
মহোল্লাসে ভরপুর!
কি সুন্দর ছায়াপথ, শোভে নিশাপতি পাশে
অপরূপ দরশন;
নীল চারু চন্দ্রাতপে হীরকনক্ষত্ররাজি
সমুজ্জ্বল আভরণ!

হের মাতঃ বঙ্গভূমি!
হের মা নয়ন মেলি,
শরতের সুখ সমাবেশ;
প্রসন্ন-বদন কিবা—
তোমার সন্তান সবে,
মহোৎসবে পূরিয়াছে দেশ!

কেন না কেন মা আজি শুভদিনে,
অপাঙ্গে নীহার-নীর,
ঘন-আবরণে ঢাকিয়া বদন
কেন মা র'য়েছ স্থির?

শরতের শশী হাসিছে কেমন
সুনীল গগনতলে;
হেরিয়া কেন মা! তোমার নয়ন
পূর্ণ হয় অশ্রুজলে!

তোমার নয়নে হেরি অশ্রুধারা
বিষণ্ণ শরত-শশী;
হেরিলে বিষণ্ণ হে মাতঃ! তোমায়
কারো নাহি রবে হাসি।

ভাগ্য-দোষে মাতঃ! তোমার হৃদয়
পুত্রশোকে জরজর;
হারা'য়ে ফেলেছ রত্নচতুষ্টয়
চারি পুত্র গুণধর!

কি করিবে মাতঃ! নিয়তি-লিখন
কে পারে খণ্ডা'তে বল?
ফেলনা ফেলনা আর গো জননি!
শরতে শ্রাবণ-জল!

কেন মা কেন মা ললাটে কালিমা,
নয়নে নীহার নীর!
আজি শুভদিনে ঘন-আবরণে
বিষণ্ণবদনে স্থির?
নিরাশ নিশ্বাস ফেলনা জননি!
ছাড় মাতঃ! শোকতাপ!
জগতজননী দুঃখবিনাশিনী
হরিবেন মনস্তাপ।

ভক্তিমান তব সন্তান-নিকর,
বদনে বিকাশে প্রীতি;
তাদের কল্যাণ করিতে সাধন
পূজ মা, সারদা সতী।

আনন্দদায়িনী, জগতজননী,
গিরিসুতা—দশভুজা ;
এসেছেন মাতঃ ! তোমার আলয়ে
ভক্তিভরে কর পূজা।

জগতজননী সমাগমে,
আজি বঙ্গ আনন্দে মগন ;
মঙ্গল কদলী, পূর্ণঘট,
দ্বারে দ্বারে শুভ দরশন।

তাই আজি আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
আনন্দের পূর্ণ কোলাহল,
সস্মিত-বদন সপ্রকাশ,
নাহি আর শোক অশ্রুজল।
ঘনঘটা নিবিড় কালিমা,
হইয়াছে এবে অবসান ;
তাই আজি প্রফুল্ল হৃদয়,
ভক্তিমান বঙ্গের সন্তান।

শ্রীরসময় লাহা।

সংসারের নিত্যসঙ্গী।

বল দেখি ভাই ! এ সংসারের নিত্য সঙ্গী কে ? সংসার-সূত্রে পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, পুত্র পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, দাস-দাসী, প্রভৃতি কতই আছে ; কিন্তু বল দেখি, ইহাদের মধ্যে সংসারের নিত্য সঙ্গী কে ?

সংসারে মানুষকে প্রধানতঃ ত্রিবিধ কার্য্য করিতে হয় ; প্রথম—জীবত্বমোচন বা মোক্ষ-সাধনচেষ্টা ; দ্বিতীয়—সংসারের সামাজিক প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্য-সমূহ ; তৃতীয়—উদর-পরিপূরণের চেষ্টা। প্রথম প্রকার কার্য্য সাধনের উপায়, একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা ; দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য সাধনের উপায়, কতকগুলি সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম-পালন ; এবং তৃতীয় প্রকার কার্য্য সাধনের উপায় অর্থোপার্জ্জন ও শরীররক্ষণ-চেষ্টা। ঈশ্বর-সাধনায় নিজের মনকে বশীভূত রাখিবার জন্য উপায় সকলের আবশ্যক হয় ; কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম গুলি পালন এবং উদর পরি-পূরণক রিতে হইলে, একটি বিশেষ সাহায্যের আবশ্যক, এই সাহায্যদাতারই নাম—সংসারের নিত্য সঙ্গী। বল দেখি ভাই ! সে কে ?

সংসারে থাকিতে হইলে, মানুষকে সংসারের কার্য্য করিতে হইবেই হইবে ; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা এই সকল সাংসারিক কার্য্যকে অকিঞ্চিৎকর বা অনিত্য বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর-সাধনাকেই মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়াছেন, কিন্তু যখন মানুষ, মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তখন তাহার মনুষ্যাবস্থার সহজাত বিশেষত্বগুলি তাহার ধর্ম্ম না হইবে কেন ?

যে দেশে যে সময়ে যে কোন লোকই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে কোন না কোন সমাজ-মধ্যে বাস করিতে হয় এবং সেই সমাজের নিয়মাদি পালনও তাহার একটী প্রধান ধর্ম্ম ; এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন, ও দয়া, দাক্ষিণ্য, মমতা, স্নেহ, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির উৎকর্ষবিধানও মানুষের আর একটী ধর্ম্ম। অনেকে ধর্ম্ম

অর্থে একমাত্র ঈশ্বরারাধনা বুঝিয়া বলেন,—
"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

কিন্তু অনেকে ধর্ম্মশব্দেও দয়া, উপকার, ভক্তি প্রভৃতি সংসারসুলভ সদ্‌গুণের অনুশীলনে পুণ্য ও অধর্ম্ম শব্দে নিকৃষ্ট-বৃত্তির অবলম্বনে নরক বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মানুষের মনুষ্যাবস্থার ধর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা আছে। শাস্ত্রে বলে, পিতাপুত্র, পতিপত্নী প্রভৃতি পার্থিব সম্বন্ধগুলি কেবল মায়ার বন্ধন মাত্র, ফলে কিছুই নহে। কিছু নাই হোক, কিন্তু যত দিন জীব মায়ামোহিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে ত কার্য্য করিতে হইবে,—আর সে কার্য্যের সদসৎ বলিয়া ব্যবস্থাও শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শাস্ত্রে সেইজন্যই বিধি আছে—
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

আরও এ বিষয়ে জনবাদ যথেষ্টই আছে। লোকে ত কথায় কথায় বলিয়া থাকে, "পৃথিব্যাঃ গুরুতরা মাতা আকাশাদুচ্চতরো পিতা।" এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের পার্থিব ধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য সামাজিক ধর্ম্মও প্রতিপালন করা আবশ্যক।

কিন্তু বলিতে হইবে সংসার যখন মায়াময়, ও মানুষ যখন মায়ামোহিত জীব, তখন এক ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত যাহা কিছু করা যায়, তাহা সমস্তই অনিত্য কর্ম্ম; কিন্তু মনুষ্যত্বের যে টুকু অনিত্য এবং অনিত্য মনুষ্যত্বের জন্য কৃত অনিত্য কর্ম্মের মধ্যে যে সু ও কু বলিয়া বিভাগ করা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, কতকগুলি অনিত্য কর্ম্মের অনিত্য মনুষ্যত্বের উপযোগী এবং কতকগুলি অনুপযোগী; যাহাহউক, এই অনিত্য সংসারে অনিত্য কর্ম্মগুলি মায়ামুগ্ধ মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া, তৎসাধন পক্ষে প্রত্যেকের একটা সাহায্য আবশ্যক; কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, অনিত্য কর্ম্মের সম্পাদন জন্য যে সাহায্য আবশ্যক তাহাও অনিত্য; কারণ যাহার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কতকটা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ততা থাকে। সামাজিক ধর্ম্ম-পালনের জন্য যতগুলি সাহায্য আবশ্যক, তন্মধ্যে "অর্থ"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

সংসারে যে কর্ম্মই কর না কেন, প্রায় তাহার অধিকাংশ স্থলেই অর্থের প্রয়োজন। আশার দাস মানব,—অর্থই সেই আশার পোষক ও বর্দ্ধক। যে কর্ম্ম কর না কেন, তাহার মূলে আশা ক্রীড়া করে; সুতরাং এক প্রকারে অর্থ সকল কর্ম্মের সাহায্যদাতা।

অনেকে সংসারে অর্থকে অনর্থের বলিয়া অর্থ-সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—
"ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ রক্ষতি।
লব্ধনাশো যথামৃত্যু স্তস্মাদেতন্নচিন্তয়েৎ॥"

অর্থাৎ ধন একে ত দুর্লভ পদার্থ, তাহার পর যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়। ইহার উপর যদি কোন রূপে সেই লব্ধধন বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সে ক্লেশ মৃত্যুর ন্যায় বোধ হয়; সুতরাং ধন-চিন্তা না করাই উচিত, কিন্তু;—

"শ্লাঘ্য স একো ভুবি মানবা নাম্
স উত্তমঃ স পুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা
নাশবিভঙ্গা- বিমুখাঃ প্রয়ান্তি॥"

অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে প্রার্থী ও শরণাগতেরা নিরাশ হইয়া বিমুখ হয় না, পৃথিবীতে সেই একমাত্র শ্লাঘ্য ; জগতে সেই প্রতিষ্ঠাপন্ন ; সেই মহৎ ও সেই ধন্যবাদার্হ। সুতরাং জগতে থাকিয়া যদি নির্ধনতা-বশতঃ গণ্যমান্য হইতে না পারা যায়, তবে সংসারে থাকিয়া সুখ কি ? আর সাধ্যমত অর্থীর প্রার্থনা-পূরণ, শরণাগতরক্ষণ, সামাজিক ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ প্রতিপালনীয়ও বটে ; সমাজের মধ্যে যদি সম্ভ্রমশালী হইতে না পারা যায় তাহা হইলে কেবল মাতার বিষ্ঠার ন্যায় ভূমিষ্ট হইয়া লাভ কি ? ধনহীনের সমাজমধ্যে অবস্থান কেবল বিড়ম্বনা মাত্র,—

"বরং বনং ব্যাঘ্র,গজাদিসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পক্কফলাম্বু ভোজনং।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনং ॥"

অর্থাৎ বাসের জন্য ব্যাঘ্র-গজাদি-সেবিত বন, আশ্রয়ের জন্য বৃক্ষ, আহারের জন্য পক্কফল, পানের নিমিত্ত নদীজল, শয়নের জন্য তৃণশয্যা এবং পরিধানের জন্য বল্কলও ভাল, তথাপি বন্ধুবর্গের মধ্যে নির্ধন হইয়া বাস করা ভাল নহে। ভাই ! তুমি হয় ত বলিবে—

"জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিপত্তিষু।
মোহয়ন্তি চ সম্পত্তৌ কথমর্থঃ সুখাবহাঃ ॥"

ধন উপার্জ্জন করিতে দুঃখভোগ করিতে হয়, বিপদের সময়ে ধনে সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, আর সম্পত্তি হইলে মোহ জন্মে ; সুতরাং যে ধন থাকায় দুঃখ, না থাকায় দুঃখ, উপার্জ্জনে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, সে ধনে সুখ কোথায় ? কিন্তু একটা কথা এইখানে বিবেচনা করা উচিত। সুখ,দুঃখ,সন্তাপ, সন্তোষ, মোহ, জ্ঞান এ সমস্ত যে কেবল ধনেই হয় আর কিছুতে হয় না. তাহা নহে ; এ সমস্তই মায়ার কার্য্য ; মায়ামোহিত মানব যতদিন সংসারে আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন এ সকলের হাত এড়াইতে পারিবে না ; সুতরাং মানব যতদিন সংসারে আবদ্ধ আছে, ততদিন সংসারের কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। শঙ্করাচার্য্যের মুখেই শোভা পায়—

"অর্থমনর্থং ভাবয়েন্নিতং।"

তিনি মায়াযুক্ত সংসারে বৈরাগী ছিলেন, তিনিই একদিন বলিতে পারিয়াছিলেন—

"মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং ॥"

তাঁহার মত লোকে একদিন জোর করিয়া বলিতে পারেন—

"পরিহর চিন্তাং নশ্বরচিত্তে।"

কিন্তু, যাহারা আকণ্ঠ মায়ায় নিমগ্ন, যাহারা "তোমার আমার" জ্ঞানের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদের মুখে ওরূপ কথা শুনিলে হাসি পায় না কি ? যখন তোমায় স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসারের সমুদয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইবে, তখন অর্থকে অনর্থ ভাবিয়া ত্যাগ করিলে তোমার চলিবে কেন ? তুমি বলিবে "তবে কি অর্থ লইয়া চিরকাল অনর্থের মধ্যে পড়িয়া থাকিব ?" সে কথা বলি না—চিরকাল অনর্থের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে বলিনা বটে, কিন্তু ধনার্জ্জন করিয়া যাহাতে অনর্থ না ঘটে, অর্থ-ব্যয়ে যাহাতে তোমার মনে ক্লেশ না হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হও ; নতুবা ধন ব্যতীত পৃথিবীতে তুমি কি করিবে ? অর্থের মহিমা বড় সাধারণ নহে—

"ধনেন ধনবাল্লোঁকে ধনান্তর্বতি পণ্ডিতঃ।" ধনেতেই লোকে ধনবান হয়,—ধনেতেই পণ্ডিত হয়।

"অর্থেন তু বিহীনস্ত পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
ক্রিয়া সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা।"

গ্রীষ্মকালে কুৎসিত অর্থাৎ অল্পজলা নদী যেরূপ নষ্ট হয়, পুরুষও সেইরূপ অর্থহীন হইলে, অল্পমেধ হয় এবং তাহার কার্য্যসকলও নষ্টহয়।

"যস্যার্থাস্তস্যমিত্রাণি,
যস্যার্থাস্তস্যবান্ধবীঃ।
যস্যার্থাঃ সঃ পুমাল্লোঁকে,
যস্যার্থাঃ সহি পণ্ডিতঃ॥"

যাহার ধন আছে, সকলেই তাহার মিত্র; যাহার ধন আছে সকলেই তাহার বান্ধব; যাহার ধন আছে সেই পুরুষ ও যাহার ধন আছে সেই পণ্ডিত।

এই ত গেল ধনের মহিমা; আবার দারিদ্রতার গুণ দেখ—

"অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং সন্মিত্ররহিতস্যচ।
মূর্খস্য চ দিশঃ শূন্যঃ সর্ব্বশূন্যাদরিদ্রতা॥"

যাহার পুত্র, ও যাহার সৎ মিত্র নাই, তাহার গৃহ শূন্য, মূর্খের সকল দিক শূন্য, কিন্তু দরিদ্রের সকলই শূন্য।

"দারিদ্র্যা দ্ধি য়মেতি হ্রীঃ
পরিগতঃ সত্বাৎ পরিভ্রশ্যতে।
নিঃসত্বঃ পরিভূয়তে
পরিভবান্নির্বেদম াপদ্যতে॥
নির্ব্বিন্নঃ শুচমেতি শোক-
নিহিতে বুদ্ধ্যা পরি ত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নির্ধনতা
সর্ব্বা পদামাস্পদং॥"

দরিদ্রতা হইতে লজ্জা হয়, প্রাপ্তলজ্জ লোক বলহীন হয়, বলহীন লোক পরাভূত হয়, পরাভূত লোক অজ্ঞান হয়, অজ্ঞান লোক শোক পায়, শোকগ্রস্তব্যক্তি বুদ্ধিহীন হয় আর বুদ্ধিহীন হইলে উৎসন্ন যায়, অতএব নির্ধনতাই সকল আপদের মূল।

কবি ঘটকর্পর একদিন বলিয়াছিলেন,—

"দারিদ্র্য দোষো গুণ রাশিনাশী।"

আবার—

'অন্নচিন্তাচমৎকারা কাতরে কবিতকুতঃ।'

আর ও দেখ—

"ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোঽপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥"

যে ব্যক্তির বহুল ধন আছে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পূজনীয় হয়; আর নির্ধন ব্যক্তি চন্দ্রের তুল্যবংশে জন্মিলেও তাহাকে সকল অপমান সহজে ভোগ করিতে হয়।

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ও বলিয়া গিয়াছেন,—

"কড়ি কট্‌কা চিড়া দই
কড়ি বিনা বন্ধু নাই,
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।"

তবে এক কথা, ধনবান হইয়া যিনি ধনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহার, কি সমাজে, কি নিজের পক্ষে, উভয় দিকেই মন্দ হয়।—

ধনবানিতি হি মদোমে কিং
গতবিভবো বিষাদমুপযামি।
করনিহতঃ কন্দুকসমাঃ।
পাতোৎপাতা মনুষ্যাণাম্॥"

"আমি ধনবান" এইরূপ অহঙ্কার হইলে সে গতবিভব হইয়া বিষাদপ্রাপ্ত হয়; কারণ হস্তস্থিত কন্দুকের ন্যায়, মনুষ্যের উন্নতি ও

অবনতির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আরও—

"ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে।"

যে ব্যক্তি ধন নিজে ভোগ বা দান না করে, তাহার ধন থাকায় লাভ কি ?

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আচারগত ঈশ্বর-সাধনার অঙ্গীভূত কার্য্যও (ব্রত, পূজা, যজ্ঞ ও তীর্থদর্শনাদি) ধনসাপেক্ষ; সুতরাং সেই সকল ধর্ম্মাচরণের জন্যও ধনোপার্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

"বিদ্যাদদাতি বিনয়ং
বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি
ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃসুখং ॥"

বিদ্যা হইতে বিনয়, বিনয় হইতে উপযুক্ততা, উপযুক্ততা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতে সুখলাভ হয়, কিন্তু তুমি বলিবে—

"ধর্ম্মস্য যস্য বিত্তেহা
বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধিপঙ্কস্য
দূরাদস্পর্শনং বরং ॥"

ধর্ম্মলাভের জন্য যাহার ধনোপার্জ্জন-স্পৃহা হয়, তাহার ধনচেষ্টা না করাই ভাল; কারণ অগ্রে কর্দ্দম মাখিয়া ধুইয়া ফেলা অপেক্ষা কর্দ্দম স্পর্শ না করাই ভাল। এখানে ধর্ম্ম অর্থে তোমার মানবের সামাজিক বা পার্থিব ধর্ম্ম হেন—ইহা ঈশ্বরারাধনা, সন্ন্যাসীর তপস্যা, বৈরাগীর বিষয়-বিতৃষ্ণা!

জাগতিক ধর্ম্ম বা সামাজিক ধর্ম্ম-প্রতি-পালনার্থ-যদি অর্থ-উপার্জ্জনে বীতস্পৃহ হও, তাহা হইলে, জগতে তোমার বাস করা ভার হইবে। তুমি নির্ধন হইলে—

"মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা
ভ্রাতা চ ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ
কান্তাচ নালিঙ্গতে ॥
অর্থ-প্রার্থন-শঙ্কয়া ন কুরুতে-
প্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে
চার্থেন সর্ব্বে বশঃ ॥"

মাতা তোমাকে নিন্দা করিবেন, পিতা আদর করিবেন না, ভ্রাতা কথা কহিবেন না, ভৃত্য রাগ করিবে, পুত্র আনুগত্য ত্যাগ করিবে, পত্নী আলিঙ্গন করিবে না, আর সুহৃদ্বর্গেরা অর্থ চাহিবার আশঙ্কায় আলাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে; অতএব সখে! অর্থ উপার্জ্জন কর, অর্থেই সকলে বশে থাকিবে। "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।" ব্যক্তি মাত্রেই অর্থের দাস।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় এ অনিত্য সংসারে অনিত্য বস্তুর মধ্যে যতদিন ডুবিয়া থাকিতে হয়, ততদিন অর্থের তুল্য সংসারের নিত্যসঙ্গী আর দ্বিতীয় নাই। ভাই! তাই বলি অর্থোপার্জ্জন করিও। অর্থ থাকিলে সংসারে তুমিই বা কে, আর স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবা-নই বা কে? সংসারের গতিক এরূপ যে, যদি ভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত হন, আর তোমার ধন থাকে, তাহাহইলে ভগবানের অপেক্ষা তোমার আদর অধিক হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি।

কোহেলা!

বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?
শ্যাম বরণ তেরি,
কিশলয় শ্যামল,
রূপ কুছুত নেহি ভায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

হাসে উষা-সতী,
টুটল আঁধার,
বহত প্রভাত কি বায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

কাহে গুরথ-আঁখি,
লাজ-বিকুঞ্চিত,
ফিরত ঘুরত মুহু চায়?
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

পেখ ভ্রমর-দল,
অরুণ সমাগম,
ফুল ফুল আকুল ধায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

বিবিধ বিহঙ্গম,
মৃদুল সমীরে,
ললিত নিনাদত গায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

আও বিহগবর!
আও সকাশে—
ছোড়হি পলব কি ছায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

গীতি মধুর তেরি,
কণ্ঠ—সুকোমল,
কোমল মুকুল কষায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

তেরি সমাগম
বিলসিত মাধব,
বিচরত মলয় কি বায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

গুণ-গরিমা তব
কো নহি জানত?
কবিকুল আকুল গায়,
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

জানে জগত-জন,
পিককুল-পালিত,
মৌকুলি কলিত কুলায়;
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

তাহে সরম কিবা?
এক হি দোষ
শোভত গুণ সমবায়।
বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

ঘোষে জগত-গুণ
গুণিজন গাহত,
গুণ জগত-জন চায়;
কোহেলা! বিজুবন কাহে তু আবরি কায়?

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাইবেল-সমালোচনা।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(খ) মরিয়ম যেগৃহে বাস করিতেন সেই গৃহে অন্য কোন ব্যক্তির বাস করণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উল্লেখ নাই এবং কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। মরিয়ম যে গৃহে বাস করিতেন, সে গৃহে অপর কোন ব্যক্তি থাকিলে, যে সময়ে গাব্রিয়েল দূত মরিয়মকে দেখা দিয়া তাঁহার গর্ভের সংবাদ দিয়াছিল, সে সময়ে সেই অপর ব্যক্তিও দূতকে দেখিতে কিম্বা দূতের কথা শুনিতে পাইতেন, কারণ ঈশ্বরের দূত কোন স্থানে আসিলে, সে স্থান একপ্রকার উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে পূর্ণ হয়, বাইবেলেই তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। আর মরিয়মের গর্ভ যৎকালীন পাপজনিত গর্ভ নহে—পরাৎপ্রভাব ছায়া করায় ও পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপর নামিয়া আসায় গর্ভ, (লূক ১ ; ৩৫) এবং সেই গর্ভে জগতের ত্রাণকর্ত্তা জন্মিবেন, তখন, সে গর্ভতো পৃথিবীর সকলেরই মহানন্দের বিষয়—লজ্জার বা গোপন করিবার বিষয় কখনই নহে, এই নিমিত্ত মরিয়মকে উক্ত গর্ভের সংবাদ দিতে গাব্রিয়েল দূতের গুপ্তভাবে মরিয়মের নিকটে আসা ও মরিয়মের কাণে কাণে সংবাদটী দিয়া যাওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। দূত, যদি প্রকাশ্য ভাবে আসিতেন, তাহা হইলে সেই বাটীতে অপর কেহ থাকিলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেন। যদি কেহ বলেন যে, 'ভূত আর দূত লোকালয় ও আলোক বিশেষতঃ জ্ঞানালোক বড়ই ভয় করেন! সেই জন্য গাব্রিয়েল দূত মরিয়মকে প্রকাশ্যে দেখা না দিয়া, রাত্রে সকলে সুষুপ্তিকালে মরিয়মকে দেখা দিয়া তাঁহাকে তাঁহার গর্ভের সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে গৃহের অপর কোন ব্যক্তি উক্ত ঘটনা-সম্বন্ধে জানিতে পারেন নাই' ; তাহা হইলেও গাব্রিয়েল দূত প্রস্থান করিবার পরে মরিয়ম, সখরিয়ের বাটীতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে (লূক ১ ; ৩৮, ৩৯) তাঁহার বাটীর কাহাকে না কাহাকে উক্ত আনন্দজনক অদ্ভুত ঘটনার বিষয় না বলিয়া যাইতে পারিতেন না, এবং মরিয়ম কোন এক ব্যক্তিকে ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনার বিষয় বলিয়া গেলে, সে বিষয় কখনই গোপন থাকিত না এবং যোষেফও সে বিষয় শুনিতে পাইতেন, এবং মরিয়ম তিন মাসের গর্ভিণী হইয়া যখন সখরিয়ের বাটী হইতে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন যোষেফ তাঁহার সতীত্বের উপর সন্দেহ করিয়া (যেমন মথি ১;১৯ পড়িলে বুঝা যায়) তাঁহাকে গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিতেন না। সুতরাং যুক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, **মরিয়ম নাসরতের কোন নিভৃত প্রদেশে একটি নির্জন কুটীরে একাকিনী বাস করিতেন।**

(গ), মরিয়ম লেখা পড়া জানিতেন কি না?—মরিয়মের লেখা পড়া জানার বিষয় আমরা শাস্ত্রে কোন প্রমাণ পাই না। লেখা-পড়া এখন যেরূপ সুলভ হইয়াছে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ সুলভ ছিল না। এখন যেমন অতি অল্পব্যয়ে সর্ব্বসাধারণে লেখা পড়া শিখিতে পারে তখন তেমন ছিল না; তখন কাগজ প্রস্তুত হয় নাই এবং ছাপিবার যন্ত্রও নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং তখন লিখিবার উপকরণ এবং পড়িবার পুস্তক অতি বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ছিল। তখন কাষ্ঠফলকে মোম্ বা ঐরূপ পদার্থের লেপ দিয়া লৌহ বা কাষ্ঠ-শলাকার সাহায্যে চিঠিপত্র প্রভৃতি অস্থায়ী বিষয় লেখা হইতে, লেখার কার্য্য হইয়া গেলে তাহা মুছিয়া মোম্ পুনরায় সমান করিয়া দেওয়া হইত; (আমাদের এদেশে অদ্যাপি কোন কোন মুদীর দোকানে ঐরূপ দুই তিন খণ্ড কাষ্ঠফলক দড়ি দিয়া একত্রে বাঁধা দেখা যায়, তাহাকে লিপি কহে) যে সকল লেখা কিছুদিন স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন হইত, সে সকল 'পেপিরা' নামক এক প্রকার বৃক্ষের পত্রে এবং অন্যান্য বৃক্ষের পত্রে লেখা হইত, সেই জন্য কাগজের ইংরাজি নাম 'পেপার'; আর বৃক্ষের পত্র লেখা হইত, বলিয়া আমরা অদ্যাপি লেখা কাগজ এবং পুস্তকের এক এক খানি কাগজকে পত্র বলিয়া থাকি, উড়িয়ারা এখন পর্য্যন্ত তাহাদের পুঁথি তাল পত্রে লেখে; আর বিশেষ বিশেষ স্থায়ী বিষয় সকল পার্চমেণ্ট নামক পাতলা চামড়ায় লেখা হইত। পূর্ব্বকালে এই সকল হস্তলিখিত গ্রন্থ যেরূপ মূল্যে বিক্রয় হইত তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইতে হয় প্লেটো (Plato) ফাইলোলেয়াসের (Phylolaus) এইরূপ তিনখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এক শত মিনাতে অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার সাত শত পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্ম্মূল্য পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিত না। সে সময়ে রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেহই লেখাপড়া শিখিতে পারিত না। মরিয়ম কোন ধনবানের কন্যা হইলে নিভৃত প্রদেশে নির্জ্জন কুটীরে একাকিনী বাস করিতেন না; প্রায় ৮০ মাইল দূরে তাঁহার জ্ঞাতি ইলীশাবেতের বাটীতে একাকিনী যাইতেন না; পুনরায় তাঁহার পূর্ণগর্ভাবস্থায় নাসরৎ হইতে বেৎলেহামে, প্রায় ৭০ মাইল দূরে, নাম লিখাইতে কেবল যোষেফের সঙ্গে যাইতেন না; এবং নবপ্রসূত শিশু যীশুকে লইয়া কেবল যোষেফের সঙ্গে, বেৎলেহাম হইতে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে, মিশরে পলায়ন করিতেন না; এবং সূত্রধর যোষেফের সহিত বিবাহার্থে বাগ্দত্তা হইতেন না; এই সকল কারণে বিবেচনা হয় যে, মরিয়ম এক জন দরীদ্রা স্ত্রীলোক ছিলেন, ফলতঃ, **মরিয়ম লেখাপড়া জানিতেন না—তিনি নিরক্ষরা ছিলেন।**

(ঘ), মরিয়মের ভরণ পোষণ কিসে হইত, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; কিন্তু মরিয়ম আত্মীয়স্বজন বিহীনা, স্বদেশত্যাগিনী, পরদেশ বাসিনী, দরিদ্রা ও অশিক্ষিতা হওয়াতে নিশ্চয় তাঁহার নিজের উপজীবিকা তাঁহাকেই উপার্জ্জন করিতে হইত, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাকে গম পিষিতে, মেষলোমের সূতা কাটিতে, দ্রাক্ষারস নিংড়া-

ইতে, বা পশমী বস্ত্র বুনিতে এবং সেই সকল সামগ্রী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ও হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে হইত। যোষেফের সঙ্গে মরিয়মের আলাপ পরিচয় হওয়া অবধি বোধ হয় মরিয়মকে আর তত খাটিতে হইত না—যোষেফ আলনা, সেলফ, চৌকী প্রভৃতি যে সকল কাষ্ঠের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন মরিয়ম নগরে নগরে গিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া আসিতেন। যাহাই হউক, **কায়িক পরিশ্রম, শিল্প বা ব্যবসায় দ্বারা যে মরিয়মের ভরণপোষণ হইত**—তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ঙ) মরিয়ম যখন যোষেফের সহিত বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তিনি যে তখন 'গৌরী' ও 'বালা' অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—যিহুদী ও লেবয়দিগের মধ্যে বালিকা বিবাহ আদৌ ছিল ছিল না, তাহাদের যৌবন বিবাহ হইত, এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স কম থাকিবার ও কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না বরং বাইবেলে বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীর সহিত বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষের বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং মরিয়মও যে পূর্ণযৌবন কালের পূর্ব্বে যোষেফের সহিত বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন তাহা সম্ভব নহে, বরং অন্যান্য কুমারীগণের যেরূপ বয়সে বিবাহ হইত মরিয়মের পিতা,মাতা ও আত্মীয় স্বজন না থাকাতে এবং মরিয়ম বিদেশিনী ও দরিদ্রা হওয়াতে তাঁহার যে সেরূপ বয়সও অতিক্রম হইয়াছিল তাহাই অধিকতর সম্ভব; —বিশেষতঃ (লূক ১; ৩৪) পড়িলে গাব্রিয়েল দূতের সহিত মরিয়মের কথোপকথনে নির্ভিকতা, যুবতীজনসুলভ লজ্জার অভাব, এবং গর্ভাধারণের নিয়ম ও কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা দর্শনে স্পষ্টই প্রীয়মান হয় যে মরিয়ম যখন যোষেফের সহিত বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন, তখন তিনি যৌবনকালের অনেক দূর অগ্রসর হইয়া প্রৌঢ়াবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, সুতরাং **সে সময়ে মরিয়মের বয়ঃক্রম অন্যূন পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল।**

(চ), মরিয়ম গর্ভবতী হইবার কতদিন পূর্ব্ব হইতে যোষেফের সহিত বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন?—এখানে বাগ্দত্তা শব্দের অর্থটী ভাল করিয়া বুঝা উচিত—নাসরৎ যোষেফের বা মরিয়মের কাহারই স্বদেশ নহে, সেখানে কাহারই আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না, সুতরাং এ বিবাহের ঘটক স্বয়ং যোষেফ ও ঘটকী স্বয়ং মরিয়ম ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ দ্বারা পরস্পরকে মনোনীত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মতে কেহ তাঁহাদের পানিপত্র অর্থাৎ বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্র কথন করেন নাই, এবং ইংরেজদিগের ন্যায় অঙ্গুরী সম্প্রদান দ্বারা Engagement অর্থাৎ বর কন্যার বিবাহের প্রতিজ্ঞা ও পরস্পর প্রকাশ্যে ও গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিবার পরওয়ানা হয় নাই এবং যোষেফ ও মরিয়মে পরস্পর love-letters অর্থাৎ প্রীতিপত্রাদি লেখা-লিখিও ছিল না, বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়ে এক দেশীয় লোক এবং উভয়ে বিদেশী হওয়াতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে সদ্ভাব, সহানুভূতি ও প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহাতেই যোষেফ

মরিয়মকে ও মরিয়ম যোষেফকে বিবাহ করিতে পরস্পর ইচ্ছা প্রকাশ ও গুপ্তপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কেননা মরিয়ম কোনপ্রকাশ্য সামাজিক রীতি অনুসারে যোষেফের প্রতি বাগ্দত্তা হইলে, যোষেফ মরিয়মের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে গোপনে ত্যাগ করিবার মানস (মথি ১ ; ১৯) করিতে পারিতেন না। সুতরাং মরিয়ম গর্ভবতী হইবার অনেকদিন পূর্ব্বে হইতে যোষেফের প্রতি বাগ্দত্তা ছিলেন ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ক্রমশঃ

দুইটি ক্ষুদ্র কবিতা।

(বামা রচনা)

রাখ্ ফেলে।

(কোনও কুমারীর প্রতি)

রাখ ফেলে মালা !
যাহারে পরাতে যাবি,
স'রে স'রে সেই যাবে—
পাবি বড় জ্বালা।
কাজ নাই—
রাখ ফেলে মালা॥

সারাদিন কার তরে,
ফুলগুলি কুড়াইয়ে,
গাঁথিস্ এ হার।
আদরে পরাতে যাবি,
সহসা আঘাত লেগে,
ছিঁড়ে যাবে তার।
কাজ নাই—
রাখ্ ফেলে হার॥

কল্পনায় বিভোর হৃদয়,
ভুলে কি গেছিস্ হারে ?
গলেনা নয়ন নীরে—
সংসার নিদয়।
হেসে হেসে কাছে এসে
সবে লয় অন্তিম বিদায় !

ফুল গুলি বড় ম্লান মুখ !
উপহার দিতে যাবি,
দলিয়া চরণ তলে
আরো দিবে দুঃখ।
আহা তোর—
ফেটে যাবে বুক।

আয় অশ্রু।

হেসে বড় শ্রান্ত, অতি শ্রান্ত এ হৃদয়!
একবার জুড়া তুই, একবার আয় বুকে,
জুড়াই হৃদয়!
আয় অশ্রু আয়।

আমোদের কোলাহলে,
শতধা শতধা হয়ে
ফেটে গেছে প্রাণ।
আয় অশ্রু, একবিন্দু সুধা কর দান॥
হাসির সুতীব্র তাপে,
একেবারে শুকাইয়া,
গিয়াছে এ হিয়া;
ভোলা দেখি ক্লান্তি টুকু,
গলা দেখি শুষ্ক প্রাণ—
সুধা টুকু দিয়া।

গয়ারাম বাবুর দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজা আসিয়াছে, বঙ্গবাসী আনন্দে মাতোয়ারা, সকলেই প্রফুল্ল, সকলেই উৎসাহ পূর্ণ; যেন সমস্ত বঙ্গবাসী একটি বৎসর ধরিয়া মৃতবৎ ছিল, আজ সহসা সঞ্জীবনী-মন্ত্রে জাগ্রত হইল। বঙ্গবাসী আজ শোক তাপ ভুলিয়াছে। বহুদিনের পর আত্মীয় কুটুম্বের মুখ দেখিবে বলিয়া প্রবাসীর মন নাচিয়া উঠিয়াছে। বিরহ-বিধুরা রমণী বহুদিন পরে স্বামী-সন্দর্শন সুখাভিলাষে পথ পানে তাকাইয়া আছে। সহরময় ছটাছটি, ছুটা-ছুটি পূজার ধুম পড়িয়াছে—এক টাকা মূল্যের জিনিষ দুই টাকায় বিক্রয় হইতেছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বত্রই পূজার আমোদ লাগিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই উৎসুক। প্রবাসী বাড়ী যাইতেছেন, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। আবার রেলে ভিড়, ট্রামওয়ে ভিড়, সর্ব্বত্র লোকের ভিড়। সন্তান যেমন বহুদিন পরে মায়ের মুখ দেখিবে বলিয়া উন্মত্ত হয়, বঙ্গবাসীও সেই উন্মত্ততায় আজ মত্ত। কিন্তু এহেন দুর্গোৎসবের সময় সকলের ভাগ্যে মা আনন্দময়ী প্রসন্না হন না। কারণ কেরাণী-মহলে বিশেষতঃ এবার বড়ই কান্না-হাটী পড়িয়াছে, আর পূজুটী চারি দিনের বেশী নয়। তার উপর আবার গৃহিণীর পত্রের উপর পত্র। আকর্ষণ দুই দিকে,—এক দিকে আফিস, অন্যদিকে ঘরের গিন্নি। একদিকে চাবুকের ভয় অন্যদিকে প্রেমের টান,। কেরাণী-মহল উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ! আসুন, এই শারদীয়া দুর্গোৎ-সবের সময় আপনারা একটি চিত্র সন্দর্শন করুন। কারণ গরীব দুঃখী সকলেই স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নূতন নূতন জিনিষ ক্রয় করিতেছেন। আমরাও সেই জন্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিমিত্ত এই নূতন চিত্রটী সংগ্রহ করিয়াছি।

গয়ারাম বাবুর নিবাস কলিকাতায়। পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্যফলে এখনও সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তার উপর

আবার পিতা বড় চাকরী করিতেন বলিয়া সম্প্রতি বড় সাহেবের সুপারিশে গয়ারাম বাবু নূতন ডেপুটী-গিরী (Deputy) পদ পাইয়াছেন। গয়ারাম বাবুর পিতা এক জন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। হিন্দুর উৎসব বার মাসই তাঁহার বাড়ীতে হইত। বিশেষ দোল দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাড়ীতে প্রচুর ব্যয় হইত।

দান, ধ্যান তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। কিন্তু গয়ারাম বাবুর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপর একটু ঝোঁক ছিল। পুঁতুল পূজা তাঁহার ভাল লাগিত না। এ ঝোঁকটা গয়ারাম যখন এণ্টান্স (Entrance) পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন সেই সময় হইতেই হইয়াছিল; কিছু দিন পরে নব বিধান ভাল লাগিল না, গয়ারাম বাবু শেষে সাধারণে যোগ দিলেন। গয়ারাম বাবুর পিতা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাহার অচলা ভক্তিছিল। গয়ারাম বাবুর একটি কন্যা ছিল এবং গয়ারাম বাবুর পিতাই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সুতরাং গয়ারাম বাবু নিজের ইচ্ছানুসারে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই এবং মেয়েকে বেথুন কলেজে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও পিতা বর্ত্তমানে কিছুই করিতে পারেন নাই। গয়ারামের পিতা আদর করিয়া পৌত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রমোদিনী,' এবং পুত্রের গৌরীদানের ফল হইবে বলিয়া অষ্টম বর্ষেই প্রমোদিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন প্রমোদিনীর স্বামীও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বাইশ বৎসরের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। গয়ারামের পিতা ভাল কুলীন দেখিয়াই পৌত্রী দান করেন।

প্রমোদিনীর স্বামী শ্যামাচরণের সংসারের অবস্থা তত ভাল ছিল না, তিনি পশ্চিমে কোন সওদাগরি আফিসে চাকুরী করিতেন বলিয়া সংসার এক রকম নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু প্রমোদিনীর স্বামী অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। এদিকে গয়ারাম বাবু যে বৎসর বি, এল্, (B. L.) পাশ করিলেন, সেই বৎসর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। গয়ারামের পিতা পুত্রের মনের ভাব বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর আস্থা আছে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য মৃত্যুর সময় এইরূপে উইল (Will) করিয়া যান, যে তাঁহার অবর্ত্তমানেঐবিষয়ের আয় হইতে নিয়মমত বৎসর বৎসর দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় উৎসব হইবে, আর যদ্যপি গয়ারাম বাবু উইল অনুযায়ী কার্য্য না করেন তবে তিনি সমুদয় বিষয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া গয়ারাম বাবুকে দোল দুর্গোৎসব করিতে হইত। গয়ারাম বাবু প্রত্যেক পূজার সময় ব্রাহ্ম বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। পূজার সময় সাহেবের দোকান হইতে ইংরাজি খানা আসিত কত সাহেব বিবির নিমন্ত্রণ হইত। গয়ারাম বাবুর পিতা যে টাকা গরিব দুঃখী দিগকে বিতরণ করিতেন, গয়ারাম তাহা সাহেব ভোজে ব্যয় করিতেন। এবার গয়ারাম বাবু নূতন ডেপুটী হইয়াছেন সুতরাং পূজার সময় অবশ্যই অনেক সাহেব বিবি ও সুশিক্ষিত রমণীগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। গয়ারাম বাবুর বাড়ি গম্‌গম্ করিতেছে।

গয়ারাম বাবুর কন্যা প্রমোদিনী প্রায় বাপের বাড়িতেই থাকিত। গয়ারাম বাবু জামাতা গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পূজার সময় তাহাকে বড় একটা নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু এবার নূতন ডেপুটী হইয়াছেন বলিয়া গয়ারাম বাবুর স্ত্রীর নিতান্ত ইচ্ছা যে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রমোদিনী ত আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। কিন্তু গয়ারাম বাবুর ইচ্ছা নয় যে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করেন। গয়ারাম বাবুর স্ত্রী নিতান্ত অনুরোধ করিলে গয়ারাম বাবু বলিলেন দেখ প্রমোদিনীর এখন নিতান্ত অল্প বয়স সবে এই বার বৎসরে পড়িয়াছে, যে আইন পাশ হইয়াছে এখন জামাই বাড়ি আনিলে আমাকে শেষে একটা হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে। গয়ারাম বাবুর স্ত্রী শুনিয়াই অবাক্। তিনি বলিলেন ওগো সে কি কথা! আমার মেয়ে ত আর এখন বালিকা নাই যে জামাই এলে দোষ হবে। গয়ারাম বাবু ফাঁপরে পড়িলেন। শেষে অগত্যা স্ত্রীর অনুরোধে জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। জামাতাকে পূজার সময় নিমন্ত্রণ করা হইল।

শ্যামাচরণ বাবু সওদাগরী অফিসে চাকরি করেন আবার আফিসে চারি দিন বই ছুটি নাই। এদিকে শ্বশুরের নিমন্ত্রণ পত্র; ফল—প্রমোদিনীর সহিত সুখ-সম্মিলন।

শ্যামাচরণ বাবু ভারী ব্যস্ত হইলেন কোন্‌দিকে যাইবেন চারি দিন ছুটি বাড়িতে যাইবেন না শ্বশুর বাটীতে যাইবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রমোদিনীর মুখ মনে পড়িল শ্যামাচরণ বাবু প্রমোদিনী কে দেখিবার জন্য অধীর হইলেন সুতরাং শ্যামাচরণ বাবু পূজার ছুটিতে শ্বশুর বাটিতে যাইবারই মনস্থ করিলেন।

অদ্য সপ্তমী পূজা গয়ারাম বাবুর বাটিতে মহাধুম! সাহেব বিবিদের খাওয়াইবার জন্য হোটেল হইতে নানা বিধ খানা আসিতেছে। খান্‌সামা বাবুর্চি প্রভৃতিতে বাটী ভরপুর হইয়াছে। শ্যামাচরণ বাবু শশুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া কাণ্ড কারখানা দেখিয়াই অবাক্ হইলেন। কি করিবেন—শ্বশুর শ্বাশুড়িকে প্রণাম করিলেন। প্রমোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন প্রমোদিনী অনেক দিন পর স্বামীর মুখ দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। কিন্তু স্বামীর মুখে চারি দিনের অধিক ছুটি নাই শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল। এদিকে গয়ারাম বাবু জামাতা আসিয়াছে দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন যেন শ্যামাচরণ ও প্রমোদিনীকে এক ঘরে রাখা না হয়। গয়ারাম বাবুর স্ত্রী বলিলেন—'সে কি এতদিনের পরে জামাই বাড়িতে আসিয়াছে, এ সব কথা যদি শুনিতে পায় তবে ত এ বাটীতে আর কখন পদার্পণ করিবে না।' গয়ারাম বাবু বলিলেন 'আমি কি করিব? আমরা গবর্ণমেণ্টের চাকরী করি; আমরা আইন মত চলিতে বাধ্য।' স্ত্রীর কথা কিছুতেই রাখিলেন না; চাকরদিগকে বাহির বাটিতে জামাতার শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্যেরা তাহাই করিল। শ্যামাচরণ বাবু রাত্রে স্ত্রীর নিকট কত কথা বলিবেন ভাবিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যখন তাহার ব্যাবস্থা শুনিলেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু কি করিবেন অগত্যা বহির্ব্বাটীতে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রমো-

দিনীও অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিল। পর দিন শ্যামাচরণ বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর ভিতর শাশুড়ি ও স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। সেই মহাষ্টমীর দিনে শাশুড়ির নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাটিতে রওনা হইলেন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও শশুর বাটিতে তিষ্টিলেন না। প্রমোদিনী কাঁদিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বাবু বাটীতে গিয়াই স্ত্রীকে পাঠাইবার জন্য গয়ারাম বাবুকে লোকজন সহ পত্র পাঠাইলেন। গয়ারাম বাবু প্রত্যুত্তরে লিখিলেন আমি কন্যাকে এত অল্প বয়সে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাইতে পারি না। শ্যামাচরণ বাবুর লোক জন সন্তুষ্টমনে প্রত্যাগমন করিল। উপসংহারে শ্যামাচরণ বাবু অনেক কষ্টে প্রমোদিনীকে আপন বাটীতে আনয়ন করিলেন; আর কখনও প্রমোদিনীকে বাপের বাটীতে পাঠাইলেন না।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।

আমোদ-প্রমোদ।

'আমোদ-প্রমোদ' সংসার মরুভূমের 'ওয়েশিশ'স্বরূপ। সংসারে থাকিয়া জীবমাত্রেই নানাপ্রকার ক্লেশ যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই দৃঢ়পেষিত হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে যদি ক্ষণকালের নিমিত্তও তাহারা দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া গিয়া আমোদ-প্রমোদ পায়, তাহাহইলে তাহাদের জীবনের ভার অনেক লাঘব বোধ হয়; সন্তাপিত জর্জ্জরিত জীব-হৃদয়ের দারুণ শেল সম বেদনা উৎপাটিত করিবার জন্যই আমোদ-প্রমোদ আবশ্যক হয়।—আমোদ প্রমোদ না থাকিলে এ সংসারে কাহারও হাস্যমুখ দেখিতে পাওয়া যাইত না, সকলেই সংসার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া বিমর্ষ-বদনে জীবন অতিবাহন করিত—জীবনে কিছুই আরাম থাকিত না; শান্তির কমনীয় বদন এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিগোচর হইত না, জীবন কেবল দুর্ব্বহ বোঝা স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই।

আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে, জীবন যে শুধু ভারী ভারী ফাঁকা ফাঁকা এবং আল্‌গা আল্‌গা বোধ হইত, এমত নহে জীবন যে কেবল ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র বা জনপ্রাণীশূন্য নির্জ্জীব মরুভুমির ন্যায় হইত, এমত নহে—এরূপ দুঃখের জীবন যে সকলেই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইত, কেবল তাহাই নহে, আমরা যে সকল সুন্দর আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব অনুপম মানবসৃষ্টপদার্থ দেখিয়া বিমোহিত ও চমৎকৃত হইতেছি তাহার কিছুই থাকিত না। যে আশায় মানব বাঁচিয়া থাকে আমোদ-প্রমোদরূপ ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, সেই আশালতা কেহই পোষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইত না, আর নৈরাশ্যের মরু-ভূমে কি মানবের কীর্ত্তিগুলি অঙ্কুরিত মুকুলিত, প্রস্ফুটিত ও ফলিত হইতে পারিত।—সুতরাং মানবকে অতি দৈন্যভাবে

দুঃখিতান্তকরণে কাল যাপন করিতে হইত। এখন যে সকল সুখচ্ছন্দতা নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া বোধ করিতেছি এবং ঈশ্বরের তুল্য বলিয়া অহঙ্কার করিতেছি, তখন তাহার সম্ভাবনা, অসাধ্য ও অসম্ভব বিষয়ের তালিকাভুক্ত হইত; শ্মশানের হাহাকার দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া ফেলিত; জীবন-কারাগারের আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইত, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে জগৎ ভাসাইয়া দিত—কি ভয়ানক!! সে নিদারুণ দশা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়?

'আমোদ-প্রমোদ' আমাদের জীবনের সারাংশ একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, আমোদ-প্রমোদ হৃদয়ের 'ভার' নামাইয়া নূতন 'ভার' বহনার্থ সক্ষম করিয়া তুলে, ইহাতে নূতন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে কোন কষ্ট বোধ হয় না, অপিচ বিরাম বোধ হইয়া থাকে; ইহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়ই, অধিকন্তু সসন্তোষে নির্ব্বাহ হেতু, শরীরও বেশ সুস্থ ও সবল থাকে—ইহার পরিণাম এই দাঁড়ায়, যে মানব নানাবিধ রোগ যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইয়া, অতি সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে সমর্থ ত হয়ই, এমন কি দীর্ঘজীবি হইলেও হইতে পারে, হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ ইহজীবনে আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, তাহা কতকগুলি সুখ দুঃখের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'জীবন' বলিতে গেলে যদি খানিকটা সময়ই বুঝায় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ইহা যতদূর অনুভব যোগ্য এবং যাহা কিছু আমরা আমাদের জীবনের বিষয় জানি তাহা সুখ দুঃখের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; 'সময়' বলিলে কি বুঝায় ইহা জানিবার জন্য কতিপয় ঘটনা চাই ও তাহাদের একটির পর একটি ও তার পর অপর একটি এইরূপ ভাবে ঘটাও চাই। এখন এই দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের জীবনের মালমসলা কতকগুলি ঘটনা, আর ঐ সকল ঘটনা সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখ-বোধ হইলে, সেই দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা স্বাভাবিকই হইয়া থাকে; আর যখন কাহারও অন্তঃকরণে সুখের আলোক বিকাশ পায়, তখন সেই সুখকে সর্ব্বাঙ্গীন সম্পন্ন করিবার জন্য কিম্বা অধিক কাল স্থায়ী করিবার জন্য সকলকেই চেষ্টিত হইতে দেখিতে পাই। এরূপ বলা যাইতে পারে যে সুখই জীবের লক্ষ্য এবং জীবনের অনুকূল এবং দুঃখই ইহার প্রতিবন্ধক।

জীবনকে কতকগুলি কার্য্য-সমষ্টি বলিলেও, আমোদ-প্রমোদ দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সমষ্টি সুশৃঙ্খলায় সম্পাদিত হয় বলিয়া এবং আমোদ-প্রমোদের অভাবে আমাদের যাবতীয় কার্য্য প্রচুর পরিমাণে হ্রাস হইত বলিয়া, আমোদ-প্রমোদকে জীবনের সারাংশ বলা যাইতে পারে, আর জীবনকে কার্য্য সমষ্টি বলিলেও কার্য্য সমষ্টির যাহা কিছু অনুভবযোগ্য তাহা সুখ দুঃখ সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপে দেখা গেল আমোদ-প্রমোদ জীবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

অনেকে আমোদ-প্রমোদকে অতি গর্হিত বলিয়া মনে করেন এবং আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কাহাকেও আমোদ-প্রমোদ করিতে দেখিলে তাঁহারা বড়ই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন এবং নানাপ্রকার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেন; উঁহাদের অভিমত যদি এইরূপ হয় যে, আমোদ-প্রমোদ আদৌ কর্ত্তব্য নহে—সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, তাহা হইলে উক্ত মত যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা আমাদের উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে।

'আমোদ' বলিতে উত্তমরূপে আত্মসুখ উপভোগ করা বুঝায়। আমোদ-প্রমোদ বলিতে দুইজনে বা বহুজনে মিলিত হইয়া, কোনবিষয়ে সুখোপভোগ করা বুঝাইয়া থাকে; আমোদ-প্রমোদ একজন লোকে হয় না, বহুজন বা অন্ততঃ দুইজন লোকও চাই, আর ঐ বহুজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে কোন বিষয়ে সুখোপভোগ করিলে আমোদ-প্রমোদ করা হয় না। আমোদ-প্রমোদে পরস্পর সুখোপভোগের আদান প্রদান থাকা চাই, একজনে স্ব-সুখবৃত্তান্ত অপরকে জানাইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রণোদিত ও উৎসাহিত হইয়া, একরূপ অভিনব ভাবে পূর্ণ আত্মসুখ বা আমোদ ভোগ করা চাই অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদে সমবেদনা ও পারম্পর্য্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

আমরা মনের দ্বারাই আমোদ-প্রমোদ জনিত সুখোপভোগ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়-গণ মনের দ্বার স্বরূপ; চক্ষুদ্বারা সৌন্দর্য্য, কর্ণ দ্বারা সুমধুর সঙ্গীত, নাসিকা দ্বারা বহুবিধ সুগন্ধ, জিহ্বা দ্বারা সদাস্বাদযুক্ত নানা প্রকার ভোজন ও স্পর্শ দ্বারা স্রক্-চন্দন বনিতাদি সঙ্গ ইত্যাদি বহু প্রকার সুখভোগ আমাদের আমোদ-জনিত। আর এক প্রকার আমোদ আছে, যাহা আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়কে চালিত করিয়া আমরা লাভ করিয়া থাকি—'আমোদ' শব্দ সচরাচর এই দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যে উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্ম দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলেই এরূপ আমোদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

'আমোদ-প্রমোদ' ও ঐরূপ। যথা—মল্লক্রীড়া, থিয়েটার, যাত্রা, নৃত্যগীত, একত্র আহার বিহার ইত্যাদি।

ঘোড়দৌড়, বাজি রাখিয়া খেলা, প্রভৃতি-কেও 'আমোদ-প্রমোদ' বলা যাইতে পারে, তবে কিছু পার্থক্য আছে, উক্ত ক্রীড়াকারীরা কে হারিবে, কে জিতিবে এই আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকে, তাহাতে ভালরূপ আমোদ করার অভাব হয়, আর কাহারও হার হইলে তাহার টাকা কড়ি লইয়া টান্ পড়ে বলিয়া ক্রীড়াকারীদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমবেদনার অভাব হয়। তবে যাহারা দর্শক, তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে পারে বটে।

সকল প্রকার খেলাতেই হার জিত আছে, কিন্তু সকল স্থলেই টাকা কড়ি বাজি রাখিয়া খেলা হয় না, এই হেতু বাজি রাখিয়া খেলা ব্যতীত অন্যত্র হার জিতের আশঙ্কা নাম মাত্র। তাহাতে আমোদ-

প্রমোদ করার কোন ব্যাঘাত ঘটে না, পরন্তু কৌতূহল উৎপাদন করে বলিয়া, আমোদ প্রমোদের পরিপোষক হয় এবং বলিতে কি, কৌতূহল না থাকিলে কোনরূপ আমোদ-প্রমোদই হইতে পারে না—কেবল কৌতুকবশতঃ ক্রীড়াস্থলে সমবেদনার অভাব নাই। একথা স্বীকার্য্য বটে, এইরূপ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রতি জিগীষাবৃত্তি বলবতী হইয়া কৌতূহল হ্রাস করিয়া আমোদ-প্রমোদের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, এবং পরিশেষে এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, ঐরূপ ক্রীড়াকে কেহই আমোদ-প্রমোদ বলিতে পারে না,—তবে ঐরূপভাব কেবল সামান্য, ইতর, নিরক্ষর কাণ্ডজ্ঞানবিহীন মূর্খ লোকদিগের মধ্যেই দেখা যায়, তাহারা খেলা কাহাকে বলে জানে না, কেবল কলহই করিয়া থাকে।

দুই বা দশজন মিলিয়া শৌণ্ডিকের দোকানে গিয়া মদ খাওয়া বা বেশ্যালয়ে গিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্যাদি করা, আমোদ-প্রমোদ বটে, কিন্তু ঐ সকল আমোদ-প্রমোদের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ বলিয়া ঐ সকল আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাদিগকে অবিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ বলে; ঐ সকল আমোদ-প্রমোদে আদৌ লিপ্ত না হইয়া উহাদের দূরে থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।" আর যাঁহারা আমোদ-প্রমোদকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, আমোদ-প্রমোদ যাঁহাদের দুই চক্ষের বিষ, তাঁহারা যদি এইরূপ আমোদ-প্রমোদকে লক্ষ্য করিয়াই উক্তবিধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাঁহারা যে নানাপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদকেও নিন্দা করিয়া থাকেন সেই বিষয়ে তাঁহাদের মত ভ্রমাত্মক, এই বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় ও অভিপ্রায় যে অতি মহৎ এই কথাই বলিতে হয়।

উপরে যে আমোদ-প্রমোদের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, আমোদ-প্রমোদে সর্ব্বদা লিপ্ত হইয়া থাকাই কর্ত্তব্য, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য সর্ব্বদাই উদ্যোগী ও সচেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বদা করিলে অথবা আমোদ-প্রমোদের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিলে, আমাদের হৃদয়ের তেজ কমিয়া যাইবে, শরীরে আলস্য, মনের দুর্ব্বলতা হইবে এবং মানব কোন কর্ম্মই করিতে পারিবে না, ইহাতে আমোদ-প্রমোদও লোপ পাইবে, সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করিলে আমোদ-প্রমোদও ভাল লাগিবে না; এক সময়ে একরূপ আমোদ-প্রমোদ করিয়া ক্ষণেক পরে অন্যরূপ আমোদ-প্রমোদ করিলেও দিন কতকের জন্য ভাল লাগিতে পারে বটে, কিন্তু, পরিশেষে এরূপ দাঁড়াইবে যে, কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ আর ভাল লাগিবে না; জনসনের 'রাসেলাস' পাঠ করিলেই ইহার সম্যক্ প্রতীতি হইবে।

প্রত্যুত, আমোদ-প্রমোদ আর বিশ্রাম লাভ একই প্রকার; উহাদের উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, আমোদ-প্রমোদ বা বিশ্রাম কেবলই করিতে হইবে, অনেক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভ এবং অনেক বিরক্তিকর ও

ক্লেশজনক মানসিক অবস্থার পর আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ বড়ই মনোহর; কিন্তু উহাদের মনোহারিত্ব কেবল তত্তৎকালের উপযোগী; তবে ভ্রান্তজীব মানব আমরা, আমরা বুঝিতে না পারিয়া আমোদ-প্রমোদ ও বিশ্রামকাল বাড়াইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হই,—আমোদ-প্রমোদ ও বিশ্রাম চিত্ত, মন ও শরীরের দৈন্য ও গ্লানি দূর করিবার জন্য—চিত্ত, মন ও শরীরকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য নহে; উহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য সদুদ্দেশ্য, চিন্তা ও কর্ম্ম রহিয়াছে, তবে নিরন্তর শরীর মন ও চিত্ত ব্যাপৃত থাকিলে উহাদের অবসাদ হয়, উহারা আর বেশী খাটিতে পারে না, বিশ্রাম বা আমোদ-প্রমোদের আবশ্যক হইয়া থাকে এবং এরূপ অবস্থাতেই কেবল উহাদের প্রয়োজন হয়।

আমোদ-প্রমোদও একরূপ বিশ্রাম বটে, যদিও শরীর চালনা কোন কোন আমোদ-প্রমোদের প্রধান অঙ্গ, তথাপি তত্তৎস্থলে চিত্ত ও মনের অবসাদ দূর করিবার জন্যই আমোদ-প্রমোদের আবশ্যক হয় বলিয়া এবং চিত্ত ও মন আপনাদের ব্যাপৃতত্তা হইতে বিরত হয় বলিয়া, আমোদ-প্রমোদ চিত্ত ও মনের বিশ্রাম বটে,—আমোদ-প্রমোদে মনও ব্যস্ত থাকে, এরূপ আপত্তি কেহ কেহ করিতেও পারেন বটে, কিন্তুযেমন অনেক খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া, মৃদু মন্দ সমীরণে শরীর ভাসাইয়া মন্দ মন্দ পাদচারণা বিশ্রামের সুখ প্রদান করে এবং বিশ্রামই বটে, সেইরূপ মন ও চিত্ত ক্লান্ত হইয়া আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইলে তাহাদেরও অবসন্নতা দূর হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব হয় এবং এই হেতু তাহারাও মন ও চিত্তের বিশ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। একথা স্বীকার্য্য বটে যে, আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত মন ও চিত্তের স্বতন্ত্র বিশ্রাম আছে, কেননা নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাও ত সম্ভব। তাহা হইলে আমোদ-প্রমোদকে কেবল একরূপ বিশ্রাম বলিলেই চলিবে না, বাস্তবিকই আমোদ-প্রমোদ এক প্রকার বিশ্রাম ও স্বতন্ত্র সুখ-প্রস্রবণ—কিন্তু তাহা হইলেও আমোদ-প্রমোদ সর্ব্বদা করা বিধেয় নহে, তাহাও উপরে সুস্পষ্ট দেখান গিয়াছে। মোট কথা এই সর্ব্বদা সৎচেষ্টা, সৎকর্ম্ম ও সৎচিন্তাকর এবং মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলে অর্থাৎ চিত্ত, মন ও শরীরের অবসাদ দূর করিবার জন্য, আমোদ-প্রমোদও বিশ্রাম গ্রহণকর।

আমাদের শাস্ত্রেও আমোদ-প্রমোদ করিবার বিধি আছে এবং সেই আমোদ-প্রমোদ নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য মানবের মঙ্গলোদ্দেশে অনেক বিধি ব্যবস্থা আছে,পাছে মানব আমোদ-প্রমোদে ভোর হইয়া আপনার পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করে, এই জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া,মানবকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে না দিয়া, তাহাকে সুপথে নীত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকল আমোদ-প্রমোদ আমাদের সময়ে সময়ে পূজাপদ্ধতি। দুর্গাপূজা একটি এইরূপ প্রধান আমোদ-প্রমোদ; সত্য সত্যই দুর্গাপূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান আমোদ-প্রমোদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, দুর্গাপূজার আমোদ-প্রমোদের সকল অঙ্গই বর্ত্তমান আছে এবং যদি কিছু কম থাকিতেও পারিত

তাহাও লোকাচারে পূরণ হইয়া গিয়াছে এবং ইহা অনেক লোক লইয়া আমোদ-প্রমোদ বলিয়া ইহার তুলনা আর নাই এবং এ আমোদ-প্রমোদ অনেক সময় ব্যাপীও বটে। দুর্গাপূজায় ভক্তি, আরাধনা প্রভৃতি থাকায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বোচ্চ আমোদ-প্রমোদ; পরন্তু বলিতে কি দুর্গা-পূজা এরূপ উচ্চ অঙ্গের আমোদ-প্রমোদ যে, ইহাকে আমোদ-প্রমোদ বলিলে, ইহার অযথা অপমান করা হয় এবং আমাদেরও এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, ইহাকে কেবল আমোদ-প্রমোদই বলি, তবে মহাশক্তির মহাপূজায় যে আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ হইয়া থাকে একথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত নহি।

চার্ব্বাক্ শাস্ত্রে বলে খাও এবং আমোদ-প্রমোদ কর, কেননা তুমি ক্ষণিক, কেবল যে ইহ জগতে তাহা নহে, মৃত্যুর পর তোমার কিছুই থাকিবে না, তুমি অন্ধকারে আসিয়াছ, তোমার আগেও কিছু ছিল না শেষেও কিছু থাকিবে না, তুমি অন্ধকারেই মিলিয়া যাইবে, তোমার আত্মাও নাই, তোমার পরলোকও নাই এবং তোমার মৃত্যুর পর শোক দুঃখও নাই, ও সকল কেবল বাতুলের উক্তি এবং প্রলাপ মাত্র।

আমরা এস্থলে চার্ব্বাকের মতের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহার মত উদ্ধৃত করিলাম না, কেবল এই বলিতেছি যে, যদিও চার্ব্বাকের মত সত্য বলিয়াও ধরা যায় (For argument's sake) তথাপি ইহ জগতেই মনুষ্যের ক্ষণিক জীবনের জন্যও সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ কর্ত্তব্য নহে, কেন নহে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আজকাল 'রঙ্গালয়' লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন, কোন কোন ছাত্রসভা প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, রঙ্গালয়ে যাইবে না, কেননা উহাতে চরিত্র খারাপ হইয়া যায় ও কোন কোন সংবাদ পত্রও রঙ্গালয়ে কেবলই দোষ দেখিতে পাইতে-ছেন, কিন্তু রঙ্গালয়ে যে আমোদ-প্রমোদ হয়, একথা বলা বাহুল্য; যদিও রঙ্গা-লয় ব্যতীত অন্যত্র আমোদ-প্রমোদ অস-ম্ভব নহে, তথাপি রঙ্গালয়ের বিভিন্ন প্রকৃতির আমোদ-প্রমোদ অন্যত্র সুলভ নহে এবং ইহাতে কোনরূপ বিশেষ দোষও নাই, তবে অনর্থক এরূপ আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকা কেবল নিজ বুদ্ধির বিড়ম্বনা বশতঃই বলিতে হইবে, কেবল বৃথা কল্পনা করিয়া দৃষ্টির অন্ধতা-বশতঃ দুর্ব্বুদ্ধি প্রযোজিতই বলিতে হইবে নিম্নে আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ নাট্যশালার উদ্দেশ্য এই ব্যঙ্গ-চ্ছলে সমাজের দোষ সংশোধন করিবার জন্য দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করা, নানাবিধ ধর্ম্ম বিষয়ক অভিনয় দ্বারা চিত্তে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করা এবং হাস্য, করুণ,বীর, প্রভৃতি রস ছড়াইয়া দিয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ দিয়া প্রফুল্লিত করা। এখন দেখা যাউক, এরূপ উদ্দেশ্য সফল হইতেছে কি না। (যদি সফল না হয় তবে, যাহাতে সফল হয় সেরূপ চেষ্টা না করিয়া কেবল রঙ্গালয় উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া বিজ্ঞ ও হৃদয়বান্ জনানুমোদিত

প্রথা নহে, এবং সুরুচি ও সভ্যতা অনুমোদিতও নহে।)

ঐরূপ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য নাট্যশালাকে ভাল ভাল নাটক, কবিতা, গীত প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয়, এবং অভিনয়ের জন্য সুদক্ষ, সঙ্গীতপটু, অভিনয়কুশল অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকেও রাখিতে হয়, ভাল ভাল চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াও রাখিতে হয়।

এখন নাট্যশালা আপন উদ্দেশ্য পালন করিতে পারিতেছে না বলিলে বলিতে হইবে হয় নাটকাদি ভাল নহে, না হয় অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, না হয় দৃশ্য পটগুলি সুন্দর নহে। (এস্থলে দর্শকদিগের সুবিধা ও অসুবিধার জন্য নানা প্রকার আবশ্যক বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন নাই বলিয়া কাযে কাযেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।)

যে সকল নাটকাদি লইয়া অভিনয় হয় তাহার কতকগুলি প্রধান প্রধান কবি ও নাটক প্রণেতার রচিত এবং অপরগুলি নাট্যশালা সম্পর্কীয় লোকদিগের রচিত। প্রথমোক্ত গুলির বিষয়ে বেশী আপত্তি হইতে পারে না, কেননা যদিও সেই সকল কবিতা ও নাটক ভাল ভাল লেখকদিগের দ্বারা লিখিত হইলেও বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর কবিতা ও নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হইবার যোগ্য নয় এরূপও ধরা যায়, তথাপি চলিত কালে উত্তমতর কবিতা ও নাটক না থাকায়, যাহা আমরা পাইতে পারি এমন কবিতা ও নাটকের অভিনয়ের দ্বারা চিত্ত-বিনোদন করায় ত কোন দোষ দিতে পারি না। এরূপ স্থলে ঐরূপ কবিতা ও নাটকের অভিনয় করিয়া চিত্তের উল্লাস সম্পাদন করা ভাল, না যতদিন না ভাল কবিতা ও নাটক প্রণীত হয়, ততদিন রঙ্গালয় বন্ধ রাখিয়া দেওয়া ভাল, তাহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

আর ঐরূপ বন্ধ রাখিলে ভাল ভাল নাটক ও কবিতা উদ্ভাবিত হওয়া অনেক পরিমাণে কমিয়াও যাইবে, কেননা নাট্যশালা দ্বারা পাকে প্রকারে ভাল ভাল কবিগণ ও নাটক রচয়িতা উৎসাহ পাইয়া থাকেন,—নাটক রচনা একেবারে উঠিয়া যাইবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেহ কেহ এমনও আছেন, যিনি বলিতে পারেন, না হইল বা উত্তম উত্তম কবিতা ও নাটকের প্রণয়ন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কবিতা ও নাটকামোদী লোকের দ্বারা কি উপকারে সম্ভাবনা আছে ও সকল মানবের কেবল 'বাবুগিরি' (Luxury) মাত্র, যত না হয় ততই ভাল, এ প্রকার লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য কবিতা ও নাটকের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে হয়, কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধে দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আমরা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে অধিক দূর গিয়া পড়ি।

আর যে কতকগুলি নাটক রঙ্গালয় সম্পর্কীয় লোকদিগের দ্বারা রচিত হয় সে গুলির সর্ব্বাঙ্গীনতা পরীক্ষা স্থানীয় বটে এবং তাহাও ঐ রঙ্গালয়েই দর্শকদিগের অনুগ্রহের তারতম্যে বিলক্ষণ রূপেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে, যদি ভাল হয় উত্তরোত্তর দর্শকমণ্ডলীর ঘন ঘন শুভ পদার্পণ হইতে

থাকে এবং আসরও জমকায় এবং খারাপ হইলে রঙ্গালয়ে কতকগুলি বেঞ্চই পড়িয়া থাকে।

আর একটী কথা, মানবগণ নানা সমাজে বিভক্ত এবং নানা ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং তাহাদের মনের ভাবও স্বতন্ত্র প্রকারের; অতএব জাতীয় রঙ্গালয়ই তত্তৎ-জাতির আমোদ-প্রমোদের স্থল। কিন্তু নৈসর্গিক কারণ বশতঃ একজাতি হইলেও এবং এক ভাষায় কথা কহিলেও প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত বিভিন্নতাবশতঃ এক জাতিই নানা সমাজে বিভক্ত, এরূপ স্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, কোন জাতীয় রঙ্গালয়ে এক সমাজের প্রতি কটাক্ষপাতও হইতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে সকলকেই রঙ্গালয়ে যাওয়া নিষেধ করা অতীব অন্যায়। যদি কোন সমাজ বিবেচনা করেন যে কোন রঙ্গালয়ে তাঁহাদের সমাজের অযথা নিন্দা করা হইতেছে তাহা হইলে তথায় তৎসমাজের অন্তর্গত কোন জনের তৎরঙ্গালয়ে গমন নিষেধ করিতে সমাজ পারেন বটে, কিন্তু সকলকে সকল রঙ্গালয়ে গমন নিষেধ করা ভাল বিবেচনা সঙ্গত নহে। আর কটাক্ষপাত হইলেও তাহা উড়াইয়া দেওয়াও সুবুদ্ধিজনের কর্ত্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ কটাক্ষপাতের মূলে যে কিছুই নাই এরূপ নহে, অবশ্যই সমাজের কোন গুরুতর দোষ—যাহা সমাজ দেখিতে পাইতেছেন না—লক্ষ্য করিয়াই কটাক্ষ করা হইয়াছে এবং বাস্তবিকই ঐরূপ কটাক্ষ করা নাট্যশালার একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং একটী প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক অনেক রাজাদিগের বিষয় শোনা গিয়াছে যাঁহারা নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য এবং কুপথে পদার্পণ করিলে বা কুপরামর্শে চালিত হইলে আত্ম সংশোধন করিবার জন্য 'ভাঁড়' রাখিতেন। অতএব যাঁহারা থিয়েটারকে কটাক্ষপাত করিতেছেন নিজ বুদ্ধিবশতঃ এইরূপ বিবেচনা করিয়া আত্ম-সংশোধনের পথে, দুরদৃষ্টক্রমে কণ্টক অর্পণ করিবার জন্য থিয়েটারের অযথা নিন্দাবাদ করেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বড়ই শোচনীয় এবং উদ্ধারের পথ সুদূর পরাহত এবং তাঁহাদের ঘোর দৈব বিড়ম্বনা।

অভিনয় কার্য্যের জন্য যেরূপ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আছেন তাহাতে কোনরূপ দোষ দেওয়া নিতান্ত মূঢ় ও অর্ব্বাচীনের কার্য্য; কিন্তু যদি বলেন যে ঐ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সম্পূর্ণ অভিনয় পারদর্শী হইয়া উঠেন নাই, তাহা হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কেহ কেহ দোষ দিয়া থাকেন বেশ্যা দ্বারা অভিনয় কার্য্য অতীব গর্হিত ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমার অধিক বলিবার কিছুই প্রয়োজন নাই, গত পূর্ব্ববারের 'রঙ্গভূমি' অভিহিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে এরূপ আপত্তির অযৌক্তিকতা, অসারতা, ভ্রমাত্মকতা এবং অদূরদর্শিতা সুস্পষ্টই বোধগম্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

দৃশ্যপট গুলির বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি সকল হইতে পারে এবং ঐ সকল আপত্তির যেরূপ খণ্ডন হইয়াছে এখানে তদ্রূপই হইবে, কেননা দৃশ্যপটাদি অভিনয়ীকৃত বিষয়েরই উপযোগী এবং সেই জন্য অভিনয়ের বিষয়ের উপযোগিতা প্রতিপন্ন

হইলেই দৃশ্যপটাদির ও প্রকারান্তরে উপযোগিতা প্রতিপন্ন করা হইল, তবে যদি বল দৃশ্যপটগুলির উন্নতি আবশ্যক, তাহা হইলে সে কথা স্বতন্ত্র এবং আমাদেরও ও কথায় কোন আপত্তি নাই।

দ্বিতীয়তঃ অবিবাহিত অথচ অধিক বয়স্ক বালকদিগকে সকল নাটকের অভিনয় দেখিতে দেওয়া উচিত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় না, কেননা নাটকের সদুদ্দেশ্য থাকিলেও, এমন অনেক বিষয় নাটকে সন্নিবেশিত আছে, যাহা সুন্দররূপে এবং সম্পূর্ণরূপে লেখক ব্যক্ত করিতে যাইয়া এবং তদ্দারা আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও এবং তাহার সম্পুর্ণ সত্যতা, হৃদয়গ্রাহিতা, মর্ম্মস্পর্শিতা সত্বেও পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রোতাদিগের মনে এমন অনেক বিষয় উত্থাপিত পারে (এবং এমন কি যাহা নাটক রচয়িতা পর্য্যন্তও সম্ভাবনা করেন নাই ও অভিনেতা অভিনেত্রীগণ হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেও অণুমাত্র প্রয়াস পান নাই, অথচ যাহাতে তাহা না হয় এরূপ চেষ্টিতও হইয়াছেন) যাহাতে তাহাদের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, কিন্তু এই হেতু নাট্যশালা যে একেবারে বর্জ্জনীয় তাহা নহে, কতকগুলি বালকের পক্ষে কতকগুলি নাটক অভিনয় দর্শন অনুপযোগী হইলেই রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া যে নিতান্ত ভ্রম ও মোহ বিজৃম্ভিত এবং হৃদয় শূন্যতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

দশজন বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয়াদি দর্শন ও শ্রবণে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ হইতে পারে এবং সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে যে বিস্তর জ্ঞানলাভ হয় এত লেখার পর একথা বলা বাহুল্য; এ বিষয়ে দর্শক মাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত হইল না।



কমলকলি দর্শনে।

(নিশাবসানে)

ছিছি ফুলকলি, কেন ঢলি ঢলি
বাড়াও হাসির মেলা ?
ফুলেতে জোছনা জ্বালায় যাতনা
একি খেলা ধল ধালা ?

ধরিতে চকোরে অমিয়া লহরে
হাসি ফাঁদ পাতে চাঁদ,
উড়িয়া উড়িয়া চকোর ঘুরিয়া
ভাবে একি পরমাদ !

গেলি নানা রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে
হাঁসির আগুন ছুটে ;
পুড়িয়া পুড়িয়া মরমে মরিয়া
অলির পরাণ টুটে।

এত যে লালসা কি আছে ভরসা
নিরাশা শুধুই ভালে ;
শেষে হলাহল শুকায় কমল
হাসি রাশি ডুবে জলে !

একি এ প্রমাদ, অলি কি উন্মাদ—
কেন হাসি বাজে প্রাণে ?
একি মায়াবিনী ছুটয়ে তটিনী—
মধুপে মজাতে টানে ?

যাওলো নলিনী মধুময়ী ধনী
হাসিওনা আরবার ;
হাসিতে বেদনা বড়ই যাতনা !!
ভ্রমরে মেরোনা আর।

না ফুটিতে কলি, ছুটে যত অলি
চাহে নয়নে নয়নে ;
দূরেতে রহিয়া থাকিয়া থাকিয়া
দেখে সেই মুখ পানে।

আসিয়া সমীর হইয়া অধীর
অধর চুমিয়া যায় ;
মলয় প্রকাশে সরোজিনী হাসে
ছুটিয়া অলি পলায়।

এ নিঠুর জ্বালা বল ফুলবালা
সহিব কেমন করে !
হৃদয়ের গাথা হৃদয়ের ব্যাথা
প্রাণ খুলে বলে তারে।

ফুলে বসিবারে ভ্রমর যে ফিরে
দূরন্ত বহে মাঝারে ;
হৃদে সদা আশা না মিটে পিয়াসা
কি করে বল লো তারে।

শ্রীঃ—

মাসিক সংবাদ।

কিছুদিন হইল, বিলাতের "ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোশিয়েসন" নামক সভাতে সিবিলিয়ান ডবলু. সি, ম্যাকফার্শন সাহেব 'ভারতে কৃষির উন্নতি' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর বেলী সাহেব উক্ত সভার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কটন সাহেব ও উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের অনেকগুলি সিবিলিয়ান উক্ত সভায় সমুপস্থিত ছিলেন।

***

বক্তা ম্যাকফার্শনের মন্তব্য এই যে, "প্রতিবৎসর প্রচুর আমদানী প্রযুক্ত ভারত-শস্য-ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং ভারতের প্রজাবর্গ একাহারী—অনাহারী হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভাবে নিত্য নিয়তই নিষ্পেষিত হইতেছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ভিতর বাইশ কোটি প্রজার বাস: ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী। বিশেষতঃ যখন একতৃতীয়াংশ রাজস্ব ভারত ভূমির খাজনা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা, কৃষি প্রধান ভারতের ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য বিচক্ষণ বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিদিগকে রীতিমত কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নে ও উন্নত প্রণালী অবলম্বনে কৃষির ফলাফল সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক।"

***

সভাপতি স্যারষ্টুয়ার্ট বেলীর বিশেষ বক্তব্য এই যে "বহু দিবসাবধি ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতের কৃষি প্রথার অনেক অনুসন্ধান সত্বেও এতদ্বারা কোনও প্রকার স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। তবে বিগত কয়েক বৎসর হইতে এসম্বন্ধে সামান্য পরিমাণে কার্য্য হইতেছে। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব প্রযুক্ত, এ বিষয়ে এতাবৎ কোন কার্য্য হয় নাই।" বঙ্গেশ্বর বেলীর বক্তৃতা বাক্যের বিপক্ষে, ভারত গভর্ণমেণ্ট অর্থাভাব সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, সীমান্তে সামরিক সজ্জায় সমূহ অর্থ ব্যয়ে অত্রত্য গভর্ণমেণ্ট রিক্তহস্ত; পরন্তু পরাধীন প্রজাপুঞ্জের প্রাণ রক্ষার প্রধান পর্য্যায়ে পশ্চাৎপদ।

***

ভারতের কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে বেঙ্গল সেক্রেটরি কটনের ও কয়েকটি কথা "কোট" করিয়া প্রকটিত করা যাইতেছে। তিনি বলেন যে,ভারতীয় কৃষক কুলের কৃষির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পর্য্যালোচনার প্রয়োজন নাই; ভারতীয় কৃষককুল কৃষি করণ কার্য্যে কৃতমুখ। তাহাদের যে টুকু শিক্ষার অভাব সেটুকু তাহাদের ক্ষমতারও অভাব; কৃষিতে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে পরিব্যাপ্ত রাখিলে চলিবে না। যাহাতে তাহারা শিল্পোন্নতি সাধনে সমধিক সচেষ্ট হইয়া সাফল্য লাভে সমর্থ হয়, সে বিষয়ও গভর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি সাপেক্ষ। অনন্য

গতি হইয়া প্রজাকুল কৃষিকার্য্যে আক্রান্ত থাকিলে পদে পদে আশঙ্কা আছে। 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ভারতাধিকার করিয়াছিলেন- ভারত জাত প্রাচীন শিল্পসামগ্রীর জন্য; কিন্তু এক্ষণে আমদানী শুল্কের স্বল্পতানিবন্ধন ও বিলাতী কলকারখানার প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত ভারতের প্রাচীন শিল্প সমভূম হইয়াগিয়াছে। এক মাত্র কৃষি অবলম্বনে আয়র্লণ্ডের এক্ষণে দারুণ দুর্দ্দশা। সুতরাং একমাত্র কৃষি অবলম্বন না করিয়া ভারতবাসীরা যাহাতে শ্রম শিল্পের সমুন্নতিতে সমধিক সচেষ্ট হন, তাহারই ব্যবস্থা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

***

সম্প্রতি পুনার শ্রমসমিতির সভাপতি-মহোদয় বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথমতঃ প্রার্থনা করিয়াছেন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন তারিখের ১৯৯ সংখক মন্তব্য মতে এক্ষণে তাঁহাদের প্রদত্ত উক্ত বোম্বাই বিভাগীয় শ্রমজাত দ্রব্যাদি বিষয়ক একটী তালিকা গ্রহণের আদেশ হয় এবং তৎপরে অন্যান্য বিভাগেও উক্তরূপ কার্য্য করা হয়—ইত্যাদি।

ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরেল লর্ড রিপণের সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, 'ভারতীয় দ্রব্যাদি যদি বিলাতি দ্রব্য অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে অথবা সমান মূল্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি, বিলাতি দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে, ভারতীয় দ্রব্যাদিই গৃহীত হইবে।' অতএব এই মন্তব্য ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, উক্ত শ্রম সমিতির তাহাই দ্বিতীয় প্রার্থনা।

***

এক্ষণে ভারতবর্ষে যেরূপ দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় ভারতীয় শ্রমজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ সাধন ও বহুল পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্যাদির সর্ব্বত্র ব্যবহার। সেই জন্য বলি, ভারতগভর্ণমেণ্ট পুনাশ্রমসমিতির প্রার্থনা পূর্ণ করিলে যথার্থই রাজোচিত কার্য্য করা হয়। আজকাল উৎসাহ অভাবেও যখন দেশীয় অনেকানেক দ্রব্যাদি, বিলাতি দ্রব্যাদির সমকক্ষ ও বিলাতী দ্রব্যাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হইতেছে, তখন গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশবাসীরাও ভারতীয় শিল্পগণের মুখ তাকাইয়া বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার বর্জ্জন করিলে ভারতে আবার যুগান্তর উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

***

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে যত কাপড়ের প্রয়োজন তাহা দেশে উৎপন্ন করিতে হইলে, ন্যূন পক্ষে তিন শত কাপড়ের কলের প্রয়োজন। বোম্বাই নগরীতে কতিপয় কল কারখানা থাকিলেও বিলাতি বস্ত্রাদিই আমাদিগের দেশে বেশী কাটতি। কিন্তু বম্বায়ের বস্ত্রাদির বেশী কাটতি—চীন ও জাপানে। কারণ বোম্বায়ে মিল এসোসিয়েসনের সে চেষ্টা যত্ন ও উদ্যম নাই, যাহাতে বঙ্গদেশে বোম্বাই কাপড়ের কাটতি হয়। বোম্বাই ধুতি সাড়ী নয়নসুক প্রভৃতি এ দেশের পছন্দোপযোগী প্রস্তুত করিলে বোম্বাই ধুতি সাড়ী যে বঙ্গবাসীগণ আগ্রহ সহকারে ব্যবহার

করিত কলিকাতার বাজারে বোম্বাই চাদরের কাট্‌তিই তাহার প্রমাণস্থল। বোম্বাই চাদর পাইলে কে আর বিলাতি চাদর ব্যবহার করে? এই জন্য বোম্বায়ের কলকারখানার কর্ত্তা দিগের কর্ত্তব্য যাহাতে দেশের অভাব মোচন হয় সেই দিকে প্রথম লক্ষ রাখা; কেবল চীন জাপানে, বোম্বাই কাপড়ের কাট্‌তিতে মাঞ্চেষ্টরের সহিত প্রতিযোগিতায় চলিবেনা, যাহাতে দেশবাসীগণ বিলাতী বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিয়া, দেশীয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ঃ।

***

বঙ্গনাগপুরের সীমান্তে রাজনন্দ গ্রাম অবস্থিত; এই গ্রামটী করদসর্দ্দারের সীমান্তর্গত। তত্রত্য কতকগুলি ব্যক্তির যত্ন ও উদ্যমে একটী বস্ত্রের কল স্থাপন করা হইতেছে। ইহা পাঁচলক্ষটাকা মূলধন লইয়া যৌথকারবারের উপর অবস্থিত। প্রত্যেক অংশের মূল্য একশত টাকামাত্র। স্বয়ং রাজা উক্ত যৌথকারবারের একজন ডিরেক্টর। এই যৌথকারবারটী রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। কারখানাটি এরূপ স্থানে অবস্থিত, যে বাণিজ্যের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। কারণ, কারখানাটী রেলওয়ে হইতে তিনশত হস্তের মধ্যে অবস্থিত; তথায় আবার বোম্বাই রেলের সহিত যোগ হইবে। সুতরাং কারখানা হইতেই রেলগাড়ীতে মাল উঠিবে ও কারখানার আবশ্যকীয় নানা দ্রব্য রেলসংযোগে একেবারেই কারখানায় উপস্থিত হইবে। আপাততঃ তিনশত তাঁত ও দশহাজার নলি চলিবে এবং উৎকৃষ্ট কল ও উপযুক্ত তত্বাবধারকগণ দ্বারা পরিচালিত হইবে। আবার কলটী আবশ্যকমতে বৃদ্ধি করিবারও উপায় আছে। উক্ত কোম্পানি পূর্ব্বোক্তরূপ সুবিধা দেখাইয়া সাধারণকে অংশীদার হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বাস্তবিক এইকলটী প্রতিষ্ঠায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের আশা যে, কলটীতে দেশীয় ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদিই সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, কারণ অগ্রে দেশ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টরকে তাড়াইয়া দাও নহিলে আর সুবিধা নাই।

***

রঙ্গপুর বাসী-দিগের উদ্যোগে যে কাপড়ের কলের আয়োজন হইয়াছে, তাহার কারখানা বাড়ী প্রস্তুত জন্য শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ গ্রামে শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে। বাঙ্গলায় কাপড়েরর কলের প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীর এই প্রথম উদ্যম; ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হইলেই মঙ্গল।

***

সেদিন বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে, পুনার শিল্পসমতির দেখাদেখি, শিল্পোন্নতির উপায় আলোচনার জন্য এক সভা বসিয়াছিল; রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই সভার সভাপতি। শিল্পোন্নতির জন্য ফলে কতদূর দাঁড়ায় বলিতে পারিনা। কারণ বাঙ্গালীর সভাসমিতিতে আমাদের ততদূর বিশ্বাস নাই। আমরা এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা হইতে দেখিয়াছি যাহা কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

***

আমাদের দেশে এক্ষণে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সম্যক উন্নতির আবশ্যক হইয়াছে।

রপ্তানির যেরূপ প্রাবল্য, তাহাতে কৃষির উন্নতি একান্ত আবশ্যক। কারণ আমাদের দেশবাসীর সমস্ত আহার যোগাইয়া যাহাতে রপ্তানিকার্য্য রীতিমত চলে সে বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বাধীন দেশে শস্যাদি স্বল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইলে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু আমাদের দেশে অধিবাসীরা খাইতে পাউক আর নাই পাউক রপ্তানি বন্ধ হইবার নহে; বিশেষতঃ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে এত অধিক শস্যাদি উৎপন্ন হওয়া উচিত, যাহাতে ইংলণ্ডাদি ও আমাদের অভাব না হয়। সেই জন্য কৃষির উন্নতি বিশেষ আবশ্যক এবং গভর্ণমেন্টেরও সাহায্যে একান্ত কর্ত্তব্য।

***

শিল্পোন্নতির জন্য দেশবাসী দিগকে যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে হইবে। আমরা যত দূর বুঝি তাহাত বোধ হয় এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের সাহায্য পাইব কিনা সন্দেহ। কারণ এ দেশের শিল্পোন্নতি করিতে হইলে ও এদেশের শিল্পদ্রব্য, সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে, ইংলণ্ড প্রভৃতির সমূহ লোকসান। অতএব দেশীয় শিল্পোন্নতি সাধন জন্য গভর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থী না হইয়া আগ্রহ সহকারে দেশীয় দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করা দেশবাসী দিগের কর্ত্তব্য; এইটুকু যত্ন চেষ্টা সকলের থাকিলে যথার্থই দেশের উপকার করা হয়।

***

কলকারখানার অভাবেও আমাদের এই বঙ্গ দেশে এখনও যে প্রকার ধুতি উড়ানী প্রভৃতি বস্ত্রাদি পাওয়া যায়, তাহা বিলাতি বস্ত্রাদি অপেক্ষা মুল্যে কোনও অংশে মহার্ঘ্য নহে, বরং ব্যবহারে বিলাতী বস্ত্রাদি অপেক্ষা স্থায়ী; দেখিতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গবাসীগণ এইরূপ বস্ত্রাদি বিলাতি বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিলে দেশীয় তাঁতী সম্প্রদায় উৎসাহ পাইয়া আরও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। এমন কি কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় যতই বিলম্ব হউক না কেন, তথাপি দেশীয় বস্ত্রাদিই দেশীয় দিগের লজ্জানিবারণে নিশ্চয় সক্ষম হইবে; অনেকের ধারণা যে কলকারখানা না হইলে এদেশে বস্ত্রাদি সুলভে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু তাহাদের এধারণা ভ্রমাত্মক। তাঁহারা যদি দেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিব বলিয়া কৃতসংকল্প হয়েন, তাহাহইলে নিশ্চয় তাঁহারা ফলে দেখিতে পাইবেন যে দেশী বস্ত্রাদিই বিলাতী বস্ত্রাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মূল্যও বেশী নহে, অথচ বিলাতী বস্ত্রাদি অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী।

***

যত কাপড় ব্যবসায়ী আমাদের দেশে আছেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক যত্ন চেষ্টা থাকিলে দেশী বস্ত্রাদির ব্যবহার সকলেই সহজে করিতে পারেন। কিন্তু সে যত্ন উদ্যম কাহারই দেখিতে পাই না। দোকানদারগণ বিলাতী ভোলে বিভোল, খরিদ্দারগণও তথৈবচ। দেশের রুচি এমনি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে বিলাতী দ্রব্য পাইলে, কি দোকানদার কি খরিদ্দার কেহই দেশীয় আদর করেন না।

***

যোড়াসাঁকো প্রভৃতি কলিকাতার যত স্থানে কাটা কাপড়ের দোকান আছে কেহই ভ্রমক্রমে দেশী কাপড়ের ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ প্রস্তুত করেন না সমস্তই বিলাতি। কোন কোন সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি যে পূর্ব্বোক্ত দোকানদারগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিপ্রাপ্ত কৃত বিদ্য ব্যক্তি; ইহারা চাকুরীতে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতেছেন। দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যে ব্যবসায় মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন ইহাই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। একথা সত্য হইলেও এবং আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণ দেশের আশা ও ভরসার স্থল হইলেও, ইঁহারা যে তাহার বিপরীত পথে গমন করিতেছেন তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। ইহারা এমনি বিলাত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে বিলাতী জুতাগুলি পর্য্যন্তও ভূরি পরিমাণে আমদানী করিতে ছাড়েন নাই। এরূপ অবস্থায় দেশীয় শিল্পাদির উন্নতি হইবে কিরূপে?

***

এখনও ইহাদের যত্ন চেষ্টা থাকিলে, দেশোন্নতির দিকে ইঁহাদের দৃষ্টি থাকিলে, ইঁহাদিগের দ্বারাই দেশীয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত পরিচ্ছদাদি দেশীয় ব্যক্তিবর্গের অঙ্গে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। সমুদ্রপারে, সুদূর প্রতীচ্য ভূমি হইতে বস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে আমদানী না করিয়া, ইঁহারা ভারতবর্ষীয় কলকারখানা প্রভৃতি হইতে কাপড় আমদানী করিয়া পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিলে দেশের মঙ্গল হয়। ব্যবসায়ীর দোকানে নানাস্থান হইতে আনীত নানা প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু কৃতবিদ্যগণের স্বদেশ ভক্তির পরিচয় দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশের শিল্পাদি নষ্ট হইয়া দেশ উৎসন্নে যাইতেছে।

***

অহিফেন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে আফিমের চাষ উঠাইতে চান, তাঁহাদের দলের একব্যক্তি প্রতিনিধি স্বরূপ সম্প্রতি বোম্বায়ে আসিয়াছেন। ইনি পত্রাদি ও খানকতক পুস্তকাদি পাঠাইয়া আমাদের, বুঝাইতে চাহেন যে চীনের সহিত আমাদের অহিফেনের ব্যবসা বন্ধের জন্য চেষ্টাকরা উচিত। ইহাদের এমনি দয়ার শরীর ও ইহাদের দয়া এমনি অসীম, যে সেই ইউরোপে অধিষ্ঠান করিয়াও আসিয়ার দুঃখেপ্রাণ কাঁদিয়াউঠে। আহা! চীন বাসীরা আহিফেন সেবন করিয়া থাকে ইহাকি ইহাদের প্রাণে সহ্য হয়!! সুতরাং যাহাতে ভারতবর্ষের সহিত চীনের অহিফেন ব্যবসা বন্ধ হয় সে চেষ্টা না করিলে চলিবে কেন? অহিফেন ব্যবসাবন্ধ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যে অহিফেনের চাষের জন্য সহস্র সহস্র কৃষক প্রতিপালিত হইতেছে, কতশত বণিকের বাণিজ্য চলিতেছে এবং যাহার রাজস্বে ভারত ধনাগারে ছয় কোটীটাকার আগম হইতেছে, বল দেখি, সেই ব্যবসাউঠাইলে ভারতবাসীকি ধনেপ্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা? ভারত ধনাগারে তেমন অর্থসমাগম নাই যাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট অহিফেনের আয় লক্ষ ছয় কোটী

টাকা পরিত্যাগ করিতে পারেন; সুতরাং অহিফেনব্যবসা উঠাইলে কারভার,গ্রস্ত দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের অবশিষ্ট শোণিত শোষণ ভিন্ন আরউপায়ান্তর কৈ? সুতরাং এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি-ও কষ্ট যাহাতে আমাদের উপভোগ করিতে নাহয় তদ্বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

***

ইংলণ্ডের উক্তধার্ম্মিক দলটী, দেখিতেছি বিদেশীর প্রতি উপদেশ প্রদানে বড়ই মজবুত; কিন্তু নিজেদের ঘরের দ্বারে দ্বারে যে সুরা স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেশ উৎসন্নে যাইতেছে তাহা ইহাদের ভ্রূক্ষেপেও আই-সেনা। সে খানে পাষণ্ড প্রকৃতি ইতর ইংরাজ গণ মদের নেশায় বিঘোর হইয়া যে সকল পৈশাচিক ব্যবহারে স্ত্রী পুত্র কলত্রাদিকে অসহ্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিতেও ভীষণ ঘৃণার উদ্রেক হয়; কিন্তু বকধার্ম্মিক দিগের দেশের দোষেরপ্রতি দৃক্‌পাতও নাই। চীনেরা অহিফেন সেবী হইয়াও সুরাপায়ী ইংরাজের ন্যায় দেশের কোন অনিষ্টকারী বা বীভৎসব্যবহারী নহে কেবলমাত্র অহিফেন সেবন করে বলিয়াই চীনের সহিত আমাদের অহিফেন ব্যবসাবন্ধ করিতে হইবে!! এমন নাহলে কি আর 'পরদুঃখ কাতরতা'। বকধার্ম্মিকগণ ভণ্ডামী ছাড়িয়া যদি স্বদেশের সুরাস্রোত বন্ধ করিতে পারেন তবে চীনেরা আফিম খায় বলিয়া প্রতিকারের চেষ্টা একদিন করিলেও করিতে পারেন, নচেৎ ঘর না সামলাইয়া বাহিরে কেবল ভণ্ডামী করিলে কিফল?

***

ইংলণ্ডে আর একটী দল আছেন, যাহা-দের আন্তরিক চেষ্টা ভারতীয় কলকারখানা ও শিল্পাদির উন্নতি যাহাতে নাহয়। কারণ তাহাহইলেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিটা বেশ ভাল রকমেই চলে অর্থাৎ বিলাতি দ্রব্যাদির ব্যবসা-বলে ভারতের অর্থশোষণে,ভারতবাসী দিগকে প্রাণে মারিয়া উদর পরিপূরণটা বড় ভাল। 'হোলট্ হলেট' প্রভৃতি এই সম্প্রদায় ভুক্ত। যথার্থ নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে,ভারতীয় কলকারখানা গুলি ইংল-ণ্ডীয় কল কারখানা অপেক্ষা পরিস্কার পরি-চ্ছন্ন ও বায়ু পরিপূর্ণ। মজুর দিগের ও কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়না।' এখানকার মজুর গণও বলে যে,আমরা বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছি কোন পরিবর্ত্তন বা আইনের আবশ্যক নাই। কিন্তু ধর্ম্মাবতার'হোলট্ হোলেট' সম্প্র-দায় বলেন, যে তোমাদের দারুণ কষ্ট তোমরা বুঝিতেছ না, আমরা তোমাদের অপেক্ষা বুঝিতেছি।' লাভের মধ্যে হিতে বিপরীত ফলফলে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভ্রমে-পড়িয়া অনর্থ একটা আইন প্রচলনে, আমাদের দেশের দফা রক্ষা করেন।

***

উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টের অন্তর্গত ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশভুক্ত পিটর্সবুর্গ-নগরে, "এমা আবট্" নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার শব দাহ করা হইয়াছে। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় 'উইলে' শবদাহ নিয়মাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রায় দশপনর হাজার টাকা মূল্যে একটী জাঁকাল পোষাকে উক্ত মহিলার শবদেহ সাজাইয়া চিতায় শায়িত করিয়া দাহ করা হয়। এই পোষাকটী উক্তকার্য্যের জন্য

তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দাহকার্য্যগত ১৭ই মে তারিখে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজকাল যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে তাহাদের মধ্যে শবদাহ প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া বাস্তবিক আমাদের আনন্দ হয়।

***

যাত্রীদিগের উপর, রেলওয়ে কোম্পানীর অত্যাচারের জন্য বিগত ১০ই অক্টোবর 'ইণ্ডিয়ান সভা' হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টকে এক আবেদন পত্র নিম্নোক্তরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হাবড়ার বিশ্রামগৃহে Waiting room এক যুবতীর উপর রেলওয়ে কোম্পানীর টিকেট কলেক্টরের অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যখন গাড়ি চলিতে থাকে তখনও যাত্রীদের উপর অনেক প্রকার অত্যাচার হয় তাহাও বিদিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভগলপুরের জজ উইলকিন্‌স সাহেব প্রত্যেক গাড়ি হইতে গাড়ির গার্ডের সহিত যাত্রীদিগের যাহাতে কথা বার্ত্তা কিম্বা কোন রকম ইঙ্গিত চলে তাহার পরামর্শ দিয়াছেন; এবং রেলওয়ে ষ্টেসনে স্ত্রীলোক দিগের উপর টিকেট কলেক্টরদের কোনরূপ অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য সভা হইতে স্ত্রীলোক টিকেট কলেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছে, এবং কখন কখন 'বালির' যাত্রীদের টিকেট দেখিবার জন্য হাবড়া হইতে টিকেট কলেক্টরগণ স্ত্রীলোক দিগের গাড়ীতে বসিয়া 'বালিতে' যাতায়াত করেন তন্নিমিত্ত ইহাদের জন্য পৃথক গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে এবং যাত্রীদের উপর টিকেট কলেক্টরের কর্তৃক কোনরূপ অত্যাচার না হয় তাহার জন্য ইনেস্পেক্টরের বন্দোবস্ত করিতে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আজকাল রেলওয়েতে ঘন ঘন যেরূপ অত্যাচার কাহিনী শুনা যাইতেছে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য আমরা আশা করি রেলওয়ে কোম্পানীর অত্যাচার দমনের জন্য গভর্ণমেণ্ট উক্ত সভার আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিবেন।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে সুবোধিনীতে আবার একখানি নূতন উপন্যাস মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। এই উপন্যাস খানি অন্তিম-মিলন প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনেরই লেখনী-প্রসূত, নাম "বিপন্নপথিক।" সুবোধিনীর পাঠক পাঠিকার নিকট অক্ষয় বাবু অপরিচিত নহেন। তাহার অন্তিম মিলন "পাঠে" আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন আশা করি নূতন উপন্যাস "বিপন্নপথিক" পাঠে ততোধিক সুখী হইবেন। অক্ষয়বাবু আমাদের পরম হিতৈষীবন্ধু, বিশেষতঃ সুবোধিনীর জন্য ইনি যথেষ্ট আন্তরিক যত্নও পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বলিতে কি ইনি সুবোধিনীর একজন প্রধান প্রতিপালক।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের
ভ্রাতা
শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—সপ্তম সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১২৯৮।



Calcutta:

Printed & Published by S. C. Sen, at the

GREAT TOWN PRESS.

No. 163, MUSJEEDBARI STREET,

1891.

নিয়মাবলী

১। সুবোধিনী প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা ৩২ পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে এক সংখ্যা করিয়া নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

২। সুবোধিনীর অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা চারিখানি পুস্তক উপহার পাইবেন। উপহার প্রার্থিগণকে পুস্তক পাঠাইবার ব্যয়াদির জন্য অতিরিক্ত চারি আনা দিতে হইবে অর্থাৎ ১৸৹ টাকা পাঠাইলে, উপহার পুস্তক ও এক বৎসর সুবোধিনী নিয়মিতরূপে পাইবেন। উপহার পুস্তক যথাঃ—

(ক) মানস-কুসুম (কবিতা-পুস্তক ৯৬ পৃষ্ঠা) ৺কালিদাস মিত্র প্রণীত।

(খ) ধর্ম্ম-পরীক্ষা (নাটক ৮৮ পৃষ্ঠা) শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

(গ) একটী চিত্র (উপন্যাস ৩৪ পৃষ্ঠা) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

(ঘ) A Visit to Darjeeling by Bhola Nath Mitra.

৪। সুবোধিনী সর্ব্বত্র ডাকযোগে প্রেরিত হয়;—অতএব যদি কেহ কোনও মাসের সুবোধিনী নিয়মিত মাসের মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে, তিনি তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। ইহার পর, আমরা আর দায়ী থাকিব না।

৫। প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী থাকিবেন,—সম্পাদক বা প্রিণ্টার দায়ী নহেন।

৬। সুবোধিনীর প্রতিসংখ্যার নগদ মূল্য ৶৹ আনা।

৭। সুবোধিনীতে বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি লাইন ।৹ আনা।

৮। সুবোধিনী-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি-পত্র ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাইবেন।

৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্,
সিমুলিয়া—কলিকাতা।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।
সুবোধিনী-সম্পাদক।

[প্রথম বৎসরে সুবোধিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য—দুইটাকা। দ্বিতীয় বৎসর গ্রাহকের জন্য ১৷৹ মাত্র]

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। } কার্ত্তিক—১২৯৮। { সপ্তম সংখ্যা।

তিরস্কার।

দিন বয়ে যায়,
পা দিয়ে নায়,
ভাবছ কিসের আশে ?
ঝপ্ করে নাও,
পার হ'য়ে যাও,
নইলে থাক বসে।
গা তুলা'য়ে
বুক ফুলা'য়ে,
বল্লে যাব পার ;
মজ্‌লে কসে,
রঙ্গরসে,
কল্লে কিবা তার।
হয় বাজি ভোর,
দেখ্‌ছি যে তোর,
কপাল পাথর চাপা ;

দেখতে হাঁদা,
সোঁদর গাধা,
ভিতর কেবল ফাঁপা।
ডাকৃতেছে হায়,
"কে যাবি আয়"
নায়ের চড়ন্‌দার ;
ত্বরিৎ যানা,
আনা গোনা,
থাক্‌বে না ক আর।
অন্তরে বল্,
কর্ রে কেবল,
ছাড়্‌রে মুখের জারি ;
শেষ কালে কি,
পড়্‌বি ফাঁকি,
সাম্‌নে বিপদ ভারি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বিপন্ন-পথিক।

(উপন্যাস)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত।

উপক্রমণিকা।

আর্য্যগণ সংসারকে "বিষবৃক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদিগের বহুদর্শন! ধন্য তাঁহাদিগের গভীর গবেষণা!! শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছে, সহস্র সহস্র সম্বৎসর অনন্ত কালে মিশাইয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগের সেই সারগর্ভ অকাট্য বচন জগতে চিরপ্রথিতই রহিয়াছে। সত্য বটে, মানব-বিহঙ্গ জননীর স্নেহ-নীড়ে লালিত ও জনকের সতর্ক নয়নে সংরক্ষিত, কিন্তু তাহার অবস্থিতি কোথায়? বিষময় কিশলয় সঞ্চালিত বিষাক্ত বায়ু সেবন ও বিষময় ফলের বিষাক্ত রস আস্বাদনে তাহার দেহ মন ও বৃত্তি সমূহ সকলই ক্রমে বিষপুষ্ট হইয়া বিষময় পরিণামই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কোন সৌভাগ্যবশে কোন শুভযোগে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ কৃপা লাভ করিয়া এই বিষময় তরু কোটরে অমৃতময় নিবাস নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হও, দেখিও জীব! সাবধান!! আর তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইতে চাহিও না; আর ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইও না। অমৃতময় আহার আপনি জুটিবে; পক্ষ সঞ্চালন না করিয়াও উড্ডয়ন শক্তি প্রাপ্ত হইবে; কিছুরই অভাব থাকবে না। ব্যাধ-ভয়ে ভীত হইয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় কাল-হরণ করিতে হইবে না। নিরবধি অমৃত রস আস্বাদন করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিবে।

কথাটি সহজ নয়—অনেক সৌভাগ্যে এরূপ সংঘটন হইয়া থাকে। দুর্লভবস্তুর অন্বেষণ করিতে হইলে, দুর্ব্বহ শ্রমভার বহন করিতে হয়। জীব! তুমি এই মহাবৃক্ষের আপাত মনোরম শ্যাম-পল্লবের আপাত স্নিগ্ধছায়ায় বিমোহিত হইবে,—না ইহার অন্ধকারময় কোটর মধ্যে, শান্তিসুখের অন্বেষণ করিবে? কোনটী তুমি ভালবাসিবে? কোনটী তোমার সহজ বোধ হইবে? জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই, সহজেই বুঝা যাইতেছে। যদি তুমি আপাত সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হইবে, তবে তোমার এমন দুর্দ্দশা কেন? কখন বা ব্যাধ আসিয়া নিশিত-কলম্বে বিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কখনও বা ভীষণ অজগরে তোমায় গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে, কখনও বা তুমি সজীব অবস্থায় পিঞ্জর ও নিগড় বদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতেছ।

যাহাকে আপন বলিয়া যত্ন করি, সেই পর; যাহাকে স্থায়ী বলিয়া জানি সেই অস্থায়ী; যাহাকে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়, সেই মৃত; যাহাকে সুন্দর বলিয়া জানি, সেই কদর্য্য; যাহাকে সম্পদ বলিয়া মানি সেই বিপদ এবং

যাহা সুখময় বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, তাহাই পরে অশান্তির আকর হইয়া উঠে। একবার নয়, অনেকবার প্রবর্ত্তিত হইয়াও এই ভ্রান্তজ্ঞান—ভ্রান্তধারণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভ্রান্তের আশ্রয় লইনা কেন? বিষয়-মদিরা কি এতই মিষ্ট লাগে? মিষ্ট যদি—তবে কষ্টপ্রদ কেন? অনিত্যের নিত্যতা অসারের সারত্ব কেমন করিয়া সম্ভবিতে পারে? আমরা ধ্রুববস্তু পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের আশায় কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকি কিন্তু ক্ষান্ত হই না। কি আশ্চর্য্য! সামান্য কীটানু হইয়া এই দুস্তর ভবসাগর স্বেচ্ছায় অতিক্রম করিব! কি অহঙ্কার! কি দম্ভ!! কি প্রমাদ!!!

মনোরথ পূর্ণ হয় না বলিয়া বিধাতাকে গালাগালি দিয়া থাকি, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপাকে, নিষ্ঠুর শাস্তি বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকি। ভ্রান্ত জীব! ভ্রান্ত-পথ অবলম্বন করিলে মনোরথ কেমন করিয়া সফল হইবে? কৃপা কি শাস্তি, কেমন করিয়া বুঝিবে? স্বইচ্ছায় ক্রন্দন করিবে—ক্রন্দন বিলুপ্ত হইবে কেমন করিয়া? আপনি নিগড় পায়ে পরিবে তবে আর বন্ধন মুক্ত কেমন করিয়া হইবে? আপনার প্রবৃত্তি-বশে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইবে তাহা হইলে আর পরাধীন বলিয়া ক্রন্দন করিলে কি হইবে? যাহাকে যথার্থ অধীন বলে তাহাই হইতে চেষ্টিত হও, তাহা হইলে আর পরাধীন থাকিতে হইবে না। যদি আপনাকে অধীন বলিয়া জানিতে পার তাহা হইলে আর ভাবনা কি? স্বাধীন হইতে চাহিও না, যদি স্বাধীনতা চাও, তাহা হইলে তোমার মত নিরাশ্রয় তোমার মত অপর আর কে আছে? তুমি দুই পদে ভর দিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাক, ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়। আবার বল আমি স্বাধীন হইব যাহার? সর্ব্বাঙ্গ মহাপাপে আবদ্ধ সে আবার স্বাধীন? কি হাস্যের কথা!!

অন্ধজীব! তুমি যখন এই ব্যাধসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যকে সুখময় নন্দন-কাননের সহিত তুলনা করিয়া থাক, তখন তোমার জ্ঞান বিলক্ষণ পরিপক্ক বলিতে হইবে! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; তুমি ভাল কথায় কাণ দিবে না তাহা আমি জানি। এখন লেখনীকে একটু লিখিতে দাও, রসনাকে দুই চারিটা প্রলাপ বকিতে দাও, নির্জ্জীব মনকে একটু উচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ হইতে দাও।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিল্বতলে।

গ্রীষ্মকাল বেলা দ্বিপ্রহর, রৌদ্রের তেজে ঘরের বাহির হইবার যো নাই। সূর্য্যদেব সহস্র কিরণে বসুধাকে দগ্ধ করিতেছেন, অনেকক্ষণ পথ পানে চাহিয়া থাকিলে, এক আধটী মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। গূঢ় প্রেমিক বায়স শ্যামপল্লবের স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া প্রিয়াসনে নিভৃত আলাপে ব্যাপৃত। জগৎ-প্রাণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, সন্ধ্যাগমের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ফলতঃ সকলেই পরিতপ্ত—সকলেই অবসাদ প্রাপ্ত! স্বভাব যেন অগত্যা বিশ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াই অবস্থিতি করিতেছেন। এই মধ্যাহ্ন কালে ভবানীচরণ আহারাদি সমাপন

পূর্ব্বক হুঁকা হস্তে বহির্বাটীস্থ বিল্বপাদপের ছায়ায় আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং তামাকু সেবন করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ভবানীচরণ ভাবুন বসিয়া; আমরা এই অবসরে আমাদিগের পাঠকবৃন্দকে তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনাইয়া দিব। ভবানীচরণ দরিদ্র কায়স্থের সন্তান—বিবাহ ধনাঢ্য গৃহে। ভবানীচরণের বাটীখানি সুবৃহৎ কিন্তু সংস্কার বিহনে পাতনোম্মুখ। বাটীখানি তাঁহার নিজের নহে,প্রিয়ার পিতামহ প্রদত্ত; অতএব ভোগদখলে অধিকার আছে, অন্নকষ্টে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। শ্বশুরালয় হইতে ভবানীচরণ মাসিক ১০০৲ একশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইতেছিলেন—সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং জাতও গিয়াছে পেটও ভরে নাই এক্ষণে আফিসের কুড়িটী টাকা মাত্র পেন্‌সনে নির্ভর করিয়া দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিতেছেন। পরিবারের অপব্যয়ে হস্তে এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান হয় না। যাহাহউক পূর্ব্বে বুঝিয়া চলিলে এরূপ অবস্থা ঘটিত না। সেতার শিক্ষায় ভবানীচরণ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছেন তদুপরি ধনাঢ্য বংশোদ্ভবা সহধর্ম্মিণীর চিত্তবিনোদনার্থ ৪। ৫টী দাস দাসী ও নানাবিধ সুখ সেব্য বস্তুর আয়োজন করিতেই তাঁহাকে একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হইয়াছে। এখন শীতকালে ভবানীচরণ উড়ানি ব্যবহার করেন—বলেন আমার শীত বোধ হয় না, পাদুকা-বিহীন পদে গমনাগমন করেন—বলেন যত খোলাসা থাকা যায় ততই ভাল। ভবানীচরণের বয়ক্রম এক্ষণে ৭০ বৎসর বার্দ্ধক্য ও ভাবনা চিন্তায় লাবণ্যের অনেক ব্যত্যয় জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে প্রথম যৌবনে যে তিনি একজন কার্ত্তিক বিশেষ পুরুষ ছিলেন,সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় থাকেনা। তাহা হইলে আর কি হইবে? স্বাভাবিক সারল্য বশতঃ ভবানীচরণ মনে করিয়াছিলেন ধার কর্জ্জ করিলে অভাব মোচন হইয়া থাকে, ভাল তাহাই কিছু দিন করিলেন, কিন্তু পরে দেখিলেন উহা আবার পরিশোধ করিতে হয়। প্রথম কল্পে যেমন সুখ শেষ কল্পে তেমনি কষ্ট। সুতরাং সে কৌশল আর খাটিল না। ভবানীচরণের পুত্র সন্তান হয় নাই কেবল দুইটী কন্যা-সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক্ষণে একটী মৃতা। অপরটী বিধবা;কন্যা দুইটী নিতান্ত সুশ্রী বলিয়া বড় বড় ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। বিধাতা তাঁহার প্রতি নিতান্তই বিমুখ অতএব তাঁহাদের লইয়া তাঁহার আর সুখ হইবে কেমন করিয়া? বিধবা কন্যাটী বাটীতেই আছেন, তাঁহার একটী পুত্র সন্তান আছে। ভবানীচরণ মনে করিয়াছিলেন যে, এই দৌহিত্র সন্তানটীকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইলে সে তাঁহার বৃদ্ধকালের যষ্টি স্বরূপ হইবে। কিন্তু ভগবানের বিড়ম্বনায় ও ভবানীচরণের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই যষ্টি এক্ষণে তাঁহার পৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। ছেলেটী নাবালক অবস্থাতেই পাঁচ ইয়ার সমভিব্যাহারে তামাকু সেবন করিতে ও পায়রা উড়াইতে শিখিয়াছে। তবেই ভাবুক পাঠক! ভাবিয়া দেখুন ভবানীচরণের ভাবনার অভাব কি? ভবানীচরণের দেহ এখন কঙ্কালাবশিষ্ট। তিনি,তিন মাথা এক করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন,

ও ভাবিতেছেন—সংসারের পথ কি পঙ্কিল কি জটীল! এখানে অবস্থিতি করিলে দুঃখ ভিন্ন সুখলেশ পাইবার আশা নাই। কোন্ মুহূর্ত্তে কি অবস্থা ঘটিবে, কোন্ পলকে কি প্রলয় উপস্থিত হইবে, এই ভয়েই সদাই সশঙ্কিত হইতে হয়। এই ক্রব্যাদ-বহুল-সংসারারণ্যে প্রতি পদ বিক্ষেপেই বিপৎপাতের সম্ভাবনা। কামিনীকাঞ্চনরূপ মায়ামৃগ পরিবৃত এই অরণ্যানী মূর্খগণের নিকটেই সুখ সেব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে অভয় চরণে শরণ লইলে, সকল ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অভয় চরণ কোথায় পাই? কে এমন সুহৃৎ আছে আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দেয়? গুরুদেব! আমার কেশজাল ধারণ করিয়া, আমায় এই বিষয় ভাবনা রূপ মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার কর।

ভবানীচরণ বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় অদূরে আর একটী মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল। পতনোন্মুখ অশ্রুজলের প্রকটন না হইতে হইতেই সেই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। ভবানীচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আরে কেও? রাখাল বাবু যে? এস এস—

রাখাল। আবার!

ভবা। কেন?—কি, হয়েছে কি?—

রাখা। বলি ওর তলায় ক'বার যেতে হয়?

ভবা। কেন হে! তোমার ত—মাথায় চুল আছে।

রাখা। সেটা ভয়ে ভয়ে রাখ্‌তে হয়েছে, তা' নইলে এ গরমে আর চুল রাখ্‌তে আছে।

ভবা। গরম টা কিসের? ধনের না কি?

রাখা। নিজের পরমায়ু আর পরের বিষয় কেও কম দেখে না।

ভবা। আমিও বলি এই দণ্ডে যেতে পারি, তা' হলেই সকল জ্বালায় নিষ্কৃতি পাই।

রাখা। তাই বুঝি ন্যাড়া মাথা করে বেল তলায় বসে আছ?—আ মুখে আগুন!

ভবা। আরে এ অখণ্ড প্রমাই, ওতে কি কিছু হয়?

রাখা। কেমন?—ফাট্‌ছে ফুট্‌ছে কেমন আজ কাল?

ভবা। ওঃ তা খুব্।

রাখা। তবু কিছু হয় না—কেমন ভবানী খুড়ো?

ভবা। না;-যম কে কলা দেখিয়ে বসে আছি।

রাখা। ঠিঠি চাপাটি পাও?

ভবা। তা মধ্যে মধ্যে পাঠাতে ছাড়ে কৈ?

রাখা। কি রকম?

ভবা। আর বাবা! বুড়ো হলেই নানা খানাধরে। তোমার এখন কচি কচি গোঁফ উঠ্‌ছে তুমি এখন ওসব কি জান্‌বে বল?

রাখা। ইস্ তাইত! এমনিই ঠাণ্ডা-রালে নাকি;

ভবা। তা নাত কি? পানটী খেয়ে, চুলটী বাগিয়ে, বুকে চাদর খানি বেঁধে, নবীন ছোক্‌রাটী হয়ে আস্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারিনে? আরও যদি বৌমা বেঁচে থাক্‌তেন—

রাখা। অবশ্য অবশ্য।

ভবা। আজ রবিবার বলে একবার এদিকে আসা হল বুঝি।

রাখা। হ্যাঁ—বলি খুড়োমশাই আমার, অনেক করে ডেকে পাঠান তাই একবার এলেম।

ভবা। তা বেশ করেছ। রাখালবাবু! মাথা ফাটবার কথাটাই জিজ্ঞাসা করলে, চূণের খবর কিছু বলতে পার?

রাখা। চূণ খুড়ীমার সিন্দুকে।

ভবা। আমার ত আর অবিদিত নাই।

রাখা। খুড়ো আমার সর্ব্বজ্ঞ হয়ে বসে আছেন।

ভবা। না হে রাখাল বাবু! বড়ই দুঃসময় সে দিন দেখ্‌লে ত হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, তুমি হেন ভাইপো না থাক্‌লেই ত আমাকে জেলে নিয়ে পচাত।

রাখা। ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন।

ভবা। একবারে অচল হয়ে পড়েছে আর চলে না।

রাখা। কি কর্‌বে বল খুড়ো? যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে লোকের সংসার চলা ভার হয়ে উঠেছে।

ভবা। সে দিন জমীদার বাবুর কাছে একবার পাঠিয়েছিলেম, বলি এ অবস্থায় কিছু সাহায্য কর্‌বে। কিছুই না।

রাখা। তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাই এমন করেছিলে।

ভবা। কেন বল দেখি?

রাখা। খুড়ো! জাননা? কথায় বলে "সোণার খুরের এঁড়ে, আর পীরবরাবর মেড়ে" যতই হোগ্ সেই ডোর্ কপিন্ ঘুচে-কোট পেণ্টুলেন্ আর পিঠ বস্ত্র ঘুচে চোগা হয়েছে ত? না আর কিছু।

ভবা। ঠিক্ বলেছ। এখন ভাবি কি কুকর্ম্মই করেছি।

রাখা। আমি হেন তোমার মন্ত্রী আছি তুমি পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার না?

ভবা। দুঃখের সময় সকলেই অযত্ন করে।

রাখা। মামাশ্বশুরের কাছে যে তোমার ৫০০০৲ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে তার কি কর্‌ছ?

ভবা। ও বেটা বিড়াল তপস্বী যে, সে টাকা দেয় এমত বোঝায় না।

রাখা। সে ত সেই পশ্চিমে, তার বড় বেটা বীরেন্দ্র কি বলে?

ভবা। সে লোক ভাল, সে দিতে চায়।

রাখা। হুঁঃ খুড়ো মশায়! ভাল আর মন্দ—

"কাযে কথায় ঐক্য হয়,
তবে জানি সত্য কয়;
কথায় আছে কাযে নাই,
হারামজাদার জড় সেই।

ভবা। যা বলেছ।

রাখা। এখন টাকা আদায়ের উপায় কি?

ভবা। উপায়—মকদ্দমা।

রাখা। টাকা কোথায়।

ভবা। ধার—

রাখা। দেবে কে?

ভবা। তোমার খুড়ীমায়ের গহনা।

রাখা। পথে এস। ভাল সে গুলি গেলে কি কর্‌বে?

ভবা। তা হলে যা বল্‌ছ তাই পথেই বস্‌তে হবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভবানীচরণের তামাকু পুড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া গিয়া আর এক ছিলিম্ সাজিয়া রাখাল বাবুর হস্তে দিলেন। রাখাল বাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! খুড়োমহাশয়ের সে দিন কোথায় গেল? খুড়োমহাশয় আফিস হইতে আসিয়া খাটের উপর শয়ন করিলে এক জন পা টিপিত, একজন মাথা টিপিত, একজন বাতাস করিত, এখন সেই খুড়া মহাশয়কে আমার, স্বহস্তে তামাকু সাজিতে হইল! ধন্য রে কাল! তোর মাহাত্ম্যকে ধন্য!! খুড়োমহাশয় আমার শ্রীধরের শ্রীচরণে ফুলতুলসী দিয়ে বুড়া হয়ে গেলেন, শ্রীধর কি একবার মুখ তুলে চাইবেন না? হায়! হায়! এমন লোকের এমন দশা কেন হয়? প্রকাশ্যে বলিলেন "খুড়োমহাশয়! তোমার সেই রাজ পুত্রের মত চেহারা কোথায় গেল? তুমি যে আট টাকা জোড়া ফরাস ডাঙ্গার কালা পেড়ে ভিন্ন পর্‌তে না—ভাল গরদের জামা ভিন্ন গায় দিতে না—আট টাকা জোড়া মন্‌টিথের বাড়ীর জুতো ভিন্ন পায় দিতে না, চিনিশর্কর ভিন্ন বদনে দিতে না, তোমার সে দিন কোথায় গেল? তুমি যে এই ছেঁড়া মলমল্ পরে রয়েছ একি আমরা চেয়ে দেখতে পারি? খুড়ী মা বেটীর কি পাষাণ হৃদয়!"

ভবানীবাবুর দুঃখ সাগর উথলিয়া উঠিল, অবসাদ প্রাপ্ত অনুজ্জ্বল চক্ষু ভেদ করিয়া, দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। বলিলেন "রাখাল বাবু! সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।" ভবানী বাবুর চক্ষে অশ্রুবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়া রাখাল বাবুর অমায়িক অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। শরচ্চন্দ্র সমতুল সুন্দর বদন রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল। তিনি কথঞ্চিৎ অশ্রুবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন "ভবানী বাবু! তোমার ভাবনা কি? যতদিন আমি আছি, তত দিন আমি এক বেলা আহার করিয়াও তোমার উপকার করিব। ভবানী বাবু, রাখাল বাবুর কথা শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "বাপ্ তুমি চিরজীবী হও, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোগ্ তোমার।"

বলিতে কি, বসুবংশতিলক রাখাল বাবু এই রূপ আশীর্ব্বাদের যোগ্য পাত্রই বটেন। ইঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। অনৃত বচন বা প্রবঞ্চনা ইঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। প্রভুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা ইনি বিশেষরূপে অবগত। সময়ে ধনাঢ্যগণও দুইপয়সা দিয়া লোকের উপকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, কিন্তু রাখাল বাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও যথাসাধ্য দানে লোকের উপকার করিয়া থাকেন। ইঁহার দান অতি গোপনীয়। খুড়োমহাশয়ের ত কথাই নাই, খুড়োমহাশয় দুই এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিলেই রাখাল বাবু কোথায় আছেন; কোন সিন্দুক হইতে কি বাহির করিয়া দিবেন, পরিবারের কোন গহনা খানি বন্ধক দিয়া অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক খুড়োমহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহার ঠিক্ পান না। ফলতঃ, সরলে সরলে যেরূপ সংপ্রীতি হইয়া থাকে এ উভয়ে সেইরূপই হইয়াছে। ভবানীবাবু যে কোন বিপদেই পড়ুন না কেন,

অগ্রে রাখাল বাবুকে সমস্তই জানাইবেন, রাখাল বাবুও প্রাণপণে তৎপ্রতীকারের চেষ্টা পাইবেন। বলিতে কি, ভবানীচরণ রাখাল বাবুকে, সংসার মরুভূমে, কল্পপাদপ তুল্য দেখিয়া থাকেন।

রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ভাগ্যে কোথায়!"

ভবা। ভাগ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করো না, সেটা এখন'কানায়ে ভাগ্‌নে'হয়ে দাঁড়িয়েছে,।

রাখা। কেন খুড়ো! সে ত পড়া শুনো কর্‌ছিল ভাল।

ভবা। তা বল্লে কি হয়? সে পড়া তার এখন পড়ারভোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাখা। বিধাতা তোমার কপালে সুখ লেখেন নি তবে?

ভবা। কৈ আর?

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বৈঠকখানা হইতে তব্‌লার চাঁটি সহকারে মৃদু মধুর গীত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

"মানে মানে কি যাবে রজনী?
বদন তোল কথা কও চাঁদবদনি!"—

ভবানীচরণ বলিয়া উঠিলেন "শুন্‌লে এখন! আমি বুড়ো দাদা এই খানে ব'সে আছি—আর ও কেমন চাঁটি লাগাচ্ছে।

রাখা। তাইত খুড়ো ভাগ্যে আমার এমন তয়ের হয়েছে! তা হবে না কেন, দাদার নাতী কি না। তুমি খুড়ো সেতার বাজায়ে বিষয় বরবাদ দিলে, আর ও কিছুই করবে না, তাও কি হয়? তা খুড়ো তোমার ভাবনা নাই। ওস্তাদি করেও ছুপয়সা এনে তোমায় খাওাবে ত?

ভবা। একবার ডাক না—ডেকে ছুটো বোঝাও। রাখাল বাবু কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য সহকারে ডাকিলেন "মহিন!—ও মহিন!" তবলায় চাঁটি বন্ধ হইল গীত ও থামিল। মহিন মুখ খানি ভাল ছেলের মত করিয়া এবং কোমরের কাপড় খুলিয়া কোঁচা করিতে করিতে রাখালবাবুর সম্মুখে আসিল। রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি এখন কি কর্‌ছিলে?

ভবা। ওর গুষ্টির মাথা কর্‌ছিল

রাখা। তুমি থামো—

রাখালবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কর্‌ছিলে? মহিন, কাল বিলম্ব না করিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল "আজ্ঞে জিওমেট্রি মুখস্থ কর্‌ছিলাম্—কোয়ার্টালি একজামিন্ আস্‌ছে কিনা।"

রাখা। আমার কাছে মিছে কথা কইবে যদি,তাহলে আর তোমাদের বাড়ী আস্‌ব না।

মহি। আজ্ঞে আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্য কর্‌ছি—

রাখা। চুপ্!—একেবারে গেছ?

মহি। তবে আমি আর কি বলব?

রাখা। হাত নামাও, হাত এঁটো কর্‌ছ কেন? আর তোমার অমন লাল টক্ টকে ঠোঁট এমন কাল হয়ে যাচ্ছে কেন? যা হোক্ তোমাকে দেখে আমি সন্তুষ্ট হলেম্ না। তুমি কেমনই এক রকম হ'য়ে যাচ্ছ।

মহি। তা—চিরকালই কি এক রকম থাকব?

রাখা। তোমার জ্যাটামি রাখ। ভাল

তুমি যে 'জিওমেট্রি' পড়ছিলে, "ফাষ্ট-প্রপোজিসন্'টা 'প্রুফ্' কর দেখি?

মহি। সে কি এখন মনে আছে?

রাখা। তা থাকবে কেন?

মহি। ওতে আমার তেমন "টেষ্ট" নাই; আমি এইবার অবধি খালি 'লিটারেচর' পড়বো আর 'হোমষ্টডি' কর্‌বো।

ভবা। আর তোমার 'হোমষ্টাড্ডি' কর্‌তে হবে না।

মহি। এখন ও কথা বল্লে আমি শুন্‌ব না—তোমারইত দোষ।

ভবা। কিসে?—রাজপুত্তুর! কিসে?

মহি। যতই বল, স্কুলে আর আমি যাচ্চিনে।

ভবা। হাঁ! ঐ কাযের কথা।

রাখা। আঃ! তুমি যে জ্বালালে গা, নাড়ীই টিপ্‌তে দাও—

ভবা। আচ্ছা আমি এই চুপ্ করলেম্—তোমরা মামা ভাগ্নেতে কথা কও।

রাখা। আচ্ছা তুমি স্কুলে যাবেনা কেন?

মহি। উ'নি খালি আমাকে 'ফিরি' পড়াবেন, আর এর ওর কাছ থেকে বই চেয়ে আন্‌বেন, তাতে কি পড়া শুনো হয়?

রাখা। তোমাকে ক্লাসে বস্‌তে দেয় ত?

মহি। আজ্ঞে তা দেয়।

রাখা। আর অপরের বইয়ে যা' লেখা আছে, তোমার বইয়েও তাই লেখা আছে ত?

মহি। আজ্ঞে তা আছে।

রাখা। তবে তোমার বিনা পয়সায় পড়া হয়, সেটা মন্দ কি?

মহি। ঐ কেমন মন লাগে না।

রাখা। সেটা তবে তোমার মনের দোষ, দাদা মহাশয়ের নয়?

ভবানী বাবুর শুষ্ক গণ্ডে হাস্যের বিকাশ পাইল; মহিন নীরব। মোকদ্দমায় ভ্রাতুষ্পুত্র বিচারকর্ত্তা, সুতরাং খুড়ো মহাশয়েরই জিৎ। রাখালবাবু বলিলেন "খুড়ো! রোগটা বড় সহজ নয়।" ভবানী বাবু বলিলেন "প্রতিকার কর, তা নইলে হয় আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই, না হয় ও যাগ্।" এই কথায় মহিন রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "তা বেরিয়ে যাই যাব, বড়ই ত বাড়ী, একখানা ভাঙা বাড়ী নিয়ে এত জাঁক!"

ভবানী বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; বলিলেন "আর, আজ্ তুই আছিস্ আর আমি আছি, আজ, তোকে হুঁকোপেটা না করি ত আমি বাপের বেটা নই।"

রাখাল বাবু দেখিলেন মহা বিভ্রাট। ঝি অন্তঃপুর হইতে বেগে বহির্গত হইয়া বলিল "বাবু! দিদিমণি বল্‌ছেন মহিন বাবুকে অত বক্‌বেন্ না, একে ও দুষ্টু ছেলে, আবার কি করে বস্‌বে, ওর যা খুসি তাই করুগ্।" ভবানী বাবু বলিলেন "ঐ মাগু, পেলে রাখাল বাবু?"

রাখা। তাই ত, তোমার যে দেখ্‌ছি উভয় সঙ্কট!

ভবা। কোন্ দিকে এখন যাই বল দেখি? মৃত্যু ত নিয়তই কামনা কর্‌ছি; গুরু আমার অখণ্ড পরমায়ু দিয়েছেন; যম তাই নিতে চায় না।

রাখাল বাবু উভয়কেই বুঝাইলেন। খুড়ো মহাশয়কে বলিলেন "একটু ধৈর্য্য ধারণ কর্‌বেন। মহিনকে বলিলেন "ভাল করে মন দিয়ে পড়া শুনো কর্‌বে।" ফলতঃ নূতন কথা কিছুই বলিলেন না। ফল যাহা হইবে তাহা বুঝাই যাইতেছে।

ভবানী বাবুর নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে দেখিয়া রাখাল বাবু বলিলেন "খুড়ো এখন আসি তবে, শালখেয় একটু বরাত আছে। রাখাল বাবু চলিয়া গেল, ভবানী বাবু মহিন্‌কে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বাহিরের শয়ন কক্ষ প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।

সতী-মাহাত্ম্য।

(৺কালিদাস মিত্র বিরচিত।)

(১)

নগেন্দ্রকুমার নাম—ব্রাহ্মণ নন্দন—
নিবাস নন্দনগ্রামে, নদীয়া-জেলায়;
দীনতা-বশতঃ দুঃখে সদা নিমগন,
ভিক্ষাবৃত্তি, একমাত্র জীবিকা-উপায়।

(২)

এ জগতে কেহ তাঁর ছিল না আপন,
একমাত্র প্রণয়িনী সংসার-সঙ্গিনী;
মনোরমা নাম তার—রমণী-রতন—
পতিপ্রাণা, ভক্তিমতী স্বামী-সোহাগিনী।

(৩)

নগেন্দ্রও কার্য্যকরে, পত্নী-মনঃপূত
সহায় সম্পদ তাঁর, প্রেয়সী কেবল;
দরিদ্রতা-নিপীড়িত, শ্রম অভিভূত—
দুঃখতপ্ত হৃদয়ের—জুড়া'বার স্থল।

(৪)

সারাদিন ভিক্ষা করি সন্ধ্যা-আগমনে,
ফিরিত নগেন্দ্র যবে আপন আলয়;
প্রেয়সী-পঙ্কজ-মুখ নিরখি নয়নে—
ভাসিত আনন্দ-নীরে তাঁহার হৃদয়।

(৫)

এইরূপ পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয়ে,
দুঃখে সুখে কষ্টে দিন করয়ে যাপন,
দারিদ্র্য-দুঃখেতে বটে পীড়িত উভয়ে,
দাম্পত্য-প্রণয়ে কিন্তু সুখী দুইজন!

(৬)

ব্রাহ্মণের কুটীরের স্বল্পমাত্র দূরে,
সম্পত্তিশালিনী কোন বেশ্যার ভবন;
তাহার আজ্ঞায় কত দাস দাসী ঘুরে,
ফুটন্ত-কুসুম সম তাহার যৌবন।

(৭)

একদিন ভিক্ষা করি আপন কুটীরে,
আসিবে নগেন্দ্র যবে, দিবা-অবসানে;
এহেন সময়ে সেই প্রাসাদ-উপরে,
দাঁড়াইয়া বারনারী—হেরিল নয়ানে।

(৮)

এলা'য়ে কুন্তল-দাম কুসুম-জড়িত,
র'য়েছে দাঁড়া'য়ে ধনী সুবঙ্কিম ঠামে;
রূপের প্রভায় দিক্‌ করে আলোকিত—
স্মরশরে পথিকেরে বিঁধিছে মরমে।

(৯)

কি জানি কেমন তারে হেরি অকস্মাৎ,
আর যেন নগেনের চলেনা চরণ ;
অসীম সৌন্দর্য্য-প্রতি করি দৃষ্টিপাত,
নগেন্দ্রর পলকহীন—নিস্পন্দ নয়ন।

(১০)

হৃদয়-আবেগভরে ভাবে মনে মনে—
"এ হেন রমণী যারে প্রণয় বিতরে ;
তার মত ভাগ্যবান্ কে আছে ভুবনে ;
ধরায় স্বর্গের সুখ সেই ভোগ করে।

(১১)

"কত ভাগ্যবান্ আহা ! প্রেমিক সেজন,
না জানি কতই সুখে, হৃদি তা'র ভাসে ;
যখন এহেন নারী—বাঞ্ছিত রতন—
হৃদয়ে ধারণ করে প্রণয়-আবেশে।

(১২)

"দরিদ্র, কাঙ্গাল, আমি দীনহীন অতি—
মম সম এ জগতে আছে কোন জন ?
তথাপি কেন যে মোর হতেছে দুর্ম্মতি—
লভিতে বাসনা এই দুর্ল্লভ রতন।

(১৩)

"আপনি কমলাদেবী পুরাইতে আশ,
আসিয়া করেন বাস, যাহার আলয় ;
মোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ যার কিঙ্করের দাস,
পদ-নখ-যোগ্য যার আমি কভু নয়।

(১৪)

"এহেন রমণীরত্ন কেন অকারণ,
লভিতে বাসনা সদা হইতেছে মনে ?
জাগিয়া জাগিয়া আমি দেখি কি স্বপন ?
বাতুল হ'লাম বুঝি অদৃষ্টের গুণে !

(১৫)

"বামনের আশা যথা ধরে চন্দ্রমারে,
বন্ধ্যা রমণীর আশা হয় পুত্রবতী ;
বধিরের আশা যথা গীত শুনিবারে,
নিশ্চয় জানিনু মোর এ আশা তেমতি।"

(১৬)

এতেক ভাবিয়া মনে, ফেলিয়া নিশ্বাস,
ধীরেধীরে তথা হতে নগেন্দ্র তখন—
চলিল—চঞ্চল-চিত্ত, হৃদয় হতাশ—
আপন কুটীরে শেষে করিল গমন।

(১৭)

পতির এ ভাব হেরি মনোরমা-সতী,
ব্যাকুল হইয়া কত জিজ্ঞাসে তখন,—
"কেন নাথ ! হেরি আজ চিন্তাকুল অতি,
কি কারণে আজি তব বিষণ্ণ বদন ?

(১৮)

"দারিদ্র্য-সাগরে পড়ি, অভাব-তুফানে,
অম্লান-বদনে দুঃখ সহিছ যখন,
কত দুঃখ পেয়ে হৃদি বেঁধেছ পাষাণে,
দুঃখ পাও, যেন দুঃখে নহ নিমগন।

(১৯)

"কেন তবে চিন্তাকুল আজি প্রাণেশ্বর !
কিদুঃখে মলিন হেরি তব বিধুমুখ ?
বিলম্ব না সহে নাথ ! বলহ সত্বর
বিদরে ও মুখ হেরি এ দাসীর বুক।"

(২০)

শুনি প্রণয়িনী-বাণী নগেন্দ্র তখন—
কি বলি বু'ঝাবে তা'রে ভাবেমনে মনে,
"বলিব স্বরূপ যাহে চিন্তাকুল মন,
করিব না প্রবঞ্চনা প্রেয়সীর সনে।"

(২১)

এত স্থির করি বলে নগেন্দ্রকুমার—
"শুন প্রিয়তমে! মম চিন্তার কারণ,
হেরিলাম বিলাসিনী রূপসীর সার,
ভিক্ষা করি আসি যবে আপন ভবন।

(২২)

"হেরি তারে হইলাম মদনে মোহিত,
কামানলে জ্বলে তনু অঙ্গ জর জর;
হ'য়েছে বড়ই সাধ—হইলে মিলিত
একবার তার সনে, জুড়াই অন্তর।

(২৩)

"কিন্তু এ বাসনা প্রিয়ে! হবে না সফল,
দীনহীন হতভাগ্য আমি অভাজন ;
মনের এ সাধ মনে থাকিবে কেবল,
হতাশ-হৃদয়ে তাই চিন্তায় মগন।"

(২৪)

শুনি এ সকল ভাবে মনোরমা সতী—
"পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতিই দেবতা;
রমণীর পতি বিনা নাহি অন্যগতি,
পতিরে রাখিলে তুষ্ট, সন্তুষ্ট বিধাতা।

(২৫)

"অতএব, সাধ্যমত করিব যতন,
নারীর জনম শুধু পতিতুষ্টিতরে",
এত ভাবি মনোরমা নগেন্দ্রে তখন;
আশ্বাসিয়া, সে রজনী অবসান করে।

(২৬)

পরদিন মনোরমা প্রভাতে উঠিয়া,
বারাঙ্গনা ভবনেতে করিল গমন;
বারনারী তারে হেরি কহে সম্বোধিয়া—
"কি কারণে আজি তব হেথা আগমন?

(২৭)

"পতিপ্রাণা নারী তুমি সাবিত্রী যেমন,
সদা রত হেরি তোমা 'পতি-শুশ্রূষায়;
অবিচলভাবে তব পতি-পদে মন,
পতিব্রতা-রমণীর আদর্শ তোমায়।

(২৮)

"পবিত্র প্রেমেতে বাঁধা তোমরা দু'জন—
হেরি তোমা দোঁহাকার মধুর প্রণয়—
কুলটা রমণী আমি ঘৃণার ভাজন,
আমারো অন্তরে হয় ক্ষোভের উদয়।

(২৯)

"কি হবে বলিয়া বৃথা আমার বারতা?
কিবা অভিপ্রায়ে তব শুভ আগমন?
বল সতি! যদি থাকে আমার ক্ষমতা,
পূরাইব এখনিই তব আকিঞ্চন।

(৩০)

"দরিদ্রতা—হীনতায় তোমরা আকুল,
তাই কি এসেছ সতি! আমার আলয়?
তোমাদের দুঃখ হেরি আমিও ব্যাকুল,
লহ সতি! ধন রত্ন যাহা মনে লয়।"

(৩১)

"আসিনি হেথায় আমি অর্থের প্রয়াসে",
আশা পেয়ে মনোরমা কহিল তাঁহারে—
"যে আশে এসেছি আমি তোমার সকাশে
যদ্যপি অভয় দাও পারি কহিবারে।"

(৩২)

এত শুনি বারাঙ্গনা কহিলা তাঁহারে,—
"এত কুটুম্বিতা কেন কর অকারণ?
বলহ মরম-কথা নির্ভয়ে আমারে;
আমার নিকটে তব কিবা প্রয়োজন?"

(৩৩)

"শুনি মনোরমা তার কন কাণে কাণে,—
হেরি তব রূপ-রাশি মম প্রাণেশ্বর
হলেন অধীর অতি মদনের বাণে,
যদি তারে দয়া কর,—এই ভিক্ষা মোর।"

(৩৪)

এত শুনি বারাঙ্গনা মধুর বচনে
বলে,—"সতি! এত ভয় এই ভিক্ষা তরে?
পাঠাইয়া দিও হেথা তব প্রাণধনে,
তুষিব তাঁহারে আমি পরম আদরে।"

(৩৫)

পূর্ণমনোরথ হয়ে, মনোরমা-সতী,
আনন্দে স্বামীরে গিয়া কহিল সকল;
নগেন্দ্রকুমার শুনি পুলকিত অতি,
ভাবে "রবি কত ক্ষণে যাবে অস্তাচল।"

(৩৬)

ভাবী সুখ-কল্পনায় দিন হ'ল গত,
সন্ধ্যায় নগেন্দ্র যান বেশ্যার ভবন;
বারাঙ্গনা, ব্রাহ্মণেরে হেরি সমাগত,
সাদরে বসায় তাঁরে করি সম্ভাষণ।

(৩৭)

বারবিলাসিনী, পাশে বসিয়া তাঁহার,
নানাবিধ মিষ্টালাপে লাগিল তুষিতে;
বলিল;—"একটি কথা রাখহ আমার,
জলযোগ কিছু ভাই! হইবে করিতে।"

(৩৮)

নগেন্দ্রকুমার তার স্বীকার পাইয়া,
ভোজনের তরে যায় বারাঙ্গনা সনে;
ভোজন-আগারমধ্যে প্রবেশ করিয়া,
চারিপাত্রে খাদ্যদ্রব্য হেরিল নয়নে।

(৩৯)

কাঞ্চন, রজত, কাংস, মৃণ্ময়-আধার,
চারি পাত্র পাশাপাশি র'য়েছে স্থাপিত;
কিন্তু, খাদ্য দ্রব্য সব একই প্রকার,
নগেন্দ্রকুমার হেরি হইল বিস্মিত।

(৪০)

বারাঙ্গনা-অনুরোধে নগেন্দ্র তখন,
প্রথমে সুবর্ণপাত্রে করেন আহার,
অতঃপর, রৌপ্য-পাত্রে করিয়া ভোজন,
কাংস-পাত্রে করিলেন ভোজন আবার।

(৪১)

ভোজন সমাপি' দ্বিজ মৃত্তিকা-আধারে,
হস্ত মুখ ধৌত করি বসেন যখন,
বারাঙ্গনা পার্শ্বে বসি, নগেন্দ্রকুমারে
প্রশান্তবদনে ধীরে, কহিছে তখন—

(৪২)

"এখন আমারে তুমি কহ দেখি ঠিক,
চারি ভিন্ন পাত্রে তুমি করিলে ভোজন,
কোন পাত্রে খাদ্য মিষ্ট লাগিল অধিক?
সত্য করি বল মোরে, করো না গোপন।"

(৪৩)

এতেক শুনিয়া কহে নগেন্দ্র তখন,
"তারতম্য কিছু নাহি হ'ল অনুমান;
ভিন্ন চারি পাত্রে বটে করিনু ভোজন,
কিন্তু খাদ্য দ্রব্য সব একই সমান।"

(৪৪)

কুলটা কৌশল করি কহিছে তখন,—
"পাত্রভেদে খাদ্য যদি সম আস্বাদনে;
নিজ পত্নী তেয়াগিয়া তবে কি কারণ,
আসিয়াছ বল শুনি মম নিকেতনে?

(৪৫)

"মনে কর,—পত্নী তব মৃত্তিকা-বাসন,
না হয় হইনু আমি কাঞ্চন-আধার,
ব্যবহারে তারতম্য না পাও যখন,
তবে কেন করিলেহে হেন অবিচার?

(৪৬)

"অমান্য করেছ যাঁ'রে সামান্য ভাবিয়া,
রমণীর সার সেই অমূল্য রতন;
মুগ্ধ হইয়াছ রূপ আমার হেরিয়া,
তব পত্নী-পদরেণু নহি কদাচন।

(৪৭)

"সতীত্ব-ধনেতে ধনী সেই সে রমণী,
আমি যাহা অর্থ লাগি করেছি বিক্রয়;
আমার কথার ভাব বুঝ গুণমণি!
বিচার করিয়া দেখ, হয় কি না হয়।"

(৪৮)

বারনারী-মুখে শুনি এরূপ বচন,
সহসা নগেন্দ্র মনে চমকি উঠিল;
জ্ঞান-চক্ষু যেন তার হ'ল উন্মীলন,
স্বপনের সম সব ভাবিতে লাগিল।

(৪৯)

ক্ষণকাল পরে তবে পাইয়া চেতন,
অনুতাপ-অনলেতে দহে হৃদি তাঁর;
মনোরমা গুণাবলী করিয়া স্মরণ,
আপনারে দেন দ্বিজ শতেক ধিক্কার।

(৫০)

অনুশোচনায় তারে আকুল হইয়া,
ভাবে দ্বিজ—কি জঘন্য চরিত্র আমার,
সতীসাধ্বী পতিব্রতা রমণী ত্যজিয়া,
মোহিত হইনু হেরে রূপ কুলটার!

(৫১)

"ভুলিলাম ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য ভয়,
ভুলিনু আপন পত্নী সাবিত্রী-সমান;
হইলাম জ্ঞান-শূন্য পাগলের প্রায়,
পশুবৃত্তি চরিতার্থে ঢেলে দিনু প্রাণ!"

(৫২)

এত ভাবি বেশ্যা-পদে করি নমস্কার,
নগেন্দ্র-কুমার তারে বলিল তখন,—
"কামে মত্ত, এসেছিনু সকাশে তোমার,
দিব্য-জ্ঞান পাইয়াছি—বিদায় এখন।

(৫৩)

"করিলে আমার তুমি বড় উপকার,
পাপ-কার্য্য হ'তে মোরে উদ্ধার করিলে;
চিরদিন রবে ইহা মনেতে আমার,
আপনার গুণে মম মতি ফিরাইলে।"

(৫৪)

লজ্জা-অবনত-মুখী বারবিলাসিনী,
ব্রাহ্মণের পদে ধরি কহিছে তখন,—
"বড়ই পাপিনী আমি কুলটা-কামিনী,
মম অপরাধ কিছু ক'র না গ্রহণ।

(৫৫)

"আর এক নিবেদন আছে শ্রীচরণে,—
মম উপহার হবে করিতে গ্রহণ,
অর্থাভাবে কষ্ট পাও তোমরা দু'জনে
বাসনা হ'য়েছে তাই দিতে কিছু ধন।"

(৫৬)

এতবলি ধনরত্ন যথেষ্ট আনিয়া,
বারাঙ্গনা ব্রাহ্মণের করিল প্রণাম;
প্রফুল্ল-অন্তরে তারে আশীর্ব্বাদ দিয়া।
নগেন্দ্রকুমার করে অমনি প্রস্থান।

(৫৭)

আসিয়া নগেন্দ্র পরে আপন কুটীরে,
মনোরমা-পাশে বসি 'সকলি বলিল ;
অনুতাপ করি নিজ দুকর্ম্মের তরে,
প্রেয়সী নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

(৫৮)

ভালবাসা—অনুরাগ, প্রেয়সী-উপরে
পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল ;
পবিত্র প্রণয়ে দোঁহে, আনন্দ-অন্তরে,
সংসার-সাগরে সুখে ভাসিতে লাগিল।

অভাব ও তাহার পূরণ।

জীবের কেবলই অভাব, কেবলই নাই নাই রব, ইহার যে কখনও কিছু ছিল, ইহার স্বভাব, আচরণ দেখিয়া ত তাহা একবারও বোধ হয় না। যখনই ইহার কাছে দাঁড়াও, তখনই ইহার মর্ম্মভেদী "নাস্তি নাস্তি" শব্দে কর্ণযুগল ঝালাপালা হইয়া যাইবে, ইহার বদনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া নয়নযুগল আপনা-আপনি মুদিয়া যাইবে এবং সেই বীভৎস দৃশ্য হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য মন বড়ই ব্যগ্র হইবে। আহা! অভাবব্যঞ্জক ভাবভঙ্গী স্বরাদি কি শোকোদ্দীপক!! চব্বিশ ঘণ্টাই ইহার শব্দ,—এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। ভাল, দেখা যাউক এত অভাব কিসের জন্য ?

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, যে জীবের আত্ম-রক্ষার জন্য ও বংশবৃদ্ধি করিবার জন্য বড়ই আকিঞ্চন এবং সে সর্ব্বদাই এই অভাব বিনাশ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে এই দেখিতে পাইতেছি যে, সেই জীব, একবার আহারাদি করিয়া শরীর-রক্ষা করিয়া ও একবার বংশরক্ষা করিবার উপায় করিয়াই ক্ষান্ত নহে ; সে একবার খাইয়া ছুটাছুটী করিয়া বা নীরবে বসিয়া থাকিলেও, তাহার খাদ্যদ্রব্যজাত রক্তের ব্যয় করিয়া ফেলিয়া শরীররক্ষার জন্য আবার আহার খুঁজিতেছে এবং সময়ে সময়ে ঐ রক্তজাত শুক্র বা শোণিতের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, তাহা খরচ করিবার যোগাড়ে আছে।

বিধাতার এ এক বড় মজার খেলা,—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-চক্র কেবল 'যোগাড়যন্ত্র' আর খরচ,—কেবল ছড়াছড়ি, মারা মারি, দৌড়া-দৌড়ি, মার্ মার্, ধর্ ধর্, কাট্ কাট্। দেখিলে বোধ হয়, যেন এ সংসার ব্যস্ততার একশেষ, চঞ্চলতার পরাকাষ্ঠা, নিরাশার লীলাভূমি, হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ লোভা-দির চিরবিনোদকানন।

সে যাহা হউক, বিধাতার আর এক কল দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ যে দেখিতেছ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড কেবল 'অভাব অভাব' বলিয়া বিকট রব তুলিয়া দিগ্‌দিগন্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে, তুমি কি মনে করিতেছ, ঐ অভাব মিটাইবার জন্য বিধাতা কোটী কোটী অসংখ্য কোটি ভাণ্ডার সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন ? একথা যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ভ্রান্ত ; তুমি তাঁহার অনুপম যথাযোগ্য বিনিযোজন

ক্ষমতার বিষয় কিছুই জাননা, যদি এক মহী-মণ্ডলের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ভাণ্ডার সৃজন করিতে হইল, তাহা হইলে, তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলই বা কি আর পালন-শৃঙ্খলাই বা কি? তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী, জগৎব্রহ্মাণ্ডস্বামী বলিয়া জানিও। আর তুমি যে পুরাণাদিতে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের সুদর্শন চক্রের কথা শুনিয়াছ এবং বিষ্ণুকে পালক বলিয়া বর্ণনা করিতে দেখিয়াছ, সেই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের একরূপই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; তাঁহার উক্ত চক্রের বহুবিধ রূপ আছে, যেমন অসুর দানবাদি মারিবার জন্য একরূপ সচরাচর বর্ণিত হইতে শুনা যায়। অধিক কি, প্রকৃত কথা এই যে, ভগবান্ এই জগতের অভাব এই জগতের দ্বারাই পূরণ করিতেছেন, তিনি পরমাণুর অবিনশ্বরত্ব ও জগতে মৃত্যুর সৃজন করিয়া এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন; তিনি কিরূপে এই সকল করিতেছেন, তাহা সবিশেষ লিখিবার এখানে আবশ্যক নাই এবং তাহা সবিশেষ বুঝিয়া উঠাও মানবের অল্পবুদ্ধির অত্যন্ত অসাধ্য,—বর্ণনা করা দূরের কথা। ধন্য তাঁহার মহিমা! ধন্য তাঁহার বুদ্ধিকৌশল! ধন্য তাঁহার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কৌশল! মানব, কেবল শত শত ধন্যবাদ দিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হও, যতই অগ্রসর হইবে, ততই তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে। তোমাকে ঐ স্থান হইতে ফিরিতে বলিতেছি, কেননা তুমি ঐখানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিলে ঐশ্বর্য্যের গোলকধাঁদায় পড়িয়া পথহারা হইবে, অথবা অগাধসলিলে ডুবিয়া গিয়া হাবুডুবু খাইয়া মরিবে, অথবা ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে নয়ন ঝলসিয়া যাইবে আর ঐদিকে আত্মম্ভরিতা গর্ব্ব, তর্ক, মোহ কেবল তোমার সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভাল, এখন প্রকৃত কথায় আসা যাউক। যদি জীবগণ বাস্তবিকই অভাবের জন্য নিতান্ত জর্জ্জরিত, প্রপীড়িত ও উদ্বেজিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে কেন জীবগণ অপমৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করুক না। একথা কোন তার্কিকে বলিতে পারে; কিন্তু ভগবান্ উহাদের আত্মরক্ষার জন্য এক সাধারণ জ্ঞান দিয়াছেন অর্থাৎ জীবদেহ মন প্রভৃতি এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহাতে সে না জানিয়া আপনার অজ্ঞাতানুসারে, শরীরের, মনের ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম বা স্বভাব-বশে, আত্মরক্ষার্থ সচেষ্ট থাকে; আরও তিনি উহাদের মনে 'আশা' বলিয়া এক মৃতসঞ্জীবনী ও প্রদান করিয়াছেন। জীবগণ নানাবিধ প্রকারে চেষ্টা করিয়া কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইলে, তাহার মানসমধ্যে নিহিত মৃতসঞ্জীবনী আশালতার রসে আপ্যায়িত হইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ,—লেখাপড়া শিখা বা জ্ঞানার্জ্জন করা, দয়াদাক্ষিণ্য শমদম অহিংসাদি সম্পাদন বা পরিপোষণ প্রভৃতি মানবের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অভাব আছে। এই গুলি কেবল মানবেরই আছে; কেননা মানব ইতর সাধারণ জন্তু হইতে অধিক বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান্; শরীরের ন্যায় মানবকে তাহার বুদ্ধির ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষোভ মিটাইতে হইবে। তবে, এ অভাব মানবমাত্রে যে প্রবলভাবে বহিতেছে বা জীবমাত্রেই যে নাই তাহা বলিতে সাহস করিনা, কেননা অনেক মানব আছে, যাহাদের সকল

সময় ও উত্তম কেবল প্রথমোক্ত অভাব পূরণ করিতেই ক্ষয় হইয়া যায় এবং বোধ হয় তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়-বত্তা, শরীররক্ষার্থ ও বংশবৃদ্ধিকরণার্থ চেষ্টা-শক্তিদ্বারা ঘন আকৃষ্ট হইয়া, তাহার সহিতই ঘনীভূত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। আর এমন অনেক ইতর পশুপক্ষীও আছে, যাহারা তাহাদের সমজাতীয় অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্ ও হৃদয়বান্ হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের অধিকতর বুদ্ধি ও হৃদয়বত্তার উৎকর্ষ সাধন করিতেও দেখা যায় না।

জ্ঞানার্জ্জন করিতে করিতে জ্ঞানার্জ্জন করিবার ইচ্ছা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, যতই জ্ঞানার্জ্জন কর না কেন, জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষোভ কিছুতেই মেটে না, এই জন্য জ্ঞানার্জ্জন ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদির উৎকর্ষ সাধনকেও অভাব, বলা যায়। আরও বিধাতা মানবের স্মরণশক্তিকে এরূপ করিয়া রাখিয়াছেন যে, সে তাহার অর্জ্জিত বিষয় আপনার যথেচ্ছ আয়ত্ত রাখিতে পারে না,—সে তাহার শিক্ষিত অনেক বিষয়ই ভুলিয়া যায়। এ কথা অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে, যে তিনি মানবের উপকারার্থ ই মানবের স্মরণ-শক্তিকে এতাদৃশ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন; কেননা এক বিষয় নিত্য স্মৃতি-পথারূঢ় রাখিলে মানবের যন্ত্রণার আর সীমা থাকিত না। সেই বিষয় দুঃখ-জনক হইলে ত কথাই নাই; আর একরূপ হইলে দ্বিতীয় বিষয় অন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না।

দয়া-দাক্ষিণ্যের উৎকর্ষের অভাব-বোধ, নূতন দয়া-দাক্ষিণ্যের স্থল দেখিলেই উদয় হইয়া থাকে। তখন পূর্ব্বকৃত দয়া-দাক্ষিণ্য অপ্রচুর বলিয়াই বোধ হয়। একই মানব যেন ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন করিয়া সৃষ্ট হইতেছে। এক সময়ে প্রদর্শিত দয়া-দাক্ষিণ্য ভাব যেন তাহার ক্ষণকাল পরে যথেষ্ট দয়া-দাক্ষিণ্য-ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, এই বলিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না।

তৃতীয়তঃ—সামাজিক, রাজকীয়, অর্থ, বাণিজ্য, আইন, মিউনিসিপ্যালিটী সম্পর্কীয় (রাস্তাঘাট প্রভৃতি) অভাব।

এই সকল অভাব কেবল মানবেরই সম্ভবে এবং অন্য কোন ইতর জন্তুতে সম্ভবে না। কেননা, এই সকল অভাব মানবের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাধীন বশতঃ তাহাদের পক্ষে ঘটিয়াছে এবং ঐ সকল ঘটনাপরম্পরা মানব আপনিই করিয়াছে, এই জন্য ঐ সকল ঘটনাপরম্পরা কৃত্রিম। কারণ মানব ইতর জীবজন্তুর সহিত সাধারণ নহে। নানাবিধ কারণে মানবকে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় এবং সমাজে থাকিলে রাজা, অর্থ, বাণিজ্য, পথ, ঘাট, যান প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। কতকগুলি জন্তুরও সমাজ আছে, যেমন অশ্ব, হস্তী, মধুমক্ষিকা, বানর প্রভৃতি; কিন্তু তাহাদের সমাজ মানবসমাজের ন্যায় জটিল বা কুটিল নহে, অতি সরল নিয়মের উপর স্থাপিত।

পূর্ব্বোক্ত অভাব সকলও কখনও পূরণ হয় না। সমাজ কেবল নিয়মের উপর নিয়ম জারী করিতেছে, কত পরিবর্ত্তন হই-তেছে, কত নূতন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হই-

তেছে, কত পুরাতন প্রথা নষ্ট হইয়া যাই-তেছে। এ সকলের মূল কারণ হইতেছে, মানবের নিত্য অভাব। নানাবিধ সজ্বর্ষে মানব পূর্ব্ব নিয়মের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে।

এই স্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অধুনা হিন্দুজাতির উপর অনেক জাতির সজ্বর্ষ-বন্যা আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং (ব্রাহ্মেরা যে রূপ উপদেশ দিয়া থাকে) হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং তৎস্থলে অন্য জাতি প্রদর্শিত আচার ব্যবহার গ্রহণীয়। আমার মতে এই উপদেশ পুতিগন্ধময় বিষ্ঠার ন্যায় সুদূরে বর্জ্জনীয়। যদিও এস্থলে উক্ত উপদেশ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত নহি, তথাপিইহা বলা আবশ্যক যে নানাবিধ জাতির সজ্বর্ষ জন্য যে হিন্দু-আচার ব্যবহারের উপর উপদ্রব চলিয়া আসিতেছে, তাহার দূরীকরণ করাই কর্ত্তব্য; এবং তাহাই এক্ষণকার অভাব। অতএব পাঠক! এমন মনে করিবেন না যে আমি সামাজিক অভাব বলিতে কেবল সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িবার উপদেশ দিতেছি। আর বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে অনবরত পরিবর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত থাকিলেও সেই সকল পরিবর্ত্তন-স্রোত একটা বদ্ধমূল মহাতরুর উপর দিয়াই বহিয়া যাইতেছে। ইহা বলা বাহুল্য, সমাজ-রূপ মহাবৃক্ষ সুদৃঢ় মূলের উপর স্থাপিত। মানব-স্বভাব নানা পরিবর্ত্তন বাত্যাবিক্ষোভে আকুলিত হইলেও তাহাতে এমন কতকগুলি সার্ব্বকালিক চিরন্তন সনাতনধর্ম্ম আছে, যাহার উপর স্থাপিত হইলে অচল ভূধরকেও ব্যঙ্গ করিতে পারে। আর তাহা যদি না হইবে, তবে সমাজই বা কেমন করিয়া স্থায়ী হইবে। যদি আজ মানবের কতকগুলি স্বভাব-বশে সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং কাল তাহার সে সকল স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়, তাহাহইলে কি কোন সমাজের অস্তিত্ব থাকিত, না সমাজ স্থাপনই হইত?

রাজকীয় অভাব।—এটিও নিত্য; চোর দস্যু, অগ্নিদ, গরদ প্রভৃতি সমাজের নিত্যসঙ্গী। সমাজ না থাকিলেও ইহাদের সম্ভাবনা আছে এবং সমাজ থাকিলে ইহাদের সম্ভাবনা অধিক। আর রাজ্যের সৈন্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, পররাষ্ট্র আক্রমণ, স্বদুর্গ শত্রুকর্ত্তৃক অবরোধ প্রভৃতির জন্য নিত্য কত শত উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে।

অর্থের অভাব।—এটীও নিত্য; নানাবিধ কারণে সমাজে থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং এমন কি এমন প্রয়োজন হয় যে, অর্থ না থাকিলে সংসার একেবারেই অচল হইয়া পড়ে; পরন্তু অর্থই সংসারীর নিত্যসঙ্গী। অর্থ থাকিলে সকল দিকই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয়। অধিক কি বলিব, অর্থেই জগৎ বশীভূত হইয়া আছে। এই সকল কারণেই অর্থের এত আদর, অর্থ সংগ্রহের জন্য সকলেই এত লালায়িত এবং অর্থের এতই অভাব বোধ। কিন্তু অর্থের কি এক মোহিনী শক্তি আছে, যদি কেহ অসংখ্য অর্থেরও অধিপতি হয়, তাহাহইলেও তাহার অর্থ-পিপাসা আদৌ মিটেনা। বরং "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"। এতাদৃশী রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষার কারণ অর্থদ্বারা কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করিতে

পারা যায়, ইহা বলিলেও পর্য্যাপ্ত হইবে না।

বাণিজ্য প্রভৃতিরও নিত্য অভাব।—কেননা এ সকলগুলি মানবের অন্যান্য অভাবের নিত্য অনুচর।

কোন কোন তার্কিক এরূপ বলিতে পারে যে জীবমাত্রের বিশেষতঃ মানবের যে এত ক্লেশ এত ধস্তাধস্তি এত ছটফটানি এবং ইহারা যে আপনাদের জীবন বিভুর কৌশল ক্রমে আপনারাই বলি দেয় না এবং চির-জীবনই এইরূপ ক্লেশে ও যাতনায় কাটাইয়া থাকে, ইহার জন্য বিভুই দোষী; কেননা এইরূপ করিয়া তাঁহার নিষ্ঠুর আমোদ ভোগ করা হইতেছে।

উহাদের প্রতিকূলে এই বক্তব্য যে বিভু কোন নিষ্ঠুর আমোদই ভোগ করিতেছেন না। তিনি যে কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন পালন করিতেছেন ও লয় করিতেছেন তাহা মানববুদ্ধির গোচর হইবার নহে। আর তোমার চক্ষে যাহা নিষ্ঠুর দেখিতেছ এবং মৃত্যু দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া যে তাঁহাকে গালি দিতেছ, সেই মৃত্যুর বিষয়ও ভাবিয়া দেখ, দেখিবে যে তুমি একদেশদর্শী পক্ষপাতী। সকল দিক্ দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা দেখিয়া পুলকিত হইবে। তুমি হয় ত বলিবে ঐ যে দুরাচার ব্যাঘ্র একটী ক্ষুদ্রকায় হরিণ-শিশুর প্রাণবধ করিয়া খাইতেছে এবং হরিণ-শিশু মৃত্যুর পূর্ব্বে করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে অতি হতাশ-ভাবে চাহিয়া চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এ দৃশ্য কি হৃদয় বিদারক নহে এবং ইহাতে কি বিশ্বনিয়ন্তার নিন্দা করিতে হয় না? আমি বলি দেখিতে হৃদয় বিদারক বটে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার নিন্দা করিতে পারি না। কেননা অনেক স্থানে তাঁহার করুণ-স্বভাবের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারি না; বরং নিজের বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়াই বোধ হয়। আর ঐ বিষয়েই তাঁহারা দয়াও দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তিনি মৃত্যু সৃষ্টি করিয়া ঐ হরিণ-শিশুকে বহু যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইলেন। যদি জীবন্ত হরিণ-শিশু ব্যাঘ্রের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া জঠরে জীর্ণ হইত এবং রক্ত বিষ্টাদিরূপে পরিণত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে কি কষ্টকর হইত!! আর মৃত্যু সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার অনেক করুণাও দেখা যায় সেগুলি এস্থলে বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

আরও দেখ, শমদমাদির অনুশীলন দ্বারা উক্তবিধ হৃদয় বিদারক দৃশ্যের উক্তবিধ ভয়ানকভাব থাকে না। বিশেষ, যদি মনে করা যায়, এই সংসার একটী ভীষণ রণক্ষেত্র তাহা হইলে আমাদের অন্তঃকরণ ঐ সকল ভয়ানক দৃশ্য দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইতে পায় না। এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, মানব তুমি যে চক্ষে ভগবানের নৃশংসতা দেখিতেছ সে চক্ষু তোমাকে ভুল দেখাইতেছে; তোমার দৃষ্টি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

উপরে যে প্রকৃতির ঘোরতর যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, মানব আপনার বুদ্ধি কৌশলে সেই প্রকৃতির উপর কতকপরিমাণে আধিপত্য করিতেছে,—প্রকৃতিকে খাটাইয়া প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছে; কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না।

চতুর্থতঃ—আত্মার ধর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি-প্রেম-পিপাসা। এই চতুর্থ অভাব কেবল

মনুষ্যের মধ্যেই দৃষ্ট হয়, এবং এই অভাব মনুষ্যের মধ্যেও অতিশয় বিরল।

এই চতুর্থোক্ত অভাবটী, দ্বিতীয়োক্ত অভাব জ্ঞানার্জ্জনাকাঙ্ক্ষা দয়া দাক্ষিণ্যাদি-লিপ্সার ন্যায়; ইহাদের স্বভাব এই যে ইহাদের লাভবিষয়ে স্বয়ং ব্যতীত অপর কেহ প্রতিদ্বন্দী বা বিঘ্নকারী নাই; এবং এই সকল অভাব পূরণ হইতে থাকিলেও উত্তরোত্তর আরও অধিক পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইবার পথে অনেক বিঘ্ন ব্যাঘাত আছে; যেমন আত্মাভিমান, গর্ব্ব, ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি। এই হেতু ঐ সকল আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং তাহা পূরণ করিবার জন্য উপরোক্ত বিঘ্ন ব্যাঘাতগুলির বিনাশ সাধন করিতে হইবে। কিরূপে বিনাশ করিতে হয়, তাহা লিখিতে গেলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইয়া পড়িবে এবং তাহা এস্থলে লিখিতে যাওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বলা ভাল যদিও এই দুই প্রকার অভাবের জন্য আমাদের অনেক ক্লেশভোগ ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ইহাদের লাভকরা আমাদের মানবীয় অবস্থার অতীব উপাদেয় এবং সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানব এই দুই অভাবে পড়িলে অন্যান্য অভাব কর্ত্তৃক বড় অধিক উৎপীড়িত হয় না। বিশেষতঃ চতুর্থোক্ত অভাবে পড়িলে অন্যান্য অভাব সকল বিস্মৃত হইয়া, শান্তির কমনীয় ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতে থাকে; এবং কত যে বিবিধ প্রকার সুখোপলব্ধি করে তাহা বর্ণাতীত। মানব অন্য সকল প্রকার অভাবে পড়িয়াই 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে থাকে; কিন্তু এই চতুর্থোক্ত অভাবে পড়িলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহেনা। দ্বিতীয়োক্ত অভাব মোচনার্থ জ্ঞান-বিদ্যানুশীলন করিতে থাকিলে তাহার নানাবিধ আধিব্যাধিজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইবার সম্ভব; অপিচ দ্বিতীয়োক্ত অভাব মোচনের অনুশীলন করিলে তাহার অন্যান্য অভাব সকল বিশেষরূপে তিরোহিত না হইয়া তাহাকে উৎপীড়িত করিতে থাকে।

অভাব সকলের মধ্যে উত্তমাধমভেদে বিশেষ তারতম্য আছে। অপেক্ষাকৃত উত্তমতর অভাব বলিতে গেলে এই বুঝায় যে, যে অভাব পূরণ হইলে অভাব-পূরণ-জনিত ফল অধিকতর স্থায়িত্বলাভ করে। যে অভাব পূরণ হইলে অন্তরের ছট্‌ফটানি প্রাণের হাহাকার চিত্তের দারুণ শ্মশানক্ষেত্রের আর্ত্তনাদ, কিছুই থাকে না, সেই অভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের চতুর্থোক্ত অভাবেই সর্ব্বোত্তম। যে নর এই অভাব অনুভব করিয়া তাহার পূরণ করেন তিনিই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়োক্ত অভাব, প্রথমোক্ত হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল বটে, কিন্তু ইহারও ফল স্থায়ী নহে।

আর একটি কথা এই, যে প্রথমোক্ত অভাব জীব-শরীরের ধর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয়োক্তটী অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অথবা জীবের অন্তরের ধর্ম্মজাত; তৃতীয়োক্তটী জীবের বাহ্যধর্ম্ম ও অন্তর্ধর্ম্মের ন্যূনাধিকপরিমাণে মিশ্রণ সমুদ্ভূত; চতুর্থোক্তটী জীবের আত্মার আকাঙ্ক্ষা হইতে জাত অথবা আত্মার ধর্ম্মবশতঃ সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই সকল অভাব সকলেরই ভাগ্যে উপস্থিত হয় না। প্রথমোক্ত অভাব সকলেরই উপস্থিত হয়,

কিন্তু যে মহাত্মা প্রথমোক্ত অভাবপূরণেই ব্যস্ত না হন এবং প্রথমোক্ত অভাবপূরণকেই মনুষ্যোচিতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা না করেন, প্রত্যুতঃ, মনুষ্যেতরজীবোচিত বিবেচনা করেন, তিনি দ্বিতীয়োক্ত (এবং তৃতীয়োক্ত-টীর প্রতি মনোযোগ দিলে তৃতীয়োক্তটীরও) অভাব বোধ করিয়া তৎপূরণ-জনিত বিপুল সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হন। কিন্তু চতুর্থোক্তটী সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, এই চতুর্থোক্ত অভাব বোধ করিতে হইলে, প্রথম তিনটী অভাবের দ্বারা মুহ্যমান্ হৃদয় হইলে হইবে না; প্রথম তিনটী অভাব পূরণের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিলে চলিবে না; উহাদের পূরণ যে কোন প্রকারে অতিঅল্পায়াসে হইলেই হইল, এবং ঐ আয়াস যতদূর অজ্ঞাতসারে হয় ততই ভাল।

প্রথমোক্ত অভাব পূরণের দ্বারা শারীরিক উন্নতি, দ্বিতীয়োক্ত দ্বারা মানসিক শ্রীবৃদ্ধি ও তৃতীয়োক্ত দ্বারা পার্থিব সুখ সম্ভোগের শ্রীবৃদ্ধি হয়; এই সকল উন্নতির পরিণতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু চতুর্থোক্ত অভাবটীর দ্বারা ক্রমিক উন্নতি; ইহার আর পরিণতি দেখা যায় না। যদিও কচিৎ দুই একজনকে এক সময়ে চতুর্থোক্ত অভাব বোধ করিতে দেখা যাইলেও আবার অন্যান্য অভাব সকলের পূরণেই ব্যস্ত দেখা যায় এবং চতুর্থোক্ত অভাব পূরণ করিতে দেখা যায় না, তথাপি এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, সেই মনুষ্যের চতুর্থোক্ত অভাব পূরণ করিতে করিতেই তাহার চতুর্থোক্ত অভাব পূরণজনিত উন্নতির পরিণতি হইতেছে। সেই মনুষ্য পথ-হারা ও লক্ষভ্রষ্ট; এবং যদিও এক অর্থে তাহার পক্ষে তাহার চতুর্থোক্ত অভাব পূরণের চরম হইয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু সে যে দিন দিন চতুর্থোক্ত অভাব পূরণ জনিত উন্নতি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা তাহার ক্রমিক চতুর্থোক্ত অভাব পূরণ করিতে করিতে হইতেছে এরূপ বলা যায় না; বরং সে চতু-র্থোক্ত অভাব পূরণ ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়াই এমন দশা প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপই বোধ হয়। সহজ কথায় বলিতে গেলে, যেমন শরীরের অভাব পূরাইতে পূরাইতে শরীরের বল কমিয়া আইসে—জরাভাব উপস্থিত হয়, মানসিক অভাব পূরাইতে পূরাইতে মনের নিস্তেজতা ও দুর্ব্বলতা আইসে, চতুর্থোক্ত অভাব পূরণের তাহা ঘটে না,—কথিত আছে যে ধর্ম্মই মৃত মনুষ্যের একমাত্র সহায় ও অনুগমনকারী; আর কিছুই সঙ্গে যায় না। অর্থাৎ চতুর্থোক্ত অভাবপূরণজনিত উন্নতি মৃত্যু-সময় অতিক্রম করিয়া যায়, সে উন্নতির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাত ঘটেনা।

উপরে যে চারিটী অভাব বলিয়া লিখিত হইল, বাস্তবিক তাহারা চারিটীই যে প্রকৃত অভাব তাহা নহে। প্রথম তিনটী অভাব যেন স্বপ্ন-লব্ধ দুর্লভ বস্তুলাভের জন্য আকিঞ্চন। জীব যেন এই ভবাটবীতে মায়া-নিদ্রায় নিদ্রিত; এবং দয়াময় বিভু যেন এই মায়ামুগ্ধজীবের নিদ্রাকালে স্বপ্নাবেশে তাহার প্রকৃত অভাবের (গন্তব্য পথের) 'নিশানা,' 'আবছায়া' দিয়া অন্তর্ধান হইয়াছেন। এই আবছায়া, নিশানা হইতেছে—জীবের এই মায়াময় সংসারে ক্ষণ-কালের নিমিত্ত প্রথম তিন প্রকার অভাব পূরণের জন্য সুখভোগ; জীবের হুড়া-হুড়ি, দৌড়াদৌড়িই যেন নিদ্রাকালের বিভু

প্রদর্শিত বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষায় ধাবমান হওয়া; এবং তাহার হাহাকার, মর্ম্মবেদনা যেন তৎবস্তু-দর্শনলাভের অঘটনহেতু বিষাদ ও শোকোচ্ছ্বাস। তবে যাঁহার বিভুকৃপায় নিদ্রাভাঙ্গিয়াছে তিনিই অভাবটীকে জানিতে পারিয়াছেন এবং বস্তুটীকে পাইবার আশায় অন্বেষণ করিতেছেন। তিনিই বুঝিয়াছেন,—বাস্তবিক জীবের কি অভাব; এবং তিনি তাহা পূরণ করিয়া অমৃতকেও তুচ্ছ করিয়া উত্তম ফললাভে আত্মাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অপর সকলে নিদ্রার ঘোরে 'আব্ছায়া'র অন্বেষণে আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছে।

আর একটী কথা, একপ্রকারের অভাব অন্তপ্রকারের অভাবকে গ্রাস করিয়া থাকে। যেমন, যে লোক প্রথমোক্ত অভাব লইয়া ব্যস্ত, তাহার অন্তকোন প্রকার অভাব উপস্থিত হয় না। যদিও উত্তরোত্তর বর্ণিত অভাব সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণিত অভাব সকলকে কিছু কিছু পূরণ না করিলে, আপনারা পূর্ণ হইতে সমর্থ হয় না, তথাপি উত্তরোত্তর বর্ণিত অভাব সকল উদিত হইলে, অন্যান্য অভাব সকল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। অর্থাৎ যাঁহার চতুর্থোক্ত অভাব পূরণ হইতেছে তিনি প্রথমোক্ত অভাব বা দ্বিতীয়োক্ত বা তৃতীয়োক্ত অভাব সকলকে পূর্ণ করিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টিত হন না—যেমন তত্তৎঅভাব পূরণকারীরা হইয়া থাকে। তাঁহার যতটুকু না হইলে চলে'না, ততটুকু পূরণ করিতে হয়। তাঁহাকে আহার দ্বারা শরীর রাখিতেও হয়, বিবেকের দ্বারা মনকেও পবিত্র করিতে হয়; কিন্তু তাঁহাকে যে 'বাবু' হইতে হইবে তাহা নহে; তিনি বিলাসিতার জন্য ব্যস্ত নহেন, তিনি বিদ্বান, ধনবান জ্ঞানবান্ হইতে সচেষ্ট নহেন এবং মান ও পদপ্রার্থীও নহেন।

এক্ষণে একটী প্রয়োজনীয় কথা আসিয়া পড়িতেছে যে, শ্রেয়স্কাম জীবের পক্ষে কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার যথার্থ অভাব পূরণ করা হয়। এ প্রবন্ধে উক্ত বিষয় লিখিতে হইবে না কেননা এই প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বেই দীর্ঘ হইয়াছে। বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।



সন্ধ্যা।

আকাশের পর পার হ'তে,
ভেসে এল কল্পনা আমার,
শুধু এল? তা নয়—তা নয়,
নিয়ে এল চুম্বন কাহার!

মেঘ-রঙ, আসে যায় আসে,
কত যায়, কত ভাসে চোকে,—
ভাল করি ফুটিছে না যেন,
মুছে তাই ফেলিতেছে এঁকে।

যা'চায় ফুটাতে চিত্রকর,
হয়না বুঝিবা মনোমত;
ভাবটী হারায়ে যায় বুকে,
তাই তার পরিশ্রম এত।

ধীরে ধীরে মুছিয়া আসিছে—
পশ্চিমে অন্তিম-হাসি-রেখা;
সন্ধ্যাতারা কি ভাবিছে যেন,
পূর্ব্বাকাশে দাঁড়াইয়া একা।

বল কার মৃদু পরশেতে,
ফুটিয়া উঠিল কুমুদিনী?
বল কার পদছায়া পেয়ে,
পাখীরা গাহিছে আগমনী?

আকাশের পরপার হতে
ভেসে এল কল্পনা আমার;
শুধু এল? তা নয়—তা নয়,
নিয়ে এল চুম্বন সন্ধ্যার।

শ্রীমতী——দাসী।

স্বপ্ন।

সংসারের জ্বালা,
করে ঝালা পালা,
পালা পালা করে প্রাণ;

পশিলাম ধীরে,
উদ্যান ভিতরে,
গাহিতে দুঃখের গান।

গীত গাহিব কি,
ঢুলে আসে আঁখি,—
শুইনু ঘাসের পরে;"

দেখিনু স্বপন,
হরষে মগন,
হইনু ঘুমের ঘোরে।

দেখি, নাহি কোন সুখ,
ঘুচেছে অসুখ,
রোগ শোক আর জরা;

মোর তরে একা,
পরকাশে রাকা,
দিবাকর আর তারা।

নদনদী গণ,
ভূধর কানন,
ফুল ফল ধরে শাখা;

ধন ধান্য ভরা,
এই বসুন্ধরা,
অধীশ্বর আমি একা।

হরষিত চিতে,
আঁখি পালটিতে,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর;

দেখি দুখ ভরে,
ধরণী উপরে,
রজনী হয়েছে ভোর।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।

কবির অন্তর।

(From Tennyson's "The Poet's mind.")

ক'রনা ব্যথিত, কবির অন্তর
তব অল্প-বুদ্ধির প্রভাবে ;
ক'রনা ব্যথিত, কবির অন্তর
সে গাম্ভীর্য্য স্পর্শিতে নারিবে।
কবির অন্তর- উজ্জ্বল, বিমল
স্ফটিক-সলিলা স্রোতস্বতী ;
স্বতঃই উজ্জ্বল আলোক যেমন,
সুবিমল—সম সদাগতি।

চিন্তার কালিমা রেখা ভালে—
তার্কিক ! এসনা এই স্থানে,
পবিত্র এ কাব্যের উদ্যানে।
দারুণ ঘৃণার সহ
হাসিয়া কলুষ হাসি,
এসনা এসনা এই স্থানে।

মন্দার বেষ্টিত এ কাননে,
পবিত্র সুরভি ময়—
প্রত্যেক প্রসূনে তার
পূত বারি ঢালিব যতনে ;
নিষ্ঠুর আনন্দে তব
ফেলিবে মলিন করি,
সে কোমল কুসুম রতনে !

মৃত্যু তব কটাক্ষে প্রকাশে,
পড়িছে তুহিন্ প্রতিশ্বাসে,
ছোট ছোট-তরু-লতাগুলি
ম্রিয়মান তাহার পরশে।

পশিবে না তোমার শ্রবণে,
দাঁড়াইয়ে রয়েছে যথায়—
বন বিহগেরা—কুঞ্জবনে—
মধুর ললিত-গীত গায়।

পরম পবিত্র এ কানন,
গায় সদা ফুল্ল পক্ষিগণ,
তুমি যদি আসিতে হেথায়,
এ গানের হইত পতন।

মধ্যস্থলে নাচে কিবা উল্লাসে নির্ঝর,
চিরপ্রভা—স্থির সমুজ্জ্বল,
সৌদামিনী উড়ায় অঞ্চল !
নির্ঘোষ গম্ভীর,স্নিগ্ধ—জুড়ায় অন্তর।

দাঁড়ায়ে অদূরে ওই
সুরঞ্জিত শিখরীর—
শীরষ হইতে দিনরাত,
আসে এই সলিল প্রপাত।
নেচে নেচে পড়ে ফুল্লমনে,
শ্যামল এ সমতলোপরি,
উন্নত শৈলের আকর্ষণে,
স্বর্গ হ'তে আসে এ লহরী।
গাহে চির প্রণয় সঙ্গীত,
উচ্চ কণ্ঠে মধুর নিস্বনে ;
কিন্তু তুমি এতই বধির,
পশিবে না তোমার শ্রবণে।
থাক তুমি রয়েছ যেখানে
পাপী তুমি এসনা হেথায় ;
তুমি যদি পশিবে এখানে,
এ সঙ্গীত মিশিবে ধরায়।

শ্রীরসময় লাহা।

বাইবেল-সমালোচনা।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(ছ) বিবাহের কথা হইবার পূর্ব্ব হইতে যোষেফের সহিত মরিয়মের আলাপ পরিচয় ছিল কি না?—যোষেফ ও মরিয়ম উভয়েই যৎকালীন এক দেশীয় লোক ছিলেন এবং যে কোন কারণেই হউক, উভয়েই নাসরতে আসিয়া প্রবাসী ও প্রবাসিনী হইয়াছিলেন, তৎকালে, মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্দত্তা হইবার পূর্ব্ব হইতে যে. যোষেফের পরিচিতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যোষেফের সহিত মরিয়মের বিবাহের সম্বন্ধে বাইবেলে যখন কোন বর-কর্ত্তা বা কন্যা-কর্ত্তার উল্লেখ নাই, তখন নিশ্চয়ই এ বিবাহের বর-কর্ত্তা স্বয়ং যোষেফ ও কন্যা-কর্ত্তা স্বয়ং মরিয়ম ছিলেন—পূর্ব্বের বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলে "বরকর্ত্তা বর এবং কন্যাকর্ত্তা কন্যা" কথনই হইতে পারে না। আগস্ত-কৈসরের আজ্ঞানুসারে নাম লিখাইবার জন্য মরিয়ম যখন নাসরৎ হইতে যিহুদিয়া দেশের বৈৎ-লেহম নগরে গমন করিয়াছিলেন, তখন যোষেফের সহিত মরিয়মের বিবাহ হয় নাই, তত্রাপি মরিয়মের সহিত কেবল যোষেফই গিয়াছিলেন; আর কোন আত্মীয় স্বজন বা দাস দাসী সঙ্গে থাকার কথা বাইবেলে লেখা নাই। যোষেফের সহিত মরিয়মের পূর্ব্বাবধি আলাপ পরিচয় না থাকিলে মরিয়ম একাকিনী যোষেফের সঙ্গে যাইতে সাহস করিতেন না—অন্ততঃ তাঁহার লোকলজ্জার ভয়ও হইত। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, **বিবাহের কথা হইবার পূর্ব্ব হইতে যোষেফের সহিত মরিয়মের আলাপ পরিচয় ছিল।**

(জ) বিবাহের পূর্ব্বে মরিয়ম একাকিনী যোষেফের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিতেন কি না, এবং তাঁহার সহিত কোন স্থানে যাইতেন কি না? মরিয়ম যে যোষেফের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশ্যে ও গোপনে যেখানে সেখানে যাইতেন ও তাহাতে বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার যোষেফের বা মরিয়মের কেহই ছিল না তাহা আমরা বাইবেল পাঠেই বিলক্ষণ জানিতে পারি; যথা—"তাহাতে ঐ যোষেফও আপনার বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখাইয়া দিবার জন্য গালীলস্থ নাসরৎ হইতে যিহুদিয়াস্থ বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেল।" লূক ২; ৪। "তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটী ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে প্রস্থান করিল এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় থাকিল।" মথি ২; ১৪, ১৫। "তাহাতে সে (যোষেফ) উঠিয়া শিশুটি ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে আইল। কিন্তু যিহুদিয়াতে আর্খিলায় নিজ পিতা হেরোদের পদে রাজত্ব করিতেছে ইহা শুনিয়া সেই স্থানে যাইতে ভয় করিল; পরে স্বপ্নযোগে (ঈশ্বর হইতে) আদেশ পাইয়া গালীল প্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক

নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিল।" মথি ২; ২১, ২২। মরিয়ম বিবাহের পূর্ব্বে একাকিনী যোষেফের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত যে সকল স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন সে সকল স্থান বড় কাছাকাছি ছিল না। গালীলস্থ নাসরৎ হইতে যিহুদিয়াস্থ বৈৎলেহম ৮০ মাইলের কম নহে—বৈৎলেহম হইতে মিসর ১০০ মাইলের কম নহে, মিসর হইতে নাসরৎ ১৫৩ মাইলের কম নহে—তখন রেলগাড়ী ও বাষ্পীয়-পোত বা শকট ছিল না, তাহাতে আবার ঐ সকল প্রদেশ পাহাড় পর্ব্বত, নদী ও হ্রদ দ্বারা সঙ্কুলিত ছিল; সুতরাং নানা স্থানে নানা-প্রকার অবস্থা ও ঘটনার বাধ্য হইয়া মরিয়মকে যে যোষেফের সহিত একত্রে ভোজনপান ও একত্রে শয়নাদি করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—স্মরণ রাখিবেন, এখন যোষেফ পূর্ণ যুবক ও মরিয়ম পূর্ণ যুবতী, সামান্য সূত্রধর ও তৎপ্রতি বাগ্দত্তা স্ত্রী, উভয়েই নিরক্ষর, নীতিশিক্ষা কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সে কালের লোকেরা ইন্দ্রিয় দমনে কত সক্ষম ছিলেন তাহা ছুতার কামারের কথা দূরে থাকুক, বাইবেলে 'লোট,' 'দায়ূদ' প্রভৃতি সাধুদিগের জীবনচরিতেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। স্থূলবুদ্ধি খ্রীষ্টিয়ানগণ বলিতে পারেন যে, "যোষেফের সহিত মরিয়মের এই যে নানা স্থানে একাকিনী যাতায়াতের বিষয় বাইবেলে লেখা আছে, তাহা মরিয়মের সহিত যোষেফের বিবাহের পরে, পূর্ব্বে নহে, কারণ বাইবেলেই লেখা আছে, যথা—'পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রভুর দূতের আজ্ঞামত কর্ম্ম করত আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল' মথি ১; ২৪। বস্তুতঃ, যোষেফ মরিয়মকে বিবাহ করিয়াছিলেন"। এখানে, "আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল" এই কয়েকটী বাইবেল উক্ত বচন হইতে যদি কোন খ্রীষ্টিয়ান অর্থ করেন যে "দূতের আজ্ঞানুসারে যোষেফ মরিয়মকে বিবাহ করিয়াছিলেন" তাহাহইলে আমি তাহার উত্তরে বলি যে, "না"। লূক ১; ৩৯ ও ৫৬ পদ পড়িলে দেখা যায় যে মরিয়ম গর্ভবতী হইবার অনতিপরেই নাসরৎ পরিত্যাগ করিয়া যিহুদিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার জ্ঞাতি ইলীসাবেতের বাটিতে গিয়া তিন মাস কাল অবস্থিতি করেন; তৎপরে নাসরতে নিজ বাটিতে ফিরিয়া আসেন। মরিয়ম তিন মাসের গর্ভাবস্থায় নাসরতে নিজ বাটিতে ফিরিয়া আসিলে যোষেফ তাঁহার লক্ষণাদি দেখিয়া যখন তাঁহাকে গর্ভিণী বুঝিয়া তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে গোপনে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন (মথি ১; ১৮, ১৯) সেই সময়েই ঈশ্বরের দূত যোষেফকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া মরিয়মকে গ্রহণ করিতে অভয় দান করেন, (মথি ১; ২০, ২১) এবং সেই সময়েই যোষেফ দূতের আজ্ঞানুসারে মরিয়মকে গ্রহণ করেন—মথি ১; ২৪। এই 'গ্রহণ করা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যদি বিবাহ করা হয় তাহা হইলে, মরিয়মের তিন বা চারি মাসের গর্ভাবস্থায় যোষেফ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু মরিয়ম ও যোষেফ যখন তাঁহাদের নাম লিখাইতে যিহুদিয়ার বৈৎলেহম নগরে গিয়াছিলেন, তখন মরিয়ম যে পূর্ণগর্ভা ছিলেন, অন্ততঃ যোষেফ দূতের আজ্ঞানুসারে মরিয়মকে

গ্রহণ করিবার পরে যে তাঁহারা বৈৎলেহমে নাম লিখাইতে গিয়াছিলেন, তাহা বাইবেল পাঠকারী কোন খ্রীষ্টিয়ানই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; লূকের ২; ৪ পদে লেখা আছে "তাহাতে ঐ যোষেফও আপনার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্মে গালীলস্থ নাসরৎ নগর হইতে যিহুদিয়াস্থ বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেল।" 'বাগ্দত্তা' শব্দ বিবাহের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হয়, বিবাহ হইলে আর 'বাগ্দত্তা' শব্দ ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং মরিয়মের পূর্ণগর্ভাবস্থাতেও লূক যখন তাঁহাকে বাগ্দত্তা বলিতেছেন তখন, যোষেফের সহিত মরিয়মের যে এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, তাহাই প্রমাণ হইতেছে, সুতরাং তিন চারি মাসের গর্ভাবস্থায় যোষেফের 'গ্রহণ করার' অর্থ বিবাহ করা কোন মতে হইতে পারে না—সেখানে 'গ্রহণ করা' শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যোষেফ মরিয়মকে গর্ভবতী বুঝিয়া তাঁহাকে মন হইতে দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু দূতের কথা শুনিয়া যোষেফের মনের সেই সন্দেহ দূর হওয়াতে তিনি মরিয়মকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভালবাসিতে লাগিলেন। যোষেফের সহিত মরিয়মের যে কখনই বিবাহ হয় নাই, তাহার আর একটী অকাট্য প্রমাণ এই যে, খ্রীষ্টিয়ানগণ মরিয়মকে অদ্যাবধি "কুমারী মরিয়ম" বলিয়া থাকেন।

মরিয়ম গাব্রিয়েল দূতের যতই দোহাই দিউন না কেন, খ্রীষ্ট যতই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করুন না কেন এবং মথি ও লূক তাঁহাদের গুরু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরত্ব ও গুরুর মাতা মরিয়মকে সতীত্ব দিবার নিমিত্ত যতই প্রমাণ উদ্ভাবন করুন না কেন, খ্রীষ্টের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়গণ যে তাহা বিশ্বাস করিতেন না—তাঁহারা যে খ্রীষ্টকে যোষেফ ও মরিয়মের স্বভাব-জাত সন্তান বলিয়া মনে করিতেন, তাহা বাইবেল পাঠেই আমরা অবগত হই; যথা—"কার্য্যারম্ভকালে যীশুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিল; তিনি লৌকিক জ্ঞানে যোষেফের পুত্র।" লূক ৩; ২৩। "কিন্তু ফরীশিয়া কহিতে লাগিল, ভূতগণের অধিপতির সাহায্যে সে (খ্রীষ্ট) ভূতগণকে ছাড়ায়।" মথি ৯; ৩৪। "পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপনার দুইজন শিষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই জিজ্ঞাসা করিল,—'যাঁহার আগমন হইবে সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব?" মথি ১১; ২,৩। এই যোহন যীশুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন এবং ইনিই অল্পদিন পূর্ব্বে যীশুকে বাপ্তাইজিত করিয়াছিলেন এবং যীশুর মাথার উপরে পবিত্র আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন; (যোহন ১;৩২)। "এই সকল দৃষ্টান্ত কথা সমাপ্ত করিলে পর যীশু স্থানান্তরে গমন করিলেন। এবং স্বদেশে আসিয়া লোকদিগকে তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমত বিজ্ঞান ও এমত প্রভাবের ক্রিয়া কোথা হইতে হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব ও যোশি ও শিমোন ও যিহূদা এ সকলে কি ইহার ভ্রাতা নহে? এবং ইহার ভগিনীরা কি সকলে আমাদের এখানে নাই? তবে এ

কোথা হইতে এই সমস্ত পাইল?" মথি ১৩; ৫৩—৫৬। অধিক আর কি দেখাইব, যীশুর স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়রাই যীশুকে ঈশ্বরনিন্দক অপরাধে অপরাধী প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে অবশেষে ক্রুশে বধ করিল। যাহা হউক, মরিয়ম ও যোষেফের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়রা যখন যীশুকে স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত না তখন, তাহারা যে মরিয়মের মুখে গাব্রিয়েল দূতের দর্শনবৃত্তান্ত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভ হওন বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা একেবারেই অসম্ভব; বস্তুতঃ তাহারা মরিয়মকে যোষেফের প্রকৃত স্ত্রী এবং যীশুকে যোষেফ ও মরিয়মের প্রাকৃতিক পুত্র (Natural son) বলিয়াই বিশ্বাস করিত, এবং তাহারা যে কখন মরিয়ম ও যোষেফকে সামাজিক প্রথা এবং বিধান অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন তাহা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লেখ, প্রমাণ বা আভাস নাই; সুতরাং যোষেফের সহিত মরিয়মের একাকিনী যে সকল যাতায়াতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সে সকলই বিবাহের পূর্ব্বে; অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, **বিবাহের পূর্ব্বে মরিয়ম একাকিনী যোষেফের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিতেন এবং যোষেফের সহিত যেখানে সেখানে যাইতেন।**

(ঝ) মরিয়ম সুরা পান করিতেন কি না?—বাইবেলে সুরা শব্দের অর্থ দ্রাক্ষাফলের বা আঙ্গুরের নিষ্পীড়িত ও উৎসেচিত রস বা 'পোর্টওয়াইন'। এই 'পোর্টওয়াইন' যিহুদিয়দিগের নিত্য পেয় সামগ্রী ছিল। যিহুদিয়দের ব্যবহার অনুসারে এই সুরা পান করা বিশেষ দোষনীয় ছিল না। তখন এই দ্রাক্ষাফলের চাষ ও দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করা রাজার একচেটে (Monopoly) ছিল না এবং এই সুরার উপরে রাজকীয় কর বা লাইসেন্স কিছুই ছিল না, সুতরাং সকলেই ইচ্ছা করিলে দ্রাক্ষার চাষ ও দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করিত বলিয়া দ্রাক্ষারস অতি সুলভ ছিল। এই সুরার মাদকতা গুণ সম্বন্ধে ১ম শমূয়েল ২৫; ৩৬ পদে নাবালচরিতে; ২য় শমূয়েল ১১; ১৩ পদে উরিয়াচরিতে; ১ম রাজাবলি ২০; ১৬ পদে বিন্‌হেদদ্ চরিতে; দানিয়েল ৫;৩,৪ পদে বেল্‌শৎসর ও তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীগণ চরিতে; আদিপুস্তক ৯; ২১ পদে নোহ চরিতে; আদিপুস্তক ১৯;৩০ ৩৬ পদে লোট ও তাঁহার কন্যাদ্বয়চরিতে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুরা এরূপ মাদক হইলেও আমাদিগের দেশে পরিষ্কার ও শীতল জল যেমন সকলের নিত্য ও অবশ্য পানীয়, যিহুদিয়দিগের এই সুরাও তদ্রূপ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিত্য ও অবশ্য পানীয় ছিল। বিশেষতঃ যিহুদিয়দিগের পার্ব্বণে এবং বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে এই সুরার কিরূপ স্রোত বহিত তাহা বাইবেলেই দেখুন—"সেই স্থানে যিহুদিলোকদের শুচিকরণ ব্যবহারানুসারে দুই তিনমোন জল ধরে এমন ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায় জল ভর; তাহাতে তাহারা সে সকল কানা পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও; তাহাতে তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন দ্রাক্ষারসে পরিণত সেইজল আস্বাদন করিল, তখন তাহা কোথাকার তাহা জ্ঞাত ছিল না; কিন্তু ঐ যে পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল তাহারা জ্ঞাত ছিল।" যোহন ২;৭—৯। পাঠকগণ! আর অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক কি?—এরূপ সুরা-প্রধান দেশে বাস করিয়া মরিয়ম যে সুরাপান করিতেন না তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ যোহন ২;২,৩ পদ পড়িলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে **মরিয়ম সুরাপান করিতেন।**

(ক্রমশঃ)

মাসিক-সংবাদ।

বিগত ৩১ অক্টোবর তারিখে কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ সভায় "বঙ্গীয় শিল্পসমিতি"র বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। জিওলজিকেল ডিপার্টমেন্টের সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট বাবু প্রমথনাথ বসু উক্তসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভারতীয় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ ও অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের বর্ত্তমান আভ্যন্তরিক অবস্থা যে কিরূপ ও তাহার প্রতিকারের উপায় কি, প্রমথ নাথ এ সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ভারতবাসী মাত্রেরই জানা আবশ্যক। আমরা তাঁহার বক্তৃতার অনেকাংশ নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি।

***

ভারতবর্ষ এক্ষণে দরিদ্রদেশ। দেশের লোকসংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দশ বৎসরের মধ্যে সাত আট কোটী লোকের বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রমথ বাবু বলেন যে,—১৮৭৩ সালে আয়ব্যয় সমিতির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন যে, 'ভারতের সর্ব্বসাধারণে এতই দরিদ্র যে তাহাদের জীবন ধারণের উপায় নাই বলিলেও চলে। বিলাসিতা সুখস্বচ্ছন্দতার কথা দূরে থাকুক ভারতের একজন ব্যক্তি, স্বীয় পরিবারবর্গকে অতি কষ্টে পূর্ণাশন বা অর্দ্ধাশন করাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল।'—ইণ্ডিয়া বজেট লইয়া বিলাতের পার্লিয়ামেন্টে যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে মহাসভার সভ্য মিঃ এস্, স্মিথ বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, 'ভারতের অধিবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র।' একথা সম্পূর্ণ সত্য; জেলের কয়েদীরা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে খাইতে পরিতে পায় ভারতের প্রায় চারি ভাগের তিনভাগ অর্থাৎ বারআনা অধিবাসীরা সেরূপ আহারাদি করিতে পায় না। বাস্তবিক আমাদের দারিদ্র্য অতীব গভীর। আরও দুঃখের বিষয় এই যে এ দারিদ্রতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

***

আমাদের দেশীয় শিল্পাদির অবনতি সম্বন্ধে প্রমথ বাবু বলেন যে—আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পিগণও উৎসন্নে গিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালেও এদেশে যে পরিমাণে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত তাহা দেশবাসীদিগের ব্যবহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়া বিদেশে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইত। কিন্তু এক্ষণে কেবল কাঁচা কার্পাসই রপ্তানী হইতেছে। কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাদি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় এককোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রাদি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল; আর ১৮৮৮।৮৯ সালে আমরা ইংলণ্ড হইতে প্রায় উনত্রিংশকোটী টাকার বস্ত্রাদি আমদানী করিয়াছি। শতবর্ষের কত পরিবর্ত্তন!! একশতাব্দীর পূর্ব্বে শিল্প-জাত-লাভ এদেশে থাকিত ও দেশেরই ধনবৃদ্ধি করিত; আজ সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের লাভ আর আমাদের নাই। আজ তাহা বিদেশের

ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং দেশ ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এক সময়ে, যে সমস্ত শিল্পিগণ দেশীয় প্রধান প্রধান শিল্প-সমিতির সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধন ও পরিপোষণ করিত, আজ তাহাদের অধিকাংশই উদর যাতনায় কৃষি বা সামান্য শ্রমজীবির কার্য্য করিতেছে।

***

প্রমথ বাবু, এসম্বন্ধে কটন সাহেবের মত উত্থাপন করিয়া বলেন যে,—বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অন্যতম সেক্রেটরি মিঃ এচ্ জে, এস্, কটন বলেন যে 'দেশের সর্ব্বস্থানেই শিল্পিগণ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। বিভাগীয় কমিসনরবর্গ ও জেলার হেড-কলেক্টারগণ, একথা প্রতি বৎসরেরই গভর্ণমেন্টের গোচর করিয়া থাকেন। এমন বৎসর নাই যে বৎসর গবর্ণমেন্টের গোচরে একথা আসে নাই। শিল্পকরের উচ্ছেদ বশতঃ এদেশের সকল স্থানেই কৃষি বৃদ্ধি পাইতেছে।' শিল্পের অভাবে বড় বড় নগর সামান্য গ্রামে পরিণত হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক্ষণে এদেশের শতকরা ৯০ জন ব্যক্তির কৃষিকার্য্যই জীবন ধারণের উপায়। দেশের লোক কৃষি ব্যবসায়ী হইতেছে, কিন্তু দেশীয় সমস্ত লোকসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বড়ই কম।

***

প্রমথ বাবু আরও বলেন, যে—বিলাতের কৃষিবিজ্ঞানবিদ্‌প্রসিদ্ধ সার জেম্‌স কেয়ার্ড ১৮৮৭ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্য হইয়া হইয়া এ দেশে আসেন। কৃষকের তুলনায় ভূমির পরিমাণ জ্ঞাত হইয়া তিনি বলেন যে, 'বিলাতে একবর্গ মাইল, ভূমি প্রকৃষ্টরূপে কর্ষণ করিয়া ২৫ জন যুবক ও বৃদ্ধ এবং ২৫ জন স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার চলিতে পারে; কিন্তু ইহার চতুর্গুণ হিসাবে অর্থাৎ ভারতের প্রতিবর্গ মাইলে আবাদী ভূমিতে দুইশত ব্যক্তির চলিতে পারে, এরূপ হিসাব ধরিলেও ভারতে যে পরিমাণে আবাদ জমী আছে তাহাতে ভারতবাসীর এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তির চলিতে পারে মাত্র।' ভূমির উপর লোকের নির্ভর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যদি না বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে লোকে আহার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কিন্তু সে আশাও অত্যন্ত কম। সুতরাং কৃষক কুলের ভাবী পরিণাম অতীব শোচনীয়। দারিদ্র্য প্রপীড়িত শত শত শিল্পী উদরান্নের জন্য কৃষিদিগের দল পুষ্ট করিতেছে এবং জমীর উপরই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের সহিত ঘোরতর জীবন সংগ্রামে নিরত হইযাছে—সে সংগ্রাম ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

***

প্রমথবাবু এসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের কার্য্য-কলাপের উল্লেখ করিয়া বলেন যে—ভারতের কৃষির কোন্ উপায়ে কোন্ পথে উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রসিদ্ধ কৃষি-তত্ত্ববিদ্ বিলাতি ডাক্তার ভোয়েলকারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সবিশেষ যত্নসহকারে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে,—'ভারতীয় প্রজাকুল কেবলমাত্র "কৃষি-কার্য্যের মূলতত্ত্ব জানে;

কিন্তু অনেকের ধারণা আছে যে এ দেশীয় কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে অপটু ; কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সমস্তই ব্যর্থ হইযাছে। আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বরং যাঁহারা ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে যান তাঁহাদের অপেক্ষা ভারতীয় কৃষকেরা এ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন।'—খুব গভীর করিয়া কর্ষণ সম্বন্ধে ইনি বলেন যে,—'স্থানে স্থানে গভীর খননে ভূমির রস বিনাশ পাইযা অনিষ্ট করে।' সুতরাং কৃষকের আশা কিরূপ শোচনীয় দেখুন।

***

শিল্পী দিগের সম্বন্ধে প্রমথ বাবু বলেন যে,—শিল্পকরদিগেরও কষ্টের পরিসীমা নাই। কেহ কেহ বলিবেন তাহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হইযাছে, কিন্তু যে পরিমাণে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হইযাছে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য তাহার কতগুণ আইন আকবরী পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি, যে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আকবরের সমযে, সামান্য শ্রমজীবির মজুরী ছিল এক আনা মাত্র, কিন্তু তখন গমের মণ ছিল পাঁচ আনা ও চাউলের মণ ছিল আট আনা মাত্র। সে পরিমাণে মজুরী এখন তিনগুণ চড়িযাছে ; কিন্তু গম ও চাউলের মূল্য চড়িয়াছে সাতগুণ। সুতরাং পূর্ব্বে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত এখন উদরান্নের জন্য লালায়িত। ইহা কেবল আমাদের মত নহে সার অকলন্দ কল্‌ভিন, সার চার্লস এলিয়ট, সার উইলিয়ম হন্টার প্রভৃতি মহামান্য রাজপুরুষগণও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিযাছেন। ১৮৮৫ সালে সার অকলন্দ কল্‌ভিন্ বলেন যে,—"লোকের যেরূপ আয় তাহাতে কায়ক্লেশে জীবন রক্ষা করাই কঠিন; অবস্থা পরিবর্ত্তনে মৃত্যুসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮৮১ সালের সহস্রের মধ্যে ২০.৯৮ জনের মৃত্যু পরিমাণ দেখা যায। ১৮৮৯ সালে উক্ত হিসাবে ইহার পরিমাণ ২৮.০৮। গণণায় ভুলে সামান্য প্রভেদ হইতে পারে কিন্তু গণনায় ভুলে দশবৎসরের মধ্যে প্রতি সহস্রে যে আট জনের বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

***

দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রমথ বাবু বলেন যে—'সামান্য লোক দিগের অবস্থার ন্যায মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের অবস্থাও উন্নত নহে ; বরং মন্দ। সরকারী উচ্চ কর্ম্মে ইহাদের অধিককার নাই বলিলেও চলে। একে ত আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদুপরি পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী কতিপয় নূতন প্রথা প্রবেশ করিয়া নূতন ব্যয় ভার বাড়াইযাছে মাত্র। ইহাদিগকে এক্ষণে কায করিতে হয় ইংরাজের ন্যায—কিন্তু ইংরাজের ন্যায কিছুই নাই। ইহাদের খাদ্য, ব্যবহার, পুরস্কার, বেতনাদি সকলই বিভিন্ন। জীবন নির্ব্বাহের ব্যয বৃদ্ধি হইয়াছে অথচ আয়ের বৃদ্ধি আদৌ নাই। মাংস-ব্যবহারে সকলে সক্ষম নহে ; দুগ্ধ ও দুগ্ধ প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যাদিই আমাদের পুষ্টিকর আহার ; কিন্তু সেই দুগ্ধই এখন দুর্মূল্য। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকেরা পূর্ব্বে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া আহার পাইত, এক্ষণে তদপেক্ষা অতিরিক্ত শ্রম

করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আহার পাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যে তাহারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারেই দুর্ব্বল হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং বহুমূত্রাদি পীড়া-প্রাদুর্ভাব এক্ষণে অধিক হইয়াছে। এইরূপে সমাজের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর কি কৃষক, কি শিল্পী, কি শ্রমজীবি, কি শিক্ষিত-সম্প্রদায়, সকলেই দারিদ্র্যের দারুণ আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইয়া ডুবিতেছে—জীবন নির্ব্বাহের [illegible] মধ্যে ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

***

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য প্রমথ বাবু বলেন যে—কোটী কোটী লোকের দারুণ অভাব মুষ্টিমেয় সরকারী চাকুরীতে কখনই পূরণ হইতে পারে না, তবে এই বিষম বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি? উপায় একমাত্র শিল্পোন্নতি। শিল্পোন্নতি করিতে পারিলে সাধারণ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে ও কৃষিকার্য্যের ও সমধিক উন্নতি সাধন হইতে পারিবে। এ কথা এক্ষণে রাজা ও প্রজা উভয়েই বুঝিতেছেন। তাহার উপায় উদ্যোগও দেখা যাইতেছে। বোম্বায়ের পার্শী ও মারহাট্টারা তাহার প্রমান স্থল। বঙ্গদেশেও, কাপড়ের কল কারখানা, গ্যাসের কারখানার প্রভৃতির উদ্যোগ দেখিয়া আশা হয় যে, বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রাখর্য্য বুঝিয়া সকলে উক্তবিধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু কোন্ পথাবলম্বন করিলে কোন্ শিল্পের উন্নতি করিলে, কোন্ শিল্পের পুনঃ প্রচলন করিতে পারা যাইবে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে স্থিরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

***

প্রমথনাথ এই সমস্ত বলিবার পর আমাদিগের প্রাচীন জাতিভেদ ও জাতিব্যবসায় ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বতন জাতি-ব্যবসায় ব্যতিক্রমই আমাদের এই দুর্দ্দশার মূল। তখনকার লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিত, তাহার কারণ তাহারা আপন আপন অবস্থায় ও জাতি-ব্যবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিত। জাতিভেদ প্রথাই আমাদিগকে উন্নত করিয়াছিল। কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে এখন আমাদের সে সুখস্বচ্ছন্দতা বা উন্নতি কিছুই নাই। বিদেশী বণিক এদেশে আসিয়া কত উপায় উদ্ভাবনে, কল বসাইয়া, খনি খুঁড়িয়া, ব্যবসা প্রভৃতি করিয়া দেশের ধন দুই হাতে লুটিতেছে, চক্ষের উপর দেখিতেছি, কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং আমাদের দশা আর কি হইবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভারতের কোথায় মেটে তৈল মিলে? কিরূপে ঐ তৈল তুলিলে লাভ হয়? কিরূপে লৌহ গলান যায়? দেশীয় কোন্ কোন্ দ্রব্য হইতে সাবান প্রস্তুত হয়? সহস্রের ভিতর একজনও তাহার উত্তর দিতে পারিবে না।

***

স্থানাভাব বশতঃ প্রমথ বাবুর বক্তৃতার শেষাংশ প্রকাশিত হইল না, বারান্তরে প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের
ভ্রাতা
শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড—অষ্টম ও নবম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ—১২৯৮।

কলিকাতা।

৩নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীপরমসুখ সাহা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩২ নং মাণিকতলা
ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১২৯৮ সাল।

সুবোধিনী-সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত।

"SUBODHINI"—A monthly magazine in Bengali, Unlike other Bengali magazines which are not very particular in point of regularity, this periodical has been very steadily coming out every month, and we are glad to state that we have in hand the complete set for the Bengali year ending Chaitra last. We note its decided improvement every month. Some of the articles and poems of the last 3 issues are excellent. We wish it a long life and every success———PEOPLE, May 9 1891.

"SUBODHINI"—Is the name of a Bengali periodical that I have received for review. It is a smartly written paper, but there is some room for improvement———INDIAN PLANTER'S GAZETTE, June 3 1891.

সুবোধিনী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী—হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় গদ্য-পদ্য প্রবন্ধ-সম্বলিত। বঙ্গীয় স্বভাষানুরাগী পাঠকদিগের নিকট সাদরে গৃহীত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।—সঙ্গিনী, কার্ত্তিক ১২৯৭।

সুবোধিনী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। সুবোধিনী যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে; ইহার প্রবন্ধগুলি পড়িবার উপযুক্ত বটে। "প্রমদাসুন্দর বাবু" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। এইরূপ মাসিক পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনীয়, আমরা সুবোধিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—বঙ্গ-নিবাসী, ১৪ই চৈত্র, ১২৯৭ সাল।

সুবোধিনী—(মাসিক-পত্রিকা)। দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ হইল, এখন এ পত্রিকার সমালোচনায় সাহস করিয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারি। "দোলযাত্রা"-প্রবন্ধে বেশ একটু ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া গেল। দোলযাত্রা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি পরিপাটি। "দার্জ্জিলিং ভ্রমণ-কারীর পত্র" প্রস্তাবটিও মন্দ হয় নাই। 'পাষণ্ড-দলনে' বাস্তবিকই পাষণ্ডগণের দলন হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।———নবযুগ, ১৮ই বৈশাখ, ১২৯৮।

সুবোধিনী—এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা ১২৯৮ বৈশাখ আমরা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম—ইহার লেখার বেশ ভাবুকতা আছে। গবেষণারও গভীর উচ্ছাস আছে। ভাষার উদ্বোধিনী শক্তি আছে। স্থানে স্থানে সম্পাদকের ধর্ম্মানুরাগ অধ্যবসায়ের চিহ্ন আছে। তবে পত্রিকার পরিমাণ অনুসারে লিখিত "বিষয়" বড় বেশী হইয়াছে। ইহার দীর্ঘ জীবন আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।———দিনাজপুর পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। অগ্রহায়ণ—১২৯৮। অষ্টম সংখ্যা।

বিফল আশা।

আমার, আশার স্বপন রহিল শুধু,
শৃঙ্খলে রহিল পরাণ জড়া'য়ে,
বেড়াই কেবল বাসনা কুড়া'য়ে,
শুধু নদীকল,
মেঘ নিরমল,
কুহরিয়া উঠে কোকিল-বঁধু।

হাসি, কান্না, শোক, সদা অহরহ!
কত মিছা প্রেম, ছায়াবাজী স্নেহ;
কত বা মিলন, কত বা বিরহ
দু'দিনের তরে সাজান বাসা;
কেহ বা আদরে,
কেহ তিরস্কারে,
কিছুতে মেটে না দুরন্ত আশা।

আমি, কা'র পথ চাহি জেগে থাকি নিশি,
কোন বন হ'তে কাণে আসে বাঁশী,
কা'র অভিসারে কাল-স্রোতে ভাসি,
বল বল একি মিথ্যা সকলি?
কা'রে ভালবাসি,
কা'রে আমি চাহি,
কা'র অভিশাপে এত ব্যাকুলী!

কত লোকে আমি বলি ভালবাসি,
অধীর হইয়া ছুটে কাছে আসি,
চোকে চোকে মিলে,
সুখ যায় চলে,
ভাব বুঝাবারে পাইনা ভাষা;
কিছুতেই যদি না মিটিতে চায়—
বল, বল, কেন, কেন এ আশা?

শ্রীমতী—দাসী।

সুরুচি ও কুরুচির এক পৃষ্ঠা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বোধ হয় শীঘ্রই অন্তর্জলি করিতে হইবে। ধূয়া উঠিয়াছে, যে, সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক কুরুচি পূর্ণ স্থান [illegible] স্থান ছাত্রদিগকে যাহাতে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান্ ও বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। যে সকল স্থান পাঠ করিলে ছাত্রদিগের নীতিজ্ঞান মলিন হইতে পারে, সুনীতির পরিবর্ত্তে দুর্নীতির বীজ কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে, সে সকল স্থান ছাত্রদিগের সর্ব্বথা বিষবৎ পরিবর্জ্জনীয়। প্রাচীন কুরুচির সহিত নব্য সুরুচির এই তুমুল সংগ্রামে ফল যে কি হইবে, তাহা তমসাবৃত মানব-জ্ঞানাতীত ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত।

ইংরাজী ভাষা, রাজপুরুষদিগের ভাষা, ইংরাজী ভাষা, নব্য বঙ্গের অর্থকরী ভাষা, ইংরাজী ভাষা, শুভ্রবসনা যশোদেবীর প্রসাদ লাভের একমাত্র উপায়। এ হেন ইংরাজী ভাষা যে পবিত্র, পরিমার্জ্জিত, কুরুচি দোষ-বিবর্জ্জিত ও সুরুচি-সম্পন্ন—এ হেন ভাষায় লিখিত প্রত্যেক পুস্তকের প্রত্যেক স্থান যে ছাত্রেরা নির্ব্বিঘ্নে পাঠ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা—ছি! ছি!—এ ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি কুরুচিময় ও ধিক্কারজনক স্থানে পরিপূর্ণ—এ ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির সকল স্থান ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া উচিত নয়—কখনই উচিত নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের কুভাব-ব্যঞ্জক স্থান গুলি পড়িয়াই ছাত্রেরা দুর্নীতি-পরায়ণ হইতেছে। এই যে দেখিতেছ, অজাত-শ্মশ্রু বালকেরা "চুরুট" মুখে দিয়া, চতুর্দ্দিকে ধূমপুঞ্জ বিকীর্ণ করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছে, ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কুরুচি-পূর্ণ স্থান সমূহ পাঠের ফল! এই যে দেখিতেছ, উনঃবিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক, পিতামাতাকে সম্মান করে না, পিতামাতাকে বাটীর দাস-দাসীর অপেক্ষা অবজ্ঞা করে, মুষ্টি-মেয় অন্ন দান করে বলিয়া, শত বার পিতামাতাকে অদৃষ্টচর, আশ্রুতপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ "উপকার" বুঝাইয়া দেয়, এ সকলি কুরুচি পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক পাঠের ফল!! এই যে দেখিতেছ, হিন্দু যুবক এখনও পৈতৃক ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করে, অথচ ওঙ্কারের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, ইহা ও কুরুচি পূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক পাঠের ফল!!! এই সকল শ্লোক পড়িয়াই বালকদিগের তরল মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইতেছে—হৃদয়ে দেব-ধর্ম্মের আভা না খেলিয়া, পশু-ধর্ম্মের তীক্ষ্ণালোকের বিকাশ হইতেছে। অতএব উঠ, জাগ ভ্রাতৃগণ! কালিদাসের মস্তক চর্ব্বণ কর, শ্রীহর্ষকে বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শ গর্ভে ডুবাইয়া দাও, ভারবীকে হিমালয়-তুঙ্গ-শৃঙ্গে উচ্চ ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দাও, দেখিবে

ভারতে ছাত্রদিগের মধ্যে নীতির ছড়াছড়ি হইবে—দুর্নীতির অঙ্কুশ মাত্রও দেখিতে পাইবে না।

"সুরুচি" রোগ "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" ব্যাধির ন্যায় বঙ্গে নূতন দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। যে রোগ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ছিল না, সে রোগের ঔষধও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাই—বলা বাহুল্য। "সুরুচি" রোগের ঔষধ পাইব কোথা হইতে? আমরা একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াছিলাম, তিনি স্থির কিছুই বলিতে পারেন নাই। তবে "লাঠৌষধি" পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে। যাহা হউক, কোন দেশে নব রোগের আবির্ভাব হইলে, দেশস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঔষধ আবিষ্কার ও রোগীকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদিগকে তজ্জন্য বিব্রত হইতে হইবে না।

সুরুচি-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির প্রকোপ মাতৃভাষার উপরই বেশী বলিয়া বোধ হয়। জল দেখিলে, কুক্কুর দংশিত ব্যক্তির যেমন জলাতঙ্ক রোগ বৃদ্ধি হয়—জলের উপকারিতা মনে থাকে না, সেইরূপ নবাবির্ভূত সুরুচি রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিরও সংস্কৃত শ্লোক দেখিলে ব্যাধি বৃদ্ধি হয়—সংস্কৃত শ্লোকের প্রতি ছত্রে প্রতীয়মান, ভাবের পূর্ণ বিকাশ, সৌন্দর্য্যের মন-মুগ্ধকর বিস্তার ও কবি কল্পনার চূড়ান্ত সীমা, একেবারে ভুলিয়া যায়। তদ্বিপরীতে কুরুচির ছড়াছড়ি দেখে ও ঘৃণায়, ক্ষোভে নাসিকা সঙ্কুচিত করে। যে সকল শ্লোক সুরুচি রোগগ্রস্তের ব্যাধি বৃদ্ধি করে; তাহাদের দুই একটী নমুনা আমরা পাঠকদিগের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা করি।

কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন :—

স সৈন্যপরিভোগেণ
গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ
শঙ্কনীয়ামিবাহকরোৎ॥

রঘুবংশ। ৪র্থ সর্গ। ৪৫ শ্লোক।

অর্থ:—সেই রঘু, (জলবিহারাদিতে) নিজ সৈন্যগণের উপভোগ দ্বারা এবং নিজ হস্তিগণের মদগন্ধ দ্বারা কাবেরী নদীকে (পরপুরুষ সম্ভোগে চিহ্নিতা রমণীর ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়া) যেন তদীয় পতি সমুদ্রের নিকট অবিশ্বাসিনী করিয়া দিলেন।

আর এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন :—

"তত্র স্বয়ংবরসমাহৃতরাজলোকম্
কন্যাললাম কমনীয়মজস্য লিপ্সোঃ।
ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ
নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী বভূব॥"

রঘুবংশ। ৫ম সর্গ। ৬৪ শ্লোক।

অর্থ:—সেই স্বয়ম্বর সভায় সমস্ত রাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন; অজ সেই কমনীয় কন্যারত্ন লাভের জন্য সমুৎসুক থাকায়, রাত্রিকালে নিদ্রা, পতির অভিপ্রায় বোধে অসমর্থা (অথবা পতির অন্য নায়িকায় আসক্তি দর্শনে কুপিতা) দয়িতার ন্যায় বহু বিলম্বে তাঁহার নয়নাভিমুখী হইল।

ভট্টিকাব্যকার ভট্টিকাব্যে লিখিয়াছেন—

"প্রভাতবাতাহতকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতী রেণুপিশঙ্গ বিগ্রহম্।

নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্ ॥
ভট্টিকাব্য। ২য় সর্গ। ৬ষ্ঠ শ্লোক।

অর্থ:—প্রভাত-বাতান্দোলিতা চঞ্চলগাত্রী ঈর্ষা-কষায়িতা হইয়াই যেন কুমুদ্বতী-পরাগ পিঙ্গলাঙ্গ ভৃঙ্গকে অপসারিত করিয়াছিল। মানিনী স্ত্রী পতির অন্য নারী-সঙ্গম কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

"উপমান" ও "উপমেয়" লইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্য কবিরা যেরূপ খেলা খেলিয়াছেন—"উপমান"ও "উপমেয়" লইয়া কাব্যোদ্যানের সৌন্দর্য্য যেরূপ বৃদ্ধি করিয়াছেন, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায়, যে কোন দেশের কোন কবিই তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই সকল শ্লোক পড়িলে, ছাত্রেরা কেন নৈতিক বল হারাইবে, তাহা—মূর্খ আমরা—বুঝিতে পারি না। পাঠক এরূপ শ্লোকে কুরুচি খুঁজিয়া পায় না; এই সকল শ্লোক পড়িতে পড়িতে. ভাবে বিভোল হইয়া, আত্মহারা হইয়া, কল্পনার রাজত্বে ঘুরিতে থাকে—আর বুঝিতে পারে, "তুমি-আমি-যাদু-মাধু" প্রভৃতি "নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী"র কবিগণ (?) কবিত্ব শক্তি অভাবে ছন্দ লইয়া ছেলে খেলা করি, বড় জিনিষকে ছোট করিয়া কবিত্ব শক্তি (?) দেখাই, "সুন্দরকে" কালি কাগজের মধ্যে ফেলিয়া অসুন্দর করিয়া ফেলি। কিন্তু "কালিদাস" প্রভৃতি প্রকৃত কবিগণ ছোটকে বড় করিতেন—অসুন্দরকেও সুন্দর করিতেন—মানব উপহাসাস্পদবস্তুতেও মানবের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেন। কবি ছিলেন তাঁহারাই—তাঁহারাই কাব্যের চূড়ান্ত বিকাশ ও পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহারাই কবি—"তুমি-আমি-যাদু মাধু" তদ্বিপরীত। তাঁহারা বীণার ঝঙ্কারে লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন—"তুমি-আমি-যাদু-মাধু" প্রভৃতি ছন্দে লোক হাসাই বইত না।

এক্ষণে সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়িয়া, ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। ইংরাজী সাহিত্য 'সুরুচি' পূর্ণ—কুরুচির লেশ মাত্র নাই—আছে মাত্র সুরুচির মলয় সমীরান্দোলিত মৃদু মধুর সুগন্ধ।

"টেনিসন্" ইংলণ্ডের—"পয়েট লরিয়েট"—শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি লিখিয়াছেন;—

"Ah me, my mountain shepherd,
that my arms
Were wound about thee,
and my hot lips prest
Close, close to thine
in that quick-falling dew
Of fruitful kisses, thick as
Autumn rains
Flash in the pools
of whirling Simois."
Œnone.

আহা কি সুন্দর ভাব! কি সুরুচির সুগন্ধ!! "চুম্বনের" কি প্রাণোন্মত্তকারিণী বর্ণনা!!! একে "চুম্বন" পৃথিবীর সার জিনিষ—তায় আবার পবিত্র চুম্বন—সোণায় সোহাগার সম্মিলন! এই প্রেমপূর্ণ "চুম্বনের" (ভ্রাতৃপ্রেমোদ্ভূত চুম্বন কি?) বর্ণনা দেখিয়া, কবির পদ চুম্বনে ইচ্ছা হয় না কি? হয়

বৈকি। একে প্রেম (ভগিপ্রেম ?)—তায় চুম্বন—তায় বর্ণনার ঘটা—ভক্তিবশে হৃদয় আপ্লুত না হওয়াই আশ্চর্য্য।

পাঠক! এইবার অন্ধকবি মিলটনের দুই একটী নমুনা দেখুন। মিলটন্ "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখিয়াছেন ;—

"Amazement seized
All the host of Heaven ;
back they recoiled afraid
At first, and called me *Sin*,
and for a sign
Portentous held me ;
but, familiar grown,
I pleased, and with attractive
graces won
The most averse—thee chiefly,
who, full oft
Thyself in me thy perfect
image viewing,
Becam'st enamoured ; and
such joy thou took'st
With me in secret that my
womb conceived
A growing burden."

Paradise Lost. Bk. II.

প্রতি ছত্রে সুরুচি ! সুরুচি !! সুরুচি !!!
কবি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

I fled, and cried out *Death* !
Hell trembled at the hideous
name, and sighed
From all her caves, and back
resounded *Death* !
I fled ; but he pursued (though
more, it seems,
Inflamed with lust than rage),
and, swifter far,
Me overtook, his mother,
all dismayed,
And, in embraces
forcible and foul
Engendering with me,
of that rape begot
These yelling monsters,
that with ceaseless cry
Surround me, as thou saw'st—
hourly conceived
And hourly born,
with sorrow infinite
To me."

(P. L.) Bk. II.

পাঠক! এই কবিতায় কুরুচির গন্ধমাত্র পেলেন কি? প্রতি কথায় সুরুচি—সুরুচি ; সুরুচি ছাড়া কিছুই নাই।

"ড্রাইডেন" ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"In pious times, ere priest-
craft did begin,
Before polygamy
was made a sin,
When man on many
multiplied his kind,

Ere one to one was
cursedly confined,
When nature prompted
and no law denied
Promiscuous use of concu-
bine and bride
Then Israel's monarch after
Heaven's own heart
His vigorous warmth
did variously impart
To wives and slaves, and, wide
as his command,
Scattered his Maker's image
through the land.
Michal, of royal blood,
the crown did wear,
A soil ungrateful to the
tiller's care :
Not so the rest ;
for several mothers bore
To god-like David
several sons before.
But since like slaves his bed
they did ascend
No true succession could
their seed attend."

Absalom and Achitophel.

পাঠক ! মনে রাখিবেন "*Absalom and Achitophel*" সময়ে সময়ে এম্, এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয়।

পাঠক ! সুরুচির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেন—এই বার উচ্চতর সোপানে উঠিবেন আসুন। ড্রাইডেন লিখিয়াছেন ;—

"The dame herself the goddess
well expressed,
Not more distinguished
by her purple vest
Than by the charming
features of her face,
And, even in slumber,
a superior grace :
Her comely limbs composed
with decent care,
Her body shaded with a
slight cymarr ;
Her bosom to the view
was only bare :
Where two beginning paps
were scarcely spied,
For yet their places were
but signified ;
The fanning wind upon
her bosom blows,
To meet the fanning wind
the bosom rose ;
The fanning wind and purling
streams continue
her repose."

Cymon and Iphigenia.

পাঠক ! উচ্চতর সোপানে উঠিলেন। এই বার উচ্চতম সোপানে উঠিবেন আসুন। ড্রাইডেন্ লিখিয়াছেন ;—

"The garden, seated
on the level floor,
She left behind, and
locking every door,
Thought all secure ; but little
did she know,
Blind to her fate, she had
enclosed her foe.
Attending Guiscard in his
leathern frock
Stood ready, with his
thrice repeated knock :
Thrice with a doleful sound
the jarring grate
Rung deaf and hollow, and
presaged their fate.
The door unlocked, to known
delight they haste,
And panting, in each other's
arms embraced,
Rush to the conscious bed,
a mutual freight,
And heedless press it with
their wonted weight.
The sudden bound awaked
the sleeping sire,
And showed a sight
no parent can desire ;
His opening eyes at once
with odious view
The love discovered,
and the lover knew :
He would have cried ; but
hoping that he dreamt,
Amazement tied his tongue,
and stopped the attempt.
The ensuing moment all the
truth declared,
But now he stood collected
and prepared ;
For malice and revenge had
put him on his guard.

* * * *

"The thoughtless pair, indulg-
ing their desires,
Alternate kindled and then
quenched their fires ;
Nor thinking in the shades
of death they played,
Full of themselves, themselves
alone surveyed,
And, too secure, were by
themselves betrayed.
Long time dissolved in pleasure
thus they lay,
Till nature could no more
suffice their play ;
Then rose the youth, and
through the cave again
Returned ; the princes mingled
with her train."

Sigismonda and Guiscardo.

বিদ্যাসুন্দরের "বিহার-বর্ণনার" জন্য সুরুচি প্রিয় বাবুরা "ভারতচন্দ্রের" উপর খড়্গ হস্ত ; কিন্তু তাঁহাদিগের পূজ্য-গুরু "ড্রাইডেন" সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিতে চান ? ড্রাইডেন ভারতচন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছেন—এক বিষয়ে ; তিনি নায়িকার "শয়ন-গৃহে" তাঁহার পিতাকে নামাইয়াছেন—পিতাকে কন্যার ও কন্যার প্রেমিক-প্রাণনাথের "বিহার" দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এতদূর "বেল্লিক-পানা" করিতে পারেন নাই। ধন্য ড্রাইডেন—ধন্য তুমি!

"বাবুরা" যাহাকে "কুরুচি" বলেন, সে "কুরুচি"সকল সাহিত্যেই আছে। তবে সুখের বিষয়, ইংরাজী সাহিত্যে যেরূপ খোলাখুলি-ভাব, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ কিছুই নাই। তবু "বাবুরা" সংস্কৃত সাহিত্যে দোষ দেখেন—ইংরাজী সাহিত্যে গুণ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। নিজের 'মা'তে কেবল দোষ দেখেন—পরের 'মা'র কথা পাড়িলে, মুখ দিয়া আহ্লাদে 'লালা' গড়াইতে থাকে। "বাবুদের" দোষ দিই বা কিরূপে ? দোষ বাবুদের নয়—দোষ বাবুদের শিক্ষার, আর লেখকের দগ্ধভাগ্যের!

যেরূপ কাল পড়িয়াছে, বোধ হয়, কুরুচির দুর্গন্ধ ভারত হইতে শীঘ্রই অপনীত হইবে ও সুরুচির সুগন্ধ 'ফুর্ ফুর্' করিয়া বহিতে থাকিবে। "বাবুরা" হয়ত দিন কয়েক পরে বাঙ্গালীর কাপড় চাদরে কুরুচি দেখিবেন, বাঙ্গালীর খাওয়ায়, বসায় কুরুচি দেখিবেন ; বিবাহ প্রথায় কুরুচি ত পূর্ব্বেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী-বালক! পিতা মাতাকে আর "বাবা", "মা" বলিয়া ডাকিও না—"পাপা" ও "মাম্মা" বলিয়া ডাকিও—কারণ "বাবা" ও "মা" শব্দদ্বয়ে সুরুচি-প্রিয় বাবুরা কুরুচির গন্ধ অনুভব করিতে পারেন—হয়ত কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই অনুভব করিতেছেন। বসন্তের সমীরণ! তুমি আর 'ঝির্ ঝির্' করিয়া বহিও না—"বাবুরা" তোমাকে দেখিলেই শিহরিয়া উঠেন। বিদ্যাপতি! চণ্ডীদাস! গোবিন্দদাস! তোমরা "পুস্তকাধার" মধ্যে কীট-দংশন যন্ত্রণায় অস্তিত্বহীন হও—তোমাদের দেখিলে বাবুদের গায়ে জ্বর আসে—রোগ বৃদ্ধি হয়। আর বসন্তের কোকিল! তোমায় আর কি বলিব ? তুমি আর কুহু কুহু ডাকে বিরহী বিরহিণীর বিরহব্যথা বাড়াইও না। যদি ভাল চাও ত ভারত ছাড়িয়া শীঘ্র পলাও। নহিলে "বাবুরা" ভলণ্টিয়ার হইলে, সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগের উপর 'গুলি' চালাইবেন।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।



বাইবেল-সমালোচনা।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ঞ), মরিয়ম কি পর্দ্দানিসিন্ কুলবালা ছিলেন? অথবা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের ন্যায়, পদব্রজে মাঠে ঘাটে ও হাটেবাজারে বেড়াইতেন? মরিয়ম আত্মীয়-স্বজন-হীনা ও প্রবাসিনী ছিলেন। তিনি দরিদ্রা ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা নিজের উপজীবিকা নিজে উপার্জ্জন করিতে হইত; সুতরাং তাঁহার দাস দাসী থাকা কখনই সম্ভব নহে; বরং তাহাকে নিজের উপজীবিকা উপার্জ্জন করিবার জন্য যে নিশ্চয়ই পদব্রজে রাজপথে ও হাটেবাজারে যাইতে হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা মরিয়মের গর্ভধারণের পরেই নাসরৎ হইতে য়িহুদিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রায় ৮০ মাইল দূরে তাঁহার জ্ঞাতি ইলীশাবেতের বাটীতে পদব্রজে গমন, তিন মাসের গর্ভাবস্থায় তথা হইতে নাসরতে পুনরাগমন, পূর্ণ গর্ভাবস্থায় নাসরৎ হইতে য়িহুদিয়ার বৈৎলেহম নগরে প্রায় ৭০ মাইল গমন, এবং নবপ্রসূতি অবস্থায় য়িহুদিয়ার বৈৎলেহম হইতে আফ্রিকার মিসরে পলায়ন, এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মরিয়মের কায়িক শক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণুতা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে—**মরিয়ম পর্দ্দানিসিন্ কুলবালা ছিলেন না—তিনি নীচবংশায়া নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের ন্যায় সর্ব্বদা মাঠে ঘাটে ও হাটে বাজারে পদব্রজে বেড়াইতেন।**

যে জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া, মথি ও লূক যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতির মূলে আমরা যে চারিজনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে যীশুর মাতা মরিয়মের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব দেখাইলাম। এক্ষণে অবশিষ্ট তিন জনের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

দ্বিতীয়—'ইলীশাবেৎ'। ইলীশাবেৎ, মরিয়মের জ্ঞাতি-ভগিনী ছিলেন; এবং আমরা লূক ১,৫ পড়িয়া অবগত হই যে ইলীশাবেৎ হারোণের বংশোদ্ভবা ও যাজক-পত্নী ছিলেন; লূক ১;৭ পড়িয়া জানিতে পারি যে ইলীশাবেৎ চিরবন্ধ্যা ছিলেন; লূক ১;২৪ পাঠে দেখিতে পাই যে তিনি গর্ভবতী হইলেন! "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ কথা যে কেবল হিন্দুরাই বলিয়া থাকেন তাহা নহে—পূর্ব্বকালে য়িহুদিয়াদিগের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রীগণ সন্তান উৎপাদন ও বংশ রক্ষার্থে অতিশয় যত্নবান

ও যত্নবতী ছিলেন। এমন কি, স্বামীর বংশ রক্ষার্থে অব্রামের স্ত্রী অব্রামের সহিত তাঁহার দাসীকে শয়ন করাইতে সঙ্কুচিতা হন নাই—(আদি পুস্তক ১৬;২,৩); এবং পিতৃবংশ রক্ষা করিতে লোটের কন্যাগণ পিতৃ সহবাস পর্য্যন্ত করিতে লজ্জা বা ঘৃণাবোধ করেন নাই, সুতরাং ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত মনোকুষ্টে কালযাপন করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। সচরাচর দেখা যায় যে বন্ধ্যা নারীগণ আত্মীয় স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ ও সন্তান হওন সংবাদে আহ্লাদে একেবারে নাচিয়া উঠে এবং সেই গর্ভ ও সন্তান যেরূপে হউক না কেন, রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবতী হয়। ইলীশাবেৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত বন্ধ্যা থাকাতে তাঁহারও যে সেইরূপ স্বভাব হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং ইলীশাবেৎ, মরিয়মের জ্ঞাত-ভগিনী হওয়াতে **মরিয়মের গর্ভ ও গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি ইলীশাবেতের বিশেষ মমতা ছিল।**

তৃতীয়,—'সখরিয়'। সখরিয় একজন যাজক ছিলেন। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যাজক ও পুরোহিতগণের মধ্যে অধিকাংশই যে মিথ্যা-বাদী, শঠ, প্রতারক ও বুজরুক হইয়া থাকেন তাহা বহুদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, সাধু, সরলচিত্ত ও নিস্কপট যাজক ও পুরোহিত অতি বিরল। সখরিয় এই দুয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর যাজক ছিলেন তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ বৃদ্ধাবস্থায় গর্ভিণী হওয়াতে এবং সেই সময়ে, যে কোন কারণেই হউক, সখরিয় বাক্‌শক্তিহীন হওয়াতে তিনি যে তাঁহার স্ত্রীর বশীভূত হইতে একান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা কে না বিশ্বাস করিবে? সুতরাং **সখরিয়' সেই সময়ে নানা প্রকার অবস্থার অধীন হইয়া তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেতের ও তাঁহার শ্যালিকা মরিয়মের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।**

চতুর্থ,—'যোষেফ'। যোষেফ একজন সামান্য সূত্রধর ছিলেন এবং মরিয়মের প্রণয়ে পড়িয়াই হউক, দরিদ্রতা বশতঃই হউক অথবা অপর যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার নিজদেশ যিহুদিয়াস্থ বৈৎলেহম পরিত্যাগ করিয়া গালীলস্থ নাসরৎ নগরে আসিয়া প্রবাসী হইয়াছিলেন। যোষেফের দেশে তাঁহার ঘর বাড়ী ছিল না এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজনও ছিলেন না। কেহ থাকিলেও হয় ত যোষেফের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না অথবা তাঁহার অবস্থা এত মন্দ ছিল যে তাঁহার বাটীতে অতিরিক্ত দুই জনের স্থানও ছিল না। যোষেফের স্বদেশে যদি যোষেফের বা মরিয়মের অথবা তাহাদের কোন সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়ের ঘর বাড়ী থাকিত তাহা হইলে আগস্ত কৈসরের আজ্ঞানুসারে যোষেফ ও মরিয়ম যখন বৈৎ-লেহমে স্বদেশে গিয়াছিলেন তখন তাঁহারা নিজ বাটীতে অথবা কোন আত্মীয়ের বাটিতে থাকিতেন। পূর্ণগর্ভা মরিয়মকে লইয়া যোষেফ স্থানাভাবে উত্তরণীয় গৃহে অর্থাৎ 'চটি'তে থাকিতেন না এবং নবজাত

শিশু যীশুকে যাবপাত্রে শয়ন করাইতেন না। যোষেফ যে অজ্ঞাত-কুল-শীলবিশিষ্ট এক জন সামান্য দরিদ্র লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মথি ১; ৭—১৬ পড়িলে দেখা যায় যে যোষেফ 'শলোমনের' বংশোদ্ভব; কিন্তু লূক ৩; ২৩—৩১ পড়িলে দেখা যায় যে ঐ যোষেফ 'নাথনে'র বংশোদ্ভব। নাথন শলোমনের সহোদর ছিলেন। মথি ১; ১৬ পদে লেখা আছে যোষেফের পিতার নাম 'যাকোব'; কিন্তু লূক ৩; ২৩ পাঠে জানা যায় যে ঐ যোষেফের পিতার নাম 'এলি'। যোষেফ এক জন খ্যাত নামা ব্যক্তি হইলে তিনি কাহার সন্তান, অন্ততঃ তাঁহার পিতার নাম কি ছিল এই বিষয়ে মথি ও লূক দুই জন সুসমাচার লেখকের লেখায় অনৈক্য হইত না। শলোমন ও নাথন যে এক ব্যক্তির নাম নহে এবং যাকোব ও এলি যে স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। যাহা হউক, আমরা বাইবেল হইতে যোষেফের সম্বন্ধে যতটুকু আভাস ও ইঙ্গিত পাইয়াছি তাহা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, **যোষেফ এক জন অজ্ঞাত-কুল-শীল, আত্মীয়-স্বজন-বিহীন, মূর্খ, দরিদ্র ও প্রবাসী ছুতার মিস্ত্রি ছিলেন।**

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক এই চারি জনের মধ্যে কাহার কথা কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

(১ম) মরিয়মের কুমারী অবস্থায়, বিশেষতঃ যখন এক জনের সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই বিবাহ হইবে, এমন সময়ে মরিয়মের গর্ভ হইল—মরিয়ম বুঝিতে পারিলেন তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—তিনি প্রমাদ গণিলেন, বুঝিলেন বিষম বিপদ, বড়ই লজ্জা—(লজ্জায় না তো কিসে?) লজ্জায় তিনি যোষেফকে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। মরিয়ম আপনাকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়াই, বাইবেলে লেখা আছে, মরিয়ম গাত্রোত্থান করিয়া ত্বরায় (ইলীশাবেতের নিকট) গমন করিল। দুশ্চরিত্রা রমণীগণ স্বামী না থাকা অবস্থায় গর্ভ হইলে সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য প্রথমে কতই চেষ্টা করিয়া থাকে। গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার বিষাক্ত ঔষধ সেবন ও প্রয়োগ করিয়া, যাহার নিতান্ত কপালের জোর, সেই প্রাণ ও মান দুই রক্ষা করিতে পারে, নচেৎ অধিকাংশই মান বাঁচাইতে গিয়া হয় প্রাণ হারায় অথবা কোন বিষাক্ত ঔষধের প্রভাবে যাবজ্জীবনের মত স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ বিষাক্ত ঔষধ পাইবার সুবিধা না ঘটিলে অথবা বিষাক্ত ঔষধ সেবন করিতে সাহস না হইলে, গর্ভ গোপন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পাণ্ডু, উদরী, গুল্ম প্রভৃতি কত রোগের দোহাই দেয় এবং সেই সেই রোগের প্রতিকারার্থে তীর্থাদি দর্শনের ছলনা করিয়া পূর্ণকালে প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত কোন অপরিচিত স্থানে গিয়া অজ্ঞাতবাস করে। কিন্তু ঐ গর্ভ যদি গোপন করিতে না পারে—ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও "অমুক মৃত ব্যক্তি

মধ্যে মধ্যে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিত।”—“স্বপ্নে দেখিতাম যেন অমুক ঠাকুর বা অমুক দেবতা আমার কাছে আসিয়া শয়ন করিত।” ইত্যাদি ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা বলিয়া সকলের অবিশ্বাস ভাজন ও হাস্যাস্পদ হয়, তত্রাপি একটা জীবিত ব্যক্তির নাম পারকপক্ষে করে না। পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভ হওয়া, মরিয়মকে গাব্রিয়েল দূতের দর্শন দেওয়া ও তাঁহার গর্ভ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা প্রভৃতি কথা কেবল মরিয়মের মুখে শুনিয়া কে বিশ্বাস করিতে পারে? সুসমাচার লেখক, মথি ও লূক গাব্রিয়েল দূতকে মরিয়মের নিকটে আসিতেও দেখেন নাই এবং মরিয়মের সহিত গাব্রিয়েল দূতের কথাবার্ত্তাও শ্রবণ করেন নাই। মরিয়মের সহিত গাব্রিয়েল দূতের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহা মরিয়ম ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিবার বিষয় বাইবেলে কোন স্থানে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে একা মরিয়মের কথাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যৌবন বিষম কাল, যৌবনের প্রারম্ভে রিপু সকল বর্ষাকালীন স্রোতস্বতীর ন্যায় নরনারীদিগকে প্রবল বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। রিপুর প্রাবল্যে মনুষ্য একেবারে হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি বিহীন অন্ধ ও পশুতুল্য হয়। মরিয়ম পূর্ণ যুবতী, তাহাতে আবার তাঁহার অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তিনি যে এরূপ পরীক্ষায় না পড়িতে পারেন তাহা কে বলিতে পারে? যোষেফের সহিত মরিয়মের অনেক দিন পর্য্যন্ত আলাপ পরিচয় ছিল, এক্ষণে তাঁহারই সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, সুতরাং মরিয়ম যোষেফকে যে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন এবং যোষেফ তাঁহাকে বিবাহ না করিলে বা ঘৃণা করিলে অথবা ভাল না বাসিলে মরিয়ম যে জগৎ অন্ধকার দেখিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মরিয়মের গর্ভ অপর কোন্ পুরুষের সহিত গুপ্ত প্রণয় দ্বারাই হউক, অথবা যোষেফের অজ্ঞাতসারে! যোষেফের দ্বারাই হউক মরিয়ম, যোষেফের নিকটে নিজের লজ্জা নিবারণ ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য এবং যোষেফের ভালবাসা পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিবার জন্য যে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার দিয়া মিথ্যা কথা বলিবেন ও অলীক গল্প সাজাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? মরিয়ম যেরূপ অবস্থার ও প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে আবার সম্প্রতি যে বিপদে পড়িয়াছেন তাহাতে পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিরাই মিথ্যা কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না, কুমারী মরিয়ম কোন্ ছার! আমরা বাইবেল পাঠে অবগত হই যে, বিশ্বাসীদিগের পিতা নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক ঈশ্বরভক্ত ‘অব্রাম্’ মিথ্যা কথা কহিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যথা—“অনন্তর দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অব্রাম মিসরে প্রবাস করিতে যাত্রা করিল, কেন না [কনান] দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। পরে মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে অব্রাম নিজ পত্নী সারাকে কহিল, দেখ,

আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; এ কারণ মিস্রীয় লোকেরা তোমাকে দেখিয়া, তুমি আমার ভার্য্যা বলিয়া, আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবিত রাখিবে। অতএব বিনয় করি, তুমি আমার ভগিনী, এই কথা কহিও, তাহাতে তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমা হেতু আমার প্রাণ বাঁচিবে।” (আদি পুস্তক ১২; ১০—১৩) “অব্রামের স্ত্রী সারাও স্বামীর কথায় সম্মত হইয়া, অব্রামের ভগিনী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া ফরৌণ রাজাকে বিবাহ করিতেও আপত্তি করেন নাই। আদি পুস্তক ১২; ১৬। ঐ সারা অতি সামান্য কারণে আর একটি মিথ্যা কথা কহিয়াছিল—বাইবেলে তাহারও উল্লেখ আছে। যথা—“তাহাতে সারা মিথ্যা করিয়া কহিল আমি হাসি নাই; কেননা সে ভয় পাইল। কিন্তু তিনি [সদাপ্রভু] কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলা।” আদি পুস্তক ১৮; ১৫। ‘যাকোব’ ঈশ্বরের মনোনীত বংশের পিতা, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং ঈশ্বরের দূতের সহিত মল্ল যুদ্ধে জয়ী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে প্রবঞ্চনা করিয়া জ্যেষ্ঠাধিকার লইবার জন্য তাহার পিতার নিকটে অনেকগুলি মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন। যথা—যাকোবের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে বৎস, তুমি কে?” যাকোব আপন পিতাকে কহিল, “আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ” ইত্যাদি। আদি পুস্তক ২৭; ১৮, ১৯। ‘দায়ূদ’ এক জন ঈশ্বরের পরমভক্ত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত ‘গীত’ রচক ও রাজা ছিলেন। কিন্তু আমরা ২য় শমূয়েল ১১, ২—১৭ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে দায়ূদ তাঁহার এক জন যোদ্ধার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন; তাহাতে সেই স্ত্রীলোকের গর্ভ হওয়াতে দায়ূদ নিজের দোষ আচ্ছাদন করিয়া উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে চাপাইবার জন্য উক্ত যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনাইয়া তাহার স্ত্রীর সহিত এক রাত্র শয়ন করাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিরাছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃত কার্য্য না হওয়াতে দায়ূদ উক্ত যোদ্ধাকে কৌশলে বধ করাইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টের মনোনীত দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে পিতর, যাকোব ও যোহন এই তিন জন শিষ্য খ্রীষ্টের অতি প্রিয় ছিলেন। পিতর নামের অর্থ প্রস্তর এবং পিতর খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে প্রস্তরবৎ দৃঢ় ও অটল ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু খ্রীষ্ট যখন শত্রু হস্তে সমর্পিত হইলেন এবং পীলাতের নিকটে যখন খ্রীষ্টের বিচার হইতেছিল তখন ঐ পিতর নিজের প্রাণ ও মান রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন দেখুন:—খ্রীষ্টকে যখন পীলাতের বাটীতে বিপক্ষেরা তিরস্কার প্রহার ও অপমান করিতেছিল সেই সময়ে পিতর বাহিরে প্রাঙ্গনে বসিয়াছিল, তাহাতে এক দাসী তাঁহার (পিতরের) নিকটে গিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে (পিতর) সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিল, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাল না। অপর

সে বহির্দ্বারের নিকটে গেলে আর এক দাসী তাহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ও সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তাহাতে সে দিব্য পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি সেই মানুষকে চিনি না। আর কিঞ্চিৎ কাল পরে দণ্ডায়মান লোকেরা আসিয়া পিতরকে কহিল, অবশ্য তুমিও তাহাদের একজন, কেননা তোমার তোমার ভাষা তোমাকে ব্যক্ত করিতেছে। তখন সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া কহিতে লাগিল আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।" মথি ২৬;৬৯—৭৪।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক নাই—পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে নিজের প্রাণ ও মান অপেক্ষা প্রিয় ও বহুমূল্য সামগ্রী মনুষ্যের কিছুই নাই এবং এই প্রাণ ও মান রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য করিতে পারে না এমন পাপ নাই, মিথ্যাকথা সামান্য কথা। আবার কাহারও কাহারও বিবেচনায় 'প্রাণ' অপেক্ষা 'মান' শ্রেষ্ঠ, এই জন্য অনেকে 'মান' হারাইবার ভয়ে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে। কুমারী মরিয়মের বিবাহে পূর্ব্বে গর্ভ হওয়াতে তিনি যে এই মানের দায়ে ঠেকিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মরিয়মের যে কেবল মানের দায় ঘটিয়াছিল তাহা নহে—মরিয়ম প্রাণের দায়েও পড়িয়াছিলেন; কারণ সেই সময়ে মোশির ব্যবস্থানুসারে যিহুদিয়-দিগের বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা হইত। আর মোশির ব্যবস্থায় কি লেখা আছে দেখুন—"যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুই জনকে বাহির করিয়া নগর-দ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরা-ঘাতে বধ করিবা; কেননা নগর মধ্যে থাকিলেও সেই কন্যা চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষ আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে।" দ্বিতীয় বিবরণ ২২;২৩, ২৪। মরিয়ম এরূপ অবস্থায় পড়িয়া নিজের মান ও প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে মিথ্যা কথা কহিতে ও অদ্ভুত গল্প রটাইতে পারেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে মরিয়মের কোন কথাই বিশ্বাস যোগ্য বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

(২য়) ইলীশাবেৎ মরিয়মের জ্ঞাতি ভগিনী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ মরিয়মকে বড় ভাল বাসিতেন, কারণ মরিয়ম আপনাকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়াই, যোষেফকে বা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া ত্বরায় ইলীশাবেতের নিকটে গিয়াছিলেন এবং ইলীশাবেৎ তাঁহাকে তিন মাস পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে রাখিয়াছিলেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, স্বামী হীনার গর্ভ হইলে, মা, মাসী ও ভগিনীরাই গর্ভিণীকে মানের ও প্রাণের দায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ভগিনীকে বিশেষতঃ জ্ঞাতি-ভগিনীকে মনের সকল নিগূঢ় কথা যেমন খুলিয়া বলিতে পারে, তেমন আপন মা মাসীকে অথবা অপর কোন আত্মীয়কে খুলিয়া বলিতে পারে না, সেই কারণেই হউক অথবা ইলীশাবেৎ ভিন্ন

মরিয়মের আর অন্য কোন আত্মীয় না থাকাতেই হউক, তিনি আপনাকে গর্ভিণী বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার জ্ঞাতি-ভগিনী ইলীশাবেতের শরণ লইয়াছিলেন। মরিয়ম ইলীশাবেতের নিকটে গিয়া, পবিত্র আত্মা কর্তৃক তাঁহার গর্ভ হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন, অথবা কোন মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার গর্ভ হইয়াছে বলিয়া সেই দায় হইতে উদ্ধারার্থে ইলীশাবেতের পায়ে জড়াইয়া ধরাতে,ইলীশাবেৎ মরিয়মকে, 'পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভ হইয়াছে ও গাব্রিয়েল দূত দর্শন দিয়া গর্ভের সংবাদ জানাইয়া গিয়াছে' প্রভৃতি বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা অসাধ্য; কিন্তু ইলীশাবেৎ যাজক-পত্নী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার স্বামীর নিকট ঐ প্রকারের অনেক বুজরুকি ও অনেক কথা শিখিয়াছিলেন সুতরাং জ্ঞাতিভগিনী এই বিপদ মুক্ত করিবার জন্য তিনি যে মরিয়মকে ঐরূপ একটা অপূর্ব্ব কাহিনী শিখাইয়া দিতে পারেন তাহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, মরিয়ম ইলীশাবেতের জ্ঞাতি-ভগিনী হওয়াতে এবং মরিয়মের গর্ভ হইবার অব্যবহিত পরে মরিয়মকে তিন মাস পর্য্যন্ত আপন আলয়ে রাখাতে. পবিত্র আত্মা কর্তৃক কুমারী মরিয়মের গর্ভে যীশুখৃষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইলীশাবেতের কোন কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

(৩য়) সখরিয় ইলীশাবেতের স্বামী এবং মরিয়মের ভগিনীপতি ছিলেন। একে ত স্ত্রীর ও শালার অনুরোধ অবহেলা করা কতদূর কঠিন তাহা সকলেই জানেন,তাহাতে আবার ইলীশাবেৎ বৃদ্ধাবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছেন—সখরিয়ের বংশ রক্ষা করিবেন—সখরিয়ের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন—তাহার উপর.আবার যে কোন কারণেই হউক, এই সময়ে সখরিয় বাক্‌শক্তিহীন হইয়াছেন আকার ইঙ্গিতেই সমুদায় প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়—ইলীশাবৎ এক দণ্ড কাছে না থাকিলে সখরিয়কে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হয়—এমন অবস্থায় ইলীশাবেৎ সখরিয়কে যিরূশালোমের মন্দিরের চূড়াটা ভাঙ্গিয়া আনিতে অনুরোধ করিলে সখরিয় বোধ হয় তাহাতেও অসম্মত হইতেন না—এ হেন অবস্থায় সখরিয় শালীর মান ও প্রাণ বাঁচাবার জন্য স্ত্রীর অনুরোধে যে একটা মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না তাহা কি কখন হইতে পারে? সুতরাং ঈদৃশ অবস্থাপন্ন যাজক সখরিয়ের মুখে যীশু খ্রীষ্টের অসাধারণ জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া কখনই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

(৪র্থ) যোষেফ অনেক দিন পর্য্যন্ত মরিয়মকে ভাল বাসিতেন। এক্ষণে যোষেফের সহিত মরিয়মের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হওয়াতে মরিয়মের প্রতি যোষেফের একটা বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এমন সময়ে মরিয়ম হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হওয়াতে যোষেফ মণিহারা ফণীর মত,বৎস হারা গাভীর মত,মরিয়মকে যে কুত স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং কত দিবস যে তাঁহার অনাহার বা একাহার হইয়াছিল এবং কত রাত্র যে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, তাহা নবানুরাগী বিরহী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। বিচ্ছেদ,

প্রণয়রূপ বৃক্ষের বর্ষা কালীন জল এবং বিচ্ছেদের পরে মিলন, তাহার সুমিষ্ট ফল। বিচ্ছেদকালে বিরহী ও বিরহিনী পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অনেক বচসা ও দোষারোপ করিতে পারে, এবং এক জন অন্য জনকে পরিত্যাগ করিবার মানসও করিতে পারে; কিন্তু তৎপরে যদি মিলন হয় তাহা হইলে উভয়ে পূর্ব্বের সকল দুঃখ ও কষ্ট ভুলিয়া যায় এবং উভয়ের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হওয়াতে পরস্পর পরস্পরের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভাল বাসে। যোষেফ তিন মাস পর্য্যন্ত মরিয়মের নিমিত্ত অকথ্য বিরহ যাতনা ভোগ করিয়া যখন পুনরায় মরিয়মকে পাই লেন তখন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। চাঁদে যতই কলঙ্ক থাকুক না কেন,আকাশের চাঁদ হাতে পাইলে কে তাহা ছাড়িয়া দিতে চায়? যোষেফ তিন মাস বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরে মরিয়মকে পাইয়া এমনই প্রেমোন্মত্ত ও প্রণয়ান্ধ হইলেন যে মরিয়মকে শেষে গর্ভিণী জানিতে পারিয়াও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মূর্খ যোষেফ ঈদৃশ অবস্থায় মরিয়মের প্রত্যেক কথা যে বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন অথবা মরিরমকে মন হইতে দূর করিতে না পারিয়া তাঁহার কলঙ্ক আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত স্বপ্নে গাব্রিয়েল দূতের আদেশ পাই- বেন তাহা বিচিত্র নহে। অতএব পবিত্র আত্মার দ্বারা মরিয়মের গর্ভধারণ সম্বন্ধে যোষেফের কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, মথি ও লূক ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে বা খ্রীষ্টের, মরি- য়মের বা যোষেফের প্রমুখাৎ শুনিয়া খ্রীষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত লেখেন নাই, কিন্তু জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং ঐ জনশ্রুতির মূলে মরিয়ম ইলীশাবেৎ, সখরিয় ও যোষেফ ভিন্ন আর কেহ থাকিতে পারেন না। অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন, ঐ চারি জনের অথবা উহাদের মধ্যে কাহারও মুখে শুনিয়া বলিতেন। তৎপরে যখন প্রমাণ পাইতেছি যে ঐ জনশ্রুতির মূলে যে চারি জনকে দেখাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই খ্রীষ্টের আত্মীয় এবং খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ একটা মিথ্যা গল্প রটনা করিবার প্রচুর স্বার্থ ছিল, তখন উক্ত চারি জনের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে সুতরাং ঐ চারি জনের দ্বারা প্রচারিত যে জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া মথি ও লূক খ্রীষ্টের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন তাহাও কোন মতে বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না।

জনৈক খ্রীষ্টিয়ান তনয়।



ধনহীনের বিলাপ।

(৺কৈলাসচন্দ্র রায়-বিরচিত)

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং নদৃষ্টং কবিনাহি তেন
দারিদ্রদোষা গুণরাশিনাশী॥"

—কবিবাক্যং।

ব্যবসায়, হ'ল সায়, কি উপায় হবে?
দিবানিশি, ভাবি বসি, কিসে মান রবে!
দিন দিন, দশাহীন, তনুক্ষীণ ভেবে,
এ সংসারে, অনুসারে কেবা কারে দেবে?
অন্ন মোটা, বস্ত্র মোটা,—তাও যোটা দায়,
অবশেষ, এত ক্লেশ, বুঝি প্রাণ যায়।
'শুধু হাঁড়ি পাত বাঁধা,'—কত কাল কাটে?
ভাঁড় যোড়া ভার হ'ল, জল খাই ঘাটে!
ভাঁড়াভাঁড়ি বাড়াবাড়ি দেখে, মহাজন
ধার দিতে নাহি চায়; বলে 'অভাজন'।
শুধিতে না পারি আর যার করি ধার,
দীনভাবে, দিন যাবে, সেও'দেখি ভার!
ভিখারী ভবনে এলে ভাবিয়া আকুল;
'হাত-যোড়া, শুভাশৌচ, বাড়ান্ত তণ্ডুল,'—
বচনে বিদায় দিয়ে, পাই পরিতাপ,
ভিক্ষুক বঞ্চিত হ'লে জন্মে কত পাপ।
অশৌচান্তে, গ্রহণান্তে, ফেলে সবে হাঁড়ী,
কড়ি কোথা পাব ব'লে হাঁড়ি নাহি ছাড়ি।
দৈবযোগে ভাঙ্গে যদি, তবে কিন্তে হয়,
কি করিব চারা নাই, সে যে, নৈলে নয়।
ঘর খুঁজে মেলে না'ক এক কড়া কড়ি,
অন্ন বিনে ক্ষুণ্ণ সদা, উচোটেতে পড়ি।

সোণা দানা দশ খানা নাহি কিছু ঘরে,
পরিবার আপনার 'গালা' প'রে মরে।
নেই ঘরে খাঁই খাঁই,—সদা জ্বালাতন,
রাগ হ'লে, কলে ছলে করি সম্বরণ।
বনিতারে কটু কথা বলিতে ডরাই,
ভাত দিতে ভর্ত্তা নই, কীলের গোঁসাই!
ললনা নিকটে কভু না করি বড়াই,
পাছে বলে, "পাগমত",—সে বড় বালাই।
ভার্য্যা-হাতে ভাঙ্গে যদি এয়োতের খাড়ু,
ঢেকে রাখে হাত যেন ভিয়নের তাড়ু।
লোকে পাছে দেখে হাত, তাই রাখে ঢেকে,
সধবা বিধবা হ'ল পতি বেঁচে থেকে!
দারাসুত, দেখে কত মনে সাধ ওটে,
ফুক্ আছে, বাটী কাছে, দুধ্ নাহি যোটে!
খাবার জন্যেতে শিশু করে আব্দার,
কথায় ভুলায়ে তারে, রাখা হয় ভার।
যা ধরে তা ছাড়ে না'ক, "দাও, দাও" বলে,
অবশেষে কেঁদে শিশু পড়ে ভূমিতলে।
রমণী অমনি এসে কোলে লয় তুলে;
বলে, "বাছা কোথা পাব, ঘরে নাই মূলে।
একে মরি জ্ব'লে পুড়ে, কেঁদ না'ক আর,
ওই আসে ছেলেধরা, ঘুম' একবার।

কোথা কাণ-কাটা 'জুজু' আয় ঝপ্ ক'রে,
আমার কাঁদুনে ছেলে, নিয়ে যা রে ধ'রে।
অবোধ বালক নিয়ে হ'ল বড় দায়,
ঘুম্পাড়ানী মাসি, পিসি,আয় চোকে আয়।"
খেতে চেলে, নাহি পেলে, হবে কেন ঘুম;
যে ক'রেছে কোলে তারে,সে যে করে ধুম;—
"আমা হ'তে হ'ল না'ক,ছেলে শান্ত করা।
সত্যি কি প'ড়েছি এত চোরদায়ে ধরা?
যা বাছা! ওদের কাছে, যা চাবি তা পাবি!
তাই শুনে, মনে মনে, কতশত ভাবি।
এ সময়ে আমি যদি কোন কথা বলি,
স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব হবে,লোক ঢলাঢলি।
র'য়েছি সংসারে ডুবে, কিন্তু নাই টাকা,
চক্ষু গিয়ে, দেহ নিয়ে, সে যেমন থাকা।
নিমন্ত্রণে, হৃষ্টমনে যায় রামাগণ,
নানা রঙ্গে পরে তারা বসন ভূষণ।
তা' সবার সঙ্গে যদি মম জায়া যায়,
ছিন্নবাসে রুক্ষকেশে, মর্ম্মে ব্যথা পায়।
কোন নারী দেখে বলে,"ক্যান্‌লা হেন দশা?
সে কি ভাল বাসে না'ক, বুঝি বড় কশা।
যা হোক তা হোক ব্যানে এমন্তো দেখি নে,
তোলা-শাড়ী একখানি দিতে নারে কিনে!"
"মিন্সে বড় অগোছাল", কোন বামা কয়,—
"টাট্‌কিমুট্‌কি ভালাঙ্কোরে,গা সাজাতে হয়!"
আর ধনী বলে, "দিদি, মিন্সে উড়্‌ধুড়ে,
দেখা পেলে, ইচ্ছা করে বলি খুব তুড়ে।"
গলা দেখে, গলা ছেড়ে, কোন ধনি কয়,
"আহা মরি শুধু গলা, একি প্রাণে সয়!"
আর রামা কাছে এসে, হেসে হেসে বলে,
"বিয়েতে বদলে মালা, দিয়েছিল গলে।
দেখে মুখ, ফাটে বুক, নথ নাই নাকে,
ভাল মেয়ে ব'লে ওযে ঘোম্‌টা দিয়ে ঢাকে।
নীচে, উপরেতে যত বিঁধ কাণে আছে,
সকলেতে খড়্‌কে দেয়া, বুজে যায় পাছে।
আহা মরি কান্না পায় দেখে দু'টি কাণ,
ওযে তবু চুলে ঢেকে রাখে তার মান।
কেহ বলে, "দেহ জ্বলে, আহা! ম'রে যাই,
তুল ডাটী, হস্ত দুটি, তাতে কিছু নাই!
শাঁখা যদি দিত, তবু, হাত হ'ত ঢাকা;
কিঅভাগ্যি! ছিছি বোন,সেকি বেশী টাকা?"
কোন রামা বলে, "ওমা! পায়ে মল নাই,
খেদ ক'রে আল্‌তা বুঝি পরেনিক তাই।
শুধু পায়ে আল্‌তাপরা, সাজে না'ক ভালো,
চুট্‌কিমলে পা'র শোভা,আল্‌তা করে আলো।"
এইরূপে রামাগণে, নানা কথা কয়,
শুনে দুখে, অধোমুখে, সে রমণী রয়।
ঘরে এসে ভার্য্যা বলে,—"কি কপাল পোড়া
ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলি, দিয়ে শিল নোড়া।
অলঙ্কার হয় কভু, তবে যাব খেতে,
নৈলে বড় ঘৃণা করে, পোড়া নারী-জেতে।"
এই মত, জায়া যত খেদ ক'রে বলে,
শুনে দুখ, ফাটে বুক, ভাসি চক্ষুঃ-জলে।
'স্ত্রীভাগোতে ধন হয়,' যদি বলি তারে,
লূণ-ছিটে কাটা ঘায়ে, কে সহিতে পারে?
আর যত, মনোগত, দুঃখ কত কব,
মায়া-পাশ-ফাঁস কেটে উদাসীন হব।
বিনা টাকা, ফাঁকা সব! থাকা ভাল বনে,
ভজে ইষ্ট, যাবে কষ্ট, র'ব হৃষ্টমনে।
কোথা প্রভু! দয়াময়, কাঙ্গালের ধন,
কৃপা করি, ওহে হরি! দেহ দরশন।
ভবে এসে, মায়াবশে, তোমা ধনে ভুলে,
বাণিজ্যে না হ'ল লাভ, হারালাম মূলে!

কোন কর্ম্ম করি নাই এসে কর্ম্মভূমি,
নিজ গুণে যদি প্রভু! দয়া কর তুমি।
অসার সংসারে সার তুমি ভগবান্,
কাতরে করুণা কর করুণানিধান।
হ'য়েছি শরণাগত পাব পরিত্রাণ,
অন্তকালে "কৃষ্ণ" ব'লে যেন ত্যজি প্রাণ।

বিপন্ন-পথিক।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোরকে কীট।

বৈশাখী পূর্ণিমা। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রিকার বিকাশ। তিগ্মতেজা ভাস্করের পশ্চাতে পশ্চাতেই শান্ততেজা শশাঙ্কের সমুদয়। অবনী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ প্রস্তুত; জগৎ কতকটা কোলাহল শূন্য হইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে পাঠক মহাশয়! নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন দেখি কে ঐ গুবাপত্রাচ্ছাদিত গৃহের বাতায়নে বসিয়া বাগ্‌দা নদীর সুবর্ণময়ী তরঙ্গমালার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে এবং অনন্তে মিশাইতেছে। পাঠক! বলুন দেখি কে ঐ বালিকা অনিমেষ নয়নে ঐ তরঙ্গ নিচয় গণনা করিতেছে। বালিকার করস্থিত পুস্তক পতনোন্মুখ—কিন্তু বালিকা বেহুঁস হইয়া তরঙ্গের প্রতি একই দৃষ্টে চাহিয়া আছে। কেন? এ বয়সে উহার এ ভাব কেন? এত ভাবুকের ন্যায় তরঙ্গের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকাই বা কেন? বালিকা কি পদ্য লিখিবে? যদি লিখিতে চায় লিখিতে দিন, আমি এই অবসরে বাগ্‌দা নদীর একটু বিবরণ আপনাকে প্রদান করিব।

বাগ্‌দা এখন মজিয়া গিয়াছে। গত বৎসর দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট ঐ নদীর পার্শ্ব দিয়া যে সুবিস্তীর্ণ খাল খনন করাইয়া দিয়াছেন, উহাকেই "বাগ্‌দানদী" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে মেদিনীপুর কাঁথি মংকুমার মধ্যে বাগ্‌দা একটি সুবিস্তীর্ণ ও সুগভীর নদী ছিল। বঙ্গসাগরের সহিত উহার আদান প্রদান চলিত। এই কল্যাণদায়িনী নদীর প্রভাবে কাঁথির কৃষি ও বাণিজ্যের কোন অভাব ছিল না। ইহারই একটি ক্ষুদ্র শাখার উপর সুবিখ্যাত 'বালিঘাই' বন্দর এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কালক্রমে বাগ্‌দা ও তাহার শাখাগুলি মৃত্তিকায় ভরাট হইয়া মনুষ্যের বাসগৃহ অপেক্ষা ২।১ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিল। তখন 'বালিঘাই' বন্দর একবারে শ্মশান প্রায় হইল। কালক্রমে সকলই পরিবর্ত্তিত হইবে—সমস্ত জগতই পরিবর্ত্তনশীল। সে সকল ভাবিতে গেলে জ্ঞান থাকে না। বিশ্ব নিয়ন্তার অনু-

লঙ্ঘনীয় নিয়ম কে রোধ করিতে পারে?

এখন দেখা যাউক ঐ নবনীতকোমলাঙ্গী আয়তলোচনা একাকিনী বসিয়া কি করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ, অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। নাম "নলিনী"। নলিনীর মাতা নাই, বালিকা অবস্থাতেই নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। নলিনীর পিতার নাম 'অনন্তরাম ঘোষ'। অনন্তরাম, জাহাজে দালালী কর্ম্ম করেন। কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় নলিনীকে গৃহে রাখিয়া এবং কতকগুলি খাদ্য সামগ্রী ও খেলনা দিয়া বাটীর সদরদ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যান্। অনন্তের ইহা দৈনন্দিন কার্য্য। অনন্তের স্ত্রী বিয়োগ বড় অধিক দিন হয় নাই—প্রায় বৎসর দুই হইবে। অনন্তের সংসারে আর কেহই নাই। সঙ্গতি যদিও কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে পরিচারিকা রাখিতে পারেন না। স্ত্রী বিয়োগের পর প্রথম প্রথম কন্যাটীকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া যাইবার সময় অনন্তের হৃদয়-মর্ম্মে এতাদৃশ গুরুতর আঘাত লাগিত যে তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবিরলধারে অশ্রু মোচন করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইতেন। বিশেষতঃ কন্যাটী তাঁহাকে ছাড়িত না। কত ভুলাইয়া, কত খেলনা দিয়া, তবে তিনি তাহাকে রাখিয়া যাইতেন; পথে গিয়া অন্তরে অন্তরে কন্যাটীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—"মা! তো'র কিছু ভয় নাই, জগদীশ্বর তো'কে কুশলে রাখুন।" বালিকাটী আঁধার ঘরের মাণিকের ন্যায়, সমস্ত দিন টুট্ টুট্ করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা পাইলে খায়, ঘুম পাইলে ঘুমায়, কথা কহিবার ইচ্ছা হইলে পুত্তলিকার সহিত কথা কয়। বিকাল হইলে পিতার পা ধুইবার জল, গা মুছিবার গামছা, হুঁকা কলিকা সমস্ত ঠিক্ করিয়া রাখে এবং তৎপরে ঘরে সন্ধ্যা দিয়া 'কেতাব' লইয়া পড়িতে বসে। এই গুলি নলিনীর প্রাত্যাহিক কার্য্য।

নলিনি! আজ তুমি পুস্তক পাঠে অমনোযোগিনী হইয়া তরঙ্গের প্রতি কি নিমিত্ত এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ? তোমার মুখখানি প্রভাতকালীন শশধরের ন্যায় ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে কেন? নলিনি! বুঝিয়াছি তোমার স্নেহময়ী জননীর বিমল প্রতিমূর্ত্তি তোমার স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে,—তোমার সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ সেই পরম পদার্থে নিহিত হইয়াছে,—তাই তোমার করস্থিত পুস্তক, স্খলিত হইয়া পড়িতেছে,—তোমার সে দিকে দৃষ্টি নাই। নলিনি! তুমি কি ভাবিতেছ এই বাগিদার বিচিত্র বীচিমালাই তোমার জননীর চিতাভস্ম বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে? তুমি কি ভাবিতেছ তোমার মাতা আর আসিবেন্ না, এ জন্মের মত গিয়াছেন? হাঁ তাই বটে। কিন্তু জানিও নলিনি! সকলেরই বিনাশ আছে, জলন্ত অনলে জল পড়িবার সময় আছে, সূর্য্যোদয়ে ঘোর তামসী নিশার অবসান হইয়া থাকে।

নলিনী পুস্তক পাঠ করে, কিন্তু তাহার

পিতার হৃদয় অদ্যাবধি এতদূর শোকভারাক্রান্ত যে তিনি এক দিনও নলিনীকে জিজ্ঞাসা করেন নাই—এখানি কি পুস্তক বা এখানি কোথায় পাইলে? নলিনীও তাঁহাকে বলে নাই এখানি অমুক দিয়াছে, বা এখানি অমুক পুস্তক।

নলিনী পুস্তক খানি হস্তে করিয়া এক দৃষ্টে তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতেছে আর এক এক বার মনে করিতেছে, ম্যামসাহেব এখনও আসিল না কেন? বৈকাল বহিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, তথাপি ম্যাম্ সাহেব আসিল না কেন?

নলিনী এইরূপ উদ্বিগ্নচিত্তে সময় যাপন করিতেছে, এমন সময়ে শুভ্রদশনা শ্বেতাঙ্গিনী মিস্ 'টিপট্' দ্রুত-পদ সঞ্চারে নলিনীর বাতায়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। মিস্ টিপট্ বালিকা বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কি ইংরাজ কি নেটিভ খৃষ্টান—সর্ব্বভূতে সম দয়া। মিস্ টিপট্ স্বয়ং যেমন রসিকা ও প্রেমিকা পরের প্রতি প্রেম' বিতরণেও ততোধিকা। মিস্ টিপট্ প্রৌঢ়বয়স্কা—আজন্ম অবিবাহিতা। পড়াশুনা, কার্পেট বোনা, প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত কার্য্যেই তাঁহার দিনমান কাটিয়া যায়। রজনীতে তিনি পাদরী ভ্রাতাগণের সহিত 'ইনোসেণ্ট' আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত থাকেন। ফলতঃ সমাজ বা সংবাদপত্রে তিনি সতী সাধ্বীর অগ্রগণ্যা বলিয়াই পরিচিত,—নিস্বার্থ প্রেম বিতরণ তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কার্য্য।

মিস্ টিপট্ বাতায়ন সম্মুখে উপস্থিতা হইলে, নলিনী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। থুর্থুরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া সস্মিত-আননে ম্যাম্ সাহেবকে সেলাম করিল। এইরূপ একহস্তে নমস্কার মিস্ তাহাকে শিখাইয়াছেন। মিস্ টিপট্ গোলাপ কুসুমবৎ অধরোষ্ঠ অতি সাবধানে অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নোলেনি! How are you—টুমি কেমন আছে?

ন। ভাল আছি।

মি। আচ্ছা টুমার পিটা এখোন কোঠায়?

ন। বাবা এখনো আসেন নাই।

মি। আজ এটো ডেরী হইটেছে কেন?

ন। আজ তোমারও দেরী, তাঁ'রও দেরি।

মি। সে ভালো হইয়াছে—যীশু রোক্ষা করিয়াছেন।

ন। কেন ম্যাম্ সাহেব?

মি। না—সে কোঠা যাইটে ডাও—এখন টুমি কি পাঠ অভ্যাস করিয়াছ?

ন। মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায় শেষ করিয়াছি।

মি। ভাল, মুখস্থ বল ডেখি।

নলিনী আরম্ভ করিল,—"যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়েম যুষফের প্রতি বাক্‌দত্তা হইলে, তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে সে পবিত্র আত্মাদ্বারা গর্ভবতী হইল। ইহাতে তাঁহার স্বামী যুষফ ধার্ম্মিক হওয়াতে তাঁহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে গোপনে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। সে এমত ভাবিতে-

ছিল, ইতিমধ্যে পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল—হে দায়ুদের সন্তান যূষফ্, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না; কেন না তাহার গর্ভ পবিত্রআত্মা হইতে হইয়াছে। সে পুত্র প্রসব করিবে এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু ত্রাণকর্ত্তা রাখিবা; কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।"

নলিনী এইরূপ পাঠ বলিতেছে এমন সময় দ্বারদেশে পিতার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মিস্‌-টিপট্‌কে বলিল—'তুমি বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, ঐ বাবা আসিয়াছেন।'

এই কথা শুনিয়া মিস্ মনে মনে ভীত হইয়া বলিলেন—'এখন টবে চলিলাম।'

মিস্ টিপট্ দ্রুত-পদ-সঞ্চারে পলায়ন করিলেন। নলিনী উচ্চৈঃস্বরে 'ম্যাম্ সাহেব' 'ম্যাম্‌সাহেব' করিয়া ডাকিতে লাগিল। আর ম্যাম্‌সাহেব!—দে দৌড়!—

নলিনী দ্বারদেবাটন করিল, পিতা বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—নলিনি! কে কথা কহিতেছিল?

ন। ম্যাম্‌সাহেব।

অ। 'ম্যাম্‌সাহেব' কে?

ন। ও মা! সে কি গো! তুমি ম্যাম্‌-সাহেবকে চেন না! ম্যাম্‌সাহেব আমাকে কত ভালবাসে, কত খাবার দেয়, কত বই দেয়—

অ। তোর হাতে ও কি বই?

ন। এই দেখনা—কেমন সোণার জলে বাঁধান।

পুস্তকখানি নলিনী পিতার হস্তে দিল। পুস্তক দেখিয়া অনন্তের মস্তক ঘুরিয়া গেল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, নিস্তেজ নয়ন প্রান্ত হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইল। অনন্ত ভাবিলেন—অনাথাকে একাকিনী পাইয়া কোন্ কুহকিনী কুহকজাল বিস্তার করিল! কি ভয়ানক কথা!! যে ম্লেচ্ছাচার পূতিগন্ধময় পুরীষবৎ পরিত্যজ্য কুলিন্‌কায়স্থ গৃহে গোপনে সেই ম্লেচ্ছাচার বীজ উপ্ত হইতে চলিল!!! হা জগদীশ! আমার দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। হায়! আজ সেই পতিপ্রাণা আমায় ফেলিয়া কোথায় গেল? সে থাকিলে কি আর আমায় এত ভাবনা ভাবিতে হইত? এখন কি করি? কোথায় যাই? নলিনী আমার এখনও আইবড়, একথা রাষ্ট্র হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে।

এই সকল কথা যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, অনন্তের শোকাবেগ ততই উচ্ছ-লিত হইতে লাগিল, তিনি কথঞ্চিৎ ভাব গোপন করিয়া নলিনীকে বলিলেন "মা! আমি যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ তুই আর ও দিক্‌কার জানালা খুলিস্ না, কেহ ডাকি-লেও জবাব দিস্ না?"

ন। কেন বাবা।

অনন্ত কন্যাকে ভূত ডাইনের ভয় দেখাইতে সাহস করিলেন না; কারণ কন্যা আবার যথা সময়ে তাহাকে একাকিনী রাখিয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে হইবে। 'ভয়' জগতে আছে ইহা নলিনী জানিতে পারিলেই মহা মুস্কিল,—কায কর্ম্ম সকলই বন্ধ হইয়া যাইবে। অনন্ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—কেন

নলিনী তুই ত বলেছিস্ "তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো" তবে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্ কেন ?

নলিনী বলিল—তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব, কিন্তু ম্যাম্‌সাহেব যদি ডাকে, তা' হ'লে কি কর্‌ব ? অনন্ত বলিলেন—তা হ'লে তুমি চুপ্ করে থাক্‌বে।

ন। ম্যামসাহেব যে আমাকে ভালবাসে—কত খাবার দ্যায়—

স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি অনন্তের রাগ উপস্থিত হইল। ক্রোধ সংযুক্ত স্বরে নলিনীকে বলিলেন—এত খেয়েও কি তোর পেট ভরে না ? তবে কি আমার মাথাটা খেয়ে ক্ষান্ত হবি ?

ন। মাথা কি খাওয়া যায় ? হ্যাঁ বাবা মাথা কি খাবার জিনিষ ?

নলিনীর সারল্য সন্দর্শনে অনন্ত অধিকতর মর্ম্ম পীড়ায় অধীর হইলেন। ভাবিলেন, অভাগিনী আমার ঘরে কেন জন্ম গ্রহণ করিল। অন্য ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলে এত দিন কত সুখে কত আদরে দাস দাসীর ক্রোড়ে ক্রোড়ে বেড়াইত, আমার ঘরে আসিয়া প্রহরিণীর কার্য্য করিতে করিতেই বাছার আইবড় বয়স কাটিয়া গেল। প্রকাশ্যে বলিলেন "নলিনি! মা আমার! এ বইখানি তুই কি কর্‌বি ?"

ন। পড়্‌ব।

অ। এ পড়ে কি হবে ?

ন। কত কত ভাল ভাল কথা শিখ্‌ব।

অ। ভাল কথাত আমার কাছে ত কত শুন্‌তে পাস্ ?

ন। এ কথা তার চেয়ে ভাল।

অ। তুই পাগ্‌লী।

ন। আমাকে বই দাও, আমি পড়ি; ম্যাম্‌সাহেব আবার কাল্ এসে পড়া নেবে।

অ। এ বই পড়্‌তে নেই, এ আমি তুলে রেখে দোবো।

ন। তবে আমি কাঁদ্‌ব।

নলিনীর মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইল দেখিয়া, অনন্ত আর থাকিতে পারিলেন না। বইখানি হস্তে দিলেন; ভাবিলেন নলিনী নিদ্রা গেলে পুস্তকখানি বাগ্‌দা জলে নিক্ষেপ করিবেন। আবার ভাবিলেন হঠাৎ এরূপ কার্য্য করিলে বালিকা অন্তরে ব্যথা পাইবে। এমন সোণার জলে বাঁধান বইখানি নলিনীর হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপ রহিয়াছে; মুগ্ধস্বভাবা বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া এই খেলনাটী কেমন করিয়া কাড়িয়া লই ? নলিনী আমার দুধের বালিকা—বাইবেলের মর্ম্ম কি বুঝিবে ? বাইবেলের যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইয়া দেয় এমন কোন পাদ্‌রী জগতে আছে কি না সন্দেহ। বালিকা বাইবেল বুঝিবে অনেক দূরের কথা।

ইতিপূর্ব্বে হিন্দু সমাজে যখন পদ-প্রার্থী পাদরীদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল, অনন্তরাম একদা এক শুভ্র শ্মশ্রু পাদরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সাহেব! তুমি বাইবেলের মতে 'অগ্নি'ও 'পবিত্র-আত্মা' দ্বারা ব্যাপটাইজ করিতে পার ? তাহাতে সেই নিরহঙ্কার অকৈতববাদী বিজ্ঞবর এই উত্তর দেন যে—'বাবু! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা

আমাদের দ্বারা অসম্ভব; আমরা জল দিয়াই ব্যাপটাইজ করিয়া থাকি। আমাদের ধর্ম্ম বিতরণ কেবল অর্থের জন্যই জানিবে।' তাঁহার এই স্বার্থশূন্য বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অনন্তরাম তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তের এই অকাট্য দলিল।

অনন্ত ভাবিলেন বাইবেল যেন নলিনীর পক্ষে ক্রীড়নক স্বরূপ হইল; কিন্তু যে কুহকিনী ক্রীড়নক প্রদান করিয়াছে, তাহার সহিত সংসর্গ রাখিলে নলিনীর সম্পূর্ণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। যাহাতে সে পথে কণ্টক পড়ে এমন উপায় করিতে হইবে।

পুস্তক পাইয়া নলিনী পরম আহ্লাদিতা হইল। ভাবিল এমন বস্তুটী হাতছাড়া হইতেছিল—এখন ধড়ে প্রাণ আসিল। অনন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে কন্যার ক্রীড়নক ফিরাইয়া দিলেন। ভাবিলেন আর নয়, নলিনীর বিবাহের উদ্যোগ করা যাউক। আমার ঘরে কেহ নাই বলিয়া কি কন্যাকে আইবড় করিয়া রাখিব? আমি একাকী; আমার অরণ্য বাসই শ্রেয়ঃ। নলিনী আমার শ্বশুরালয়ে থাকিবে; আমাকে আর কাহারও ভাবনা ভাবিতে হইবে না। একটা পেট কোন প্রকারে চলিয়া যাইবে।

হায় অনন্ত! তোমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে কন্যার বিবাহ দিয়াই বনবাস যাইবে? বিবাহ দিলেই কি বনবাস যাইতে হয়? জামাই লইয়া দিন কতক আমোদ আহ্লাদ করিবে না? যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, যিনি সকলের পিতা, তিনি এত বড় সংসারী,—তুমি পুত্র হইয়া সংসার ত্যাগী হইবে! বন কি তোমার এখানে নাই? তুমি বৃক্ষলতাময় বনে গমন করিবে, মন তোমার সঙ্গে যাইবে। মনকে তুমি কোথায় রাখিয়া যাইবে? যে মন তোমায় একবার বলিল বনে চল, সেই আবার পর মুহূর্ত্তে বলিবে গৃহে প্রত্যাগমন কর। তবেই অনন্ত! তুমি এখন অনন্ত ভাবনায় পড়িলে—কোন্ দিকে যাইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছ না। যদি ভাল চাও, যেখানে আছ সেইখানেই থাক। তোমায় বনে যাইতে হইবে না—বনই তোমার নিকটে আসিতে পারে। এখন তোমার কার্য্য কি? কলিকায় কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই আপাতঃ বিনাশ করিবার চেষ্টা পাও, নচেৎ ঐ কীট ক্রমে কলিকাটী নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

নলিনী কলিকায় আগুন তুলিয়া 'ফুঁ' দিতে দিতে লইয়া আসিল। পিতা সাদরে হুঁকাটী লইয়া সমস্ত চিন্তা সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। নলিনী নিকটে বসিয়া পিতার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।

"আর্ত্তাতে মুদিতে হৃষ্টা
প্রোষিতে মলিনা কৃশা—"

কেন না হইলে তুমি মাথার ভূষণ?
বিনাইয়ে নানা ছাঁদে,
বিনোদ কবরী বেঁধে,
পরিতাম তার মাঝে করিয়ে যতন।
ওহে মাথার ভূষণ!

কেন না হইলে তুমি সিঁথির সিঁদুর?
গোপনে ঘোমটা খুলে,
পরিতাম কুতূহলে,
নিমেষে যাতনা-জ্বালা হয়ে যেত দূর।
ওহে সিঁথির সিঁদুর!

কেন না হইলে নাথ! অলকা তিলকা,
অগুরু চন্দন ঘষি,
পরিতাম দিবানিশি,
ললাটে সাজিত ভাল প্রেমের পতাকা।
ওহে অলকা তিলকা!

কেন না হইলে নাথ! আঁখির কাজল?
যতনে তুলিকা ধরি,
পরিতাম ধীরি ধীরি,
সরাগে শোভিত ভাল নয়ন সজল।
ওহে আঁখির কাজল!

কেন না হইলে তুমি তাম্বুলের রাগ?
অধরে করিয়ে বাসা,
মিটাইতে মনো আশা,
সে রাগে ঘুচিয়ে যেতো হৃদয়-বিরাগ।
ওহে তাম্বুলের রাগ!

কেন না হইলে তুমি শ্রবণ কুণ্ডল?
দুলি দুলি রসাবেশে,
চুমিতে কপোল দেশে,
কখন চুমিতে ভ্রমে অলক কুন্তল।
ওহে শ্রবণ কুণ্ডল!

কেন না হইলে নাথ! মণিময় হার?
কভু রাখি কণ্ঠ' পরে,
কভু ধরি পয়োধরে,
রাখিয়ে হৃদয়ে যেতো হৃদয়ের ভার।
ওহে মণিময় হার!

কেন না হইলে নাথ! কষিত কাঞ্চন?
তা হলে সোহাগে গেলে,
রাখিতাম কুতূহলে,
এ ভুজমৃণালযুগে করি আভরণ।
ওহে কষিত কাঞ্চন!

কেননা হইলে তুমি অঞ্চলের বাস?
তোমারে জড়া'য়ে গায়ে,
এড়া'য়ে বিরহ দায়ে,
খেতাম মাধবে মৃদু মলয়-বাতাস।
ওহে অঞ্চলের বাস!

কেন না হইলে তুমি শীতল চন্দন?
তোমারে সর্ব্বাঙ্গে মাখি,
হ'তাম্ পরম সুখী,
নিমেষে নিভিয়ে যেত বিরহ-দহন,
ওহে শীতল চন্দন!

কেন না হইলে নাথ! কমলের কলি?
গিয়া সরোবর জলে,
খেদা'য়ে ভ্রমর দলে,
আনিতাম তোমা ধনে হয়ে কুতূহলী।
ওহে কমলের কলি!

কেন না হইলে নাথ! বকুলের ফুল?
ধেয়ে গিয়ে তরুমূলে,
অঙ্গুলে খুঁটিয়ে তুলে,
আনিতাম প্রেম ভরে ভরিয়ে দুকুল।
ওহে বকুলের ফুল!

কেন না হইলে তুমি গগনের চাঁদ?
সুনীল বিমান তলে,
অথবা সরসী জলে,
ধরিতাম তোমাধনে পাতি প্রেম ফাঁদ।
ওহে গগনের চাঁদ!

কেন না হইলে তুমি প্রদোষের তারা?
পুলক পূরিত মনে,
হেরিতাম তোমা ধনে,
নয়ন মদিরা-রসে হয়ে মাতুয়ারা।
ওহে প্রদোষের তারা!

কেন না হইলে নাথ! প্রভাতের রায়?
রজনী হইলে শেষ
উড়ায়ে অলক কেঁশ,
কুসুম কোমল করে জাগাতে আমায়।
ওহে প্রভাতের রায়।

কবে সেই শুভ দিন আসিবে আবার!
হেরে সে কমল মুখ,
পলা'বে সকল দুখ,
পড়িবে স্মরণ পথে অধিনী তোমার?
নিরাশ প্রাণের আশা মিটিবে আমার?

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

মাসিক-সংবাদ।

শিল্প দুই প্রকার। প্রথম, 'শ্রম-শিল্প'; যেমন ছুতার কামারের কায; কারণ ইহা শ্রম-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়—'বিজ্ঞান-শিল্প'; যেমন খনির কায, গ্লাসের কায, বস্ত্র বুনন, সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি। সুতরাং বিজ্ঞান-শিল্পের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এদেশে এখন বিজ্ঞান শিল্পেরই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এই সস্তারদিনে, নকলের প্রাদুর্ভাবে প্রথম প্রকার অর্থাৎ 'শ্রম-শিল্পের' উদ্ধারের আশা নাই। শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যে মজুরী বেশী পড়ায় তাহার দর উচ্চ; কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে লোকে চায় সস্তার জিনিষ। সুতরাং শ্রম-শিল্প-বলে আমরা বিলাতী বিজ্ঞান-শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম হইব না। অতএব বিজ্ঞান-শিল্পবলেই যে আমরা বিশেষ

লাভবান্ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে আজকাল যে সমস্ত শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে তাহাতে কেবল শ্রম শিল্প শিক্ষাই হইয়া থাকে। এ সকল বিদ্যালয়ে যে আদৌ উপকার নাই তাহা নহে—তবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও দেশের লোকের অন্ন সংস্থানের উপায় যাহাতে হইবে সেরূপ বিজ্ঞান-শিল্প বিদ্যালয় এদেশে নাই। এরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সহজ সাধ্য নহে; কারণ ইহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ সংগ্রহ একেবারে হইবে না। সুতরাং দেশমধ্যে যেখানে বিজ্ঞান-শিল্প-শিক্ষার যে উপায় আছে তাহাই অবলম্বনে আমাদিগকে উহা শিখিতে হইবে। আশা করা যায়—এ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টও আমাদের সাহায্য করিবেন।

* *

*

শিক্ষা হইলেই কার্য্য হইবে না। কি প্রকারে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, প্রথম তাহাও বিবেচ্য। বহুল পরিমাণে কার্য্য না করিলে কিছুতেই লাভ হইবে না। সুতরাং বহুল অর্থ ভিন্ন কার্য্য হইবে না। এই গরিবের দেশে এক বা দুই জনে অর্থ দিতে সক্ষম হইবে, তাহা দুরাশা মাত্র; সুতরাং দশ জনে মিলিয়া যৌথ কারবার করিতে হইবে। কিন্তু শিল্প রক্ষা করাও বড় গুরুতর ব্যাপার; কারণ আমাদের দেশে আমদানী দ্রব্যের উপর কোনরূপ রাজকর নাই। তাহার উপর আবার রেলওয়ে ষ্টীমারের প্রাদুর্ভাব। দূরস্থিত দেশ হইতে আহারীয় দ্রব্যাদি আনিয়া রেলে সময়ে সময়ে অন্ন কষ্ট নিবারিত হয় বটে, কিন্তু রেলের প্রভাবেই সামান্য বিলাতী জিনিষটীও মফঃস্বলের সামান্য পল্লিগ্রামে গিয়া, দেশীয় দ্রব্যের ধ্বংশ সাধনে, অন্ন সংস্থানের উপায় রোধ করিতেছে। আমাদানী-কর না বসাইলে এ দেশের বাণিজ্য-শিল্প রক্ষার যে কোন উপায় নাই, ইহা বড় বড় ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীর মত। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি কটন সাহেবও এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। আর স্বদেশ-শিল্প রক্ষার্থ আমদানী-কর সর্ব্বদেশে বর্ত্তমান—নাই কেবল আমাদের এই ভারতে। কিন্তু ইংরাজ আমদানী-কর বসাইবেন এ আশা বৃথা; সুতরাং শিল্প রক্ষার উপায় আমাদিগকেই বিধিমতে করিতে হইবে। এবং ইহাই আমাদের একান্ত ভাবিবার বিষয় ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা অপেক্ষা শিল্পোন্নতি চেষ্টাই যে একান্ত আবশ্যক—ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। অন্নকষ্ট পীড়িত, উদরান্নের জন্য লালায়িত দরিদ্রদিগের রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্কার কি? দারুণ কষ্টের ভীম মূর্ত্তি অদূরভবিষ্যতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে—ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অতএব উন্নতির ভাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত পথে প্রধাবিত হও।

* *

*

এই খানেই প্রথম বাবুর বক্তৃতার শেষ। পাঠক! উক্ত বক্তৃতার আদ্যোপান্ত পড়িলে দেশের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

সেই কারণেই আমরা অতীব যত্নের সহিত তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ করিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে সকলেরই কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা গত আশ্বিন মাসের 'মাসিক সংবাদ' ও অন্যান্য প্রবন্ধেও দেশের শিল্প, কৃষি, ও বাণিজ্যাদির বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। প্রথম বাবুর বক্তৃতার সেই সমস্ত বিষয়েরও আভাস পাওয়া যায়। তবে এ সকল বিষয়ের যত আন্দোলন করা যায় ততই ভাল।

* *
*

বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ, 'সেণ্টএণ্ড্রু'ভোজ টাউনহলে সমাধা হইয়া গিয়াছে—এই ভোজ প্রতি বৎসরেই হইয়া থাকে। যে সকল স্কটলণ্ড-বাসী ইংরাজ, এ দেশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া স্কটলণ্ডের খৃষ্টান্ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক 'সেণ্ট-আণ্ড্রু'র স্মরণার্থ এই উৎসব করিয়া থাকেন। তাই ইহার নাম 'সেণ্টএণ্ড্রু ভোজ'। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসব বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে, এ সভায় ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়া থাকে। এখন ইহা একটী সামাজিক ব্যাপার মাত্র—ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই। তবে আছে কেবল সুরার সম্বর্দ্ধনা—গণ্য মান্য ইংরাজের অভ্যর্থনা—ভোজন পান-ঘোলআনা, রাজনৈতিক আলোচনা আর আমোদআহ্লাদের বৈঠকখানা। আমাদের বড় লাট বাহাদুরও এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আতিথ্য সৎকার গ্রহণান্তর সভার উদ্যোগিগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সভাপতি ছিলেন—'বণিক-সমিতির' সভাপতি মেকাই সাহেব। উৎসবের পান ভোজনান্তে সভাপতি সাহেব বড়লাটকে সুরাহুতি প্রদান করিয়া নানা কথার সহিত ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন ও আমাদিগের বড়লাট লর্ড ল্যান্স ডাউন প্রত্যুত্তরে ভারত সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন তাহারই সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি।

* *
*

বন্দনাদির পর, মেকাই, মণিপুরের কথা উল্লেখ করেন, পরে দেশের নানা স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা বলেন, কিন্তু স্বীয় মতামত কিছু প্রকাশ করেন নাই। তিনি কৌশলে কুটীর আইনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট রূপে বলিতে—কি জন্য জানি না—সাহস করেন নাই। এ বৎসরের লোকসংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়া, তিনি বড়লাটকে বলেন যে, গত দশ বৎসরে এদেশে যে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্ত বৃটন-দ্বীপের লোকসংখ্যার সমতুল্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের লোকসংখ্যা পঁচিশ কোটী চল্লিশ লক্ষ ছিল, এ বৎসরের গণনায় স্থির হইয়াছে লোকসংখ্যা আটাইশকোটী ষাট লক্ষ। সুতরাং দশ বৎসরে লোক বাড়িয়াছে—তিন কোটী বিশ লক্ষ। এই লোক বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রশ্ন দিন দিন ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে! সুতরাং লোক বৃদ্ধির সহিতই লোকের জীবনোপায়ের পথ প্রদর্শন আবশ্যক ও তজ্জন্য কৃষি, বাণিজ্য

প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। দেশের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথে আইনাদির প্রবর্ত্তন দ্বারা যাহাতে বাধা না পড়ে সে দিকে সুদৃষ্টি রাখিলে এই অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জীবনোপায়ের সম্ভাবনা আছে।

মেকাই সাহেবের এই কথায় কুটীর আইনের আভাস পাওয়া যায় মাত্র কিন্তু কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে কি ভাল হইত না?

* *
*

'ইন্‌কম ট্যাক্সে'র কথাও মেকাই সাহেব তুলিয়াছিলেন। বক্তৃতার স্থানে স্থানে ভ্রূকুটী প্রকাশও করিয়াছিলেন। পরিশেষে গবর্ণমেন্টের স্বচ্ছল অবস্থায় যাহাতে উক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া লওয়া হয় তজ্জন্য বড়লাটের নিকট অনুরোধও করিয়াছিলেন।

* *
*

গত বৎসর হইতে বিলাতী পাদরী পুঙ্গবদিগের প্ররোচনায় পার্লিয়ামেন্টের মেম্বরগণ ভারতগবর্ণমেন্টকে অহিফেনের পাপ-ব্যবসা উঠাইয়া দিবার জন্য যে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহার আন্দোলন ও মহাসভার মন্তব্য উপলক্ষ করিয়া, বক্তৃতার উপসংহারে মেকাই সাহেব বলেন যে, ভারত গবর্ণমেন্টের অহিফেণ আয় বন্ধ হইলে, বিশেষ রূপ আর্থিক বিভ্রাট ঘটিবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

* *
*

এই আয়ের সাপক্ষে, ভারতগভর্ণমেন্ট, বিলাতে যে সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইয়াছেন বিলাতী মন্ত্রীরা তাহা অনুমোদন না করিলে, ভারতের আর্থিক অবস্থা বড়ই বিষম হইয়া উঠিবে। ভারতবাসীর হিতার্থে অহিফেণ ব্যবসা রোধ করিবার জন্য বিলাত-বাসীরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতবাসীর মঙ্গল সাধনে যদি তাঁহারা এতই উদ্বিগ্ন, তবে তাঁহারা, ভারতে মদ পাঠাইয়া বৎসর বৎসর যে বিশ কোটী টাকা আয় করিতেছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন না কেন। মদে, দেশের অনিষ্ট যেরূপ হইতেছে, অহিফেণে তাহার শতাংশের এক অংশও অনিষ্ট হয় না, অথচ বিলাতী পরার্থনীতি দিগের যত বিদ্বেষ—অহিফেণে। মদের উপর কটাক্ষে তাঁহাদিগের রাজনৈতিক ব্যবসা বন্ধের সম্ভাবনা, এমন কি অনেকেই তাহা হইলে মহাসভার আসন লাভেও বঞ্চিত হইবেন।

* *
*

এইরূপে মেকাইসাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে, আমাদের বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের বক্তৃতা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে স্কচ জাতীর প্রশংসা-গীতি গাহিয়া, আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের সুখ্যাতি-গীতি আরম্ভ করেন। আর ইহাও বলেন যে ব্রিটীশ-সাম্রাজ্য যেরূপ বিশাল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে গভর্ণমেন্টের আর রাজ্যবৃদ্ধি-স্পৃহা আদৌ নাই। দেশীয় রাজ্য সমূহের সুশাসন দেখিতে পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। আর দেশীয় রাজ্য গুলি হইতে প্রাচ্য-শাসন প্রণালীর বিলোপ ও তাঁহাদিগের

অভিপ্রেত নহে; বরং পাশ্চাত্য শাসন প্রণালীর সহিত এরূপ শাসনে সুফলেরই সম্ভাবনা।

* *
*

বড়লাট বলেন যে, ভারতের ন্যায় স্থান আর নাই। কাল যে, কি ঘটিবে তাহা আজ বলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দরিদ্র কৃষক হয় ত ক্ষেত্র,শস্যশালিনী দেখিয়া,আশায় হইয়া মোহিত, কিন্তু পঙ্গপাল আসিয়া সকল গুলিই নষ্ট করিয়া গেল। রাজস্ব-সচীব মনে করিয়া আছেন যে এবার রাজস্বের হিসাবে টাকা উদ্বৃত দেখাইতে পারিব কিন্তু হয় ত যুদ্ধ বিগ্রহ বা দুর্ভিক্ষ প্রভাবে অথবা অনটনে সে সমস্ত আশা একেবারে ভাসিয়া গেল। এজন্য আমাদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে।

* *
*

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বড় লাট বলেন, যে, রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষের উপক্রম চারিদিকে। রাজপুতনা হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বাইয়ের দিকে দুর্ভিক্ষ-ভীতি অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই আসন্ন বিপদ দূরীকরণ জন্য আমরা সাধ্যমত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যেখানে যেখানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য ইহার মধ্যে ষাট হাজার লোককে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করা হইতেছে।বিভাগীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন।

* *
*

লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও তাহার উপায় নির্দ্ধারণে বড়লাট বলেন যে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসনেই ভারতের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে নানা উপায়ে লোক সংখ্যা বাড়িতে দেওয়া হইত না। এক্ষণে আমাদের শাসন গুণে সে সকল পথ রোধ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই লোক বৃদ্ধির জন্য অন্ন সংস্থানের যতদূর উপায় করা যাইতে পারে সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। কৃষি বিস্তার জলের খাল বৃদ্ধি জনশূন্য স্থানে লোক চালনা প্রভৃতির উপায় দেখিতে আমরা সততই চিন্তিত।

* *
*

যুদ্ধ বিগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বড় লাট বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সীমান্তে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলেও আমরা একপ্রকার নিশ্চিন্ত আছি। বাহিরে যদি শান্তি ভঙ্গ হয় তবে সে বাহিরের কারণেই হইবে। অধিকতর রাজ্য বিস্তারের জন্য আমরা এ কার্য্য করিতে যাইব না। আরও সন্তোষের বিষয় এই যে, বাহিঃশত্রু আক্রমণ রক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। তজ্জন্য কিছু খরচাদি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা যত সংক্ষেপে হয় তজ্জন্যও আমরা সচেষ্ট রহিয়াছি।

* *
*

পরে বড় লাট অর্থ সম্বন্ধে সোণার বাজার ও অহিফেণ ব্যবসার উল্লেখ করিয়া বলেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে টাকার মূল্য একটু বাড়িয়া ছিল আবার কমিয়া গিয়াছে। আর উঠিতেছে না। অহিফেণ সম্বন্ধে বলেন যে, আমরা অর্থ লাভের জন্য নূতন নূতন স্থানে অহিফেণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া বেড়াই না। নানা কারণে বিক্রয় বাড়িয়াছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও চোরাই মালের কাট্তি কমিয়াছে বলিয়া সরকারের অহিফেণ বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি ভাল বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, যদি এক

কলমের আঁচড়ে অহিফেণের আয় হইতে বঞ্চিত হই তথাপি চীন ও ভারতবর্ষে অহিফেণ সেবন বন্ধ হইবে না। আমরা যতই করি না কেন, ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি হইবে। ইংলণ্ডে যাঁহারা সুরাপান একেবারে বন্ধ করিতে চান, তাঁহারা যেমন আইন করিয়া সুরাপান বন্ধ করিতে পারেন না, অহিফেণ সম্বন্ধে আমরাও সেইরূপ অক্ষম।

* *
*

ইনকম ট্যাক্স উঠাইবার সম্বন্ধে বড়লাটের মত যে,'আয়করে'র মূলে কিছু দোষ থাকিলেও তাহা উঠাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত করের জন্য দরিদ্রগণ কষ্ট পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই জন্য লবণকর ও চাউল রপ্তানি-শুল্ক অগ্রে উঠাইতে হইবে। তার পর ইন্‌কমট্যাক্সের কথা। অর্থের স্বচ্ছল হইলে এই সকল করের তিরোধানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

* *
*

এই সকল বক্তৃতার পর বড়লাট স্বয়ং ভাল আছেন বলিয়া ভারত সম্বন্ধে রূপক করিয়া বলেন যে, "ভারত আনাড়ী বিলাতী ডাক্তারদিগের হাতে পড়িয়াছেন তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি এরূপ যে ডাক্তারেরা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া এক মনে কার্য্য করিলে এই চিকিৎসাতেই আরোগ্য লাভ করিবেন।"

* *
*

পাঠকগণ দেখিবেন—মেকাই সাহেব ও বড়লাটের বক্তৃতার যে অংশটুকু আমরা উপরে প্রকাশ করিলাম তাহাতে কেবলই আমাদের দেশের কথা। সম্মতি আইন, মণিপুরের যুদ্ধ, পামীরের কথা এ সকল গুলির কোনও মতামত আমরা বড়লাটের নিকট হইতে পাই নাই। তিনি দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেও অনেক কথা বলেন নাই। তাঁহার মুখে দেশের কথা, আমাদের সুখ দুঃখের কথা, আরও বিস্তৃতরূপ শুনিবার আশা ছিল; কিন্তু এ বক্তৃতায় সে আশা মিটিল না। অধিকন্তু বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার জীবিকা উপায়, দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রভৃতি বিষয় গুলির বিশেষ কোন উদ্যোগের কথা শুনিতে পাইলেও আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতাম।

* *
*

মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা শূরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতাদিগের কৌশলে আজ বাৎসরিক কাল রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা ব্যপদেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাঁকুড় গাছীতে রাণী স্বর্ণময়ীর এক উদ্যানে অবস্থান করিতে ছিলেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ প্রাতে মহারাজ শূরচন্দ্র সেই উদ্যানে জ্বর ও উদরাময় রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় মণিপুর-সিংহাসন পরিত্যাগ করেন নাই! রেসিডেণ্ট গ্রীমউডের ষড়যন্ত্রে ভ্রাতৃগণের বিদ্রোহিতায় রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধাভিনয় শেষ হইলে মহারাজ পরিত্যক্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তির আশায় বড়লাটের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বড়লাট তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—যদি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা না করেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন। একে টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি, কুলচন্দ্র প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—ভ্রাতাগণের ও মণিপুরের শোচনীয় পরিণামে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল,তাহাতে আবার স্বীয় ভগ্ন-অদৃষ্টের পুনঃ পরিবর্ত্তন আশায় বিমুখ হইয়া রোগে শোকে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে কাল আসিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান

করিল !! মহারাজের মৃত্যু সংবাদে বড়লাট বাহাদুর নিজ তোষাখানার দরয়ানকে মহারাজার সৎকারের জন্য কাঁকুড় গাছীতে পাঠাইয়া দেন। মৃতদেহ নবদ্বীপে লইয়া গিয়া সৎকার করিবার কথা হয়; কিন্তু সকলের অনুমোদিত না হওয়াতে, নিমতলার শ্মশানক্ষেত্রে জাহ্নবী-গর্ভে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়। মণিপুর সিংহাসনে এক্ষণে একটী 'বালক' অবস্থিত—ইংরাজই প্রকৃত মণিপুরের রাজা।

* * *

মণিপুর রাজের পরাজয়ে এবং ইংরাজরাজের বিচারে মণিপুরের চির প্রচলিত ভবিষ দ্বাণী কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বংশবংশানুক্রমে মণিপুরীদের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে,—'এক সময়ে দেবতা সম্মুখে দুইটী শ্বেত-কায়ের মস্তক কাটা পড়িবে—সেই সময়ে পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ ও পূর্ব্ব দ্বার মুক্ত হইবে—তিন দিক্ হইতে তিনটি রাজা আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে, তখনই জানিবে—'মণিপুর রাজ্যের পতন'। মণিপুরের "মইহুরাণ" নামক পুরাণে ইহা লিখিত আছে মণিপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এ কথা জানে। মণিপুরের রেসিডেণ্ট 'মাক্‌সোয়েল' সাহেব ইহার তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন ভবিষ্যদ্বাণী ছত্রে ছত্রে মিলিয়াছে। মিলাইয়া দেখুন;—দেবতার সম্মুখে 'কুইণ্টন' ও 'স্কিন' সাহেব দ্বয়ের মস্তক পতন—কোহিমা, টামু ও শিলচর এই তিন দিক্ দিয়া ইংরাজ সৈন্যের মণিপুর আক্রমণ—কাদেট, গ্রাহাম ও রেনিক এই তিন জন সেনাদলের অধিনায়ক সুতরাং এই তিন জনই রাজস্থানীয়। 'বিশেষতঃ জাতীয়ত্ব সূত্রে ইংরাজ রাজের প্রত্যেকেই ভারতে রাজরূপে পূজিত। পুরাণের কথা কখনই মিথ্যা হয় না।

* * *

গৃহ-বিবাদই মণিপুরের শোচনীয় পরিণামের মূল কারণ কিন্তু গৃহ বিচ্ছেদের মূল কারণ কি তাহা সম্প্রতি মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকাল এজেণ্ট গ্রিমউডের বিধবা-পত্নী প্রকাশিত "মণিপুরেবর্ষত্রয়" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবি গ্রিমউড বলেন—এই গৃহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ—যুবতীর মোহিনী মূর্ত্তি—মণিপুরের এক স্বর্ণকারের যোড়শী সুন্দরী কন্যা নাম মায়াকপুরী। স্বর্ণকার তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা মণিপুরের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও পক্কসেন উভয় ভ্রাতাই সেই সুন্দরীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সুন্দরীর ভালবাসা লাভ করিতে উভয়েই বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন কিন্তু স্বর্ণকার-কন্যা কাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে কেহ কেহ বলেন সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎই মায়াকপুরীর ভালবাসা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। যুবতী, সেনাপতির প্রতিই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। মণিপুরে এক দিন রাত্রে নৃত্যগীতাদি হয়। সামাজিক রীতি অনুসারে মণিপুরের কুলমহিলারা প্রাপ্ত বয়স্কা হইলেও প্রকাশ্য সভা স্থলে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। মায়াকপুরীও সেই দিবস সভায় নৃত্য করিতে ছিলেন। জানি না তিনি কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন কি না। কিন্তু নৃত্য-সভা ভঙ্গের পরই ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ আরম্ভ হয়। মহারাজা শূরচন্দ্র পক্কসেনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া শূরচন্দ্রের প্রতি সেনাপতি টীকেন্দ্রজীতের বিদ্বেষভাবের সূত্রপাত হয়। সেই বিদ্বেষের ফল শূরচন্দ্রের নির্ব্বাসন।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। পৌষ—১২৯৮। নবম সংখ্যা।

রাধিকা।

সরল কোমল
কিশোর হৃদয়
পিরীতিতে টলমল ;
কোমল চকিত
মধুর চাহনি,
চোকের কোনেতে জল।

রাঙা ঠোঁট দুটী
ফুটিয়া ফুটিয়া
পড়েছে ঈষৎ হাসি ;
বিকচ কুমুদ
উপরে যেমন
খেলিছে কৌমুদী রাশি।

যমুনার কুলে
লতা-কুঞ্জচয়
কদম্ব ফুটেছে গাছে ;
দেখায় না ভাল
কচি মুখ খানি
না থাকিলে তার মাঝে।

চপল চকিত
হরিণী নয়নে
চারিদিক পানে চায় ;
চরণ বিক্ষেপে
সৌন্দর্য্য তরঙ্গ
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

হাসিতে বিষাদে
মাখা মুখ যেন
নীরদে চপলা খেলা ;
অতি সুকুমার
অঙ্গের গঠন
আরো সুকুমারী বালা।

গভীর নিশীথে
সুদুর নিশ্রুত
বংশী-রব সম বাণী।
রস নিরমিতা
কুসুম-প্রতিমা
শ্যামের হৃদয় রাণী।

শ্রীমতী—দাসী।

রাজা ও প্রজা।

"রক্ষিতা চ বয়ং তাত রাজভির্ধর্ম্মদৃষ্টিভিঃ"

মহাভারত।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একদা মাসিডোনিয়ার অধিপতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্‌জাণ্ডার্, আফ্রিকার উপকূলস্থিত কোন অসভ্য রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা সম্রাট্‌কে অতিথি জনোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন; এবং ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে সুবর্ণবর্ণ খর্জ্জুর ফল ও অন্যান্য অযত্ন-সম্ভূত খাদ্য সামগ্রী তৎসমক্ষে উপনীত করিয়া, আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। মহানুভব আলেক্‌জাণ্ডার তৎ সমুদয় সাদরে গ্রহণ করিয়া খর্জ্জুর ফলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহারান্তে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতে করিতে রাজসমক্ষে সমুপস্থিত হইল। রাজা কারণ জিজ্ঞাসু হইলে বাদী কহিল—"মহারাজ! আমি এই ব্যক্তির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি; কিন্তু মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে দেখিলাম তন্মধ্যে কিছু ধন সম্পত্তি প্রোথিত রহিয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম আমি উক্ত ধন কোন মতেই আত্মসাৎ করিতে পারি না। অতএব বিক্রেতাকে উহা ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু বিক্রেতা উহা লইতে অস্বীকার করিতেছে। তচ্ছ্রবণে রাজা প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন তুমি ঐ ধন ফিরাইয়া লইতে চাহিতেছ না?"

প্রতি। মহারাজ! আমি যখন উহাকে ঐ ভূমিখণ্ড বিক্রয় করিয়াছি তখন আমি উহার গর্ভে যাহা কিছু আছে, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছি। আমি ত দেখিতে যাই নাই উহার মধ্যে রত্ন আছে কি ধন আছে কিম্বা কিছুই নাই?

রাজা। তবে তুমি ঐ ধন লইতে ইচ্ছা কর না?

প্রতি। আজ্ঞে না। উহা বাদীকেই সম্পূর্ণ অর্শাইতেছে।

রাজা। বাদি! তুমি ঐ ধন আত্মসাৎ কর; কারণ তুমি যখন ঐ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছ, তখন উহার গর্ভস্থ মৃত্তিকা বা অন্যান্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তোমারই প্রাপ্য।

বাদী। মহারাজ! এ কেমন আজ্ঞা করিতেছেন। আমি স্বল্প মূল্যে বহুধন কেমন করিয়া লইতে পারি? ধর্ম্ম মাথার উপর বিরাজ করিতেছেন।

রাজা। ভাল, তোমরা যদি কেহই উহা লইবে না, তবে আমি তোমাদের এই বিবাদ মিটাইয়া দিতেছি। তোমাদের উভয়ের মধ্যে

কাহারও অনূঢ়া কন্যা সন্তান আছে কি?

বাদী। মহারাজ! আমার একটী অনূঢ়া কন্যা সন্তান আছে।

রাজা। বুঝিলাম, তোমার কন্যা সন্তান আছে, কিন্তু প্রতিবাদীর কোন অবিবাহিত পুত্র সন্তান আছে কি না?

প্রতি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আমার একটী অবিবাহিত পুত্র সন্তান আছে।

রাজা। ভাল, ইহাই ত আমি চাই। বাদি! তুমি প্রতিবাদীর পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিবে এবং ঐ ধন যাহা তুমি মৃত্তিকার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছ, পাত্রটীকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবে। তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া গেল।

রাজার এই বিচারে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইল। মহামতি আলেক্‌জাণ্ডার অসভ্য রাজের এই সূক্ষ্ম বিচার সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। অসভ্য-রাজ সম্রাট্‌কে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মহাশয়! বিচারটা সূক্ষ্ম হইয়াছে কি না? আপনাদের দেশে এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে আপনারা কিরূপ বিচার করিয়া থাকেন?"

আলেক্‌জাণ্ডর বলিলেন—"আমাদের দেশে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বাদী ও প্রতিবাদী রাজদ্বারে প্রথমে সংবাদ না দিয়া প্রোথিত অর্থ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়াছে,—এই অপরাধে উভয়েই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং ঐ অর্থ রাজকোষ-ভুক্ত হইবে।"

অসভ্য-রাজ সম্রাটের মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! আপনাদের দেশে সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে? মেঘ, বারি বর্ষণ করে এবং গো মেষাদি পশুগণ বিচরণ করিয়া থাকে?"

সম্রাট কহিলেন—হাঁ এ সমস্তই হইয়া থাকে। তখন অসভ্যরাজ কহিলেন—"বুঝিলাম ঐ সূর্য্যোদয় বা ঐ বারি-বর্ষণ কেবল ঐ সকল পশুদিগের নিমিত্তই হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের নিমিত্ত নহে। কারণ যে দেশের রাজা ও রাজপুরুষগণ এতদূর স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী, সে দেশ একেবারে উৎসন্ন না গিয়া যে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে—শান্তি, সুখ ও সারল্য এই এই স্থানেই বিরাজ করিতেছে। ইহাদিগের অর্থ নাই, মান নাই, মহামূল্য পরিচ্ছদ নাই, কিছুই নাই, কিন্তু ইহাদিগের এক দিনের সুখ আমরা চিরজীবনেও প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হই না। এই অসভ্য-রাজ 'ব্যবস্থা' 'রাজনীতি' বা 'দর্শন-শাস্ত্র' কিছুই পাঠ করেন নাই; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কেমন সূক্ষ্ম ও ধর্ম্ম সম্মত বিচার করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক মহাশয়! বর্ত্তমান কালে এরূপ সূক্ষ্ম ও সদ্বিচার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ রাজা ও প্রজা পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ও যুক্তিসঙ্গত,

তাহা এক্ষণকার লোকে কুটিল বিবেচনায় সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারে না। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বা ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ রাজধর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, এমন আর জগতের কোন ইতিহাস বা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ যে কত কাল সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা ও রাজর্ষিগণ যে নানাবিধ সদ্গুণ ও আলোকসামান্য রাজধর্ম্মে বিভূষিত ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। তবে আমরা এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগেই যে অসভ্যরাজার গুণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহার কারণ এই যে, এতকাল পূর্ব্বে এমন অসভ্য জাতীর মধ্যেও এরূপ সদ্গুণ ও রাজধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল।

রাজার উচিত, লোকানুরঞ্জন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং ; প্রজার উচিত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রাজ-ভক্তি প্রদর্শন। কিন্তু সেই লোকানুরঞ্জন-ব্রত প্রতিপালন করা মুখের কথা নহে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও এক সময়ে বলিয়াছিলেন "কষ্টোজনঃ কুলধনৈরনুরঞ্জনীয়ঃ" এবং কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ, যে সময় ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা পুত্রকে অপরাপর উপদেশ অপেক্ষা নিম্নলিখিত উপদেশটী প্রদান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন।

"জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধাস্ত্বং
বাল এব নবঞ্চরাজ্যং।
"যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনেস্যাত্ত-
স্মাৎ যশো যৎ পরমং ধনংবঃ॥"

জামাতৃ যজ্ঞে আমরা নিরুদ্ধ হইয়াছি। তুমি বালক এবং রাজ্যও নূতন ; অতএব প্রজানুরঞ্জনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক এবং তাহাতে যে যশোলাভ হইবে তাহাই আমাদিগের পরমধন। রাজা রামচন্দ্র লোকানুরঞ্জন ব্রতের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং তন্নিবন্ধন পরিশেষে প্রিয়তমা জানকীকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই বিশাল ভারতবর্ষের কিয়দংশ মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি রুষরাজের ন্যায় এই ভূমণ্ডলের অষ্টমাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন নাই বটে, অথবা তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যে দিবাকর কখনও অস্ত গমন করেন নাই এমনও ঘটে নাই বটে কিন্তু তিনি স্বীয় প্রজা-বাৎসল্য ও দয়া দাক্ষিণ্য গুণে এতাদৃশ সমুন্নত কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল অদ্যাপি তাঁহার নাম ভূমণ্ডলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমরা যখনই কোন রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি বিরাজ করিতে দেখি, তখনই উহাকে রাম রাজ্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকি।

রাজা যদি যথেচ্ছাচারী হয়, রাজা যদি প্রজাপালন পরিবর্ত্তে প্রজাপীড়নে মনোনিবেশ করে, রাজা যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় বিরত থাকে, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যে অশান্তি-স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রজাগণ নিয়ত নিপীড়িত হইয়া পরিশেষে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে ; তাঁহারা পরোক্ষে নিন্দাবাদ ও প্রত্যক্ষে চাটুবাদ অবলম্বন

করিয়া রাজাকে সকল বিষয়েই প্রবঞ্চনা করিতে শিখিবে অথবা উপদ্রবের ভয়ে তুষ্টি-ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাকিবে—ইহার আর বিচিত্র কি?

পাঠক মহাশয়! অধিক দিনের কথা স্মরণ করিতে হইবে না, একবার মাত্র সেই পাপের প্রতিরূপ, উগ্র-স্বভাব নিষ্ঠুর নবাব সিরাজের প্রতি অবলোকন করুন। দেখুন বর্ষৈকমাত্র রাজত্ব করিয়া পরিণামে তাঁহার কি দুর্গতি ঘটিল। সেই অর্ব্বাচীন সৎকথা ও সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ক্রমশঃ প্রজা, পারিষদ, বন্ধুবান্ধব এমন কি আত্মপরিজন কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত হইয়া, অবশেষে ঘাতকহস্তে জীবন সমর্পণ করিল। এই কি রাজার পরিণাম! ইহা কি রাজকুলের কলঙ্ক নহে? যে দেশের রাজা এইরূপ যথেচ্ছাচারী, সে দেশ অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদা মহর্ষি শমিক সর্ব্বগুণান্বিত রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক অকারণ অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে সপ্তাহ মধ্যে তক্ষকদংশক রূপ অভিশাপ প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে মহর্ষি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া নানা প্রকার পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং কোপন-স্বভাব পুত্রকে অশেষ বিধানে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"বৎস শৃঙ্গি! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ! রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্য অরাজক হইবে।" 'অরাজকে জানপদে দোষা জায়ন্তেবৈ সদা' অরাজক দেশে অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে। রাজা দুর্বৃত্ত লোক দিগকে শাসন করিয়া আমাদিগকে নিরাপদ করেন। এবং আমরা রাজগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম দৃষ্টিতে রক্ষিত হইয়া থাকি।

যথেচ্ছাচারীর রাজ্যে বাস ও অরাজক রাজ্যে বাস উভয়ই সমান। ফলতঃ সুধাময় পুর্ণচন্দ্র গগন মণ্ডলে বিরাজ করিলে জগৎ যেমন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, সেইরূপ সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত ধর্ম্মশীল রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ্য-মধ্যে শান্তি-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকেন। এইরূপ রাজার শাসনে প্রজাবর্গ সকলেই পরিতুষ্ট থাকে এবং প্রাণপণে রাজার উপকারে প্রবৃত্ত হয়। রাজার অমঙ্গলে তাহারা আপনার অমঙ্গল জ্ঞান করে। আমরা এমন অনেক রাজার বিষয় পাঠ করিয়াছি যাহারা স্বীয় সুখে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল প্রজাবর্গের হিত-কামনায় মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন যামিনী যাপন করিয়াছেন।

রাজকার্য্য একটা ব্যবসা বাণিজ্য নহে। রাজ-বুদ্ধি একটী স্বতন্ত্র বুদ্ধি। ভবিষ্যতে যাঁহাকে অনেক লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বুদ্ধি প্রাখর্য্য ও বিবেচনা শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত মন্ত্রী পাইলে তাঁহার যশঃ সৌরভ দিন দিন দিগন্তব্যাপী হইতে থাকে। মণি ও কাঞ্চন একত্র হইলে যেরূপ শোভা সম্পাদিত হয়, উপযুক্ত রাজা ও উপযুক্ত মন্ত্রী একত্র মিলিত হইলে সেইরূপ শোভা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নতুবা অর্ব্বাচীন মূর্খ রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুত্তলিকা-

বৎ প্রতীয়মান হয় এবং এক মন্ত্রী ভিন্ন তাঁহার আর সহায় সম্বল কিছুই থাকে না। মন্ত্রী স্বার্থপর হইলে সে রাজার নিস্তার নাই। সম্রাট্ আকবর চৌদ্দ বৎসর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে সমস্ত রাজকার্য্য বুঝিয়া লইয়া স্বার্থপর কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিলেন এবং উপযুক্ত মন্ত্রীবর্গের সহিত মিলিত হইয়া স্বহস্তে রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহ-প্রমুখ নরপতিগণ অবিলম্বে তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করিলেন এবং রাজ্যও কুশলে চলিতে লাগিল। মুসলমান হইয়াও তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজকার্য্য বুঝিয়া লওয়া, ইহা কি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়? মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবজীর এমন কোন অসামান্য লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা তিনি ভারতেশ্বর আরঙ্গজীবের একজন দুর্দ্দান্ত শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন? কোন ইতিহাসবেত্তা তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহাকে "Greater than Hydur Ali greater even than Runjit Singh" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে রাজা সর্ব্বদা স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমা বর্দ্ধনে সমুৎসুক, তিনি কখন প্রজাগণের সুখ-সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বৃহৎ রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে অনেক সৈন্য সামন্ত ও অনেক অর্থের প্রয়োজন। প্রজার অর্থ লইয়াই রাজার অর্থ। প্রজা কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহারই কিয়দংশ রাজাকে কর স্বরূপ প্রদান করে। ইহাতেই রাজ্যরক্ষা হইয়া থাকে। সেই কর অধিক হইলেই প্রজার সর্ব্বনাশ। রাজা স্বয়ং কিছুই দেখিতে পারেন না, অতএব প্রতিনিধি ও প্রতিনিধির প্রতিনিধিগণ দ্বারা রাজকার্য্য পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে। যাঁহার রাজ্য, যাঁহার প্রজা, তদুপরি তাঁহারাই স্বত্ব, তাঁহারই মমতা থাকিতে পারে। প্রতিনিধিগণ কেমন করিয়া পররাজ্য ও পর প্রজাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। প্রতিনিধিগণ বেতনভোগী। বেতন বৃদ্ধি ও স্বার্থসাধন-লালসায়, তাহারা যে কোন প্রকারেই হউক রাজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে। তাহাতেও প্রজাগণের প্রভূত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। ফলতঃ এই প্রকার রাজ্যেই বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, অকাল মৃত্যু, নির্দ্দোষের দণ্ড, দোষীর পুরস্কার এবং অযথা অর্থ শোষণাদি নানাবিধ অনর্থপাত হইয়া থাকে। ইং ১৮৫৭ সালে যে ভয়ঙ্কর সিপাহি বিদ্রোহে সমগ্র ভারত, এমন কি সমগ্র ব্রিটন পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল, রাজপ্রতিনিধি কি তাহার আদি কারণ নহেন? কয়েক বৎসর অতীত হইল যে দুর্ভিক্ষ ও অকাল মৃত্যুতে মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা কি প্রতিনিধিগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ নহে? প্রতিনিধিগণের অর্থ ও যশোলালসায় নিরন্তর কত শত অনর্থপাত হইতেছে; কিন্তু রাজা ও সম্রাট্‌গণের সাম্রাজ্য-সীমা-বর্দ্ধন-লালসা তথাপি তিরো-

হিত হয় না। চক্রবর্ত্তী-রাজা যদি করদ ও মিত্র রাজগণের আবেদন স্বয়ং পাঠ বা স্বকর্ণে শ্রবণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি ক্রমে নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া স্ব স্ব প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতাবর্দ্ধনে অমনোযোগী হইবেন না? প্রশস্তমনা সম্রাট্ কখন সামান্য প্রজাগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি অনেকানেক রাজগণে পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত হইয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ নামে অভিহিত হইতে অভিলাষী হয়েন। কেবল সামান্য প্রজাগণের উপর রাজত্ব সংস্থাপন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল হরণ করা, কাপুরুষ ও অর্থশোষক রাজার কর্ম্ম। শাস্ত্রোক্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ রাজধর্ম্মে ভূষিত হইয়া রাজত্ব করাই প্রকৃত প্রতাপশালী রাজার কর্ম্ম।

রাজ্য শাসন করিতে হইলে, নানাজাতীয় প্রজাগণের প্রতিপালন করিতে হয়। আমাদিগের ভারতেশ্বরীর বিশাল সাম্রাজ্যে নানাবিধ লোকের বাস। হিন্দু; মুসলমান, পারসি, শিখ, জৈন, প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রজাবর্গ তাঁহার সংসারে পরমসুখে অবস্থিতি করিতেছে। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কি? যাহাতে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া এবং পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিরহিত হইয়া, সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, যাহাতে তাহারা দুর্ভিক্ষ ও দস্যুভয়ে সদাই সশঙ্কচিত্তে বাস না করে, যাহাতে তাহারা স্বার্থপর রাজপুরুষগণের হস্তে পতিত হইয়া কষ্টভোগ না করে, এতদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী হওয়া তাঁহার বিধেয়। যাহাতে প্রজাগণের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশ হয় তৎপ্রতিকার বিষয়ে উপেক্ষা ও ঔদাস্য অবলম্বন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে।

আমরা তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া এতাবৎকাল যে প্রকার সুখ-সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছি, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, ব্রিটিশ্ রাজ-কুলের কোন রাজা বা রাজ্ঞী প্রজাগণের এরূপ প্রশংসা-পাত্র বা পাত্রী হইতে পারেন নাই। কিন্তু যদি তিনি রাজপুরুষগণের ভ্রমাত্মক পরামর্শেই হউক বা স্বীয় অনবধানতা বশতই হউক কোন ভ্রান্তি বা অশান্তিমূলক কার্য্যে অগ্রসর হয়েন সে স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি তখন দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিব না—"রাজ্ঞী ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, শান্তি-তরুমূলে কুঠারাঘাত করিবেন না?"

প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, প্রজার সুখেই রাজার সুখ এবং প্রজাবর্গ গুণকীর্ত্তন করিলেই রাজার যশঃ সৌরভ দিগন্তব্যাপী হইয়া থাকে। ইতিহাসবেত্তাগণ প্রজাবৎসল রাজাকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়া থাকেন। প্রজার মনোবেদনায় রাজার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় গগনমণ্ডল নিবীড় জলদ-জালে পরিবৃত হইলে যেরূপ লোচনানন্দদায়ক হয় না, সেইরূপ সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য রাজ্যে অশান্তির উদয়

হইলে প্রজাবর্গের নিতান্তই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। স্থান বিশেষে প্রতিনিধিগণ আপন গুণে অবিমৃশ্যকারী সম্রাটের মুখোজ্জ্বল করেন এবং স্থান বিশেষে তাঁহারা সর্ব্বগুণান্বিত রাজাকেও নিন্দার আস্পদ করিয়া তুলেন। লর্ড ক্যানিং, লর্ড নর্থব্রুক লর্ড রিপণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতে আসিয়া ভারতেশ্বরীর বদন-মণ্ডল কতদূর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতিনিধিবর্গের কলঙ্ক-স্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে কতদূর অযশোভাগিনী করিয়াছেন।

যে প্রজাকে স্বল্পমাত্র সুখশান্তি প্রদান করিলেই দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া জগদীশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে থাকে, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা অতীব অনায়াস সাধ্য—সন্দেহ নাই। তবে কেন রাজা ও রাজপুরুষগণ স্ব স্ব নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সেই প্রজাকে অল্পের নিমিত্ত অসন্তুষ্ট করিয়া, আপন আপন সুখ্যাতি-মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন, বলিতে পারি না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।



স্মৃতিপথে—প্রিয়তম।

আবার, আবার, কেন গো আবার
জাগা'লে সুখের স্মৃতি ?

শিশির-বাসর, সুখদা শর্ব্বরী
অথবা যৌবন-আনন্দ-লহরী,
পলক নিমেষে পলায় যেমনি,
তার চেয়ে হায় ! আসিয়া অমনি,
গেলে তুমি দ্রুতগতি।
আবার, আবার, কেন গো আবার
জাগা'লে সুখের স্মৃতি ?

তৃণ-পর্ণহীন ধরণী যেমন,
সুষুপ্তি বিহীন রজনী যেমন
হরষবিহীন মানস যেমন,
পরিত্যক্ত র'য়েছি নির্জ্জনে !

মধুর মাধব আসিবে আবার,
ভাসিবে বিমানে কোকিল-ঝঙ্কার,
জানি প্রিয়তম ! আসিবে না আর,
তবে কেন জাগিছ স্মরণে ?

যত দিন হায় ! হইতেছে গত,
ছায়া'পরে ছায়া হ'তেছে পতিত,
তথাপি, সে স্মৃতি র'য়েছে জাগ্রত
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে ;

বৃথা এ যৌবন—তোমারি মতন—
তোমারি সহিত করিতে গমন।
—বনের বিহঙ্গ বিমানে যেমন—
সদারত প্রফুল্ল হৃদয়ে।

তোমার বিহনে বৃথা এ জীবন,
শিশির-পাদপ বিরস যেমন ;
প্রভাত কিরণে উজ্জলবরণ
পল্লব ধারণে কি ফল বল !

কিসে কাটে দিন সদাই বাসনা,
নিশি নিদ্রা-হীন বাড়ায় যাতনা,
মোর তরে আর বিফল ভাবনা
এ দগ্ধ জীবনে মরণ ভাল।

যূথি, যাতি, বেলা—বিবাহ-বাসরে,
বিকচ গোলাপ কবরী উপরে,
সহকার-শাখা সহমৃতা করে,
ভৈরবীর গলে জবার মালা ;

এ ভগ্ন হৃদয়ে দাও ছড়াইয়ে,
ভূতলে পতিতা প্রভাতের বায়ে
নীহার-নয়না শেফালি কুড়ায়ে,
তাহে যদি কিছু জুড়ায় জ্বালা !

একি প্রিয়তম ! এ খেলা কেমন,
কিছুই বুঝিতে পারি না এখন,
তোমার ভাবনা সুখের মিলন
অথবা জ্বালায় শোকের বাতি ;

আবার, আবার, কেন গো আবার
জাগা'লে হৃদয়ে সুখের স্মৃতি ?

শ্রীরসময় লাহা।

জাতীয় একতা।

আজকাল সচরাচর সকল লোকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে পরস্পর একতা নাই। একজনে বিপদে পড়িলে, দশজনে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না। এরূপ আচরণের কারণ সচরাচর লোকে অনুমান করিয়া থাকে যে, বাঙ্গালী ঘোর স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর, ভীরু, কাপুরুষ ও বিষম হিংস্রক-স্বভাব; বিপদে পড়িলে বাঁচাইবার জন্য সাধ্যমত আনুকূল্য ত করিবেই না, বরং যাহাতে বিপদ্ হইতে কোনরকমে রক্ষা না পায় অথবা আরও ভয়ানক বিপদে পতিত হয়, ইহাই তাহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা।

অপর কেহ কেহ বলেন,—বাঙ্গালীজাতি বড় মূর্খ ও কুসংস্কারাপন্ন; কেহ বিপদে পড়িলে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে না; যেহেতু বাঙ্গালী বলে, ঈশ্বর তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছে আমরা কি করিব, সে পূর্ব্ব জন্মে পাপ করিয়াছে, তাহার ফল ভুগিতেই হইবে, আমরা মিছামিছি চেষ্টা করিয়া কি করিব?

অপর কেহ বলেন যে, বাঙ্গালীজাতির একতা-হীনতার মূল কারণ ইহাদিগের সমাজ-গত কতকগুলি ভয়ানক দোষ—জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য এবং অন্যান্য কতকগুলি সামাজিক নিয়ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালীজাতির একতা-হীনতার মূল কারণ ও মজ্জাগত কারণ—বাঙ্গালীর পৌরাণিক ধর্ম্ম। কেহ কেহ কেবল শিব-পূজা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব দেখিলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হন। অপরঞ্চ বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতিরাও আপন আপন উপাস্য ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসকদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণার সহিত অবলোকন করিয়া থাকেন।

আর কতকগুলি বলেন, মানবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানে না। মানবের চারিটী কর্ত্তব্য,(১ম) ঈশ্বরের প্রতি—তাঁহার উপাসনা ভজনা প্রভৃতি; (২য়) মানব সাধারণ বা সমাজের প্রতি—কৃতজ্ঞতা, পরস্পর আনুকূল্য, দয়া, মমতা, ক্ষমা প্রভৃতি; (৩য়) নিজের প্রতি—আত্মরক্ষা, আপনাকে বিধিমতে শিক্ষিত করা প্রভৃতি; (৪র্থ) ইতর সাধারণ জন্তুগণের প্রতি—তাহাদের প্রতি করুণ ব্যবহার, তাহাদের আহার সরবরাহ করা, তাহাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক দেখা শুনা ইত্যাদি। ইহাঁরা বলেন—বাঙ্গলীজাতির হিতাহিত বিবেচনা (Morality) বড়ই কম (very low), বাঙ্গালীদের (Morality) নৈতিক-জ্ঞান একেবারে নাই বা লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়।

ইংরেজ-জাতির মধ্যে একতার বিষয়

এইরূপ শুনা যায় যে, উহারা কোন আইন বা কর (tax) 'রদ' করিবার জন্য কিম্বা উহাদের কোন স্বত্ব লোপের চেষ্টা হইলে উহারা 'এককাট্টা' হইয়া থাকে। উহারা একত্র হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করে। আর আমাদের এদেশে কালা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধ হইতে হইলে একজুটী বান্ধিয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, ইংরেজদিগের ঐ একতা-বন্ধনের মূল হইতেছে 'পার্লেমেণ্ট'। ইংরেজ পার্লেমেণ্টের কথায় উঠে বসে। পার্লেমেণ্টের ভ্রূভঙ্গীতে ইংরেজজাতি বানরবৎ নাচিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ,—ইংরেজের বাণিজ্য বিষয়ে যে একতা দেখা যায়, তাহা উহাদের শুভাদৃষ্ট-মূলক—কি শুভদিনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের নিকট পূর্ব্ব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীতে ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল! সেই দিন হইতেই উহাদের 'কোম্পানী' বাঁধিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিবার দিন উপস্থিত হয়। আর আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে, আমরা বর্ত্তমান কালে যে সকল সম্ভূয়সমুখান ব্যবসা খুলিতেছি, তাহা দৈব বিড়ম্বনায় নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি শুভাদৃষ্টক্রমে সম্ভূয়সমুখানে, একবার লাভ দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গ দেশেই বাণিজ্যের নিমিত্ত একতা বন্ধনের শতশত দৃষ্টান্ত অনতিবিলম্বে আবির্ভূত হইবে। তুমি বাঙ্গালীর পক্ষে সফলতা লাভ কোন ক্রমেই মনে আনিতে পারিবে না, বাঙ্গালীর নানা দোষ তোমার মনে পড়িবে, কিন্তু জানিও শুভাদৃষ্ট হইলে ও তেমনই ঘটনা-চক্রে পড়িলে এমন কি বাধা বিঘ্ন আছে, যাহা অতিক্রম করা যায় না? তুমি বলিবে ইংরেজের কি সেই এক শুভাদৃষ্ট-বলে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসা বিষয়ে একতা সংরক্ষিত হইতেছে? ইতিহাস খুলিয়া, সেই শুভাদৃষ্টের ফলের কি বিশ্বব্যাপক আয়তন, তাহা স্মরণ করিলেই এ বিষয়ে কোন গোলযোগ থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ—কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিবেন যে, ইংরেজজাতি আপনাদের স্বার্থ যেমন বোঝে, আমরা তেমন বুঝি না। কিন্তু 'কালা-নিগার' দিগের বেলায় স্বার্থ বুঝা যেমন সহজ, 'কালানিগার' দিগের এমন কোন স্বার্থ নাই, যাহা তাহারা এইরূপ সহজে বুঝে। ইংলণ্ডীয় জন সাধারণ ইংরেজ মাত্রেই (Anglo-Indian) বিবেচনা করেন, নেটিবমাত্রেই বিজিত ও আমাদের পদাশ্রিত—উহারা আমাদের ভৃত্য; অতএব, উহাদিগের প্রতি স্বামিত্ব প্রদর্শন করিতে যে ইংরেজ (Anglo-Indian) মাত্রেই চেষ্টিত হইবে এবং সেই জন্য সকলের মধ্যে যে একমতই দেখা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

পার্লেমেণ্টের ইঙ্গিতে যে ইংরেজ-মহলে একতা হয়, ইহার কারণ এই যে, জনসাধারণ জানে পার্লেমেণ্ট তাহাদের নেতা—দলপতি। তাহারা পার্লেমেণ্টকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে ও ভক্তি করে; কিন্তু কেন করে জানে না। তাহাদের জন্মাবধি অভ্যাস পার্লেমেণ্টের কথায় নড়িবে, পার্লেমেণ্টের 'টু' শব্দে উঠিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, আমাদের

দেশে এমন কেহ ছিল যাঁহার 'টুঁ' শব্দে সমাজ উঠিত ও যাঁহার টুঁ' শব্দে সমাজ বসিত। তুমি এ স্থলে ইংরেজজাতির পার্লেমেণ্টের আজ্ঞাধীন থাকার সঙ্গে, আমাদের সমাজের তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাধীন থাকার বা গ্রামকর্ত্তাদিগের আজ্ঞাধীন থাকার কথার উল্লেখ করিয়া বলিবে যে, আমাদের অপেক্ষা ইংরেজেরা অধিক সারগর্ভ একতাশৃঙ্খলের উপর দণ্ডায়মান। কেন না ইংরেজজাতির অধিকতর জ্ঞান রাশির উপর পার্লেমেণ্টের ভিত্তি নির্ম্মিত; কিন্তু কথা, এই,—জনসাধারণ পার্লেমেণ্টকে সম্মানভাজন বলিয়া ভক্তিই করিয়া থাকে, পার্লেমেণ্টকে আমাদের নির্ব্বাচিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহার বাধ্য হয় না। অপরঞ্চ বলিবে, পার্লেমেণ্টের নির্ম্মিত একতা অধিকতর স্থায়ী; কিন্তু দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণদিগের নির্ম্মিত বা গ্রামাধ্যক্ষের নির্ম্মিত একতাও তাহা অপেক্ষা হীন নহে। কেন না পার্লেমেণ্টের ন্যায়—ব্রাহ্মণ জাতি বা গ্রামাধ্যক্ষ—ইহারাও অমরত্বগণ গুণসম্পন্ন এবং যদি শেষোক্ত ধ্বংস করা যাইতে পারে, প্রথমোক্তটীরই বা কেন নয়? যদি কালে গ্রামাধ্যক্ষের লোপ পায়, পার্লেমেণ্টের কি লোপ পাইবে না?

ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায় কোন বিদেশীয় (চীন, তিব্বত, পারস্য প্রভৃতি দেশে) ব্যবসা করিতে যাইতে ব্যগ্র হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তদানুকূল্যার্থে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন—এ দৃষ্টান্তটী ইংলণ্ডীয় রাজনীতিমূলক, কিন্তু একতামূলক নহে।

একতা শব্দ 'এক' শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন অর্থ;— একের ভাব। যদি কতকগুলি লোকের মধ্যে কোন বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে পরস্পরে ঐক্য আছে, এইরূপ বুঝা যায়। তবে, যখন 'একতা' শব্দ স্বয়ং অন্য শব্দের অসংযোগে ব্যবহৃত হয়, তখন এইরূপ বুঝা যায় যে, যাহাদের মধ্যে একতা আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রায় যাবতীয় বিষয়েই পরস্পরের ঐক্য অর্থাৎ সম্মতি আছে।

একতা শব্দ দ্বারা কেবল ঐক্য বা পরস্পরের মতের মিল বা সম্মতি মাত্র বুঝায় এমত নহে অর্থাৎ একতা বলিলে যে, কেবল একটা মনের ভাব বা অবস্থামাত্র বুঝায়, এমত নহে, একতা বলিতে পরস্পরের ঐক্য এবং তন্নিবন্ধন পরস্পরের শারীরিক চেষ্টা দ্বারা সাহায্য করাও বুঝাইয়া থাকে। পরস্পরের মধ্যে আনুরক্তি, ইচ্ছার অনুমোদন এবং তন্নিবন্ধন একজোটে পরস্পরের সাহায্যার্থ কার্য্য করাও বুঝাইয়া থাকে। সৌহার্দ্দ্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, একতা বলিতেও তাহা বুঝায় বটে; তবে সৌহার্দ্দ্য অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে নিহিত থাকে, একতা বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে ঘটিতে পারে। কিন্তু, সৌহার্দ্দ্যবশতঃ লোকে যতদূর কার্য্য করিতে পারে, একতা দ্বারা ততদূর সম্ভবে না। সৌহার্দ্দ্য দুই জনার মধ্যে বিলক্ষণ আছে বলিলে, এই বুঝায় যে, ঐ দুই জন লোকের মধ্যে এক জনের সকল মনের ভাবের সহিত অপরের সকল মনের

ভাবের ঐক্য আছে এবং এক জন যাহা বলে, যাহা ভাবে, যাহা করে, যাহা বুঝে, যাহা খায় অথবা এক কথায় বলিতে গেলে, এক জনের সমস্ত আত্মা, বৃত্ত ও সমস্ত ভাবে অপরের অতীব মনোরঞ্জনকর প্রীতিপ্রদ ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদনীয়। একতা আছে বলিলে, অতদূর বুঝায় না এবং একতার মধ্যে যে মাখামাখি ভাব আছে, তাহা এত ঘন নহে—উহা হইতে অনেক পাতলা।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একতা শব্দ অবিশেষিত (Unqualified) হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার আর একটী কারণ এই যে, যদিও মানবজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন প্রভৃতির পরস্পর সামঞ্জস্য আছে এবং যদিও মানবমাত্রের মন, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি আছে, তথাপি পরস্পরের বাসস্থান, বায়ুর গুণ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম, ভাষা, মনের ভাব, চিন্তা, অনুসন্ধান বিষয়ে এত পার্থক্য আছে, যে, এই সকল পার্থক্য বা প্রভেদের বিষয় চিন্তা করিলে, মনুষ্য যে এক জাতি বা প্রজাপতি-সৃষ্ট এক পদার্থ তাহা বোধ হয় না। এমনও বোধ হইবে যে, একে যাহাতে নির্ম্মিত অন্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট কোন পদার্থ হইতে নির্ম্মিত। আর একতা শব্দের ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় যে, মানবসাধারণের যাহা সাধারণ, তাহাতে ইহা ব্যবহৃত হয় না; তবে ঐ সাধারণ অংশটা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার খানিকটা খানিকটা যদি কতকগুলি মানবের মধ্যে থাকে এবং যদি অপর কতকগুলির মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত কতকগুলির মধ্যে ঐ বিষয়ে একতা আছে বুঝা যায়। পরন্তু, একতা শব্দ বিরোধ-ব্যঞ্জক; একতা বলিলেই যে, কেবল কতকগুলি লোক এক মতাবলম্বী ও এককর্ম্মের কর্ম্মী বুঝাইবে এমত নহে, ইহাতে আরও বুঝাইবে যে, ঐ সকল এক মতাবলম্বী ও এক কর্ম্মীরা অন্য মতাবলম্বী ও অন্য কর্ম্মীদিগের বিরোধী—ভয়ানক শত্রু। একতা বলিতে যে বিরোধী বুঝাইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুইটী বিভিন্নমত বা বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ও তজ্জন্য ঝগড়াঝাটী, মারামারি, লাঠালাঠি, রক্তারক্তি না দেখা যায়, ততক্ষণ একতা দেখা যায় না। এই কারণেই একতা শব্দ স্বয়ং বা অবিশেষিত হইয়া ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। একতা বলিতে গেলেই, জাতীয়-একতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতা, দেশীয় একতা বা সভ্যজাগতিক একতা এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। সার্ব্বজনিক বা সার্ব্বভৌমিক বা সার্ব্বধর্ম্মিক একতা এ বিশ্ব সংসারে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেন না, শেষোক্তরূপ সম্ভবই হইতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে একতামাত্রেই যে বিরোধ বা বিরোধসম্ভবনীয়তা বিদ্যমান আছে, তাহার একেবারেই অভাব হইবে; আর একজোট হইয়া প্রতিকূলাচরণ করা অসম্ভব হইলে, এক জোট বাঁধিবার বা একত্র হইবার কোন আবশ্যকতাই থাকিবে না। তখন এ নিজ, এ পর, এরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিবে না; তখন বসুন্ধরা শুদ্ধ সকলেই

আত্মীয় হইবে; সুতরাং কাহার বিরুদ্ধে একতা বন্ধন হইবে? আর 'একতা' বাস্তবিকই বন্ধন বটে; স্বাধীনভাবে সকলের প্রতি স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিব, এরূপ ঘটনা একতাবলম্বীদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। একতা একটা 'গোঁ' বা 'গোঁড়ামী'-স্বরূপ—স্বদলস্থ লোকদিগের প্রতি সহানুভূতিই ইহার প্রধান কারণ। একতাবলম্বী স্ব-দলের দোষ দেখিতে পায় না এবং পরের গুণও দেখিতে পায় না। বাস্তবিকই একতাবলম্বীরা পরস্পরে পরস্পরের মুখে ঝাল খায় এবং কেহই কোন দ্রব্য নিজে আস্বাদ করিতে পায় না। এই স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, একতার একটী বিশেষ গুণ আছে; তাহা এই—যেমন কতকগুলি তৃণ বন্ধন করিলে এক গাছি দৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত হইয়া মদমত্ত দুষ্ট বারণকে বদ্ধ করিতে পারা যায়, সেইরূপ একতা-সূত্রে বদ্ধ কতকগুলি লোকের দ্বারা সময়ে সময়ে অনেক উপকার সাধিত হয়। কিন্তু যেমন তৃণ দেখিলেই তাহাকে গোছা করিয়া রজ্জু বাঁধিতেই হইবে, এরূপ বোঝায় না, তদ্রূপ কতকগুলি মানুষ পাইলেই যে, একতা বাঁধিতে হইবে, তাহাও নহে। যখন মদমত্ত দুর্দ্দান্ত মাতঙ্গের বন্ধন করিতে হইবে, তখনই রজ্জুর প্রয়োজন হইবে। অতি সাবধানী ব্যক্তি বলিতে পারেন, তৃণ দেখিলেই রজ্জু বাঁধিয়া রাখিব; কেন না দুর্দ্দান্ত গজ কখন আসিবে, কে বলিতে পারে? কিন্তু অবোধ মানব! এতদূর সতর্ক হইও না; কেননা তাহা হইলে তোমার গো, ছাগ, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি আশ্রিত ও বহু উপকারী প্রাণি সকল তৃণ না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে। একতাবন্ধন-বিষয়েও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। তবে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত বলিয়া কখন যে একতা-বন্ধন করা আবশ্যক, তাহা লিখিত হইল না।

কবি বলিয়াছেন;—

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

তিনি যথার্থই বলিয়াছেন; কেন না যাঁহাদের প্রেম, প্রণয় ও সৌহার্দ্দ্য বসুন্ধরা লইয়া, যাঁহারা বসুন্ধরাকে কুটুম্বীভূতা করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই উদার, নিঃস্বার্থ এবং স্বার্থত্যাগী। কিন্তু ঐ সকল উদারচরিত্র লোকেরা যে একতাবন্ধনে বদ্ধ, তাহা বলেন নাই; কেননা একতায় স্বার্থ আছে, বিরোধ আছে, আবার অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, প্রচ্ছন্নতা, আত্মম্ভরিতাও আছে,—উদার চরিত্রে, তাহা নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, এমন নহে,—কেননা অনৈক্য নাই বলিলেই যে একতা আছে এরূপ নহে; পরন্তু একতার মধ্যেও অনৈক্য আছে। (১ম) পরস্পরের মধ্যে এবং (২য়) স্বদল ব্যতীত অপরের আচরণের সহিত।

আজকাল যে একতার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যে কি পদার্থ এবং তাহা যে বিদেশীয় আমদানি তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে অবগত হইতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, একতা এক-দেশদর্শী ও পক্ষপাতী এবং এক বিষয় বা

এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিয়া লেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক প্রকার একতা ছিল, যাহাতে এক গ্রাম বা এক জনপদ বা এক দেশ আপনাদিগকে এক বংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত ও পরিচয় দিত। একগ্রাম গ্রামাধ্যক্ষের অধীনে থাকিত; তিনি তদ্‌গ্রামের প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তার উপর অধ্যক্ষতা করিতেন, প্রত্যেক কর্ত্তা আপন পরিবারের (স্ত্রী, পুত্র, দাস, দত্তকপুত্র প্রভৃতির) উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাহাদের মধ্যে একরূপ একতা জন্মিত; তাহার স্বভাব এইরূপ—একতাবলম্বীরা পরস্পরের মধ্যে আত্মীয় সম্বন্ধে বদ্ধ থাকিত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বড় আত্মীয়তা,স্নেহ,প্রণয়,ভক্তি ও মমতা জন্মিত। কেহবা কাহাকে পিতৃপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিত, কেহ বা পুত্রজ্ঞানে বাৎসল্য করিত। কিন্তু এইরূপ একতা যে গ্রাম বা দেশসম্পর্কে (অর্থাৎ এক গ্রামে বাস বা এক দেশে বাসের জন্য) ঘটিত, তাহা নহে। এরূপ একতা একটী অতি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ; সেই পরিবার একটী বৃহৎ গ্রাম বা জনপদ বা একটী বৃহৎ দেশস্থ জনসাধারণ লইয়া গঠিত ছিল। সেই বৃহৎ পরিবার যখন এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিত, একতাও পূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। এরূপ একতার ভিত্তি ছিল ব্যক্তি সমষ্টি অর্থাৎ ব্যক্তি সমষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সুখ, আশা ভরসা, লইয়া এই একতা সংগঠিত হইত। এই একতার মধ্যে যেটুকু অন্ধকার বা অজ্ঞান বা ভ্রম (যাহা একতার বন্ধন) তাহা পরস্পরের সৌহার্দ্দ গাঢ় তীব্র প্রণয় সমুদ্ভূত অর্থাৎ পুত্রের প্রতি ভালবাসা বা পুত্রের পিতার প্রতি ভক্তি যে প্রকারের বন্ধন, পূর্ব্বোক্ত একতার বন্ধনও তদ্রূপ ছিল।

হিন্দুজাতি নানা ভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটী মূলজাতি এবং অনেকগুলি সঙ্কর জাতি। ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্য ও ব্যবসা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে,পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে একতা আছে। সৌহার্দ্দ থাকিতে পারে, কিন্তু একতা নাই; কেননা আমাদের দেশের ব্যবসামাত্রেই যেন একরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-শূন্য। ব্রাহ্মণের কার্য্য শূদ্র করিতে পারে না, বৈশ্যের কার্য্য ক্ষত্রিয় করিতে পারে না; তবে আপদ্ পড়িলে স্বতন্ত্র কথা অর্থাৎ কেহই কাহারও কার্য্য করিতে পারে না। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শূন্য হইলেই একতা সম্ভবে না—অর্থাৎ যেখানে শত্রু নাই, বিরোধী লোক নাই সেখানে একতা নাই।

অতএব, হিন্দুজাতির যেরূপ ভাবে জাতীয় একতা ছিল বা যেরূপ একতা হিন্দুজাতির জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার সম্ভব, তাহা এইরূপ এবং এই সুনিয়মের উপর সংস্থাপিত। প্রত্যেক জাতি আপনার পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম ও ব্যবসা অবলম্বন করুক,ব্রাহ্মণগণ আপনাদের শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি অবলম্বন করুন ইত্যাদি। কিন্তু এ স্থলে অন্তরের প্রগাঢ় ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুজাতীর

জাতীয় একতা কিরূপে সংরক্ষিত হইবে। প্রবল বিজাতি বিদেশী সংঘর্ষে দারুণ জাতীয় ব্যবসা-বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং, কে জাতীয় ব্যবসা জাতিতে নিবদ্ধ রাখিবে? ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রত্যেক জাতিকে তাহার ব্যবসায়ে আবদ্ধ রাখিত। কিন্তু আর কি তা পারা যায় এবং স্বজাতিসিদ্ধ ব্যবসায় নিষ্ঠ থাকিলে তাহাকেই বা কে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? ধর্ম্ম-দণ্ড এ পাপ কলিযুগে আর নাই। কিরূপে যে হিন্দুজাতির জাতীয় একতা রক্ষিত হইবে বা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা মানব-বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তাধীন নহে। আমরা হিন্দুজাতির জাতীয় একতা বলিয়া যাহা বর্ণনা করিলাম,তাহা বাস্তবিক রক্ষণশীল একতা শব্দ বাচ্য। কেন না একতা দুই প্রকারের, একটী রক্ষণশীল (Defensive) অপরটী আক্রমণশীল (Aggresive)। হিন্দু-জাতির জাতীয় একতার মর্ম্ম এই, যাহাতে একতাভুক্ত লোকগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে—বহিঃশত্রু বা অন্তঃশত্রু কর্তৃক উদ্বেজিত বা উৎসাদিত না হয়।

শাস্ত্রে পররাষ্ট্রাভিযানের কথাও আছে বটে এবং বিজীগিষু নৃপতিগণ পররাষ্ট্র আত্মসাৎ করিতে পারেন, এরূপ অনুমতিও আছে বটে। রাজা স্বরাজ্যে সন্তুষ্ট না থাকিলে, তাহার লোভ নিবারণার্থ এরূপ অনুমতি, আদেশই বল না কেন, অতীব হিতকর। কেন না শাস্ত্রকারের ঈদৃশ অভিপ্রায় তাঁহাদের অনুমতি বিবিধ বিশেষণ দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। আর পররাষ্ট্র অন্বেষণ কখন কখন স্বার্থরক্ষার্থ বটে। কেন না পররাষ্ট্রজয়ের দ্বারা বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি, সল্লোকাবাপ্তি হইয়া থাকে। হিন্দুরাজগণকে পররাষ্ট্র জয়ের যে অনুমতি প্রদান করা হইত, তাহার বাস্তবিক অভিপ্রায় পূর্ব্বোক্তরূপই ছিল। কেন না বিজিত দেশের শাসন-কার্য্য তদ্দেশের প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে করিতে হইবে বলিয়া আদেশ এবং নানা প্রকার তদ্দেশ সম্পর্কে বিজেতা রাজার প্রতি উপদেশ দর্শনে ঐরূপ অভিপ্রায়ই বোধ হয়।

আর আক্রমণশীল একতাবদ্ধ লোকেরা সর্ব্বদা বল প্রকাশ করিয়া অন্য লোকদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে; না হয়, আপনাদের দলভুক্ত করিতে চায়। তাহাদের ইচ্ছা অপর সকলে তাহাদের সকল ছাড়িয়া শরণাপন্ন হউক অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে ঈদৃশ একতাবদ্ধ লোকেরা ধ্বংশশীল ও সংসারের ঘোর অনিষ্টকারক।

কেহ কেহ যদি মনে করেন," হিন্দুজাতির জাতীয় একতা" নষ্ট হইলে হিন্দুজাতির জাতীয়তা ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, হিন্দুজাতির শাস্ত্র এরূপ কঠোর ও এরূপ অজ্ঞান শাস্ত্রকারদিগের রচিত নহে যে, এক নিমিষেই জাতীয় একতা লোপ হইলেই, হিন্দুরজাতি লোপ ও ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাইবে। শাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া আপদ্‌কালে অনুষ্ঠেয় কার্য্যানুষ্ঠান বিবৃত আছে, তাহা পালন করিলেই হিন্দুজাতিত্ব রক্ষা হইবে। আর হিন্দুধর্ম্ম, তাহা ত অনেক দূরের কথা—হিন্দুজাতির লোপ হইলেও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপ

ভাসিয়া যাইলেও, যবন ম্লেচ্ছদিগের সহিত মিশিয়া একাকার লইলেও, হিন্দুধর্ম্ম পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইবে না। হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র মানিয়াও শাস্ত্র ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহার লাগাল পাওয়া মনুষ্যের বা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অসংখ্য শাস্ত্র স্রোতস্বিনী গিয়া অগাধ হিন্দুধর্ম্ম-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। ভক্তের হৃদয়-হ্রদ সেই ধর্ম্ম-সাগর সম্ভূত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অন্তর-প্রস্রবণ হইতে সেই ধর্ম্ম-সাগর (যাহা ক্ষণকালের জন্যও অপচীয়মান হয় না) সদা সর্ব্বদা পরিপূর্য্যমান হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল লাহা
এম, এ, বি, এল।

মনের প্রতি।

আরে রে অবোধ প্রাণ! কি হেতু আকুল?
কতদিন এল গেল, এমনি আসিবে যাবে,
পড়েছ পাথারে যদি কোথা পাবে কূল?
জীবন জলধি যেরে তরঙ্গ সঙ্কুল!

কোন দিকে চাহিওনা, কারে কিছু বলিওনা
নীরবে স্রোতের মুখে চল ভেসে ভেসে;
উত্তরি আবর্ত্ত কত, ছাড়ায়ে আঁধার দেশ,
অপার করুণা সিন্ধু জান না কি শেষে?

আশার কুসুমাবাস, নিরাশ কীটেতে ঘেরা,
আশ্বাশের চারিপাশে নিরাশ্বাস মাখা;
স্বার্থের সংসার শুধু অসার কথায় ভরা,
এযে কায়া ছায়া মাত্র স্বপ্ন-পটে আঁকা!

অসীম মায়ার রাজ্যে, কুহক ছলনা হাসি
ভালবাসা মরীচিকা ধাঁধায় মানসে!
ভুলায়ে সে চেনা পথ, স্নেহ আসি হাতে ধরে
নিয়ে যায় শেষে কোন্ যাতনার দেশে!

আর তুমি কাঁদিওনা কাঁদিবার কিছু নাই,
দেখিলে ত এতদিন করিয়া রোদন;
উপাড়িয়ে মমতায়, পাষাণে বাঁধরে বুক
ব্যথারে জড়ায়ে ধর, সুখ পাবে মন।

স্মৃতির ছায়াটি রেখে, কাহার মানস পটে—
কোথা তুমি চলে যাবে কি হবে কাহার!
ফুরা'লে দীপের আলো,ছায়া তার নিজে হতে
মিশায় আঁধারে শেষে, আঁধারে আঁধার!!

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

বিপন্ন-পথিক।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কপালগুণে গোপাল।

দশহরা—দেশের লোক কলিকাতায় আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। ঘাট, বাট প্রভৃতি সকল স্থানই জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানি পসারি মহাধুমে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। নানা বর্ণের নরনারীগণ, স্নানার্থ গঙ্গার ঘাটে গমন করিতেছে; ছেলেরা পুতুল কিনিতেছে। নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ উপকরণাদি মায়ের সম্মুখে শোভা পাইতেছে। নানাবিধ পুষ্প-মালা মায়ের বক্ষস্থলের অতুল শোভা সম্পাদন করিতেছে। চারিদিক আনন্দময়,—চারিদিক কোলাহলে পরিপূর্ণ।

বেলা ছয়টা বাজিল, ভবানী বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। চোকে মুখে জল দিয়া গঙ্গাপূজার বাজার করিতে গেলেন এবং কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি গামছায় খুঁটে বাঁধিয়া গৃহিণীর নিকটে আসিয়া ধরিয়া দিলেন। গৃহিণী স্নান করিয়া পূজার আয়োজন করিতে বসিলেন। ভবানীবাবু বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া মহিনকে বলিলেন "মহিন! একটা পরামাণিক ডাক্—দাড়ীটা কামাতে হবে।" মহিন দেখিল দাদামহাশয় পড়িতে বলেন নাই, বাপের সুপুত্রের ন্যায় পরামাণিক ডাকিতে বলিয়াছেন। অতএব, দাদামহাশয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ সদর দরজায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পাঁচঘণ্টার মত অতিবাহিত হইল—তথাপি মহিন পরামাণিক পাইল না; সুতরাং বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, আশালতার মুকুল স্বরূপ, একজন পূর্ব্বদেশীয় যুবা স্নান করিয়া বাসায় যাইতেছে; তাহার কক্ষদেশে গামছা মণ্ডিত আর্দ্র বসন, নরসুন্দরের ভাঁড় স্বরূপ শোভা পাইতেছে! মহিন মনে ভাবিল—এ ব্যক্তি প্রামাণিক না হইয়া যায় না; কিন্তু ললাটদেশে চন্দন দেখিয়া সন্দেহও জন্মিল। মহিন দেখিল,আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, 'লাগে তুক্ না লাগে তাক্' একবার ডাকিয়া ফেলা যাউক। মহিন "পরামাণিক" বলিয়া সজোরে একটি হাঁক্ দিয়াই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল; যেন কে ত কে ডাকিয়াছে। মহিনের সৌভাগ্যক্রমে সেই পূর্ব্ব দেশীয় যুবা 'কুর্ত্তা কি বল্‌ছেন'—বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মহিন তখন সাহসে নির্ভর করিয়া সদর্পে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যদি পরামাণিক্ তবে তোমার 'কাণ খুস্‌কি' নাই কেন?"—যুবা তাহার সকল কথা সম্যক

অনুধাবন করিতে না পারিয়া কেবল এই মাত্র বলিল "এজ্ঞে আমার নাম পরামাণিক নয় আমার নাম মাণিক।" মহিন বলিল "হাঁ হাঁ ঐ ঐ এস এই বাড়ী";—মাণিক অগত্যা সম্মত হইল।

মহিন, মাণিককে সঙ্গে লইয়া দাদামহাশয়ের নিকটে ধরিয়া দিল। দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "পরামানিক?" মহিন বলিল "এই যে"। ভবানী বাবু কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন "হায় রে! উপযুক্ত নাতি আমার কি পরামাণিকই ডেকে এনেছে, হরি হে কোথায় আছ? শীঘ্র শীঘ্র ডেকে নাও আমায়—আমার হাড়টা জুড়ুক।

মহি। কেন? তুমি ডাক্‌তে বল্লে, আমি ডেকে নিয়ে এলুম্।

ভবা। আ হা! হায়! হায়! কি পরামাণিকই ডেকেছ! মরে যাই আর কি।

মহি। তা এত কে জানে? ওর বগলে ঐ রকম রয়েছে, আমি মনে করলুম্ ও পরামাণিক না হয়ে যায় না। তবু আমি বল্লেম্ তোমার 'কাণ খুস্‌কি' নাই কেন? তাতে ও বেটা ত কিছু বল্লে না।

মাণি। আপনি গাইল দিচ্ছেন, মিছামিছি গাইল দিবেন না।

মহি। বেটা! তোকে গাল দেবো না! তুই বল্লি কেন "আমার নাম মাণিক"।

মাণি। দেখেন্ দেখেন্ কুর্ত্তা! আপনার পুত্র গাইল দিচ্ছেন আমি কিছুই করি নাই।

ভবা। দেখ বাপু! তুমি ওর মুখে কঁ্যাৎকরে একটা লাথি মেরে আপনার ঘরে চলে যাও।

মহি। ইস্! তা আর মার্‌বে না।

ভবা। মারবেইত।—তুই কোন আগামে ভদ্রলোককে—না হয় পূর্ব্বদেশীয়ই হ'ল—পরামাণিক বলে ডেকে নিয়ে এলি?

মহিন নীরব হইল। মাণিক অনেক মাথা ঘামাইয়া বুঝিতে পারিল ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছে। ফলতঃ সে পূর্ব্বে, ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিয়া সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বলিল, "কল্‌কতাই বদ্দর লোক সব ইমনি অয়, আমি অইলাম কুলীন কায়স্থ বদ্দর সন্তান, আমায় তুমি পরাণিক কও? মুশয়! আপনি বিচার করবেন, আপনার পুত্র আমায় পরামাণিক কয়।

মহিন রাগান্ধ হইয়া, মাণিককে মারিতে উদ্যত হইল। বলিল, "দেখ, ফের তুই পুত্র পুত্র কর্‌বি ত তোকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো, আ কচু পোড়া খেলে যা—সেই অবধি পুত্র পুত্র করে কাণটা ঝালা পালা করে দিলে।

ভবানী বাবু দেখিলেন দুই জনে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। মাণিককে বুঝাইয়া বলিলেন, "যাও বাবা! ঘরে যাও, ওটা গণ্ডমূর্খ দেখতে পাচ্ছনা? ওটার জ্ঞান থাকিলে কি আর তোমায় পরামাণিক বলে?"

পূর্ব্বদেশীয় যুবা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। মহিন দাদামহাশয়কে বলিল "তুমি কেমন ধারা লোক? যাকে তাকে বল 'ওর মুখে লাথি মার'।"

ভবা। বল্‌ব না তো কি? তোর যেমন বুদ্ধি।

বিপন্ন-পথিক।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কপালগুণে গোপাল।

দশহরা—দেশের লোক কলিকাতায় আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। ঘাট, বাট প্রভৃতি সকল স্থানই জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানি পসারি মহাধুমে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। নানা বর্ণের নরনারীগণ, স্নানার্থ গঙ্গার ঘাটে গমন করিতেছে; ছেলেরা পুতুল কিনিতেছে। নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ উপকরণাদি মায়ের সম্মুখে শোভা পাইতেছে। নানাবিধ পুষ্প-মালা মায়ের বক্ষস্থলের অতুল শোভা সম্পাদন করিতেছে। চারিদিক আনন্দময়,—চারিদিক কোলাহলে পরিপূর্ণ।

বেলা ছয়টা বাজিল, ভবানী বাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। চোকে মুখে জল দিয়া গঙ্গাপূজার বাজার করিতে গেলেন এবং কিঞ্চিৎ ফলমুলাদি গামছার খুঁটে বাঁধিয়া গৃহিণীর নিকটে আসিয়া ধরিয়া দিলেন। গৃহিণী স্নান করিয়া পূজার আয়োজন করিতে বসিলেন। ভবানীবাবু বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া মহিনকে বলিলেন "মহিন! একটা পরামাণিক ডাক্—দাড়ীটা কামাতে হবে।" মহিন দেখিল দাদামহাশয় পড়িতে বলেন নাই, বাপের সুপুত্রের ন্যায় পরামাণিক ডাকিতে বলিয়াছেন। অতএব, দাদামহাশয়ের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ সদর দরজায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পাঁচঘণ্টার মত অতিবাহিত হইল—তথাপি মহিন পরামাণিক পাইল না; সুতরাং বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, আশালতার মুকুল স্বরূপ, একজন পূর্ব্বদেশীয় যুবা স্নান করিয়া বাসায় যাইতেছে; তাহার কক্ষদেশে গামছা মণ্ডিত আর্দ্র বসন, নরসুন্দরের ভাঁড় স্বরূপ শোভা পাইতেছে! মহিন মনে ভাবিল—এ ব্যক্তি প্রামাণিক না হইয়া যায় না; কিন্তু ললাটদেশে চন্দন দেখিয়া সন্দেহও জন্মিল। মহিন দেখিল, আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, 'লাগে তুক্ না লাগে তাক্' একবার ডাকিয়া ফেলা যাউক। মহিন "পরামাণিক" বলিয়া সজোরে একটি হাঁক্ দিয়াই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল; যেন কে ত কে ডাকিয়াছে। মহিনের সৌভাগ্যক্রমে সেই পূর্ব্ব দেশীয় যুবা 'কুর্ত্তা কি বলছেন'—বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মহিন তখন সাহসে নির্ভর করিয়া সদর্পে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যদি পরামাণিক্ তবে তোমার 'কাণ খুস্কি' নাই কেন?"—যুবা তাহার সকল কথা সম্যক

অনুধাবন করিতে না পারিয়া কেবল এই মাত্র বলিল "এজ্ঞে আমার নাম পরামাণিক নয় আমার নাম মাণিক।" মহিন বলিল "হাঁ হাঁ ঐ ঐ এস এই বাড়ী";—মাণিক অগত্যা সম্মত হইল।

মহিন, মাণিককে সঙ্গে লইয়া দাদামহাশয়ের নিকটে ধরিয়া দিল। দাদামহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "পরামানিক?" মহিন বলিল "এই যে"। ভবানী বাবু কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন "হায় রে! উপযুক্ত নাতি আমার কি পরামাণিকই ডেকে এনেছে, হরি হে কোথায় আছ? শীঘ্র শীঘ্র ডেকে নাও আমায়—আমার হাড়টা জুড়ুক।

মহি। কেন? তুমি ডাক্‌তে বল্লে, আমি ডেকে নিয়ে এলুন্।

ভবা। আ হা! হায়! হায়! কি পরামাণিকই ডেকেছ! মরে যাই আর কি।

মহি। তা এত কে জানে? ওর বগলে ঐ রকম রয়েছে, আমি মনে করলুম্ ও পরামাণিক না হয়ে যায় না। তবু আমি বল্লেম্ তোমার 'কাণ খুস্‌কি' নাই কেন? তাতে ও বেটা ত কিছু বল্লে না।

মাণি। আপনি গাইল দিচ্ছেন, মিছামিছি গাইল দিবেন না।

মহি। বেটা! তোকে গাল দেবো না! তুই বল্লি কেন "আমার নাম মাণিক"।

মাণি। দেখেন্ দেখেন্ কুর্ত্তা! আপনার পুত্র গাইল দিচ্ছেন আমি কিছুই করি নাই।

ভবা। দেখ বাপু! তুমি ওর মুখে ক্যাঁৎকরে একটা লাথি মেরে আপনার ঘরে চলে যাও।

মহি। ইস্! তা আর মার্‌বে না।

ভবা। মারবেইত।—তুই কোন আগামে ভদ্রলোককে—না হয় পূর্ব্বদেশীয়ই হ'ল—পরামাণিক বলে ডেকে নিয়ে এলি?

মহিন নীরব হইল। মাণিক অনেক মাথা ঘামাইয়া বুঝিতে পারিল ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছে। ফলতঃ সে পূর্ব্বে, ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিয়া সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বলিল, "কল্‌কতাই বন্দর লোক সব ইমনি অয়, আমি অইলাম কুলীন কায়স্থ বন্দর সন্তান, আমায় তুমি পরাণিক কও? মশয়! আপনি বিচার করবেন, আপনার পুত্র আমায় পরামাণিক কয়।

মহিন রাগান্ধ হইয়া, মাণিককে মারিতে উদ্যত হইল। বলিল, "দেখ, ফের তুই পুত্র পুত্র করবি ত তোকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো, আ কচু পোড়া খেলে যা—সেই অবধি পুত্র পুত্র করে কাণটা ঝালা পালা করে দিলে।

ভবানী বাবু দেখিলেন দুই জনে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। মাণিককে বুঝাইয়া বলিলেন, "যাও বাবা! ঘরে যাও, ওটা গণ্ডমূর্খ দেখতে পাচ্ছনা? ওটার জ্ঞান থাকিলে কি আর তোমায় পরামাণিক বলে?"

পূর্ব্বদেশীয় যুবা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। মহিন দাদামহাশয়কে বলিল "তুমি কেমন ধারা লোক? যাকে তাকে বল 'ওর মুখে লাথি মার'।"

ভবা। বল্‌ব না তো কি? তোর যেমন বুদ্ধি।

মহি। বুড়ো হয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে দেখ্‌ছি।

ভবা। নে, নে, ঢের হয়েছে, এখন বসে পড়্‌গে যা।

মহি। আজ ছুটী।

ভবা। তা হ'লেই চতুর্ভুজ হ'লি আর কি।

মহি। সে যা' হক, তুমি এমনি করে যার তার সামনে অপমান কর, আমি এখানে থাক্‌তে চাই না। এক দিন কাকেও কিছু না বলে এক যায়গায় চলে যাব—তখন দেখতে পাবে।

ভবা। যাবে কোন্ চুলোয়?

মহি। সে যে চুলোয় হোক্—আমি থাকচিনে এখানে।

দুই জনে এই রূপ বচসা হইতেছে শুনিতে পাইয়া মহিনের মাতা জানালায় আসিয়া বলিলেন,—"বাবা! গঙ্গাপূজার আয়োজন হয়েছে।" ভবানী বাবু বলিলেন, "রসো কপালগুণে গোপাল পেয়েছ, তা আবার গোপালকে একটু শাসন করলে তোমার গায়ে লেগে যায়। তা মা! তোর এ ছেলেকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তোর ঐ ছেলেটি নিয়েই থাক্; আমি এক জায়গায় চলে যাই, আমার এ সংসারে আর কায নাই। প্রভা! তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বইয়ে দিলে; আমার দোষ নাই।

প্রভাবতী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; পিতার কথায় কোন উত্তর দিলেন না।

ভবানীবাবু বাটীর ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে মহিনের বয়স্য বিপিন আসিয়া সদরদ্বারে শীশ্ দিল। মহিন সাড়া দিল—"চি-দাঁ চি-ড়া"

বিপি। চি-যা চি-বি?

মহি। চি-কো চি-থা?

বিপি। চি-বা চি-গা চি-নে।

মহি। চি-যা চি-বো।

বিপি। চি-ত, চি-বে চি-আ চি-য়।

ভবানী বাবু উভয়ের এই সাঙ্কেতিক বাক্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে মনে অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে বলিলেন "তোরা কি বল্‌তে লেগেছিস্, তোদের ইংরিজি ফার্‌সি যে কিছুই বুঝতে পার্চ্চিনে।"

মহি। ও কিছু নয়—ও কি না গঙ্গায় নাইতে যাবে তাই আমাকে ডাক্‌ছিল—

ভবা। আর তুই কি বল্‌ছিলি?

মহি। আমি বল্‌ছিলুম আমি দাদামশাইয়ের সঙ্গে যাব।

ভবা। তবে অমন করে বলছিলি যে?

মহি। কেমন করে?

ভবা। ঐ যে কি 'চি-বি চি-বি' করছিলি?

মহিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল "বাঃ আপনি বুঝি এই শুন্‌লেন্—বেশ কাণ আপনার?

ভবানী বাবু মহিনের বাক্‌চাতুর্য্যে অবাক হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন এ রোগ আরোগ্য হইবার নয়। ভাবিলেন আমরাও অভিভাবকের কাছে অনেক চাতুরি করিতাম; যদিও ধরা পড়িতাম, তথাপি করিতে ছাড়িতাম না; কিন্তু এরূপ ত কোথাও শুনি নাই। বলি এ ছেলেগুলোর দশা

হবে কি গো! কালে কালে আরও কত হবে। আমরা লেখা পড়া জানি না জানি চাকরী বাকরী করেও বাইরের টাকা ঘরে এনেছি। এরা যে কি কর্‌বে কিছুই বল্‌তে পারি নে। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে তা শ্রীধরই বল্‌তে পারেন। একে এই বৃদ্ধ বয়স, কবে আছি কবে নাই, তাতে এরা মায় পোয়ে আমাকে যে কি জ্বালাতন কর্‌ছে তা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। কন্যাটীর যে কি পেলে মন ওঠে তা ভেবে চিন্তে ঠিক কর্‌তে পারি নে। সদাই অসন্তোষ, সদাই রাগ, সদাই গোষা; আরে মোলো তোর অদৃষ্টে সুখ নাই আমি কি কর্‌বো? বিবাহ দিলাম সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর,—তা নয়—তার মাথাটা খেয়ে ফেল্লি। বাপের বাড়ী এলি মানিয়ে জুনিয়ে থাক্, তাও নয় গর্ভধারিণীর সঙ্গে সদাই কলহ; মা বাপের কাছে যদি সুখ পেলিনে তবে আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় পাবে?

রৌদ্র ক্রমে অঙ্গনে নামিল দেখিয়া, ভবানী বাবু চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন এবং বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূজার উপকরণাদি একটী ভারবাহকের স্কন্ধে দিয়া গঙ্গাপূজায় গমন করিলেন। ভবানীবাবু প্রমাণ পাইলেন যে, মহিনের সকল কথাই মিথ্যা। অন্তরের যাতনা বলবতী হইল। তিনি শূন্যমনে গঙ্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহিন একটু অন্তরালে গিয়া দেখিতে লাগিল। ভবানী বাবু দ্বারদেশে বিপিনকে দেখিয়া কিছুই বলিলেন না।

বিপিন বিলম্ব দেখিয়া মহিনের মায়া কাটাইবার পূর্ব্বে আর একটি ছাড় শিশ্ দিল। শ্যামের বাঁশি বাজিলে কি আর গৃহে থাকা যায়? মহিন অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপিনের নিকট গমন করিল। বিপিন মহিনকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "ভাই এমন ছুটির দিনটা কি একবারে অমনি অমনি যাবে?" মহিন বলিল, "উঁহু তাও কি কখন হয়?"

বিপি। তবে একখান্ গাড়ী ডাকি—কি বলিস?

মহি। তাও আবার জিগেষ করতে হয়? তুইত ভারি নাবালক দেখ্‌ছি।

বিপি। টাকা?

মহি। দিদিমার বাক্সর চাবি হারিয়েছে।

বিপি। বলিস্ কি!

মহি। তা না ত কি?

বিপি। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কটা তবে তোর না কি?

মহি। আমিই বা কে আর লাটই বা কে?

বিপি। যদি জুতিয়ে করে?

মহি। তুই বড় বে-আদব।

বিপি। না—তাই বল্‌ছি, তখন রক্ষা কর্‌বে কে?

মহি। কেন? আমার টাকা আমি খরচ কর্‌চি তাতে কে কি বলবে?

বিপি। তোমার যদি, তবে তুমি লুকিয়ে নাও কেন?

মহি। আরে বুড়ো বুড়ী চোক বুজলেই আমার সব। তা ওরা যখন চোক বুজিয়ে ছিল, তখনই ত নিয়েছি।

বিপি। তোর সঙ্গে কথায় পারুব না, তবে আর দেরি করিস্‌নে বেলা হলো।

মহিনের একসুট্ কাপড় বাহিরের ঘরেই থাকে। অমনি সাজ গোজ আরম্ভ করিল ও চক্ষের নিমিষে একটি 'ইয়ার ছোক্‌রা' সাজিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

আষাঢ় মাস,—রজনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরত বৃষ্টিপাত হইতেছে। পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—শুক্লপক্ষ চন্দ্রদেব অদ্য চৌদ্দকলায় পরিপূর্ণ; লোকেও বলিতেছে আজ শুক্ল পক্ষীয়চতুর্দ্দশী তিথি; কিন্তু কৈ তাহার নিদর্শন কোথায়? কৌমুদি! আজি কি তুমি অন্ধকারে পরিণত হইয়াছ? না না—ঐযে চপলা হাত নাড়িয়া আমার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিকরিতেছে। শশধর! তুমি নিতান্তই শান্ত; নিতান্তই মৃদু; এই কাল কুটীল তমোজাল অপসারিত করিতে তোমার সুকোমল করযুগল ব্যথিত হইবে, তাই অকারণ তুমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ না। ভানু কখন এরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে চাহেন না। সত্য বটে ঘন-ঘটার ঘন আবরণ ভেদ করা তাঁহার পক্ষে বড় সহজ নহে; কিন্তু স্বরাজ্য সংস্থাপন সূচক ঘোষণাপত্র প্রচারে পরাঙ্মুখ থাকিতে পারেন না। শশাঙ্ক! একবার দেখা দাও; চকোর দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাকে একটু সুধা দান কর। আমিও তোমার প্রকাশে কোথায় কি হইতেছে প্রকাশ্য দেখিয়া লই।

দিবসের কঠিন পরিশ্রম ভোগ করিয়া অনন্তরাম গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত; কিন্তু নলিনীর চক্ষে ঘুম নাই। কেন নলিনি! আজ এত চুল্ বুল্ করিতেছ কেন? রাত্রিও অধিক হইয়াছে, তবে আর উস্‌পিস্ করিয়া পিতার নিদ্রা ভঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইতেছ কেন? পিতা ঘুমাইয়াছেন, তুমিও একটু ঘুমাও। হাঁ লক্ষ্মী মেয়ে একটু নিদ্রা যাও।

নলিনী দেখিল,পিতা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত, কাযে কাযেই আর কাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিবে? কাহার সহিত আর 'সাত ভাই চম্পা' 'রাজার ছেলে' 'কন্‌কারাক্ষসী'র গল্প করিবে? সুতরাং শয়ন করিয়া অচিরে নিদ্রাভিভূতা হইল। শান্তির সুবিমল ছায়া নলিনীর বদনমণ্ডলে পতিত হইল নীল নয়ন নিমীলিত হইল। নিদ্রে! তুমি পার্থিব চিন্তার প্রনাশিনী। তোমার সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া মনুষ্য, স্বর্গের সুখদ স্বপ্নসন্দর্শন করে; তোমার সুকোমল কর-সেবিত হইয়া সমস্ত পরিশ্রম সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পারা যায়; তোমার মহিমা অনন্ত।

কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা গিয়াই নলিনী কর প্রসারণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিল। অনন্তের এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে নলিনী একটু নড়িলে চড়িলেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। স্ত্রী বিয়োগের পর, অনন্তরাম নলিনীর জনক

ও জননী উভয়ই হইয়া বসিয়াছেন। নলিনী অনেকক্ষণ উস্‌পিস্‌ করিতেছিল, কিন্তু অদ্য রজনীতে অনন্তরাম এত ঘুমাইয়াছেন যে কিছুই তাঁহার অনুভব হয় নাই। নলিনী উঠিয়া বসিয়াই হাত দিয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না দেখিয়া নলিনী—'কৈ মা কোথায় গেলি মা!'—বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। এই বার অনন্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনন্ত উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন নলিনীর নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ; নলিনী পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। নলিনী যেন কি হারাইয়াছে।

অনন্ত শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা! কাঁদিস্‌ কেন—কি হয়েছে? নলিনীর কথা নাই। অনন্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এদিক্‌ ওদিক্‌ কি দেখ্‌চিস্‌ মা? নলিনী অভিমান-ভরে, রোদন করিতে করিতে বলিল,—"তুমি আর একটু ভাল ক'রে ঘুমোও।"

অন। কেন, কি হ'য়েছে?

নলি। আমি কি একলা পারি?

অন। কি একলা পারবি?

নলি। মা এসেছিলেন।

অন। আ পাগ্‌লি! তাই কাঁদ্‌চিস্‌?

নলি। ধরি ধরি ক'রে ধর্‌তে পারলুম্‌ না, কাঁদব না?

অন। আর কি তা'কে ধর্‌তে পারবি; মা! আর কি তা'কে ধর্‌তে পারবি? সে কোন্‌ কালে কোথায় পালিয়েছে।—

নলি। পালাবেন কোথায়? তুমি জেগে থাক্‌লে ধর্‌তে পার্‌তে, তোমার হাত ছাড়িয়ে তিনি পালাতে পারতেন না।

অন। হা! পালাতে পার্‌ত না যদি, তবে পালাল কেমন করে?

নলি। আচ্ছা তুমি একটু জেগে থাক—আবার আসবেন এখন।

অন। পাগ্‌লি! জেগে জেগে আমার অনেক রাত কেটে গেছে, কৈ একদিনও ত সে দেখা দেয় না।

নলি। বাবা! তুমি এক দিন ও দেখ্‌তে পাওনা, আমি কেমন আজ দেখ্‌তে পেলুম্‌। সেই ঢল্‌ ঢলে হাসি হাসি মুখ, সেই ডাগর ডাগর টানা চোক—ও বাবা! আমি সেই সবই দেখলুম; কিন্তু ধরতে পারলুম্‌ না। তোমার পায়ে পড়ি বাবা! চুলো না একটু জেগে থাক।

অন। নলিনি! পাগলের মত আর বকিস্‌নে একটু ঘুমো।

নলিনীর রাগ উপস্থিত হইল—বলিল তুমি ঘুমোও গে যাও আমার অত ঘুম নাই। আমি আজ সারা রাত জেগে থাক্‌ব, এ পাড়ায় এসেছেন যখন, আমি আর তাঁকে ছাড়চিনে।

নলিনী উঠিয়া প্রদীপ উস্‌কাইয়া দিল এবং দরজার খিল খুলিয়া বসিয়া রহিল।

নলিনীর এবম্বিধ আচরণে অনন্তের হাসি আসিল,—বলিলেন "নলিনি! সে এ পাড়ায় আস্‌বে কি, সে এ জগতে নাই, সে স্বর্গের লোক, দিন কতক শাপভ্রষ্ট হ'য়ে এখানে বেড়াতে এসেছিল, বেড়ান চেড়ান সাঙ্গ হলো, আপনার দেশে চলে গেল, হা!—"

নলিনী বলিল—"তুমি ভোলালে আমি ভুলব কেন? এই কতকক্ষণ আমার কাছে এসে কতকথা কইছিলেন—আমার বুঝি সে কথা আবার শুন্‌তে ইচ্ছে করে না? আমার বুঝি সে মুখ আবার দেখতে ইচ্ছে করে না? আবার বুঝি সে কোলে আবার উঠ্‌তে ইচ্ছে করে না?—আমিত বল্‌ছি তোমার ঘুম পেয়ে থাকে তুমি ঘুমোও, আমায় জ্বালিও না।"

অনন্ত বিষম মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি, মনে জানেন নলিনী এখনি ঘুমাইয়া পড়িবে আমিও ঘুমাইয়া পড়িব, কিন্তু গৃহদ্বার খোলা থাকিবে। অনন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে তোর সঙ্গে কি কথা কইছিল মা?" নলিনী বলিল শুনবে তবে শোনো—"মা আমায় বল্লেন্—নলিনি! এখানে আর কতদিন থাকবি? এখানেকি সুখ আছে? এ যে দুঃখের সংসার, এখানে খালি কষ্ট, খালি যন্ত্রণা, খালি ভাবনা, দেখ দেখি নলিনি! আমি এ সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে কেমন আছি। আমি যেখানে আছি, সেখানে কেমন হাওয়া, কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে, কত সুন্দর সুন্দর পাখী গান গায়। নলিনি! সেখানে একবার গেলে আর ভুল্‌তে পারবিনে, সেখানে একবার গেলে আর এ দিকে ফিরে চাইবিনে, আয় মা! আয়, আমি তোকে এখান থেকে চুরি করে নিয়ে যাই। আমি তোকে ভাল কথাই বল্‌ছি আমার কথা শোন্ তা নইলে দুঃখে মরবি। নলিনী তোর যদি না আস্‌তে ইচ্ছে যায়, তবে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি রাজপুত্রের সঙ্গে তোর বিবাহ হোক্ তুমি সাত বেটার মা হও; কিন্তু নলিনি! অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘট্‌বে। দেখ্ দেখি নলিনি! আমি কেমন পালিয়ে এসেছি এখান থেকে পালাতে পার্‌লেই ভাল।—এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে মা আমার, কোথায় পালিয়ে গেলেন্ বাবা! তুমি বাইরে গিয়ে একবার দেখ, তিনি তুলসী পিড়ির কাছে বস্‌তে ভাল বাস্‌তেন সেই খানেই বুঝি বসে আছেন, সেই খানেই বসে তিনি মালা সাধন কর্‌তেন সেই খানেই হয় ত বসে আছেন।

অনন্ত দেখিলেন্ বিষম বিভ্রাট। ভাবিলেন একবার বাহিরে গিয়াই দেখি, ইহাতেও যদি নলিনী ক্ষান্ত হয়। নলিনীর কথায় অনন্ত বাহিরে গেলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—"কৈ মা! দেখতে পেলেম না, হয় ত কাল সকালে আবার আসবে।"

নলিনী বলিল "কাল যদি সকালে আসেন তবে, তাঁকে কি খাওয়াবে? ঘরেত কিছু নেই।" অনন্ত বলিলেন—"আমরা যা খাবো তাকেও তাই খাওয়াব।"—নলিনী বলিল—"তাকি হয়, এত দিনের পর তিনি এসেছেন, তাঁকে ভাল করে খাওয়াতে হবে—"

"এত দিনের পর" এই কথাটি শুনিয়া অনন্ত আর থাকিতে পারিলেন না। অসহ্য শোকাবেগ হৃদয়-মর্ম্ম ভেদ করিয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। নলিনী দেখিল পিতা কাঁদিতেছেন। সত্বর উঠিয়া অঞ্চল দ্বারা

তাঁহার নেত্রজল মুছাইয়া দিল; বলিল, "বাবা! তুমিই ত বল্ছ কাল সকালে আস্বে, তবে আর কাঁদ কেন?

অনন্তের উভয় সঙ্কট। "এ জন্মে আর তা'কে পাব না," এ কথাটী অনন্ত আর ওষ্ঠপ্রান্তে আনিতে পারিলেন না। পাগলিনী কন্যাকে বুঝান ভার হইয়া উঠিবে। অনন্ত বলিলেন, "পাগ্লি! তার জন্যে কি কাঁদ্ছি,—আমি কাঁদি যে জন্যে সে তুই জান্বি কি?" নলিনী বলিল, "বাবা! অত রকম রাঁধ্বে কে?" অনন্ত বলিলেন, "সে ভার আমায় সে দিয়ে গেছে, আমিই রাঁধব। আমি যে এখন তোর দুইই হয়েছি।"

নলি। ইস্ তা আর হ'তে হয় না।

অন। আর না হলুম্ কেমন ক'রে?

নলি। কৈ তুমি ত মার মতন মেয়ে ক'রে কাপড় পর না, ঘোম্টা দাও না, চুল বাঁধ না, গয়না পর না—কিছুই কর না, তুমি আবার মা হয়েছ! হ্যাঁ তোমার গোঁফ রয়েছে, জুতো পায় দাও, তামাক খাও, তুমি আবার মা হয়েছ! তা'আর হতে হয় না। হ্যাঁ, ভাল মনে, তুমি আবার আফিসে যাও, পাগড়ি মাথায় দাও, চস্মা চোকে দাও তুমি কি করে মেয়ে মানুষ হবে? মা, তুমি নও, মা এসে ছিলেন। আমি অমন তোমার কথায় ভুলি নে। তুমি বাবা, বাবাই আছ। মা ত আমায় বল্তেন না যে, আমি তোর বাবা।

নলিনীর সরলতা সন্দর্শনে অনন্তের অন্তঃকরণ অধিকতর গাঢ় শোকে নিমগ্ন হইল। ভাবিলেন—হায়! নলিনী আমার কিছুই জানে না, মা আমার একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, মা আমার সেই পঞ্চম বর্ষের শিশুটির মতনই রহিয়া গিয়াছে।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! মা আমায় যা যা কর্তে বলেন, আমি তা কেমন করে কর্ব? মা যদি আর না আসেন্, মা যদি আমায় সঙ্গে ক'রে না নিয়ে যান্, তা হলে আমি কেমন করে মায়ের বাড়ী যাব? হ্যাঁ বাবা! সে কি অনেক দূর? হ্যাঁ বাবা, সে কি গাড়ী করে যাওয়া যায়? মা যদি না আসেন্, তুমি আমায় সঙ্গে করে রেখে আস্তে পার্বে? মা বলেছেন, সে খানে কেমন হাওয়া, কত ফুল, কত পাখী! আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে কর্চে। বাবা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

অন। আগে আমি যাব, তার পর, তোর যা খুসি হয়, তাই করিস্

নলি। ইস্ তা বই কি! তুমি এত বড় হয়েছ, তোমার দেখ্তে সাধ যায়, আর আমি এত ছোট, আমার বুঝি যেতে ইচ্ছে করে না? তোমায় ত আর ডাকেন্ নি—

অন। আমাকেই আগে ডাক্বে।

নলি। তুমি যদি ও কথা বল্বে, তা হলে আমি ফুক্ ক'রে কোথা দিয়ে পালিয়ে যাব, তুমি দেখতেও পাবে না।

অনন্তের অন্তঃকরণ একটু চিন্তাকুল হইল; ভাবিলেন এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখাও ত ভাল নয়, তিনি ইষ্টদেবতার নাম করিতে লাগিলেন। নলিনীর চক্ষে ঘুম নাই। অনন্ত বলিলেন, "নলিনি! আজ ত আর সে আস্বে না, সেই কাল সকালে আস্বে। তুই একটু

ঘুমো না কেন; আর যে রাত নেই, এখনই ভোর হবে। ভোর হলে আমি তোকে ডেকে দোব।"

নলিনী বলিল, "আচ্ছা তবে আমি একটু শুয়ে থাকি, আমি কিন্তু ঘুমোব না।"

অন। হ্যাঁ মা, তুমি একটু শুয়ে থাক, ঘুমোবে কেন?

নলি। ঘুমোলে আমায় জাগিয়ে দেবে?

অন। দোবো বই কি মা!

নলি। তা নইলে আমি কিন্তু কাঁদ্‌ব।

কথা কহিতে কহিতে নলিনীর নিদ্রাবেশ হইল, নয়নদ্বয় ক্রমে নিমীলিত হইয়া আসিল। শেষ নিশার সুমিষ্ট নিদ্রায় নলিনী অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্ত কেবল এই টুকুই অপেক্ষা করিতে ছিলেন, সুতরাং শয়ন করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

স্বপ্ন! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি পথের ভিখারীকে রাজা কর, রাজাকে দুর্গম কান্তারের তৃণ শয্যায় শায়িত কর, তুমি কখনও বা বৃথা ভয় ভাবনার সংঘটন করিয়া সুষুপ্তির শান্তিময় রাজ্যে অশান্তির বিস্তার কর, কখনও বা কারাগারে প্রবেশ করিয়া নিগড়বদ্ধ কারাবাসীর অন্তঃকরণে স্বাধীনতার শুভ্র আলোক জ্বালিয়া দাও। তুমি যে কি বস্তু, কোথায় তোমার বাস, কোথা হইতে আসিয়া তুমি যে এই নরলোকে অসম্ভবের সম্ভবতা সম্পাদন কর, তাহা বলিতে পারি না। ভাল, স্বপ্ন! আমি একটি প্রিয়বস্তু হারাইয়াছি, আমি এই দণ্ডে চক্ষু মুদ্রিত করি, তুমি এই দণ্ডে তাকে আমার কাছে এনে দাও দেখি? স্বীকার করি, তুমি তাহা পার, কিন্তু চক্ষু খুলিলে আর তাকে দেখিতে পাই না কেন? ঐটিই তোমার দোষ, ঐটিতেই তুমি মানুষকে জ্বালাতন কর। তা নইলে তোমার স্বভাব-চরিত্র বড় মন্দ নয়। তুমি এই দণ্ডেই আমায় সাঁত-সমুদ্র তের-নদী-পার স্থিত বিলাত রাজ্যে লইয়া যাইতে পার, পর মুহূর্ত্তেই আবার আমার প্রাচীরস্থিত সুক্ষ্ম রন্ধ্রে আমায় প্রবেশ করাইয়া আমার শ্বাস রুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু আমি যাহা চাই, তাহা দিতে পার না। তবে এমন প্রলোভন দেখাও কেন? মনে করি তোমার প্রলোভনে ভুলিব না, কিন্তু তোমার কুহক বড় শক্ত কুহক। তুমি ঘুম পাড়াইয়া স্বকার্য্য সাধন কর। কোন্ দিন বা তুমি তস্করের ন্যায় পরস্বাপহরণ করিয়া এই দরিদ্রকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-খচিত আভরণে ভূষিত কর, কখনও বা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পরের হস্তে সমর্পণ কর! এ তোমার কেমন রীতি? তুমি যদি আমাকে আমার প্রিয় বস্তু আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার সকল নিন্দা ঢাকিয়া যায়। তুমি ছায়া আনিয়া দিতে পার, তুমি আসল আনিয়া দিতে শিক্ষা কর না কেন? তাহা হইলে, মানুষের কত উপকার সাধন হয়। যাও যাও স্বপ্ন! আর বৃথা প্রলোভনে মানুষকে জ্বালাতন করিও না, অভিশপ্ত হইবে। যাও যাও স্বপ্ন! হস্তে আকাশের চাঁদ দিয়া কাড়িয়া লইও না, জগতে তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। তোমারই বা দোষ কি? নিন্দাপ্রিয় বিধাতা তোমায় যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই কর, আমার কথা তোমায় শুনিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

অজা ও শিবা।

[From Æsop's Fables.]

জম্বুক, যামিনী-যোগে কোন বনে চরে,
দৈব-যোগে পড়ি গেল কূপের ভিতরে।
কূপ হ'তে উঠিবারে বহু চেষ্টা পায়,
পাটহীন সেই কূপ, শিবা নিরুপায়।
অদৃষ্ট ভাঙ্গিলে হয় বিরূপ সকলি,
জম্বুক জীবন-আশে দিল জলাঞ্জলি।
যতক্ষণ প্রাণ থাকে যুঝিব, ভাবিয়া,
সলিলে রহিল পড়ি, গলা ভাসাইয়া।
বিধির নির্ব্বন্ধ তথা, অজা এক আসে;
শৃগালে সে কূপে দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে,—
"কিরূপে হ'য়েছ ভাই, কূপেতে পতিত?
দেখিয়া হৃদয় বড় হইল ব্যথিত।
এ বড় আশ্চর্য্য, কিন্তু, হেরি হে তোমার,
উঠিবারে চেষ্টা নাহি, কর একবার!"
তখন, শৃগাল কহে, "শুন ভাই অজা!
হেথাকার কিছু তুমি নাহি জান মজা।
এ কূপের জল ভাই, মিষ্ট অতিশয়,
যত জল খাই এর, পুনঃ ইচ্ছা হয়।
এক পেট খাইয়াছি, তবু সাধ আছে,
প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লে ভাই, উঠিব হে পাছে।
জল খেয়ে, হ'ল বটে আনন্দ বিপুল,
ল'য়ে যাব কেমনেতে, ভাবিয়া আকুল।
সর্ব্বদা এরূপ মম, হইতেছে মনে—
খেতে দিয়ে এই জল তুমি বন্ধুগণে।
আমার অদৃষ্ট কভু নহেক তেমন,
জল খেতে দিয়ে তুমি সবাকার মন।
পাত্র বিনা জল তোলা সাধ্য আছে কার?
কাযে কাযে, হইয়াছে অসাধ্য আমার।
ভাল কায, সবাকার অদৃষ্টে না ঘটে,
আমার অদৃষ্টে ভাই, ঠিক্ তাই বটে।
পূর্ব্ব-জন্মে পাপ ক'রে মরেছি কেবল,
এজন্ম তাইতে মোর গেল হে বিফল।
বন্ধুগণ নিজে নিজে, এসে যদি খায়,
তবেই ত এর দেখি, আছয়ে উপায়।
উঠিবার চেষ্টা নাই, সত্য এ বচন,—
কেবা ত্যজি যায় জল, সুমিষ্ট এমন!
কূপ হতে উঠিবারে, অসাধ্য আমার,
অন্য লোকে তাই বই, কি বুঝিবে আর?
একই রকমে ঠিক তোমার বচন,—
জল ছেড়ে উঠিতে, না সরে মোর মন।"
শৃগালের উক্তি শুনি, অজা কয় তবে,
"আমার এ জলপান, কিরূপেতে হবে?"
"ভাবনা কি আছে তার" কহিল শৃগাল;
"জল খাও নেমে, চুকে যা'ক্ গোলমাল।"
শুনিয়া শিবার বাণী, অজার তখন
কূপ-মধ্যে নামিবারে হ'য়ে গেল মন।
হেটমাথা করে অজা নামিবার তরে,
লম্ফ দিয়া, শিবা গিয়া, শৃঙ্গ তার ধরে।
কূপ-মধ্যে পড়িবার আগে সে অজার,
জম্বুক জমীতে উঠে, আনন্দ অপার।
থতমত খেয়ে অজা, পড়ে গেল নীরে,
শৃগাল তাহার পানে, চাহিল না ফিরে!

কূপে পড়ি অজা আর উঠিতে নারিল ;
আপনার বুদ্ধিদোষে, পঞ্চত্ব পাইল।
কার্য্যকালে, বুঝে চলা উচিত সবার,
নতুবা, সুফল-লাভ হয় না তাহার।
খলের মুখেতে মধু,—হৃদে হলাহল,
না বুঝিয়া সাধু সবে, যান রসাতল।
জগতে সবার চেষ্টা, নিজ সাধ পূরে,
পরের হিতের তরে কেবা মরে ঘুরে ?
'পরহিতে ব্রতী', যাঁরা দেন পরিচয়,
মুখে আড়ম্বর মাত্র, কাযে কিছু নয়।
এমন হিতার্থী তিনি জানান সবায়—
তাঁর যেন পর লাগি, মাথা-কাটা-দায় !
মনোগত ভাব মাত্র আপনার ইষ্ট,
বাহিরে দেখান তাই, এত মুখ মিষ্ট।
নিজ ইষ্ট সিদ্ধ হয়, পরহিত-ভাণে,
অব্যর্থ ঔষধ তাহা খল-লোক জানে।
লোকের স্বভাব কিবা, আগে বুঝা চাই,
হঠাৎ করিলে কার্য্য, রক্ষা কভু নাই।
বিশেষ ভাবিয়া কার্য্য নাহি করে যারা,
চক্রীর চক্রেতে পড়ি মারা যায় তারা।

শ্রীরাধাজীবন কবিশেখর।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচন।

আক্ষেপ। বারুইপুর নিবাসী শ্রীহেমন্ত-কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত এবং কলিকাতা ২৪ নং গিরীশ বিদ্যারত্নের গলি, অপার সার্কিউলার রোড্, "গিরীশ বিদ্যারত্ন" যন্ত্রে শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য—তিন আনা মাত্র।

এখানি কবিতা পুস্তক ; ইহাতে আটটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার সোদর প্রতিম অভিন্নহৃদয় মিত্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ সেন গুপ্তকে পুস্তক খানি উপহার দিয়াছেন—উপহার পাঠে জানা যায়, গ্রন্থকারের হৃদয় শোকানলে প্রজ্জলিত। [illegible] শোকানল নির্ব্বাণের জন্যই 'আক্ষেপ'-রচনা [illegible] কিন্তু ইহাতেও তাঁহার, শোকানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তবে, যদি তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অবসর কালে এই 'আক্ষেপের' সহিত, বন্ধুর শোকের জন্য 'আক্ষেপ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, গ্রন্থকার কতক পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন।

এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে, প্রকাশক মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—"শোকে লোকের মন মুগ্ধ হইলে, তর্কশাস্ত্র-সুলভ যুক্তি-মার্গ হইতে বিচ্যুত হয় ও পুনরুক্তি-দোষে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তার যদি ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা অবশ্য ক্ষন্তব্য।" সুতরাং, আমরা ইহার সম্বন্ধে বিশেষ মতামত প্রকাশ

করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। তবে, পুস্তক খানির সকল কবিতাই যে শোক-পরিপূর্ণ, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

১৫। তারাহার-গীতি। এ পুস্তক খানিও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় চৌধুরী-প্রণীত। আমরা ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রত্যেক ভাগের মূল্য—দুই আনা মাত্র।

দুই খানিতেই তারা বিষয়ক গীত আছে। প্রথম খানিতে ২৩টি ও দ্বিতীয় খানিতে ৫৩টী গীত আছে।

গ্রন্থকার গীত-রচনায় সুদক্ষ। তাল-মান-লয়-সংযোগে গাহিলে, তাঁহার গীত ভক্তহৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে। আমরা হেমন্ত বাবুর 'আক্ষেপ' অপেক্ষা 'তারাহারে' সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১৬। সাহিত্য-দর্পণ। এখানি শ্রীহরকুমার বন্দোপাধ্যায়-প্রণীত। ময়মনসিংহ, বাসন্তী প্রেস—শ্রীজালালউদ্দীন আহাম্মদ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি, প্রণেতা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন—উপরে লিখিয়া দিয়াছেন ইংরাজীতে—"For Review and return" অর্থাৎ তিনি পুস্তকখানির সমালোচনান্তর ফেরতপ্রার্থী। আমরা সমালোচনা করিতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা পূরণের বাধ্য নহি অর্থাৎ সমালোচনার জন্য যে পুস্তক আমাদিগের নিকট পাঠান হয়, তাহা ফেরত দিবার আমাদিগের নিয়ম নাই। অতএব, আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধ্য হইয়া আমরা পুস্তকখানির গুণাগুণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রণেতা কি উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভূমিকাতে বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, বালকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ভাষা ও জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সচ্চরিত্রতার পুরস্কার, অসাধুর গর্হন এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য তিনি এগারটী প্রবন্ধ অতি যত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়াছেন ও ভাষা প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এই পুস্তকখানি বালক শিক্ষার উপযোগী বিবেচনায় শিক্ষা বিভাগের নির্ব্বাচিত ও বালকদিগের উপকারে আসিলে গ্রন্থকার শ্রম সার্থক জ্ঞান করেন।

আমরা পুস্তকখানির অধিকাংশ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি;—পুস্তকখানি যে বালক শিক্ষার উপযোগী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও জ্ঞানপ্রদ; ভাষাও প্রাঞ্জল, তবে স্থানে স্থানে সামান্য দোষ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয় নহে। যথা—গ্রন্থকার 'কাহাকেও' স্থলে 'কেহকে' লিখিয়াছেন ইত্যাদি। এই সকল সামান্য দোষ পরিমার্জ্জিত হইলে, পুস্তকখানি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

১৭। কালী ক্ষেত্র দীপিকা—বা কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব। শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। কলিকাতা ভবানীপুর "পার্থিব যন্ত্রে" শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

এই পুস্তক খানি আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। পুস্তক খানির আকার ডিমাই আট পেজী, ছাপা ভাল, কাগজ ভাল; দুই খানি চিত্রও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে কালীঘাটের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার লিখিবার উদ্দেশ্য—"কালীঘাট একটী পীঠস্থান * * * স্বয়ম্ভু নকুলেশ্বর ও শ্যামরায় বিগ্রহ বিরাজমান থাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এই কালীঘাটের উৎপত্তি, প্রাচীন অবস্থা প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে অনেকের কৌতূহল জন্মিয়াছে। * * * বৈদেশিক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লিখিত কালীঘাটের বৃত্তান্ত সাধরণ জনরব-ঘটিত দুই একটী গল্পমূলক এবং অনৈক্য দোষে দূষিত।

পুস্তক খানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সকলে অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে "পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম," "শক্তি পূজা," "পীঠস্থানের উৎপত্তি," "কালীঘাট পীঠস্থান," "কালীঘাটের আদিম অবস্থা," "কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্ক্রিয়া," "কালীর সেবাইত ও অধিকারী," "বড়িষার সাবর্ণি চৌধুরী জমীদার," "কালীর দেবত্তর সম্পত্তি," "স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নকুলেশ্বর," ও "সাময়িক অবস্থার সমালোচনা" প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা পাঠ করিলে, কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহাও জানিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি সৃষ্টির প্রথম হইতেই শক্তি-পূজা চলিয়া আসিতেছে। শুধু ভারতে নহে, প্রাচীন আর্য্যজাতির অধিষ্ঠিত প্রত্যেক দেশেই অতি প্রাচীন কালে ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন ছিল। একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাই সেই বৈদিক ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন বক্তব্য এই যে, দেবী পূজা বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ব্বে না পরে অনুষ্ঠিত এবং দেবী পূজার কোন মূর্ত্তি পূজা ছিল কি না? গ্রন্থকর্ত্তা এ বিষয় কিছুই বলেন নাই, তবে বোধ হয় তাঁহার যুক্তি অনুসারে সেই সময় দেবীপূজা মূর্ত্তিপূজা ছিল না। মূর্ত্তিপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়-কালে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতের বহুপূর্ব্বে পীঠস্থানের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই কালীক্ষেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কাহা দ্বারা হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই এবং অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু বণিকগণ-কর্ত্তৃক "কালীঘাট" আখ্যার সূত্রপাত হইয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের সময় হইতে শাক্ত-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও শৈব সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান হালদার বংশ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কালীর সেবাইতরূপে অনুসরণ করা যায়। সেই সময়ের পূর্ব্ব হইতে কালীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। কিন্তু কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল,

তাহার স্থিরতা নাই। বর্ত্তমান বড় মন্দির ১৮০৯ সালে সাবর্ণ চৌধুরীদিগের দ্বারা সমাধা হয়। কালীর দেবত্তর সম্পত্তি কে দান করেন, তাহার স্থিরতা নাই।

এই কয়েকটী তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে তিনি বহুবিধ প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে। তিনি কালীঘাটের আবিষ্কার সম্বন্ধে পাঁচটী কিম্বদন্তীই অমূলক বলিয়াছেন, অথচ নিজে কোনটীই গ্রহণ করেন নাই, সকল গুলিই পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথচ নিজেই কোন তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হন নাই। তিনি কিম্বদন্তীমাত্রকেই উড়াইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিম্বদন্তীর মূলোদ্ঘাটন করেন নাই।

আর কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন, কতকগুলি ইউরোপীয় মত অভ্রান্ত ধরিয়াছেন। এগুলি তাঁহার স্বাধীন গবেষণার অন্তরায়। তিনি কেবল মোটামুটী কয়েকটী তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য এত প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায় ওরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিতে গিয়া তিনি বিস্তর বাজে বকিয়াছেন এবং উহাতে তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধন বড় অল্পই হইয়াছে; অধিকন্তু তাঁহার যুক্তিগুলি বড় ভাল বোধ হইল না। তিনি, ভারতে শব-সংরক্ষিণী অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া কি হেতুবাদই দেখাইয়াছেন। আপাততঃ, যতদিন না অপেক্ষাকৃত উত্তমতর কালীঘাটের পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, আশা করি ততদিন তাঁহার গ্রন্থ সমাদৃত হইতে পারিবে।

১৮। The Mother of India. By Bhogabati Charan Sen Gupta, Price four annas only.

এখানি একখানি ক্ষুদ্রকায় ইংরাজী পুস্তক—৩২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জীবনে অদ্যাবধি যে সমস্ত মোটামুটী ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র। গ্রন্থকারের ভাষা মন্দ নহে।

১৯। জ্যোতিষ—শ্রীজহরলাল ধর-প্রণীত। ও তৎকর্ত্তৃক জ্যোতিষ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ কার্য্যালয়ের সম্পাদক শ্রীনৃত্যলাল দাস কর্ত্তৃক মাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য চারি আনা।

আমরা সচিত্র বিশুদ্ধ জ্যোতিষ (গণিত ও ফলিত) সিদ্ধান্তঃপর্ব্ব, প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে—পৃথিবীর গোলত্ব, পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের চুড়ত্ব, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ইত্যাদি। গ্রন্থকার মুখবন্ধে ফলিত জ্যোতিষ সত্য কি অসত্য, গ্রহগণ সজীব কি নির্জ্জীব, মায়া বা অবিদ্যা কি, এই সকল বিষয়ের বিচার করিয়াছেন এবং ফলিত জ্যোতিষ সত্য, গ্রহগণ সজীব, দেবতা, মায়া ইন্দ্রিয় জাত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি বড় মন্দ হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে এবং আশা করি

আমরা সমস্ত গ্রন্থখানিকে এইরূপই দেখিতে পাইব। গ্রন্থখানি সচিত্র হইয়া বিলক্ষণ শিক্ষোপধায়ক ও হইয়াছে। তবে কথা এই, প্রথম খণ্ড খানি কেবল সূচনা মাত্র। ফলিত জ্যোতিষের বিষয় এই খণ্ডে মুখবন্ধরূপে উক্ত হওয়া ব্যতীত, কিছুই নাই।

কলিকাতা রিডিং রুম।

আমরা কলিকাতা "রিডিংরুমের" একখানি "প্রসপেক্টাস" পাইয়াছি। দেখিলাম কলিকাতার অনেক মান্য-গণ্য ব্যক্তি ইহার 'পেট্রন' এবং "ম্যানেজিং-কমিটির" মেম্বর। ইহার পুস্তকের সংখ্যাও বড় কম নহে—ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রায় ৪ ৫ হাজার হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদপত্রই লাইব্রেরীতে পাঠান হয়। ইহা এখন চিৎপুর রোডে "ওরিএন্টাল সেমিনারী"র ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত। এই লাইব্রেরীর রেজিষ্টারি হইলে ভাল হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করি।

অভিনয় সম্বন্ধে—সিটি থিয়েটারে আমরা "তরুবালার" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। তরুবালা নাটক খানি ভাল, ইহার অনেক অংশই বেশ উপদেশগর্ভ, তাহাতে পারদর্শী অভিনেতাগণ-কর্ত্তৃক অভিনীত হওয়াতে, ইহার উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। অখিল ও তাঁহার বিধবা ভগ্নী শান্তর অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। বিহারী মাতালের উপদেশব্যঞ্জক মাতলামি দর্শনেও আমরা সন্তোষলাভ করিয়াছি। সিটি থিয়েটারের দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদির উৎকর্ষ সাধন হইলে, এই থিয়েটারটী সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।



শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।



ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺কালিদাস মিত্রের ভ্রাতা

শ্রীভোলানাথ মিত্র-সম্পাদিত।

দ্বিতীয়, খণ্ড—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা।

মাঘ, ফাল্গুণ ও চৈত্র—১২৯৮।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। | মাঘ—১২৯৮। | দশম সংখ্যা।

প্রকৃতি-সাধনা।

আয় প্রাণময়ি! তুই, আকাশের রাণী হ'য়ে,
বিমল কুসুম-ওষ্ঠে ফুলবাস বিছাইয়ে,
প্রশান্ত নয়নকোলে তারা-জ্যোতি মিশাইয়ে,
ঢল ঢল আঁখি দুটি জলস্রোতে ভাসাইয়ে,
আয় সখি আয়!
পাগল করিয়ে তোর, উন্মাদ হৃদয়খানি,
তোরে আজ ভাল ক'রে, দেখিবারে প্রাণরাণি!
কোথা ছুটে যায়!

তুই দাঁড়া হোথা গিয়া—আকাশের পর পারে—
আমি হেথা দাঁড়াইয়া, মুগ্ধনেত্রে হেরি তোরে;
শ্যামল দুর্ব্বার ছায়া, চাঁদের জোছনা-রাশি,
তটিনীর মৃদুভাবে তোর ও মধুর হাসি,
রজনীর শ্যাম ছবি, বনের শীতল ছায়া,
পাখীদের কল কলে মাখান ও মুখে মায়া,
উষার হিঙ্গুল আভা, ওষ্ঠ দুটী টুক্ টুকে,
মালতীর মৃদু বাস, বহিয়া যাইছে বুকে,
চপলার ক্ষণিক বিকাশ;
দাঁড়া দাঁড়া একটুকু, যাস্ নে যাস্ নে সখি!
জানিস্ নে তোরি তরে এ ছার জীবন রাখি,
তুই মোর আরাম আশ্বাস!

প্রকৃতি, প্রকৃতি, মোর, জীবন-সর্ব্বস্ব মোর,
অধীর কবির হিয়া ও রাঙ্গা চরণে তোর!
অস্থিরে! হইয়া স্থির, একটুকু দাঁড়া সখি,
দেখিতে দেখিতে যাক্ অবশ হইয়া আঁখি,
ভেঙ্গে যাক্ ধৈরযের বাঁধ;
অনন্ত বিশ্বের সাথে মিলাই উন্মাদ হিয়া,
আমি কাঁদি, তুইও সখি কাঁদ!

শ্রীমতী——দাসী।

ইন্দুবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেকাল—একাল।

সেকালে সকল গ্রামের এবং সকল গৃহস্থেরই কেমন একটু বেশ শ্রীসম্পত্তি ছিল; কি শিশু, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ সকলেরই মুখে কেমন একটা মানসিক সুখের আভা দেখা যাইত! চারিদিকেই কেমন নেত্র-মন-স্নিগ্ধ-কর একটী নির্ম্মল জ্যোতিঃ। যেখানে যাও, দেখিবে কেবল চিত্ত-সচ্ছন্দতা এবং সাংসারিক সচ্ছলতা। কাহারও মনে কোনও ভাবনা নাই। প্রকৃতি তাঁহার আদরের কি চেতন কি অচেতন পদার্থ নিচয়কে সদাই আদর করিয়া সুমোহন সুন্দরদর্শন সুসাজ পরাইয়া জগতে তাঁহার অপার করুণার প্রচার করিতেন। প্রাণিগণও পুলকে নিশ্চিন্তপ্রাণে, হাস্যবদনে তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দিব্য সুখ-পুত্তলিকার ন্যায় বিচরণ করিত। সময়ে বারিপতনে দুর্ভিক্ষাদি মহামার অত্যাচার-বিরহিত ও রোগ-শোক-তাপ-বিহীন কৃষক বলের হলচালনে বসুন্ধরা সময়ে সুফল প্রদান করিয়া মনুষ্যগণের প্রাণে সুখ ও আশার তরঙ্গ ছুটাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মগতপ্রাণ করিয়া তুলিত। মনের আনন্দে তাহারা করুণাময়ীর অপার করুণার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহাদের সেই হৃদয়কন্দরের কৃতজ্ঞতাসূচক শ্রবণ মধুর ঈশ-গুণানুকীর্ত্তন ধ্বনি ছুটিয়া ছুটিয়া মুহ্যমান আবাল বৃদ্ধ বনিতার মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বিমানে বিমানে উঠিয়া পড়িয়া প্রতিধ্বনি সহ দূরে পবন স্বননে মিশিয়া যাইত। কিন্তু হায়! 'তেহিনঃ দিবসা গতা।' আজ আমরা পথের কাঙ্গাল! যেন প্রবল প্রতাপ মহীপাল আজ সত্য সত্যই কাঙ্গাল! সে আমরা নাই—আমাদের সে আমিত্ব নাই—সে গৌরবময় সম্মান সম্ভ্রম নাই। আমরা বিজাতীয় সভ্যতার কুহকালোকে পতঙ্গপ্রায় দগ্ধীভূত হইতেছি। কাঞ্চন বহুদিন হারাইয়াছি, কাচে এখন প্রাণ মজিয়াছে! প্রফুল্ল পারিজাতের পরিবর্ত্তে দুই চারিটী কণ্টক-তরু লইয়াই আপনাদের পতনোন্মুখ গৃহগুলি সাজাইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। দেশে সভ্যতার স্রোত হু হু বাড়িতেছে, সমাজে প্রবল নক্র তিমিঙ্গিল অনাচার ও বিজাতীয় রীতি-নীতি প্রবেশ করিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচার নয়ন-মন-বিহীন কুলাঙ্গারগণকে বিলাসিতার চিরদাস করিয়া তুলিতেছে। গৃহে অন্ন নাই, পর্জ্জন্য আর সময়ে বারি বর্ষণ করেন না, ভূমিরও আর সে উর্ব্বরতা নাই; সুতরাং, মাঠে ধান নাই, গৃহেও ধন নাই। কোথাও আর সে সচ্ছ-

ন্দতা বা সচ্ছলতা নাই, চারিদিকে কেবল অনাহার, অনাটন, অভিযোগ ও আর্ত্তনাদ! পূর্ব্বতন সে ক্রিয়াকলাপ আজ বিলুপ্ত প্রায়। যে দিকে কর্ণপাত কর, শুনিতে পাইবে কেবলি অকালজন্ম-মরণ থাকিয়া থাকিয়া জলধিকল্লোলের ন্যায় ভীষণ দুঃখার্ত্ত-নাদ করিতেছে। তবে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী; তাই এখনও বিজাতীয় এত শোষণ ও পেষণেও ভারতের স্থানে স্থানে আমরা প্রাচীন ক্রিয়াকলাপনিরত দু একটী শ্রীসম্পন্ন পরিবার দেখিতে পাই। জানি না, সর্ব্বনিয়ন্তা বিরলে বসিয়া তাহাদের ভবিতব্যেই বা কি কঠোর পরিণাম লিখিতেছেন। যাহা হউক, আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আজ আমরা এইরূপ একটী প্রাচীন পরিবারের কোন মহাপ্রাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কি কৃষিকার্য্যে, কি বাণিজ্যে এক সময়ে "হুগলী" সকল বিষয়েই বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল। অধুনা এমন হীন দশা দেখিলেও লোকে ইহার প্রাচীন গৌরবের বিষয় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে, ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য। হুগলীর ভূতপূর্ব্ব মহামতি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টএনবি সাহেব প্রণীত হুগলী ও চুঁচুড়ার ইতিবৃত্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে আমরা কেবল হুগলী নগরীর কথাই বলিতেছি না। এখানে হুগলী অর্থে সমুদায় হুগলী জেলাই বুঝিতে হইবে। আর আমাদের বর্ণিত বিষয়ের মূল ঘটনা স্থান ইহাঁরই অন্তর্বর্ত্তী। নানা কারণে সে স্থানের নাম আর উল্লেখ করিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

বিন্দুবালা।

অই যে পুণ্যসলিলা মুরারী পাদ-পদ্ম-নিঃসৃতা সুরধুনী ভাগীরথী প্রিয়-পুত্র ভগীরথের পিতৃ পিতামহগণ তারণ মানসে ত্রিস্রোতা হইয়া, যে স্রোতরূপে পশ্চিম মুখে গমন করিয়া কত নগর, গ্রাম ও পল্লীর পাদ-মূল বিধৌত করিয়া সরস্বতী নামে লোকের রসনায় রসনায় ধ্বনিত হইয়া, কখনও বক্র, কখনও বা ঋজুগতিতে, তরু-দল-তল-লতা-কুঞ্জ মধ্য বাহিয়া তৃণশস্যময় শ্যাম-দর্শন প্রান্তর ভেদিয়া বিগত বিভব ও প্রভাব স্মরণ করিয়া ক্ষীণ কঙ্কাল-বিশিষ্ট হইয়া এক্ষণে শুষ্ক মুখে অবস্থিতা, উহারই তীরে কোনও একটি গ্রামে ধরণীনাথ রায়ের বাস। ধরণীনাথ একজন অবস্থাপন্ন দশ-কর্ম্মান্বিত গণ্যমান্য ব্যক্তি; সংসারে তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল নাই। এক কথায়, তিনি কমলার বরপুত্র। তাঁহারি বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ। আবার সংসারে তাঁহার সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-রত্ন-দানে, তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন; সুতরাং যা কিছু হইলে এ জীবনে মানুষ সর্ব্বতোভাবে সুখী হয়, রায় মহাশয়ের তাহার কিছুরই অভাব নাই। তাই, তাঁহার মন

সদাই প্রফুল্ল। তাই তাঁহার সংসারে আনন্দ যেন নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন! জগতের যা কিছু আনন্দ তাহা বুঝি সেই স্থানেই।

কন্যা কি পুত্র এ দুয়ের মধ্যে রায় মহাশয়ের কাহারও প্রতি যত্নের তারতম্য ছিল না। তিনি সমান স্নেহে ও সমান যত্নে উভয়কেই লালন-পালন করিতেন। এখনকার মত তখনও পল্লীগ্রামে পুত্র কন্যার বিবাহ ব্যবসারূপে প্রচলিত ছিল না। তখন কন্যা-দায়কে পিতৃ-মাতৃ-দায় অপেক্ষা বিষম জ্ঞানে কাহাকেও তাদৃশ চিন্তিত বা যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অকূল পাথারে ভাসিতে হইত না। তখন লোকে ঘর বর দুইই দেখিত। তখন লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁকা 'চাপরাস' তত গ্রাহ্য করিতেন না। পাত্র সদ্বংশজাত হইলে এবং তাহার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই, যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। তাই, আমাদের প্রায় সেকেলে রায় মহাশয় কন্যা কিরূপে পার করিবেন ভাবিয়া, কোনও দিন চারিদিক আঁধার দেখিতেন না। যদিও কন্যা, পুত্রাপেক্ষা কম অযত্নের নয়, আর অযত্ন প্রায় কেহ করেনও না, কিন্তু তবুও আজ কাল কন্যা হইলে লোকে এক প্রকার হতাশ ও যার-পর-নাই চিন্তাকুল হইয়া থাকেন। এটুকু বোধ হয় আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষার সুফল; তা যাহাই হউক, সে কথার আর অধিক প্রয়োজন নাই।

রায় মহাশয়ের পুত্র এবং কন্যাটীর মধ্যে কন্যাটীই প্রথম। একদিন দু'দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, এমনি করিয়া বিন্দুবালা ক্রমে সাত আট বৎসরের হইল। এইবার রায় মহাশয় বিন্দুর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া পাত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে ঘটক ছুটিল। কত গুণসিন্ধু কত দীনবন্ধুর পুত্র জুটিল; কিন্তু রায় মহাশয়ের তাঁহাদিগের কাহাকেও পছন্দ হইল না। ছেলে জুটিলে কি হইবে, তিনি ত আর লোভ বা দায়ে পড়িয়া কোনও অজ্ঞাত কুলশীলে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন না। এইরূপ করিয়া তাহার মনোমত পাত্র আর জুটিল না। এ দিকে বিন্দুর বয়স ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল; রায় মহাশয়ও তজ্জন্য ক্রমশঃই ভাবিত হইতে লাগিলেন। বিন্দুবালাকে বয়স্থা দেখিয়া এখন কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু রায় মহাশয় ভাবিত হইলেও তাহাতে তেমন কর্ণপাত করেন না। কি করিবেন, তিনি জানেন যে, কন্যা আজীবন কুমারী হইয়া ঘরে থাকে সেও ভাল, তবু তাহাকে যেন না অপাত্রে সম্প্রদান করা হয়।

অবশেষে অনেক অনুন্ধানের পর, উত্তম পাত্রে বিন্দুবালার বিবাহ হইল। রায় মহাশয় যেমন ঘর বর খুজিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিই হইল। কিন্তু, এ বিবাহে তাঁহার অন্যদিকে একটু অসুবিধা হইল। পাত্রের অবস্থা কন্যার অবস্থাপেক্ষা অনেক উচ্চ, আর এইরূপ অসমান অবস্থার পরস্পর সংযোগে দুর্ব্বল পক্ষকে সময়ে সময়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাঁহাকেও মাঝে মাঝে সেইরূপ কিছু কিছু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল। তিনি

একবার ভাবিলেন—যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন বৃথা দুঃখ করা কেন। তিনি ত আর দু'বার সে ঘরে মেয়ে দিবেন না। তবে কিসে এত দুঃখ। কিন্তু আবার ভাবিলেন এক কন্যা কেমন করিয়াই বা একেবারে ভুলিয়া থাকিবেন। আহা! প্রকৃত স্নেহ ভালবাসার এমনি প্রভাব বটে! কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র মানব বুঝিতে পারি না। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকিলে ও পরস্পরের এত অসদ্ভাব কেন? হায়! মানব দুর্ব্বুদ্ধি ও মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ ক্ষণেক সম্পদের মোহে রূপে আচ্ছন্ন হইয়া, পরস্পরের বিবাদ ও বিচ্ছেদের বৃদ্ধি করিয়া সংসারের ঘোর অশান্তি বীজ বপন করিয়া যাহা কিছু সুখ, তাহা আবার আপনা হইতেই বিনষ্ট করে! প্রবলে দুর্ব্বলে সদ্ভাব, কথাটাও যেন অপ্রাকৃতিক। কিন্তু এরূপ বিষময় ব্যবহারের মূল প্রবল পক্ষই! দুর্ব্বলের শত সাধনা প্রবলের গর্ব্বাভিমানের কাছে কোথায় ভাসিয়া যায়! বুঝি দরিদ্রের শান্তি-সুখে ধনীর হিংসা হয়!

যাহা হউক, মনের কষ্ট মনে চাপিয়া রায় মহাশয় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এতদিন তাঁহার কোনও বিষয়ে কোন ক্লেশ ছিল না। কিন্তু এইবার তাঁহার কষ্টের যেন সূত্রপাত হইল। কে জানে এখনও ভবিষ্যতে তাহার আবার কি কষ্ট আছে! দুঃখের পর যে দুঃখ প্রায় আপনা হইতে আসিয়া থাকে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

ইন্দুবালা।

রায় মহাশয়ের এইরূপ মনের কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। দুঃখ হ'ক সুখ হ'ক দিন কাহারও হাত ধরা নয়। ক্রমে অনেক দিন কাটিয়া গেল। সময়, সৎসঙ্গ ও সৎকথা মনুষ্যের ক্ষতি, গুরুতর শোক অপমানকে ভুলাইয়া দেয়! তাই, প্রথম প্রথম যতটা হৃদয়ের ব্যাকুলতা ছিল, এখন আর রায় মহাশয়ের ততটা নাই।

এদিকে কালক্রমে তাঁহার আর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠা হইল। এই কন্যাই আমাদের আখ্যায়িকার কথিত নায়িকা। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু রায় মহাশয় ইহাতে তেমন আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার মনে কি যেন ভবিষ্যতের অমঙ্গল ছায়া পড়িল! তিনি যখনই কন্যাটীকে দেখেন, তখনই তাঁহার মন আপনা হইতে বিষণ্ণ হয়। আমরা বুঝিতে পারি না, নতুবা আমাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ মানসে আলোক ও আঁধার রূপে প্রতিনিয়তই প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

রায় মহাশয় কন্যার রূপ ও অবয়বের গঠন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আদর করিয়া তাঁহার নাম "ইন্দুবালা" রাখিলেন। প্রথম প্রথম ইন্দুকে দেখিলে তাঁহার মনে যে বিষণ্ণ ভাব উপস্থিত হইত, ক্রমিক যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শনে তাহার অনেক হ্রাস হইল। প্রবল স্নেহ ও অবিরল সন্দর্শনে এইরূপ কত

সন্দেহ কোথায় ভাসিয়া যায়! এমনই করিয়াই ত মহামায়ার আবরণে সংস্কারের দুঃখ, শোক, তাপ ঢাকিয়া থাকে। যাহাকে দেখিলে রায় মহাশয়ের মন, যেন কোনও নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবিয়া যাইত, এখন তাহারই ফুল্ল-মুখমণ্ডল ও অস্ফুট হাসি-মাখা রক্ত অধরোষ্ঠ দেখিলে, তাঁহার কত আনন্দ বোধ হইত। শেষে ক্ষুদ্র সরলা বালিকা ইন্দুকে না দেখিলে তিনি এক দণ্ডও স্থির থাকিতে পারেন না। প্রকৃত স্নেহের এমনি প্রভাব! ইহারই নাম ত মায়া! এই মায়াই মোহ এবং মোহ হইতেই আমরা মোক্ষপথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেখিতে পাই।

ক্রমে ইন্দুবালা পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। তাহার মাতার মনে এবারে বড় সাধ হইল যে, তিনি অল্প বয়সে ইন্দুর বিবাহ দিয়া "গৌরী দানে"র ফল লাভ করিবেন। হিন্দুর এ বিবাহ-পদ্ধতি ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিবার তেমন প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহা কি সুফল প্রসব করিয়া থাকে, চারিদিকে একবার নয়নপাত করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। যাহাহউক, ইন্দুবালার মাতার অনুরোধে রায় মহাশয় সেই অজ্ঞান অল্পমতি শিশু বালিকার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কত স্থান হইতে কত লোক আসিয়া ইন্দুকে দেখিয়া গেল। কিন্তু বালিকা এ সকলের কারণ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ইন্দুবালা শুনিল বটে, এ সকল তাহার বিবাহের উদ্যোগ। কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ইহার অর্থ কি অথবা বুঝিল না, এরূপ উদ্যোগ আন্দোলনে তাহার ভাল কি মন্দ হইবে। অথচ তাহার পবিত্র জীবনকে চিরদিনের জন্য অপরের অধীন করা হইবে। তাহার জীবনের সুখ দুঃখ সাধ সম্পত্তি সকলি পরের সুখ দুঃখময় জীবন নাট্যের ক্রোড়াঙ্ক হইবে। তাহার ভাগ্য সূত্র কোন অপরিচিতের ভাগ্য সূত্রের সহিত মিলিত হইবে। বুঝিল না বটে, ইন্দু কিন্তু বাটীর অপর সকলকে আনন্দিত দেখিয়া তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। তাহার মাতা হাসিতে হাসিতে এই সকল কথা অপরের নিকট বলিতেন, ইন্দুবালা তাহাই শুনিয়া ক্ষুদ্র রক্ত অধরোষ্ঠ দুইখানি বিস্ফারিত করিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিত। ইন্দু ভাবিত, বুঝি তাহার পিতা মাতা তাহাকে কোনও দুর্লভ ক্রীড়ার পদার্থ কিনিয়া দিবেন, তেমন খেলনা বুঝি পাড়ার অপর কাহারও নাই। এই ভাবিয়া তাহার মনে দ্বিগুণ আনন্দ হইল। কিন্তু হায়! ইন্দু একবার ভাবিল না যে, বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার অদৃষ্ট-পটে কি লিখিতেছেন! পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা খেলা করিতে আসিলে, ইন্দু তাহাদিগকে তাহার বিবাহ হইবে বলিয়া কত আমোদ করিত। মেয়েদের মধ্যে যাহারা একটু বয়স্কা, তাহারা এই কথা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিত। কিন্তু যাহারা তাহার সমবয়স্কা অথবা তাহাপেক্ষা কিছু ছোট, হয় ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে মনে দুঃখিত হইত এবং হিংসাও করিত যে, তাহাদেরও এমনটী কেন না হইল। তাহাদেরই মধ্যে আবার কোন বালিকা

তাহার হাত ধরিয়া বলিত, "ভাই! তোর বিয়ে হ'লে আমাকেও একটু দিবি ত?" বিবাহটা মণ্ডা কি মিঠাই, পুতুল কি পুঁথি, তাহা তাহাদের সরল প্রাণে কল্পনাতেও আসিত না। তা' না আসুক, ইন্দুর বিবাহ তাহাতে আটকাইবে না। ইন্দুও আবার মধ্যে মধ্যে মাতার নিকট যাইয়া আঁবদার করিত, কবে তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মাতা কন্যার মধুমাখা আধ-আধ কথা শুনিয়া অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, স্নেহ ভরে তাহার মুখ চুম্বন করিতেন।

এদিকে শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায়—ইন্দুবালা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সরস্বতীর নির্জ্জন তীর তাহার খেলিবার বড় সাধের স্থান। নদীর তীরের ছোট ছোট গাছ গুলি তাঁহার বড় আদরের ধন। প্রত্যূষে ও প্রদোষে দিব্য শান্তি-পুত্তলিকার ন্যায় ইন্দু নাচিয়া নাচিয়া এখানে সেখানে খেলা করিয়া বেড়াইত।

কখনও কখনও অপর বালিকার ধূলা কাদা লইয়া খেলা ঘর বাঁধিয়া কত মত খেলা করিত; কিন্তু তাহার তাহাতে আদৌ মন লাগিত না। বড় পীড়াপীড়ি করিলে খেলিতে যাইত, দেখাদেখি হয় ত খেলাঘর বাঁধিতে আরম্ভ করিত; কিন্তু বাঁধিতে বাঁধিতে হয় ভাঙ্গিয়া ফেলিত, নয় আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু কাহার ঘর কিরূপ হইতেছে—কোনখানে কিরূপ দ্রব্যগুলি কিরূপ করিয়া সাজাইলে ভাল দেখায়, তাহা তাহার মত আর কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বালিকারা খেলা ঘর বাঁধে, পুতুল খেলা করে ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়, কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয়, কত গিন্নিপনা—যেন একেবারে সংসারের হাট বসাইয়া ফেলে, বালিকা ইন্দুবালা ততদূর পারিয়া উঠিত না; কিন্তু শৈশব-সঙ্গিনীদিগের মধ্যে পুতুল-খেলার ঝি জামাই লইয়া তাহার মত আদর আর বড় কেহ করিতে পারিত না। পাতা, লতা, ধূলা কাদার অন্ন ব্যঞ্জনে তাঁহার মত পরিতোষ করিয়া আর কেহ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার হাতে না খাইলে কাহারও খাইয়া তৃপ্তি হইত না। এইরূপ পরের সংসার লইয়া সেই বয়সেই ইন্দু সময়ে সময়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু কেমন অদৃষ্ট নিজে ঘর বাঁধিয়া এত ক্রিয়া কর্ম্ম কুটুম্বিতা করিতে হইলেই, অমনি সকল দিকেই কেমন গোল বাঁধিয়া যাইত। কে জানে কি বিধির লীলা এ বুঝি ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ!

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যেও আবার অনেকে ইন্দুকে দেখিয়া গেল। পাত্রের ত আর অভাব নাই। বিশেষ রায় মহাশয়ের ন্যায় লোকের সহিত কোনও সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে কত লোক চেষ্টিত। এমন বনিয়াদি সদ্বংশ বড় সহজে মিলিবার নয়। অনেক সম্বন্ধ জুটিল বটে, এবং দু' একটা এক রকম হব-হবও হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাদের কোনটিতেই সম্মত হইলেন না। তিনি কুলীন—রায় তাঁহার উপাধি মাত্র। তিনি একবার মনে করিলেন কন্যাটীকে কুলীনেই সমর্পণ করিবেন। অনেক কুলীনের ছেলেও মিলিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সে নব গুণ সম্পন্ন কুলীন কোথায়? তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, কেবল কুলীন হইলেই বা কি হইবে; 'যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষা; কিং কুলেন ধনেন বা।' তাই তিনি শেষে স্থির করিলেন—পাত্র ভাল পাইলে, মৌলিকেও কন্যা সম্প্রদানে সম্মত আছেন। আদিরস প্রতিসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া কুশল সন্মৌলিক বিশেষেও ত আছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মণি-কাঞ্চন।

অনেক অনুসন্ধানের পর পাত্র জুটিল। যেমন কন্যা তদনুরূপ পাত্রও মিলিল। পাত্র মৌলিক, কিন্তু তাহাতে কি তেমন আসিয়া যায়। তাল পুকুর নাম আছে অথচ তাল গাছ নাই, এইরূপ দু চারিটী কুলীন বনিয়াদি ঘরের ন্যায়, রায় মহাশয় বৃথা কুলাভিমানী নহেন। পাত্রটী সদ্বংশ জাত,—সদ্‌গুণ বিশিষ্ট—সুন্দরদর্শন এবং অল্পবয়স্ক;—তবে আর বাধা কি! বিবাহের দিন স্থির হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। বালিকা ইন্দুবালার এত দিনে ভ্রম ঘুচিল। সঙ্গিনীরাও বুঝিল, তাহারা বিবাহ অর্থে যেরূপ ভাবিয়াছিল, সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত!

প্রথম প্রথম বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে যেন কত ভাবনার উদয় হইল। বিবাহের বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া ইন্দু কখনও হাসিত, কখনও কাঁদিত, কখনও ভয়ে লুকাইতে চাহিত, কখনও বা ঘুমে ঢুলিতে থাকিত। কেহ কেহ তাহাকে বুঝাইলেন। বর কত গহনা দেবে, কত ভাল ভাল পুতুল দেবে। বালিকার সরল প্রাণ তাহাতেই ভুলিয়া গেল। সত্যই ত ইন্দু কত গহনা পরিয়াছ, তবে পুতুলের কথাই বা কেন অবিশ্বাস করিবে? বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাপেক্ষা আর কোন গভীর ভাব উপস্থিত হইল না।

বিবাহের রাত্রি শেষ হইল। এখন হইতে ইন্দুর জীবনে যুগান্তর আরম্ভ হইল। কাল ইন্দু যেমন ছিল, আজ আর ইন্দু তেমন নাই—সম্পূর্ণ বিপরীত! বালিকা স্বপ্নেও যাহাকে কোনও দিন ভাবে নাই, আজ এমন একজন অপরিচিতের জীবন-স্রোতে জীবন-তরী ভাসিতে চলিল। যে গৃহে ও যাহাদের স্নেহে ইন্দু এত দিন লালিত-পালিত হইল, যে গৃহকে তিনি আপনার একমাত্র আশ্রয়-স্থান বলিয়া জানিত, যাহাদিগকে ইন্দু কত আপনার ভাবিয়া হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়াছ, আজ সে সমুদায় পাছে রাখিয়া, প্রিয় বাল-সঙ্গিনীগণের নির্ম্মল ও নিশ্চিন্ত সহবাস ও খেলা পরিত্যাগ করিয়া একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলিল! আজ আর সে গৃহে তাঁহার থাকিবার যো নাই। কি বিষম সঙ্কট কাল! বালিকার ক্ষুদ্র জীবনে, ইহাপেক্ষা গোলোযোগ আর কিসে হইবে! একদিকে পিতামাতার স্নেহ—ভালবাসা, অপরদিকে সামাজিক কঠোর নিয়ম!

ক্রমে বেলা অধিক হইল। বর কন্যার যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত। আর

বিলম্ব নাই। বালিকা কিছুতেই জননীর স্নেহময় ক্রোড় ছাড়িবেন না। যতই জননী কন্যাকে ক্রোড় হইতে নামাইতে চাহেন, ততই বালিকা প্রাণপণে জননীর অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। নয়ন-জলে তাঁহার বদন-মণ্ডল প্লাবিত—বসন সিক্ত। তাহার করুণ ও কাতর কণ্ঠে সকলেরই মন আর্দ্র হইল। কিন্তু সামাজিক নিয়মের দারুণ কঠোরতায় তাহাতে অনুমাত্র হ্রাস হইল না। শেষে বহুকষ্টে বালিকাকে তাহার জননীর কোল হইতে ছিন্ন করিয়া লওয়া হইল। কুসুম যেন বৃন্তচ্যুত হইল! আহা! বালিকার এ সময় মনের অবস্থা কি ভয়ঙ্কর।

যথা সময়ে বর কন্যা গৃহে আসিলেন। বালিকা ইন্দুবালা নূতন স্থানে আসিয়া চারিদিকেই নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইল এবং ক্রমশঃই তাহার হৃদয় নৈরাশ্যের সাগরে ডুবিয়া গেল। দু'চারি দিনের মধ্যে বিবাহের সমুদায় অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। ইন্দুবালা শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিল। আসিবার সময় তাহার একবার বা আনন্দ একবার বা ভাবনা—হয় ত আবার তাঁহাকে কোনও অপরিচিত স্থানে লইয়া যাইবে।

দিন দিন ইন্দুবালা পিতৃমাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার এই বয়োবৃদ্ধির সহিত একদিকে যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে মানসিক বৃত্তিগুলিও পরিস্ফুট হইয়া তাহার বুদ্ধিতীক্ষতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ক্রমশঃ সামান্য বায়ুবেগে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই শৈশবাবস্থাতেই লোকে দেখিল ইন্দুবালা কালে একটি রমণী রত্ন হইবে। যে একবার তাহাকে দেখিত অথবা একবার তাহার মুখের কথা শুনিত সেই তাহাকে আবার দেখিবার ও তাহার কথা শুনিবার জন্য আকুল হইত। রায় মহাশয় স্বীয় অল্প বয়স্কা কন্যার অসাধারণ বুদ্ধি শক্তির যতই মনে মনে আলোচনা করিতেন ততই তাঁহার মন আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া যাইত। কিন্তু কে জানে আবার যেন ক্ষণেকের জন্য কি ভাবিয়া বালিকার দিকে শূন্য চক্ষে চাহিয়া থাকিতেন। ভূত ভবিষ্যত যেন আঁধার বোধ হইত। সেই আঁধারে বালিকা ইন্দুর ভাগ্যপট যেন মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বালিকার সুন্দর স্বর্ণ-পুত্তলিকার ন্যায় মূর্ত্তি খানি যখন তাঁহার অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্যের গতি বোধ করিত, তখন তিনি দুচারিটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। কখন বা যাইতে যাইতে বালিকার সেই কুসুম মূর্ত্তির পানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেন এবং আকুল হইয়া ভাবিতেন মানুষের মন ও বুদ্ধি একজন প্রধান দৈবজ্ঞ।

এই রকম করিয়া বিবাহের পর দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ইন্দুর বয়স এক্ষণে প্রায় একাদশ বৎসর। এখন আর সে ইন্দুবালা নাই। সে সরলতার স্থানে লজ্জা আসিয়া আসন পাতিয়াছে! বিবাহের নামে আর সে ভাব নাই। বিবাহের কথা শুনিলেই

তাহার প্রফুল্ল বদন-মণ্ডল আরক্তিম হইয়া হইয়া উঠে, লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ইন্দু স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। এখন শৈশবের সেই নির্ম্মল হৃদয়ের উপর কি যেন একটা গুরুভার পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া ইন্দু সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠে। এখন অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি তাহার চিন্তার বিষয় হইয়াছে। নির্জ্জন পাইলেই ইন্দুবালা দূর ভবিষ্যতের পানে মন প্রাণ খুলিয়া চাহিয়া থাকে। পাঠক! একাদশ বর্ষীয়া বালিকার এরূপ চিন্তাশীলতার দোষ ধরিবেন না বা আশ্চর্য্য হইবেন না। সাধারণ বালিকার পক্ষে ইহা অসম্ভব বটে কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইন্দুবালার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। প্রকৃতির কেমন নিয়ম যে, মহৎ-লোকেরা বাল্যকালেই এমন এক একটি কায করেন যাহা অপর সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

দেখিতে দেখিতে ইন্দুর বয়স প্রায় একাদশ শেষ হইল। এই সময় শুভ দিনে ইন্দুবালা শ্বশুরালয় গমন করিল। এবার আর তাহার মনে হইল না যে কোন অপরিচিত স্থানে যাইতেছি! আশা, লজ্জা, সুখ, কত কি চিন্তা তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

ইন্দুবালা শ্বশুর বাটী আসিলে পাড়ার মেয়ে-ছেলে দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিল। যে তাহাকে দেখিতে আসিল সে আর তাহার নিকট হইতে যাইতে চাহিল না। এইরূপে দু'দশ দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে লোকেরও সমাগম কমিল। স্বভাবের নিয়মই তাই। যা কিছু উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা তাহা নূতন নূতন, শেষে আর ততটা থাকে না।

ইন্দুবালার স্বামীর নাম প্রকাশনাথ। বয়স প্রায় আঠার কি উনিশ হইবে। সংসারে তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান। তাঁহার অবস্থা ভাল না হইলেও তিনি নিতান্ত দরিদ্র নহেন। তবে যেরূপ অবস্থা হইলে এ জগতে অতি বড় আত্মীয়ের এমন কি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, প্রকাশনাথের অবস্থা তেমন না হইলেও রায় মহাশয় কোন দিন জামাতা দরিদ্র বলিয়া তাঁহাকে অযত্ন বা অনাদর করেন নাই। সুখের বিষয় এ সংসারে তাঁহারই মত অধিকাংশ লোক। এইরূপ উন্নত-হৃদয়বান ব্যক্তি না হইলে কন্যাও কখন এমত গুণবতী হন না। এমন পিতার কন্যা না হইলে কি ইন্দুবালার চরিত্র এত পবিত্র হয়। একমাত্র স্ত্রীর যত্নে প্রকাশনাথ তাঁহার অবস্থার দুশ্চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। স্বামীর সুখেই ইন্দুর সুখ এবং স্বামীর দুঃখেই দুঃখ। ইন্দুর পিতার অবস্থা প্রকাশনাথের অবস্থা হইতে ভাল হইলেও ইন্দু কোন দিন স্বামীর ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহকে ঘৃণা করে নাই। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিও তাহার আন্তরিক ভক্তি। ইন্দু, কন্যার ন্যায় তাঁহাদিগের দিবানিশি সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। প্রকাশনাথের পিতা মাতাও ইন্দুবালার সেবায় যার পর নাই প্রীতি ও অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

প্রকাশনাথেরও ইন্দুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। তিনি ইন্দুকে পাইলে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পান। কিসে ইন্দুকে সুখী করিবেন কি করিলে ইন্দু সদাই প্রফুল্ল থাকিবে এই চিন্তাই দিবা রাত্র তাঁহাকে বিব্রত করিল। স্বামীর অকপট ভালবাসায় ইন্দু নানা সুখের স্বপ্ন দেখিয়া সংসারকে পবিত্র দেবধাম জ্ঞান করিয়া, মানব জীবনকে সুখের প্রতিরূপ ভাবিয়া, বসন্তাগমে কমল কোরকের ন্যায় দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কোনরূপ দুর্ভাবনা এক দিনের জন্যও তাহার মনে উদিত হইত না।

ইন্দুবালার এতদিন ভালরূপ শিক্ষা হয় নাই। প্রকাশনাথের বড় সাধ তাহাকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দু-রমণী জগতে আদর্শ-নারী বলিয়া পরিগণিত হন এবং যে সকল মানসিক প্রবৃত্তিগুলি সম্যক পরিস্ফুট হইলে রমণী দেবী তুল্যা হন, প্রকাশনাথ বাছিয়া বাছিয়া আদর করিয়া সেই সকল গ্রন্থ স্বয়ং ইন্দুকে পড়াইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ইন্দুবালার বড়ই লজ্জা হইত। সে দারুণ লজ্জার কাছে প্রকাশনাথের অমন কত সাধনা, রাগ, অভিমান, প্রলোভন কোথায় ভাসিয়া যাইত! নবীন দাম্পত্য প্রণয়ের এই পরিচ্ছেদ টুকু বড়ই মধুর! দুইটী অস্ফুট হৃদয় কুসুমের প্রকৃত উন্মেষ ও একীকরণ! দুইটী অপরিচিত জীবনের এ সম্মিলন কাল বড় সহজ নয়! প্রকৃত দেব হৃদয় না হইলে কোন ব্যক্তিই তাহার জীবনের ভাগার্দ্ধকে নিজের বাসনানুরূপ শিক্ষিত করিতে পারেন না। বড় সাবধানে আপনার হৃদয়কে প্রণয়িনীর কাছে আদর্শরূপে ধরিতে হইবে, তবে ত তাহাকে আপনার মনের মত করিতে পারিবে। রমণীর কোমল প্রাণ নির্ম্মল হৃদয় যে ছাঁচে ঢালিবে, ঠিক্ সেইরূপই হইবে; কিন্তু কয়জন এ ধারণা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তবে প্রকাশনাথের ন্যায় উদার প্রকৃতির ইহা কখনই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। তিনি বয়সে যুবক হইলেও বিদ্যা জ্ঞানে কখনই প্রবীণের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার উপর আবার এমন দেবী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী! সরলা ইন্দুবালার লজ্জার আড়ম্বর দেখিয়া তিনি স্পষ্টই তাহাকে বলিলেন যে, অপরের কাছে তাহার লজ্জা প্রাণ ভরিয়া করিলে চলিবে; কিন্তু তাঁহার কাছে চলিবে না। দুইটী প্রাণ নিকটবর্ত্তী না হইলে কখন মিলিত হয় না। এই বলিয়া তিনি ইন্দুর আনত ইন্দুমুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলেন! ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভাল করিয়া চাহিয়াও চাহিতে পারিল না। চক্ষু দুইটী আপনা হইতেই নিমীলিত হইল, আরক্তিম মুখমণ্ডল স্বেদময় হইল প্রকাশনাথ বিষম বিপদে পড়িলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার হৃদয়ের আশা-স্রোত থামিয়া গেল। শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর ইন্দু সম্মত হইল। প্রকাশনাথও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

সাধে—বাদ।

এক এক করিয়া ইন্দুবালা ক্রমে অনেক শিক্ষা করিলেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পবিত্র গ্রন্থ হইতে প্রকাশনাথ যাহা বাছিয়া দিতেন, ইন্দু প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সেইগুলি উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঠ শিক্ষার সহিত তিনি আরও গুটিকতক বিশেষ গুণলাভ করিলেন। তাঁহার স্বামী প্রকাশনাথ বড়ই অমায়িক, বিনয়ী এবং নম্রস্বভাব।, সম্ভাব সংস্থাপনে এবং সৌজন্য প্রদর্শনে তাঁহার তুল্য আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা গুণে তিনি আপামর সাধারণ সকলেরই অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলের সহিত সমান ব্যবহার। তাঁহার পক্ষে উভয়েই সমান। তাঁহার মনে বৃথা অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না অথবা অযথা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া নিজের অসারতার পরিচয় দিতেন না। দীন দুঃখী দেখিলেই তিনি ডাকিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহিতেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। এই জন্য বৃদ্ধেরা তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। সমবয়স্ক বন্ধুগণ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিত এবং বালক বালিকারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিত। ক্রোধ কি, তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না। নিতান্ত উদ্ধত প্রকৃতিও, তাঁহার অমায়িকতার গুণে বশীভূত থাকিতে ইচ্ছা করিত। তিনি জানিতেন মানব জীবন দু-দিনের জন্য অতএব যতদূর পরস্পরের সম্ভাব সম্প্রীতিতে জীবন কাটিয়া যায় ততই ভাল। কেবল মানবের সরল ব্যবহারের দ্বারাই অতিবড় শত্রুকেও আপন করিতে পারা যায়। তিনি আরও জানিতেন যে, লোকের মনে কষ্ট দেওয়া অতি সহজ, কিন্তু কাহাকেও সন্তুষ্ট করা বা রাখা অতীব কঠিন। অল্পে অল্পে ইন্দুবালা স্বামীর এই সকল গুণ শিক্ষা করিলেন। প্রকাশনাথেরও আনন্দের সীমা নাই। এইরূপ মুহূর্ত্তের ন্যায় তাঁহাদের সেই সুখের জীবন প্রায় দুই বৎসর স্বপ্নবৎ কাটিয়া গেল।

আর বুঝি বিধাতার চক্ষে তাঁহাদের সে সুখ সহিল না! অথবা যে সুখটুকু লইয়া তাঁহারা ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার অবসান হইল। কিছুই ত চিরদিন থাকে না। বিশেষ যাহা কিছু যত সুখের তাহা আবার তত শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়! প্রকাশ নাথ ও ইন্দুবালা একবৃন্তে দুইটী কুসুম কোরকের ন্যায় দিব্য সুখে এ সংসার উদ্যানে ফুটিতে ছিলেন, কিন্তু নির্দ্দয় প্রবল পবনের সে সুখ দৃশ্য চক্ষে সহিবে কেন! দেখিতে দেখিতে বিষম রোগ আসিয়া প্রকাশ নাথকে আক্রমণ করিল। দুরাচার কাল আসিয়া অকালে তাঁহার জীবন গ্রাস করিল। ইন্দুর সুখ সূর্য্যও চিরদিনের জন্য অস্তগেল। প্রফুল্ল পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রমাকে অকস্মাৎ ঘোর জলদ জালে ছাইয়া ফেলিল। সুধাপান নিরতা পিপাসার্ত্তা

চকোরিণীর কাতর তান দূরে বায়ুর গভীর গর্জ্জনে মিশাইয়া গেল! কঠোর কুলিশ মন্ত্রে প্রাণ চমকিয়া উঠিল। যে বয়সে রমণীগণ স্বামীর সোহাগ স্নেহ ও ভালবাসার আশায় স্বামীগৃহে গমন করে দুঃখিনী ইন্দুবালা আজ সেই বয়সে স্বামীধনে বঞ্চিত হইলেন। এই বুঝি বিধাতার করুণ হৃদয়! এই বুঝি এ সংসার সুখের! এই বুঝি ইন্দুর সুখ স্বপ্নের পরিমাণ! আজ তাঁহার সকল আশা অবসান হইল। চিরদিনের মত তাঁহার জীবন আঁধারে ডুবিয়া গেল! এতদিনে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল! এতদিনে তাঁহার হৃদয়ের সন্দেহ মিটিল। দারুণ দুঃখ দুরাশা শোক তাপ, মর্ম্মস্পর্শী চিন্তানল আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ছাইয়া ফেলিল!—তাঁহার কাতর প্রাণ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! করুণ রোদনে অবিশ্রাম নয়ন জলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল। কঠিন ভূধরের ন্যায় রায় মহাশয় এই প্রচণ্ড অশনি সম্পাত সদৃশ দারুণ সংবাদ অকাতরে সহ্য করিলেন। কেন যে স্নেহের ইন্দুকে দেখিলে তাঁহার হৃদয় আঁধারে ডুবিয়া যাইত, এতদিনে তাঁহার মনের সে সন্দেহ মিটিল।

এখন হইতে ইন্দুর জীবনের প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যে ব্রত এবং নিয়মাচার বলে ভারতের বিধবা রমণীকে দেবগণেরও প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়াছে, এখন হইতে ইন্দুবালাকে সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। আহা! ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকাকে এখন হইতে সংসারের ভোগ বিলাস লালসা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র পুষ্প, ফল মূলাদি আহার দ্বারা দেহ ক্লিষ্ট ও কৃশ করিতে হইবে! বাস্তবিক যত দিন যাইতে লাগিল, অভাগিনী ইন্দু, ধর্ম্মাভিলাষিণী, ক্ষমাগুণশালিনী ও নিয়মচারিণী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী হইয়া উঠিলেন। আজকাল অনেক পিতামাতা, অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যাকে চিকণ বসন ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি রায় মহাশয়ের সে প্রকৃতি নয়! যে দিন প্রকাশনাথের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল, সেই দিন হইতেই তিনি ইন্দুকে সকল প্রকার বিলাসের দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। পতিপরায়ণ ইন্দুও অম্লানবদনে সমুদায় অলঙ্কার অঙ্গ হইতে একে একে উন্মুক্ত করিলেন। কেনই বা না করিবেন? যাঁহার জন্য সে সমুদায়ের প্রয়োজন তাঁহার অভাবে তাহা ত ধূলি হইতেও অসার! সে গুলি পরিলে অবশ্য তাঁহার দেহের শোভা বর্দ্ধিত হইবে কিন্তু যাঁহার জন্য শোভা, তিনি কই! কে আর আদর করিয়া সে শোভা দেখিবে।

প্রকৃতই হিন্দুরমণীর সুখ ও স্বার্থের সহিত এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে আর কোন জাতির রমণীজীবনে আছে কিনা বলিতে পারিনা। এরূপ আচরণ ভাল কি মন্দ তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। যাহাই হউক, সমাজ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে আজীবন তাহাকে এই রূপেই অবস্থিতি করিতে হইবে। ইহাতে ইহজীবনে আপাতঃ ক্লেশ হইলেও তিনি সুখ্যাতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী এবং পর জীবনে অনন্তধামে

অনন্ত কাল স্বীয় স্বামীর সহিত একত্র সহবাস। এমন অনেক রমণীর ধারণা যে স্বামীর মৃত্যু হইতে স্ত্রীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সময়টুকু কেবল কয় দিনের জন্য পরস্পরের বিচ্ছেদ মাত্র। মরিমরি কি সাধু এবং উচ্চ ভাব। ইহার সারবত্তা ও গভীরিতা ধারণা করিবার ক্ষমতা বিজাতীয়গণের আদৌ নাই। যে দিন আমাদের দেশের রমণীগণ এই গৌরব হইতে বিচ্যুত হইবেন, সেই দিন হইতে ভারতের যা কিছু গৌরব একেবারে লোপ পাইবে। হয় ত হিন্দুর নাম পর্য্যন্তও থাকিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

দেবী না মানবী!

প্রকাশনাথের মৃত্যুর পর ইন্দুবালা পিতৃ-গৃহে আসিলেন। এখন তাঁহার উভয় গৃহই সমান। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাকে এই অল্প বয়সে পতিধনে বঞ্চিতা ও চারু বসন ভূষণ বিহীনা দেখিয়া তাঁহার ও আত্মীয়গণের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। না যাইবে কেন? হিন্দুবালবিধবার দশা ভাবিলেও কার না হৃদয় শুকাইয়া যায়! কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থানই ত প্রকৃত মহত্ব। ইহাই ত প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং প্রকৃষ্ট পথ। বিধবা বিবাহের বিচার আমরা করিতেছি না, তবে কিনা পুনর্ব্বিবাহে বিধবার সুখ হইতে পারে, পাশব ভোগ বিলাস লালসা চরিতার্থ হইতে পারে, স্বামীর সহিত সহমরণেও হৃদয়ের জ্বালা জীবনের যাতনা নিভিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে হৃদয় বলের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়, মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হয়, সুখের পরিবর্ত্তে মহাশান্তি লাভ হয়। বিগত প্রাণপ্রিয়জনের চিন্তায় হৃদয় কৃতজ্ঞ থাকিয়া কত শান্তি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকে। সুখ নাই বা হইল, শান্তিই পরম সুখ, পরম সুখই ত সুখ, ইহার আশাও ত সান্ত্বনা। সুখ ও শান্তির প্রভেদ করা বড় সহজ নয়। প্রবৃত্তিতে সুখ আর নিবৃত্তিতে শান্তি এইরূপই প্রায় শুনা যায়। তুমি আমি সুখ অর্থে সচরাচর যেরূপ বুঝিয়া থাকি সুখের অর্থ কখনই তাহা নহে। এই অর্থ-টুকু বুঝিতে হইলে আপনাকে বুঝিতে হইবে, বিশ্ব বুঝিতে হইবে, বিশ্বপতিকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে, আর হিন্দুর বিধবাকে বুঝিতে হইবে। তবেই এ অবোধ জীবনে স্বর্গ ও মর্ত্তের ছবি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তাই না জগতে হিন্দু বিধবার এত আদর। যদি জগতে প্রকৃত সদাচার ও পতিপরায়ণতার জীবন্ত ছবি কোথাও থাকে, সে তবে হিন্দুর কুললক্ষ্মী সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারিণী এই বিধবা রমণী। কি সরল ও গভীর প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কত দূর স্বার্থ-সুখ ত্যাগ! স্বর্গে যে দেবীর কথা শুনিয়া থাকি সে বুঝি এই হিন্দুর বিধবা রমণী—ইহার তুলনা নাই। হিন্দু বিধবার পবিত্রতা হৃদয়ের গভীরতা এবং উদারতা আর বুঝি কোথাও মিলিবে না। এই বুঝি প্রকৃত প্রণয়ের অচ্ছেদ্যতার নিদর্শন। অনেকে হয়ত

আমাদের ধারণায় বিরক্ত হইবেন ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া কত যুক্তি দেখাইবেন কিন্তু আমরা বলি ধারণা ভুল হয় হউক; তবে এই টুকু যে আপনা হইতেই মনে হয় যে এই নশ্বর জগতে জীবন ত দুদিনের জন্য; উপ-ভোগে বাসনারও নিবৃত্তি হয় না; আশা না মিটিলেও সুখেরও আস্বাদ পাওয়া যায় না; অথচ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া যাঁহার সহিত একবার কোন রূপে মিলিত হইয়াছে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া রমণী এ জগতে যশোলাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা এবং পূণ্যধর্ম্ম কর্ম্মের আদর্শতা দেখাইয়া, পরজীবনে অনন্ত সুখ ধামে অনন্ত সুখলাভ করিয়া,সকল দুঃখের হাত এড়াইতে পারেন। যদি পারেন তবে ইহার অপেক্ষা আর কি আনন্দের বিষয় হইতে পারে? যিনি স্বর্গের পথ পাইয়াছেন তাঁহাকে আবার নরকের পথ দেখাইয়া, কেন তাঁহার সুখ নষ্ট কর, তাঁহাকে দ্বিগুণ সন্দিগ্ধ কর! যাক্ যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি।

ইন্দুবালা এখন পিতৃগৃহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর ও যত্নে কাল কাটাইতে লাগিলেন। হিন্দুর আদরের ধন, প্রাণের প্রাণ যে ধর্ম্ম, রায় মহাশয় কন্যাকে তাহাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ জীবনের সুখাশয়ের মূলে কুঠারাঘাত হইলেও তিনি কন্যার মানশ্চক্ষের সম্মুখে পর জীবনের অনন্ত সুখ ও স্বামী সম্মিলন সোহাগের পবিত্র চিত্র দেখাইয়া দিলেন। দুঃখিনী ইন্দুও যেন আবার নবজীবন পাইলেন। তাঁহার হতাশ বিদলিত শোক-তাপ-গ্রস্ত দহ্যমান হৃদয় যেন ত্রিদিব শান্তি বারিবর্ষণে সুশীতল হইল! তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। তাই তিনি এ পাপ সংসারের ক্ষণিক দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রফুল্ল প্রাণে অনন্ত সুখের আশায় স্থির মনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজ জীবন আর তাঁহার ভারাক্রান্ত নয়। চিরসুখ ধামে স্বামীসহবাসের আশা তাঁহার হৃদয়কে জগত হইতে স্বর্গে তুলিয়াছে! নন্দনের পারিজাত কুসুম সৌরভে প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে। পার্থিব চিন্তা তাঁহার মনে আর স্থান পাইবে কেন? তবে আর হিন্দুর ধর্ম্ম কি? পরজীবন লইয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম। ইহ জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প! তাই বিজাতীয়ের চক্ষে হিন্দুর রীতি নীতি সকলি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ আদর ও যত্নে ক্রমে অনেকদিন কাটিয়া গেল। শেষে একদিন সংবাদ আসিল ইন্দুবালার শ্বশুর অতিশয় পীড়িত। আর তাঁহার স্থির থাকিবার যো নাই। অবিলম্বে রায়মহাশয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বৈবাহিকের গৃহে উপনীত হইলেন। বৈবাহিক মৌলিক এবং দরিদ্র; আর তিনি কুলীন এবং অবস্থা-পন্ন; কিন্তু তা বলিয়া তিনি যে বৈবাহিকের বাটী যাইবেন না এ বৃথা অভিমান তাঁহার নাই। তিনি জানেন সদ্ভাব থাকিলেই আত্মীয়তা, এবং সম্প্রীতি ও সদ্ব্যবহারই কুটুম্বিতা। কুটুম্ব ধনীই হউন আর দরিদ্রই হউন যখন কুটুম্ব তখন অবশ্যই আদরণীয় বরং দেখিতে গেলে, যে দরিদ্র কুটুম্ব তাঁহাকে আরও বেশী যত্ন করা উচিত!

মানুষ মরিয়া যায়, কেবল কথা থাকিয়া যায়। অবশ্য দু' দশজন এমন আছেন যাঁহারা এত অবস্থাভিমানী যে দরিদ্রের সহিত কুটুম্বিতা হইলে, সেই কুটুম্বের সহিত কোন রূপ আহার বিহার পরিচর্য্যাদি করিতে লজ্জা বোধ করেন। এমন কি কাহারও কাহারও দরিদ্রা কন্যার উপরও আর সে স্নেহ থাকে না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এমন অসার লোক এ সংসারে অতি অল্প। আর রায় মহাশয়ের সহৃদয়তার পরিচয়, পূর্ব্বেও একবার আমরা দিয়াছি সুতরাং সে বিষয় এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

মানুষ কত সহিবে। তাই প্রকাশনাথের পিতা, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে জর্জ্জরিত এবং শয্যাগত। শ্বশুরের ঈদৃশী দশা দেখিয়া ইন্দুবালার শোক দ্বিগুণ হইল। একেত জন্মের মত স্বামী সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন! এখন সকল কায ফেলিয়া শারীরিক ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এবং আপনার অবস্থা ভুলিয়া দিবা নিশি কেবল শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। প্রকাশনাথের মাতাও তাঁহার অনেক সহায়তা করিলেন আজ সাধ্বী পত্নী ও লক্ষ্মী স্বরূপিণী পুত্রবধূর সেবায় প্রকাশনাথের পিতা রুগ্ন শয্যায় অনেক সুখলাভ করিলেন। পিতার উচ্চ অবস্থা ভাবিয়া ইন্দুবালার একবারও মনে মনে অহঙ্কার হইল না। অনেক রমণী, স্বামী দরিদ্র হইলে—"মাতা পেটে ঠাঁই দিয়াছেন আর হাঁড়িতে ঠাঁই দিতে পারিবেন না কি?" ভাবিয়া পিতৃকুলের ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া কতই অহঙ্কার করিয়া থাকেন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ মন্দ চিন্তা ইন্দুবালার পবিত্র হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? আজ মৃত স্বামীর গৃহই পবিত্র দিব্যধাম বলিয়া তাঁহার মনে হইল। শ্বশুরের সেবাই তাঁহার এক মাত্র শুভব্রত হইল। ইন্দুবালার ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস যে পিতা যত কেন ধনী হউন না তাহাতে স্ত্রীলোকের কোন অভিমান করা উচিত নয়, কেননা স্বামীর অবস্থার সহিত হিন্দুরমণীর যা কিছু সম্বন্ধ।

বধূর এত সেবা শুশ্রূষাতেও কিন্তু কোন ফল হইল না। প্রকাশনাথের শোক তাঁহার পিতাকে আর অধিক দিন সহ্য করিতে হইল না। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণ বায়ু পঞ্চভূতে মিশিল। প্রকাশনাথের মাতার ভগ্ন হৃদয় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার রোদন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। আজ শাশুড়ী ও বধূর একদশা আর কাঁদিয়া কি হইবে? যথা সময়ে মৃতের সংকার হইল। কিন্তু প্রকাশনাথের মাতা স্বামী পুত্রের শোক অধিকদিন সহিতে পারিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর দশ বার দিনের মধ্যে তিনিও ইহ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। অভাগিনী ইন্দুবালার শ্বশুরকুলের যাহা কিছু বন্ধনী তাহা আজ হইতে ঘুচিয়া গেল। বিধাতা বুঝি তাঁহার হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া বিলক্ষণরূপ পরীক্ষা করিয়া লইলেন। কেমন বিধাতার কৃপা ইন্দুও বিনা অশ্রুপাতে সকল শোক সহ্য করিলেন এবং স্বর্গের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা যেন দেখিতে পাইলেন! কেননা তিনি বুঝিয়াছেন

পার্থিব সম্পদ বা সম্বন্ধ মুক্তিপথের প্রতি-বন্ধক না হইলেও, বিলম্বের কারণ বটে; কিন্তু বিপদ অপার্থিব এবং সুখ ও স্বর্গের পথ পরিষ্কারক। তাই সাধুরা বলিয়া থাকেন, সম্পদই বিপদ আর বিপদই সম্পদ।

শ্বশুর কুলে ইন্দুর আর কেহ নাই। এখন অগত্যা তাঁহাকে চিরদিনের মত পিত্রালয়েই থাকিতে হইল। তাঁহার স্বামী নাই, পুত্র নাই, অথবা স্বামীর কোন সপিণ্ডও নাই, সুতরাং এখন পিত্রালয়ে থাকায় দোষ কি? রায় মহাশয়ও স্বীয় দুহিতাকে আপনার গৃহের সমুদায় ভারার্পণ করিলেন। তাঁহার গৃহে যে বিগ্রহ আছেন, ইন্দুবালা তাঁহারই সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় কৌশেয় বসন; পবিত্র রুদ্রাক্ষ ও স্ফটীক মালিকাই অমূল্য ভূষণ; কুসুম চয়ন দেবার্চ্চনা তাঁহার প্রধান অবলম্বন। আহা! সেই পঞ্চদশ বর্ষীয়া তপ্ত কাঞ্চন বরণা আলুলায়িতকেশা দিব্যাঙ্গনাকে নিমীলিত নয়নে দেবোপাসনা-নিরত দেখিলে কাহার না অন্তঃকরণে ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়? মরি মরি! এই হিন্দু বিধবা রমণীই বুঝি নিবৃত্তিমার্গের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! বয়স আছে কিন্তু বাসনা নাই, সুখের অনেক আছে কিন্তু সে সকলে সাধ নাই, বিলাসের দ্রব্য হাতে হাতে কিন্তু সে দিকে লালসা নাই, দেখিবার কত আছে কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। পঞ্চভূতাত্মক দেহ প্রপঞ্চময় জগতে বিরাজিত থাকিলেও এবং ত্রিতাপতাপে তাপিত ও ত্রিদোষে নিরন্তর জর্জ্জরিত হইলেও তাঁহার মন কোন্ স্বর্গে উঠিয়াছে। আহা! এ মূর্ত্তি যদি দেবী না হইলেন, তবে বুঝি দেবী পদ কেবল কল্পনার কথা মাত্র।

এইরূপে নিত্য নিত্য দেব সেবায় ইন্দুবালার জীবন কাটিতে লাগিল। কিন্তু কেবল ইহা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে তাঁহার চলে কৈ! সংসারে তাঁহার আরও অনেক কার্য্য আছে। দেবীর কৃপা ভিন্ন কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে? বিশেষ এখনও তাঁহার পরীক্ষার শেষ হয় নাই। সংসারের পরীক্ষা ও প্রলোভনের সহিত প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহার প্রকৃত হৃদয়-বলের পরিচয় কোথায়? এ ভবে এইরূপ জীবনই শিক্ষার স্থল। ইঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াই ত পথহারা সংসারী জীব আশায় ও উৎসাহে অগ্রসর হইবে। তাই তাঁহাকে সংসারে থাকিতে হইবে। সংসারের সকল কার্য্যেই প্রফুল্ল মনে যোগদান করিতে হইবে; অথচ উদাসিনীর ন্যায় নিস্পৃহ হইয়া তাঁহাকে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

রায় মহাশয়ের বহু পরিবার ভ্রাতা, ভগ্নী ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, প্রভৃতিকে লইয়া তাঁহার একত্র বাস ও আহার ব্যবহার। ইহাদের সমুদয় তত্ত্বাবধারণের ভার এখন হইতে ইন্দুর উপর পড়িল। রায় মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই এ ভার তাঁহাকে দিলেন। কোথায় কে আসিল, কখন কে গমন করিল; কাহারু বা কোনরূপ আদর যত্নের ত্রুটী হইল কি

না, এ সকলই দেখিবার ভার তাঁহার। কোথায় কাহার অসুখ করিল, অমনি তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন হয়ত কি কথায় কাহার রাগ হইয়াছে তাহার ক্রোধ শান্তি করিবার শক্তি তাঁহার ভিন্ন আর কাহারই নাই। তাঁহার কথা অমান্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও কাহার সে ইচ্ছা হয় না—হইতে পারে না। কেহ ভুলিয়াও কোন দিন তাঁহার কথা অমান্য করে নাই। এক কথায় সেই বৃহৎ পরিবারের ইন্দুই এক মাত্র তত্ত্বাবধারিকা ও রক্ষয়িত্রী। এই রায় পরিবারের আবাসভূমিই তাঁহার 'ব্রিষ্টল' বিদেশ বা 'ক্রিমিয়া!' পরের সেবা এবং পরের সুখের নিমিত্ত তাঁহার জীবন ধারণ। আহা! নিজের সেবায় কাহাকেও কোনরূপ রোগমুক্ত এবং সাহায্যে দ্বারা বিপন্মুক্ত দেখিয়া সেই উপকৃতের আনন্দে তাঁহার প্রাণ যে কত পুলকিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। পরের দুঃখ কষ্ট তাঁহার আপনার বলিয়া জ্ঞান হয়। পাঠক! ইঁহাকে আমরা দেবী বলিয়া থাকি। ইনি এখনও জীবিত। ইঁহার গুণে বৃহৎ রায় পরিবারের ক্ষুদ্র বালক বালিকা হইতে পাড়ার আবাল বৃদ্ধ সকলেই মুগ্ধ। এমন কি কেহ কোনদিন তাঁহার দেখা না পাইলে বা তাঁহার একটী কথা না শুনিলে সে দিনটাই সে বিফল মনে করিত।

এ সকল ছাড়াও তিনি সাহিত্য সমাজে বেশ সুপরিচিত। তবে তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা বলিয়াই সে সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিলাম না। যাহা হউক তাঁহার সম্বন্ধে এখনও অনেক বলিবার আছে; কিন্তু যাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় তাঁহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইল। এরূপ চরিত্র দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে কি না তাহা এখন সাধারণের বিবেচ্য।' আমরা ত যখনি সেই 'দেবী মূর্ত্তিকে দর্শন করি তখনই যেন এ ভব ধাম ছাড়িয়া পবিত্র অমর-ধামে নীত হই। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের আঁধার হৃদয় আলোকিত ও চিন্তাভারগ্রস্ত জীবন আশ্বস্ত হয়। সেই বৃহৎ রায় পরিবারের আহারান্তে যখন তিনি আহার করিতে বসেন তখন সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তি বলিয়া বারবার তাহার গুণ কীর্ত্তন ও প্রশংসাবাদ করিয়া থাকে। আহা! সেই অহমিকাশূন্যা নির্ম্মলা মূর্ত্তি দেখিলে মানসকন্দর যেন আপনা হইতে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠে। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অযত্ন সে যাতনা আমরা তাঁহার কাছে থাকিলে ভুলিয়া যাই। তাঁহার সরল ব্যবহারে প্রাণের তীব্র গরলও কোথায় চলিয়া যায়। এত অপূর্ব্ব কোন মূর্ত্তি নয়, এ বুঝি মৃত প্রকাশনাথের সকল প্রকার সদ্গুণ রাশির সমষ্টিভূতা দেবী মূর্ত্তি!!' জানি না প্রকাশনাথের ন্যায় উন্নত প্রকৃতির হস্তে এরূপ রত্ন সমর্পিত না হইলে ইহার কি রূপান্তর হইত! মেঘের কোলে বিজলীর শোভা আর দরিদ্রতার কোলে সম্পন্নাবস্থার শোভা! আঁধার না হইলে আলোক ফুটে না তারতম্যও হয় না। দরিদ্রতা না হইলে কোন হৃদয়েরও সম্যক স্ফূরণ হয় না। তাই দরিদ্রের কুললক্ষ্মী বলিয়াই বুঝি ইন্দুবালার চরিত্র এত মধুর

এত দূর প্রস্ফুটিত হইয়াছে! অথবা প্রকাশনাথকেই আমরা দরিদ্র বলি কেন? তিনি মহা ধনী ছিলেন। সত্য বটে তাঁহার অর্থ ছিল না, কিন্তু তেমন ধন কাহার নিশ্চল? প্রকাশনাথের হৃদয় ছিল। যাঁহার হৃদয় আছে এ সংসারে তিনিই মহাধনী। তুমি আমি প্রকৃত হৃদয় হারাইয়া দু'পাঁচটা পরমাণুর সমষ্টি লইয়া বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইলে কি হইবে! প্রকাশনাথ এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং এইরূপ শিক্ষাই তাঁহা প্রাণের প্রাণ ইন্দুবালাকে শিখাইয়াছিলেন। তাই আজ এ সংসারে ইন্দুবালা দেবী। এ দেবীর আদর হিন্দুই জানে। অপর কেহ জানুক আর নাই জানুক হিন্দুর তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। এই ইন্দুই হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের গৌরবাকাশের পূর্ণেন্দু!

সমাপ্ত।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।



শোক-সঙ্গীত।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

আজি কেন শূন্য মনে ওগো মা ভারতেশ্বরি!
ভাসিছ নয়ন নীরে বসি দিবা বিভাবরী?
বল মাগো চন্দ্রাননে, হাসি নাহি কি কারণে,
বিষাদে বিরস চিত, সতত কাহারে স্মরি?
কেন প্রতি গৃহ চূড়ে, বিষাদ পতাকা উড়ে,
বিষাদ বাজনা কেন, বাজিছে বিবশ করি?
আত্মীয় স্বজনগণ, শোককেতে সন্তপ্ত মন,
নীরবে বসিয়া সবে ফেলিছে নয়ন বারি?
কামান মৃদুল ভাষে, শোক চিহ্ন পরকাশে,
বিষাদ সাগরে আজি ভাসিতেছে রণ তরি?
কুমার কুমারী দলে, কেন ভাসে আঁখি জলে,
শোকের সঙ্গীত ভাষে, পরাণ অধীর করি?
বলিতে বিদরে হৃদি, কেমনে পাষাণ বিধি,
আঁধারি ধরণী ধামে, লইল কুমারে হরি।
প্রিয়সুত-প্রিয়সুত, অশেষ সুগুণযুত,
কেমনে করাল কালে, দিলে মা পরাণ ধরি!
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ভবিষ্য ভরসা আশা,
অকালে কুমার আজি চলিলা স্বরগ পুরী।
কোথা শুভ পরিণয়ে, নব বর বধূ লয়ে,
ভাসিবে আনন্দ ভরে, ও গো মা অবনীশ্বরি!
একি হলো পরমাদ, সে সাধে সাধিয়ে বাদ,
কুমার জীবন লীলা, চলি গেলা পরিহরি;
বিষাদে কাঁদিছে ঘন, কাঁদে গিরি প্রস্রবণ,
বিষাদে জলধি আজি কাঁদিছে মরমে মরি।
উঠ গো মা ত্বরা করি, শোক অশ্রু পরিহরি,
স্মর মা জগত পিতা, অন্তরে ধৈরয ধরি;
ভেসো না মা! আঁখিনীরে, উঠ মা উঠ গো ধীরে,
মলিন বদন তব, আমরা হেরিতে নারি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাইবেল সমালোচনা।

(বিশ্রাম বার)

"এইরূপে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন; এবং ঈশ্বর, সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, যে হেতুক সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্টিকরণরূপ আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।" আদি পুস্তক ২; ১—৩ পদ।

ঈশ্বর কি ছয় দিন সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিশ্রাম করা আবশ্যক হইল? কোন কোন খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের বিশ্রাম করার অর্থ সৃষ্টি কার্য্য স্থগিত করা। বিশ্রাম করার অর্থ যদি স্থগিত করাই হয় তাহা হইলে, "আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া" এই কয়টি কথার তাৎপর্য্য কি? কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার অর্থ কার্য্য স্থগিত করা; পুনরায় বিশ্রাম করার অর্থও যদি স্থগিত করা হয় তাহা হইলে "কার্য্য স্থগিত করিয়া কার্য্য স্থগিত করিলেন" এইরূপে এক কথা দুইবার করিয়া লিখিবার কারণ কি? আর ঈশ্বর যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এ সপ্তম দিনে অর্থাৎ একটি বিশেষ দিনে কেবল এক দিন বিশ্রাম করিবার কারণ কি?

ঈশ্বরের সৃষ্টির ছয় দিন এবং তাঁহার বিশ্রামের সপ্তম দিন সম্বন্ধে এক্ষণে বড়ই গোলযোগ বাঁধিয়াছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতির পূর্ব্বে মোশির ও খ্রীষ্টের শিষ্যগণ এই সাত দিনের প্রত্যেক দিনকে এক দিবারাত্রের অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার দিন মনে করিতেন; কিন্তু যখন হইতে সুসভ্য পণ্ডিতগণ দর্শন ও বিজ্ঞানবলে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব-ব্যাপার কখনই ছয় দিনে অর্থাৎ এক শত চুয়াল্লিশ ঘণ্টায় রচিত হয় নাই—ইহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবার পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি ও বিলয় হইয়া গিয়াছে, তখন হইতে দর্শন ও বিজ্ঞানবিৎ খ্রীষ্টিয়ানগণ তাঁহাদের সুর বদলাইয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনের অকাট্য প্রমাণ কোনমতে খণ্ডন করিতে না পারিয়া এক্ষণে বলেন যে, 'মনুষ্যের সহস্র বৎসর ঈশ্বরের এক দিবস, এবং ঈশ্বরের এক দিনে মনুষ্যের সহস্র বৎসর হয়,' সুতরাং বাইবেলে যে ছয় দিনে পৃথিবীর সৃষ্টির বিবরণ লেখা আছে সেই ছয় দিনের অর্থ ছয় সহস্র বৎসর। মনে করুন, যদি

সেই ছয় দিন অর্থে ছয় হাজার বৎসর হয় তাহা হইলে অবশ্যই সপ্তম দিন অর্থে সপ্তম সহস্র বৎসর বুঝিতে হইবে। এইরূপে সপ্তম দিনও যদি এক সহস্র বৎসর হয় তবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই ছয় সহস্র বৎসর সৃষ্টি করিয়া সপ্তমসহস্র বৎসরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি এক সহস্র বৎসর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিশ্রাম করার অর্থ যদি কার্য্য হইতে স্থগিত হওয়া অর্থাৎ কোন কর্ম্ম না করা হয়, তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ খ্রীষ্টিয়ানদের মতে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টির পরে এক সহস্র বৎসর কোন কর্ম্ম করেন নাই; কিন্তু আমরা আদি পুস্তকের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় পড়িয়া দেখিতে পাই, যে, আদমের পরমায়ু সর্ব্বশুদ্ধ নয়শতত্রিশ বৎসর ছিল অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টির এক সহস্র বৎসরের মধ্যেই আদমের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং আদমের জীবদ্দশাতেই ঈশ্বর আদম ও হবার বিচার করণ আদম, হবা ও সর্পকে অভিশাপ দেওন—আদম ও হবার জন্য চর্ম্মের অঙ্গরক্ষিণী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইয়া দেওন—ভূমিতে কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা উৎপন্ন করণ—আদম ও হবাকে এদন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত করণ—এদন উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ সংস্থাপন—কয়িনকে অভিশাপ দেওন ও তাহার উপরে একটা চিহ্ন দেওন প্রভৃতি বিস্তর কর্ম্মই করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আদমের জীবদ্দশাতে অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টির পরে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে, যৎকালে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, যে, পরমেশ্বর ছয় দিন অর্থাৎ ছয় সহস্র বৎসর সৃষ্টির পরে এক দিন অর্থাৎ এক সহস্র বৎসর বিশ্রাম করেন নাই; তদ্ভিন্ন সৃষ্টির ছয় দিনের প্রত্যেক দিনের পরেই যখন আমরা বাইবেলে দেখিতে পাইতেছি যে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইয়া এক একটি দিবস হইয়াছিল, তখন ঐ এক একটি দিবসকে এক এক সহস্র বৎসর বা এক এক যুগ কিরূপে বলিতে পারি? সুতরাং মোশি, সৃষ্টির যে ছয় দিনের বিষয় লিখিয়াছিলেন, সেই ছয় দিনকে আমাদের দিন ধরিলে দর্শন ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা হয়; কিন্তু সপ্তম দিন অর্থাৎ বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে অধিক গোলযোগ ঘটে না। আবার সেই ছয় দিনকে ঈশ্বরের ছয় দিন বা আমাদের ছয় যুগ বা ছয় সহস্র বৎসর ধরিলে, বাইবেলে লিখিত মোশির "সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে" গোল বাঁধে এবং ঈশ্বরের বিশ্রাম দিন অর্থাৎ সপ্তম দিনকে এক সহস্র বৎসর ধরিলে মোশির লিখিত বিবরণ অনুসারে ঈশ্বরের "সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম" করা প্রমাণ হয় না। যাহা হউক য়িহুদিদিগের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাহারা রবিবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত ছয় দিন সমস্ত কর্ম্ম করিত; কিন্তু তাহারা শনিবারে অর্থাৎ সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিত। সেই দিনে তাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত

আর কোন কঠিন পরিশ্রমজনক কর্ম্ম করিত না। যিহুদিদিগের এই ব্যবহার আদম হইতে পুরুষ পরম্পরিত চলিয়া আসিয়াছিল। অথবা মোশি যখন মিসর দেশের ফরৌণ রাজার দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে যিহুদি দিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে লইয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বনে, বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে লোকদের স্বাস্থ্যরক্ষার ও বন ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এই বিশ্রাম বারের আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক করা কঠিন; কিন্তু আদমের সময় হইতে মোশির দশ আজ্ঞা প্রচার করার সময় পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে বিশ্রামবার সম্বন্ধে বাইবেলের ভিতর যখন কোন কথাই উল্লেখ নাই তখন ইহাই খুব সম্ভব যে ছয় দিন কর্ম্ম করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কখনই নহে—ইহা মোশির স্বকপোল কল্পিত ব্যবস্থা ছিল। সপ্তাহের মধ্যে একটি বিশেষ দিন যদি ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামদিন ও ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্রীকৃত, দিন হইত তাহা হইলে আদম হইতে মোশি পর্য্যন্ত আড়াই সহস্র বৎসরের বিবরণ যাহা বাইবেলে আছে, তাহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে বিশ্রামবার পালনের কথা উল্লেখ থাকিত। মোশি যেখানে ঈশ্বর হইতে দশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া লোকদিগকে জানাইতেছেন সেখানেও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা ছয় দিন কর্ম্ম কর ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম কর, কিন্তু তিনি সপ্তাহের কোন ছয় দিন কর্ম্ম করিতে ও কোন সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিতে বলিয়াছিলেন তাহাও শাস্ত্রে কিছু উল্লেখ নাই! বাইবেলে ঈশ্বরের সৃষ্টির যে ছয় দিন এবং তাঁহার বিশ্রামের যে সপ্তম দিন লিখিত আছে সেই দিন সকল কি প্রকার দিন রবি সোম প্রভৃতি সাতটিবার অথবা সাতটি যুগ তাহাই যখন মীমাংসা হইল না তখন ঈশ্বর কি বারে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কি বারে বিশ্রাম করিয়াছিলেন তাহার মীমাংসা করা পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বিতীয় বিবরণ ৫, ১৫ পড়িলে অনুমান হয় যে, মোশি যেদিনে যিহুদিদিগকে ফরৌণ রাজার দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা একটি শনিবার ছিল সুতরাং মোশি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল, শনিবার আসিলেই তাঁহাদের দাসত্ব মোচনের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেন এবং সেই দিবসে অন্যান্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান ও স্তবস্তুত করিত এবং সেই বারকে পবিত্র জ্ঞান করিত এবং সেইখান হইতেই প্রতি শনিবারে যিহুদিগের বিশ্রামবার পালনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টিয়ানদিগের মতে খ্রীষ্ট স্বয়ং একজন যিহুদি ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণ যিহুদদিগের ব্যবহার অনুসারে বিশ্রামবার পালন করিতেন না। খ্রীষ্ট যিহুদিদিগের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিয়া

কিরূপে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন এবং বিশ্রামবার পালন সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী উদাহরণ দেখুন—মার্ক ২; ২৩—২৮ পড়িলে দেখা যায় যে "খৃষ্টের শিষ্যেরা বিশ্রামবারে শস্যের শিষ ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া ফরীশিরা খ্রীষ্টের সহিত বাদানুবাদ করাতে খ্রীষ্ট দায়ূদের নিষিদ্ধ রুটী ভোজনের বিষয় উল্লেখ করিয়া শিষ্যদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তিনি আরও বলিয়াছিলেন "বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য বিশ্রাম বারের নিমিত্ত হয় নাই'।" লুক ৬; ৬—১২ পড়িলে দেখা যায় যে, "খ্রীষ্ট বিশ্রামবারে একটি শুষ্ক হস্ত মনুষ্যকে সুস্থ করিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে অপর কোন দিনেও সুস্থ করিতে পারিতেন, কিন্তু ফরীশিরা যীশুকে বিশ্রামবার লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী করিবার অভিপ্রায়ে প্রতীক্ষা করিতেছিল যে, যীশু সেই ব্যক্তিকে বিশ্রামবারে আরোগ্য করেন কি না? যীশু তাহা জানিতে পারিয়াই তাহাকে বিশ্রামবারে সুস্থ করিলেন।" যোহন ৫; ৫—১৩ পড়িলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্ট বিশ্রামবারে ৩৮ বৎসরের রোগগ্রস্ত একটি রোগীকে সুস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিশ্রামবারে তাহার খাট তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু যিহুদিগণ তাহা জানিতেপারিয়া যখন যীশুকে তাড়না করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল তখন যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন যে, "আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত বিশ্রামবারেও কর্ম্ম করিতেছেন এবং আমিও করিতেছি"; সেই রোগী যৎকালে ৩৮ বৎসরাবধি রোগ ভোগ করিতেছিল তখন সে সুস্থ হইতে আর একদিন বিলম্ব হইলে যে মরিয়া যাইত কিম্বা খ্রীষ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেই বিশ্রামবার ভিন্ন অন্য কোন বারে সুস্থ করিতে পারিতেন না তাহা কখনই নহে, কিন্তু বিশ্রামবার পালন-সম্বন্ধে যিহুদিদিগের মধ্যে যে একটা কুসংস্কার ও কুপ্রথা ছিল তাহাই দূর করিবার জন্য খ্রীষ্ট সর্ব্বদা এইরূপে যিহুদীদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন।

এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ানগণ শনিবারকে বিশ্রামবার বলিয়া আর পালন করেন না—তাঁহারা এক্ষণে রবিবারকে বিশ্রামবার মনে করিয়া রবিবারে বিশ্রাম ও ঈশ্বরোপাসনাদি করিয়া থাকেন। শনিবারের বিশ্রামবার তুলিয়া দিবার এবং রবিবারে বিশ্রাম করিবার শাস্ত্রীয় আদেশ আমরা বাইবেলের মধ্যে কোন স্থানে দেখিতে পাই না। খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্ট রবিবারে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া রবিবারকে পবিত্ররূপে পালন করা ও সেই দিনে সাংসারিক সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম ও ঈশ্বরোপসনা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শনিবারের বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিবার কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। আমরা ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হই যে সম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইনের সময়ের পূর্ব্বে অবধি উভয় যিহুদি ও খৃষ্টিয়ানগণ শনিবারকেই বিশ্রামবার বলিয়া পালন করিত, কিন্তু কনষ্ট্যাণ্টাইনের আজ্ঞানুসারে প্রজাগণ রবিবারকে "সূর্য্যবার" বলিয়া সম্মান করিতে বাধ্য হওয়াতে এবং সেই সময় হইতে শনিবারের পরিবর্ত্তে রবিবারে বিশ্রাম করিতে ও সেই দিনকে পবিত্ররূপে পালন করিতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টিয়ানদের রবিবার পালন করা শাস্ত্রীয় কোন আদেশ বা ব্যবস্থা নাই।

জনৈক খ্রীষ্টীয়ান্-তনয়।

সৈনিকের স্বপ্নদর্শন।

"নিবার নিবার যুদ্ধ" ভেরী নিনাদিল,
তিমির বসন পরি' এল বিভাবরী ;
অগণন তারাগণ, গগনে উদিল,
প্রহরা দিতেছে যেন হইয়া প্রহরী।

সহস্র সহস্র সৈন্য ক্লান্ত কলেবরে,
দিগন্ত প্রান্তর'পরে করেছে শয়ন ;
নিদ্রায় অবশ তনু, শ্রান্ত শ্রমভরে,
আহত সৈনিকগণ ত্যাজিছে জীবন।

জ্বলন্ত ইন্ধন রক্ষা করিছে যথায়,
মুমূর্ষু দিগকে হতে শার্দ্দুলাক্রমণ ;
তার এক পার্শ্বে মম তৃণের শয্যায়,
সেই রজনীতে আমি করিনু শয়ন।

সে ভীষণ নিশাকালে গভীর নিশীথে,
হেরিনু মধুর স্বপ্ন সুপ্ত অবস্থায় ;
শেষ রজনীতে আমি প্রভাত না হ'তে,
সেই স্বপ্ন তিনবার হেরি পুনরায়।

হইল আমার মনে উদয় তখন—
ভীষণ দর্শন সেই রণক্ষেত্র হতে,
দূরে দূরে অতি দূরে করিয়া ভ্রমণ,
আসিলাম যেন এক বিজন স্থানেতে।

ভাবিনু শরৎ কাল হয়েছে উদয়,
হেরিলাম সূর্য্যোদয় পথে যেতে চলে,
আসিলাম যেন মম পিতার আলয়,
সাদর সম্ভাষ তথা করিল সকলে।

কোমল হৃদয় ছিল আমার যখন,
সেই শিশু কালে আমি যেই সুখস্থানে,
হৃষ্ট চিত্তে করিতাম কত যে ভ্রমণ,
উপনীত হইলাম নিমেষে সেখানে।

শুনিলাম উচ্চরবে, শাদ্বল উপরে,
আমার সে মেষগুলি ডাকিছে সঘনে ;
শুনিনু গাহিছে গীত সুমধুর স্বরে,
কৃষক নিকরে সুখে পুলকিত মনে।

তখন সকলে বসি করিনু আহার,
আনন্দে অধীর হয়ে বলিলাম আমি—
'যাব না ছাড়িয়া আর বিহনে আমার
শোকার্ত্ত যে পরিজন কিম্বা জন্মভূমি।'

শিশুগণে ফুল্লমনে আসে শতবার
আদর করিনু কত সস্নেহ চুম্বনে ;
উথলিল প্রেয়সীর সুখ পারাবার,
দর দর আনন্দাশ্রু বহিল নয়নে।

"করহ বিশ্রাম নাথ, আমাদের সনে
হইয়াছ ক্লান্ত তুমি জীর্ণ অতিশয় ;"
(সংগ্রাম-পীড়িত সৈন্য আনন্দিত মনে,
থাকিবে পরম সুখে করিল আশয়।)

যেমনি প্রভাত হ'ল ফুরা'ল স্বপন,
দ'হিল হৃদয় মম দুঃখে পুনরায় ;
যে মধুর কণ্ঠরব করিনু শ্রবণ
নিমেষে অমনি তাহা মিলাইল হায় !!

শ্রীভোলানাথ মিত্র।

মীমাংসা-বিভ্রাট।

—*—

(রাম বাবুর বৈঠকখানা—রাম বাবু আসীন ; হরি বাবুর প্রবেশ।)

হরি। রাম বাবু! একলা যে?

রাম। কি হরি বাবু! আসুন আসুন বসুন; অনেক দিন দেখা হয় নাই,—ভাল আছেন ত?

হরি। আর আপিস থেকে আস্তে বেলা যায়, সকালেও আসা পোষায় না; আজ ছুটী বলেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছি।

(বিজয় বাবুর প্রবেশ।)

বিজয়। এই যে, হরি বাবু! আজ এখানে এসেছেন।

রাম। বসুন বিজয় বাবু।

বিজয়। এই বস্‌ছি, বস্‌ছি, (হরি বাবুর প্রতি) হরিবাবু! অনেক দিন পরে আপনাকে দেখে আমি আজ বড় সুখী হলেম।

হরি। আর অবসর বড় পাই না, তা না হ'লে আসতে কি? সময় পেলেই আসি।

বিজয়। আস্‌বার সময় হলেই অবসর হয় না, ইচ্ছে থাক্‌লেই আসতে পারা যায়। কি বলেন রাম বাবু?

রাম। আপ্‌নি সত্য কথাই বল্‌ছেন, ইচ্ছা থাক্‌লেই সব কাজ কর্ত্তে পারা যায়।

বিজয়। তার আর সন্দেহ কি? Where there is a will there is a way.

(নিতাই বাবুর প্রবেশ।)

রাম। এই যে নিতাই বাবু! এত তাড়া তাড়ি কেন? হাঁপাচ্চ যে!

নিতাই। আরে যে গোলমাল—আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাড়ী থেকে পালিয়ে আস্‌ছি।

রাম। কেন কি হ'য়েছে! সিদ্ধেশ্বর বাবু ভাল আছেন ত?

নিতাই। ও সব কিছু নয়, ও সব কিছু নয়, সিদ্ধেশ্বর বাবুর বুঝি কখনো কিছু হ'য়ে থাকে? বাবা যে শরীর তার উপর গোল গোল চোক্; একে কাল, তাতে আবার লম্বা দাড়ি—ঠিক ভাল্লুক!

বিজয়। গোলমাল হচ্চিল কেন?

নিতাই। জ্ঞানবাবু বল্‌ছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় ছেলেদের পড়্‌বার উপযুক্ত বই নাই; এই শুনে সিদ্ধেশ্বর বাবু এম্‌নি মুখ ভঙ্গি কল্লেন যে, আমি ত ভয়ে পালিয়ে আস্‌ছি, আর জ্ঞানবাবু খাচ্চেন হাবুডুবু।

হরি। তা জ্ঞানবাবু ঠিক্ কথাই বলেছেন, আজ কাল বঙ্গভাষায় ছেলেদের শিক্ষার উপযুক্ত বই নাই বল্লেই হয়।

বিজয়। কেন অনেক বই ত আছে।

হরি। যে সমস্ত বই আছে, সে সব ইংরাজীর অনুবাদ; সুতরাং, ঐ সকল বই ইংরাজী Idea তে পরিপূর্ণ। "হিতোপদেশ" প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত বই এর অনুবাদ আছে বটে, কিন্তু তা ত বড় স্কুলে পড়ান হয় না।

রাম। তা এখন যে সব অনুবাদিত বই পড়ান হয় তাতে কি কোন দোষ হচ্চে না?

হরি। দোষ হচ্চে না? তরলমতি বালকদের সুমুখে যে চিত্র ধরা যায়, তাহারা অবিকল তাহার অনুকরণ করে; সুতরাং ইংরাজী হইতে অনুবাদিত বই গুলি পড়ানতে বালকেরা গোড়া থেকেই Anglosized হ'তে আরম্ভ হয়।

বিজয়। কি বলছেন হরি বাবু! ইংরাজীর অনুবাদ পড়ান উচিত নয়? বলি, বাঙ্গালা ভাষাটার জীবন দান করেছে কে?

হরি। স্বীকার করি বটে যে, ইংরাজদের জন্য বঙ্গভাষার এত উন্নতি; কিন্তু তা' ব'লে যে ছোট ছোট ছেলেদের কাছে, তাঁদের বই গুলি পড়াতে হ'বে,—ইহা আমার অভিমত নয়।

রাম। (হরি বাবুর প্রতি) আপনি যা' বলছেন তা' ঠিক; আমার ও ঐ মত।

বিজয়। আপনারা যা' বলছেন বলুন, আমি আপনাদের বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করি না; কেবল আপনাদের ভুলটি দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করি।

এই বলিয়া বিজয় বাবু দাড়ি চুমড়াইয়া লইলেন; হস্ত দ্বারা টেরির পারিপাট্য ও নাসাগ্রে চস্‌মা সংস্থাপন করিলেন। নিতাই বাবু গতিক দেখিয়া বলিলেন,—"আমি এখন আসি, রাম বাবু!"

রাম। কেন? একটু বস না।

নিতাই। সেখানে ত তাড়া খেয়ে আসছি, আবার এখানে কি শেষ হাতা হাতি কর্ত্তে হবে?

[নিতাই বাবুর প্রস্থান।

হরি। যাক্, বিজয় বাবু আপনি কি বলছিলেন, বলুন।

বিজয়। আপনি ইংরাজী Idea ও আমাদের Idea র মত ভেদ কচ্চেন; অর্থাৎ ইংরাজী idea র সহিত আমাদের idea র মিল নাই বলছেন। কিন্তু একটু ভাবলেই, আর আমার কথাটার অর্থ একটু তলিয়ে বুঝলেই, আপনার মতের অসারত্ব বুঝতে পারবেন। দেখুন, আগে সমস্ত জাতিই এক ছিল। এটা অবশ্য আপনাকে মানিতে হ'বে, কেন না ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

হরি। এ ত আমি কখন শুনি নাই।

বিজয়। আপনি ডারউইনের—আচ্ছা অত দূর আপনাকে যেতে হবে না—হন্টারের History তাই বা কেন? Row's Hint এতেও এর বেশ প্রমাণ দেখতে পাবেন যে, ইংরাজ, জর্ম্মণ, রুষ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতিদের মত হিন্দুও Aryan অর্থাৎ, আর্য্যজাতির একটি শাখা মাত্র। এই Aryan জাতির বাসস্থান ছিল Caspian অর্থাৎ কাশ্যপিয়ান্ হ্রদের তীরে। আবার হিন্দুদিগের মতানুসারে কশ্যপ মুনি হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়; সুতরাং তাঁহার বাসস্থান ছিল Casplan হ্রদের তীরে; কারণ, Caspian বা কাশ্যপিয়ান শব্দটী 'কশ্যপ' শব্দ হইতেই উৎপন্ন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমরা ঐ Aryan বা আর্য্যজাতির একটি শাখা মাত্র। এখন দেখুন ইংরাজ, বাঙ্গালী

প্রভৃতি জাতিসমূহের উৎপত্তি স্থান যখন এক, তখন যে উহারা এক ও উহাদের মনের ভাব অর্থাৎ idea ও এক সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। আবার দেখুন ইংরাজদের ধর্ম্মে ও আমাদের ধর্ম্মে কোন ও প্রভেদ নাই।

রাম। কি বল্লেন্—ম্লেচ্ছ ও হিন্দু উভয়ের ধর্ম্ম এক নাকি?

হরি। আবার বল্‌বেন হিন্দু মুসলমান ও ক্রিশ্চান্ সবই এক—একাকার।

বিজয়। আপনারা আগে আমার কথাটা বুঝুন, তার পর যা' হয় বল্‌বেন।

রাম। আচ্ছা বলুন।

বিজয়। দেখুন না—আমরা বলি 'কৃষ্ণ' আমাদের প্রভু, আর ইংরেজরা বলে Christ তাঁহাদের প্রভু। এখন দেখুন Christ ও কৃষ্ণ এক কি না; Christian রা 'কৃষ্ণ-ভক্ত' কিনা; একটু ভেবে দেখলেই এটা সহজেই আপনাদের উপলব্ধি হ'তে পার্‌বে।

হরি। বলেন কি? কৃষ্ণ ত Christ এর অনেক দিন আগে জন্মে ছিলেন। কৃষ্ণ ও Christ কখনও এক হ'তে পারে না। কৃষ্ণ ছিলেন এক প্রকৃতির, Christ ছিলেন অন্য প্রকৃতির। নামেতে অনেকটা সাদৃশ্য আছে ব'লে উভয়ে কখনও এক হতে পারে না; বিশেষ যখন ঐ দুইটী শব্দের অর্থ বিভিন্ন। আরো দেখুন ইংরাজীতে Paul বলে এক Family আছে, আর বাঙ্গালায় ও পালবংশ আছে তা' ব'লে বাঙ্গালার পাল-বংশ ও ইংলণ্ডের Paul Family কি এক?

বিজয়। আপনার কথা সত্য হ'তে পারে কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে, ঐ দুই বংশের আদি পুরুষ এক। যাক্ আপনি যে বল্লেন কৃষ্ণ ও Christ এই দুই শব্দের অর্থগত প্রভেদ আছে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

হরি। কৃষির্ভূবাচকঃশব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে; আর Christ এর মানে হচ্ছে anointed অর্থাৎ অভিষিক্ত। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কৃষ্ণের সহিত Christএর তুলনা কখনই হ'তে পারে না।

বিজয়। হরি বাবু! আপনি যাই বলুন, Christ, কৃষ্ণ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তার কোনও ভুল নাই। সহজ কথায় বুঝিয়ে দিচ্চি শুনুন; Christ এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে Jesus christ অর্থাৎ ঈশ-কৃষ্ণ; তিনি কৃষ্ণের ঈশ, অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁর অনেক নীচে। কৃষ্ণের পর হয় বুদ্ধ। ঈশকৃষ্ণ, কৃষ্ণের চাতুরী ও বুদ্ধদেবের সাম্য-ভাব গ্রহণ করতঃ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন।

হরি। আচ্ছা, Christ নাম যেন হ'ল ঈশকৃষ্ণ,—যদিও ঠিক্ ধর্ত্তে গেলে এটা সম্পূর্ণ ভুল—এবং নামের মানেও যেন হ'ল—আপনার মতানুসারে - কৃষ্ণের ঈশ অর্থাৎ কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা হলে যে তিনি কৃষ্ণের চেয়ে বড় হচ্চেন, তা' তখনও যুক্তি সঙ্গত হতে পারে না—কানা ছেলের নাম পিতা মাতা 'পদ্মলোচন' রাখ্‌তে পারেন। আবার দেখুন কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক—শুধু তাহা নয় ঈশ্বরের অবতার। যাঁহারা ইহাঁদের চরিত্র সমালোচনা করেন, তাঁহারা অবশ্য

ইহাঁদের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ; তাহা না হইলে, ইহাঁদের গূঢ় অভিপ্রায় তাঁহারা বুঝিতে কিরূপে সক্ষম হইবেন ?

রাম। হরি বাবু! আপনি ঠিক্ কথাই বলেছেন ; বাস্তবিক্ বিজয় বাবু, আমাদের মত অজ্ঞান লোকের, পক্ষে যাদের পদে পদে ভুল, দেবচরিত্র সম্বন্ধে পরস্পরের তুলনা করা ধৃষ্টতা ও অহংকার প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিজয়। আপনারা মনে করেন কৃষ্ণই সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনাদের কৃষ্ণ-জীবনী যেরূপ ব্রজলীলা প্রভৃতি অশ্লীল ভাব পূর্ণ তাহাতে তিনি দেবতা বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারিতেন না ; ঐ সমস্ত অশ্লীল ভাব যুক্তি ও মীমাংসার দ্বারা অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণ-চরিত্র প্রচার হইয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সভ্য নব্যভারতে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। নতুবা কৃষ্ণ-জীবনী ওরূপ কুরুচি-ভাবব্যঞ্জক হইলে, মূর্খ ব্যতীত কে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিত ? পরম পবিত্র Christ চরিত্র এ দোষে দুষ্ট নয়।

হরি। বিজয় বাবু! আপনি কি ব্রজ লীলাকে অশ্লীল ও অমূলক বলেন ? যে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি ব্রজলীলা বিশদরূপে "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন। ব্রজলীলা আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ, মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-খানি আগাগোড়া পাঠ করিলে আমাদের মত ভ্রান্তলোকের মনও ক্ষণ কালের জন্য ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হয়। এক জন উপন্যাস লেখক যে স্বকপোল কল্পিত মতে এরূপ উচ্চ ভাবপূর্ণ ব্রজলীলাকে কবি-কল্পনা প্রসূত ও অশ্লীল ভাব পূর্ণ বলিয়া বুঝিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? আপনার কেবল মাত্র আধুনিক refined কৃষ্ণ চরিত্র খানি পড়া আছে তাই এরূপ কথা বল্‌ছেন।

রাম। হরি বাবু! আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল অমূল্য রত্ন বিশেষ ; এই রত্নময় হারের গৌরব বুঝ্‌তে না পেরে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী উচ্চ শিক্ষিতেরা কেবল দাঁতে কাট্‌তে প্রয়াস পান মাত্র।

বিজয়। আপনারা মিছি মিছি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ দিচ্চেন কেন ? আপনারা Reason যুক্তি না দেখিয়ে কেবল মাত্র আপনাদের Superstitious belief এর অনুসরণ কচ্চেন, একটু Reason সহকারে ভেবে দেখুন ; Superstition এর বশবর্ত্তী কেন হ'বেন ? "শ্রীমদ্ভাগবত" খানা real কি না এ বিষয়ে আগে বোঝা উচিত।

হরি। এর আবার Superstitious belief কি ? আপনি বল্‌ছেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানা ঠিক্ নয়, আমি বল্‌ছি মহাভারত খানা ঠিক নয় ; এরূপ অসংলগ্ন কথার কি উত্তর আছে ? আপনি Christ চরিত্র পবিত্র ব'লে মানেন, তাঁর জন্ম বৃত্তান্তও বিশ্বাস

করেন, এসব কি Superstitious belief নয়?

রাম। হরিবাবু! আপনি আগে যা' বলেছিলেন তা' ঠিক্। আজ কাল্কার লোকেরা যে Anglosized হয়ে পড়েছে তা' এখন বেশ বুঝিতে পাচ্চি।

বিজয়। না না আপনারা এত গোল কচ্চেন কেন? সহজে বুঝিয়া দিচ্চি শুনুন।

হরি। বলুন।

বিজয়। আগেও বেশ বুঝ্ছিলেন। আগে সব এক ছিল, এখনও সব ঠিক আছে। দেখুন, সর্ব্ব ধর্ম্মই এক; সব ধর্ম্মের মূলে এক মহামন্ত্র আছে: সেই মহামন্ত্র হচ্চে "মহেশ"। যাকে ইংরাজীতে বলে Moses; Jesus Christ ও সর্ব্বদা Messiah অর্থাৎ 'মহেশ' 'মহেশ' বলিয়া জপ করিতেন। বুঝ্‌চেন, আগেও সব এক ছিল পরেও সব হ'বে এক। অতি পূর্ব্বে যে 'জাতীয় একতা' ছিল অর্থাৎ সর্ব্বজাতি এক ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। দেখুন না কেন, আমরা বলি 'দুহিতৃ' ইংরেজরা বলেন 'daughter', আমরা বলি 'দেববিৎ' ইংরেজরা বলেন David'; আমাদের 'শর্ম্মণ' ইউরোপে 'German'; শিবঃ savior। আর মুসলমান ও আমরা একাত্মা বলিলেই হয় কেন না আমরা সদাই বলি 'রাম' 'রাম' মুসলমানেরা বলেন 'রহিম্' 'রহিম্' আর—

হরি। থাক্ বেশ বোঝা গিয়াছে আর কাজ নাই; কোন দিন বল্‌বেন আবার আমাদের অগস্তমুনি ও Augustus Caeser এক। (হরি বাবুর হাস্য।)

রাম। সে কথায় আর কাজ কি? আর কাল অনেকেই কথার সামঞ্জস্য দেখে, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে বসেন; আর শেষের বুলী 'আগে সমস্তই এক ছিল।'

(রাম বাবুর হাস্য।)

বিজয়। (গম্ভীর ভাবে) ও রকম উপেক্ষা করে হেসে কথা উড়াইয়া দিলে চলে না; বোঝা চাই বোঝা চাই।

(ইতি বিজয় বাবু উত্থান)

রাম। বিজয় বাবু উঠ্চেন কেন; বসুন, বসুন।

হরি। একটা হাসির কথা কওয়া গেল, তার জন্যে বিজয় বাবু রাগ কচ্চেন কেন? বেশ ত বুঝিয়ে দিয়ে এর একটা মীমাংসা করুন।

রাম। আর বিভ্রাটে কাজ নাই। নিতাই বাবু এসে একটা গোল বাধালেন।

(পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। কি বাবা এত গোলমাল হচ্চে কিসের?

হরি। এই মশাই! একটা মীমাংসা হচ্চিল।

পণ্ডিত। আর বাবা! তা ত হতেই পারে, দেখনা কেন শাস্ত্রেই আছে—

"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি
দশম বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে
পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ॥"

বিজয়। পণ্ডিত মহাশয়! এর সঙ্গে শ্লোকের কি সামঞ্জস্য হল?

পণ্ডিত। এর আর ব্যাখ্যা বুঝ্‌তে পাচ্চ

না বাবা! এর সঠিক্ বাঙ্গালা তর্জ্জমা আমার আছে, সেইটা শুন্‌লেই সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বে, যথা—

শিশুর পঞ্চম বর্ষে মুখে পড়ে লাল,
দশম বরষে তাড়ি খাইয়ে মাতাল।
ষোড়শ বর্ষেতে যবে করে পদার্পণ,
মিত্রগণ সহ করে বদ আচরণ।

এ আমার সব কথাগুলি বজায় রেখে তর্জ্জমা। (সকলের হাস্য)

হরি। এ কিসের উপমা হ'ল পণ্ডিত মশায় ?

পণ্ডিত। এ আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না বাবা ? এই ষোল বছর বয়স থেকে বরাবর মিত্রগণের সহিত বদ্ আচরণ অর্থাৎ অন্যায় ব্যবহার কর্ত্তে পার। কিন্তু বাবা তোমরা এখন বড় হ'য়েছ তোমাদের কি এ রকম ঝগড়া কর্ত্তে আছে ? শাস্ত্রে থাকলই বা।

বিজয়। (হাস্যমুখে) এ শ্লোকটা কোথায় আছে পণ্ডিত মশায় ?

পণ্ডিত। এ জান না বাবা! এ চাণক্য পণ্ডিতের স্বকোপলকল্পিত শ্লোক ; একবারে অকাট্য।

হরি। (হাসিতে হাসিতে) বিশেষ আপনার ব্যাখ্যাটী বড়ই সুন্দর হ'য়েছে; আর এমন অনুবাদও কেহই কর্‌তে পারে না।

রাম। পণ্ডিত মশাই! আর একটা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন্‌তে পাইনে ?

পণ্ডিত। আর বাবা বেলা হচ্চে আমাকে শিষ্য বাড়ী যেতে হবে, আবার তার পর গঙ্গায় গিয়ে প্রাতঃস্নান কর্‌তে হ'বে, ওটা আমার নিত্যকর্ম্ম।

হরি। পণ্ডিত মশাই! প্রাতঃস্নান এখন কি ? দশটা বেজে গেছে যে।

পণ্ডিত। আর বাপু বুড়ো হুড়ো হ'য়েছি পেরে উঠিনি, কিন্তু আমাকে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান কর্‌তেই হয় ; এখন আসি তবে।

[পণ্ডিতের প্রস্থান।

বিজয়। আমিও আসি Then good bye রাম বাবু Do not take any offence হরি বাবু।

[বিজয় বাবুর প্রস্থান।

রাম। পণ্ডিত মশাই গেলেন তাই রক্ষে, না হ'লে নিতাই বাবুর কথা ফলেছিল দেখ্‌ছি।

হরি। হাঁ। বিজয় বাবু পণ্ডিত মশায়ের মতই বিদ্বান, তবে উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। পণ্ডিত মশাইকে দেখ্‌তে যেমন হোক না কেন, লোকের সঙ্গে মিস্‌তে বেশ পারেন ; আর বিজয় বাবুর মূর্ত্তিখানি হালের shine করা প্রকৃতিটাও উদ্ধত। উৎসন্নে যাবার লক্ষণ আর কি! বাপ্ ঠাকুরদাদা প্রভৃতি আদি পুরুষ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু কিন্তু এখন উনি তাঁদের মত মানেন না, উনি এখন নব্য সভ্য বাবু। আর কথায় কাজ কি ? Pope বলেছেন—

"We think our fathers fool so wise we grow
Our wiser sons no doubt will think us so."

তিনি আরো বলেছেন, একটু আধটু লেখা পড়া শেখা কেবল অনর্থের মূল—Little learning is a dangerous thing

রাম। ঠিক কথা আমাদের সংস্কৃতে শ্লোক আছে—

"অগাধ জল সঞ্চারী, বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ জলমাত্রেণ, সফরী ফর্ফরায়তে॥"
"দিব্যমাম্রফলং ভুক্ত্বা গর্ব্বং ন যাতি কোকিলঃ
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং, ভেকো মকমকায়তে॥"

আজ কালকার লোক দু'চার খানা ইংরাজী বই পড়ে মনে করেন, আমাদের সব ভুল আর ইংরেজদের সব ঠিক্, তাঁহারা অদৃষ্ট মানেন না, জন্মান্তর মানেন না, এক কথায় কিছুই মানেন না। কিন্তু যখন বিপদে পড়েন, তখন সকলকে সব মান্তে হয়।

হরি। সে কথা আর বল্‌তে? কিন্তু বিজয় বাবুর সহিষ্ণুতাগুণ যথেষ্ট যতই দোষ দেখিয়ে দাওনা কেন,তবু গোঁ বজায় রাখবার জন্য 'সহজ কথায় বুঝিয়ে দিচ্চি শুনুন', একথা বল্‌তে ছাড়েন না। আচ্ছা ভাই! উঠি এখন।

রাম। চল্লে?—মাঝে মাঝে যেন দেখা হয়।

[হরি বাবুর প্রস্থান।

সঙ্গীত।

৺ আশুতোষ দে (সাতুবাবু) বিরচিত।

দেশমল্লার—কাওয়ালী।

কেরে অঞ্জন গঞ্জন বরণী,
বামা নিরূপমা মোহিনী।
প্রমোদিত খঞ্জন, গৌরব ভঞ্জন,
ত্রিভুবন রঞ্জন নিত্য পরায়ণী।
রবি শশী নবঘন, বিজয়ী চরণ,
করি অরি জয় করি কটি সুগঠন।
মৃণাল নিন্দিয়ে কর, অতুলনা পয়োধর,
জিনি কোটী সুধাকর মনোহর বদনী।
এলোকেশী ভালে শশী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি
তিমির নিবারে যেন চপলা প্রকাশি।
কৃপাণ কমল করে, অরি শির ছেদ করে,
আশুতোষ হৃদিপরে রমণী শিরোমণি।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বেণুর রব শুনে ধেনু ফেরে বৃন্দাবনে,
চমকিত গোপিগণ মুরলী শুনি শ্রবণে।
মিলি যত সখীগণ, করে বন অন্বেষণ,
না পেয়ে সে শ্যামধন ধারা বহে দুনয়নে।
পাগলিনী মত সব, বলে কোথা হে কেশব,
এ দুঃখ আর কত সব কে ঘুচাবে তোমা বিনে
চাতকিনী গোপিগণ তুমি শ্যাম নবঘন,
তৃষায় আবৃত জনে আশুতোষ বরিষণে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। | ফাল্গুন—১২৯৮। | একাদশ সংখ্যা।

প্রদোষে।

হয়েছে দিবস অবসান;
অসিত অঞ্চলে ঘন,
আবরিয়ে চন্দ্রানন,
কাঁদে নিশি বিরস বয়ান।

বারিধারা, কুহেলিকা,
ভেদিয়া দিতেছে দেখা,
দূর গ্রামে দীপ দীপ্তিমান্;
কি এক বিমর্ষ ভাবে
আচ্ছন্ন মানস মম'
কিছুতে না পাই পরিত্রাণ।

যেমতি কুয়াসা ঘন
বিনে বারি বরিষণ
দরশনে—বর্ষণ সমান,
এই যে উৎকণ্ঠা ঘোর,
বিষাদ—যাতনা হীন—
তেমতি রয়েছে বিদ্যমান।

সরল কবিতা চয়,
হৃদয় পরশী গান,
কাছে এসে শুনাও মধুর;
এ চঞ্চল চিন্তারাশি
পাবে উপশম তায়,
দিবস ভাবনা যাবে দূর।

গেওনা পণ্ডিত বিরচিত,
কিম্বা শ্রেষ্ঠ কবিদের গীত,
যাঁহাদের পদক্ষেপ
অনন্ত কালের পথে
হইতেছে সতত ধ্বনিত।

সমর সঙ্গীত সম
তাঁহাদের কবিতায়
উচ্চভাবে করিছে বিরাজ—
অসীম আয়াসব্যাপী
জীবন—উদ্যমময়;
আমি চাই বিরাম যে আজ।

সৌম্যমূর্ত্তি কবিদের
গাও শান্ত রসময়
হৃদয় নিঃসৃত সেই গান—
যে সঙ্গীত নিদাঘের
বারিবরিষণ সম
স্নিগ্ধ করে তাপিত পরাণ
অথবা পুলক ভরে
বহে অবিরল ধারে
অশ্রু গঙ্গা ভাসায় নয়ান।

আয়াস বহুল দিবা,
বিরাম বিহীন নিশি,
আজীবন করিয়ে যাপন,
তথাপি তাঁদের প্রাণ
কি এক সঙ্গীত রসে
মগন রহিত অনুক্ষণ।

চিন্তা-স্রোত-বিচঞ্চল
শিরায় শিরায় পশি,
হেন গীত শান্তি করে দান ;
ভক্তিমান্ সাধকের
'কৃষ্ণনাম শুনে যথা
প্রেম রসে পরিষিক্ত প্রাণ।

ভাব রত্ন বিভূষিত
তাঁহাদের কাব্যহতে
তবে গীত করি নির্ব্বাচন,
কবির মধুর ছন্দে
মিলায়ে সুকণ্ঠতব
গাও তুমি মানস মোহন ;
দিবস ভাবনা যত
হোক্ দূর পরাহত,
নিশি হোক্ সঙ্গীতে মগন।

শ্রীরসময় লাহা।

শর ও সঙ্গীত।

—*—

বিক্ষেপিনু শর শূন্যপথে,
কোথা গেল জানিব কেমনে ?
কিছুতে না পাইনু দেখিতে,
গেল এত ত্বরিত গমনে।

গাহিনু সঙ্গীত বায়ু-স্রোতে,
কোথা গেল জানি না যে আমি ;
কার দৃষ্টি এতই প্রখর
হইবে তাহার অনুগামী ?

সেই তীর তমাল পাদপে
হেরিলাম কত দিন পরে ;
আদ্যোপান্ত সেই গীত মোর
রহিয়াছে সখার অন্তরে।

Long fellow

শ্রীরসময় লাহা।

প্রশ্ন চতুষ্টয়।

একদা সম্রাট আকবর তদীয় সেনানায়ক রাজা বীরবলের সহিত সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তিনি সহসা রহস্য ছলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দেখ বীরবল! বহুদিবসাবধি কয়েকটী বিষয় নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। নিয়ত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চিত্তের এক বিষম চাঞ্চল্য সমুপস্থিত হইয়াছে; আমি যেন সর্ব্বদাই সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইতেছি।"

বাদসাহের এই রহস্যগর্ভ বচন পরম্পরা সম্যক অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া, রাজা ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজন্! যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে এই দাসানুদাস শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে; সবিস্তারে বর্ণন করিতে অনুমতি হয়।"

সম্রাট বীরবলের বাক্যে বলীয়ান হইয়া উৎফুল্ল নয়নে আদেশ করিলেন—"বীরবল! আমি তোমায় চারিটি প্রশ্ন করিব; তোমাকে তাহার উত্তর প্রদান করিতে হইবে। প্রথম, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান—তিনি সকলই করিতে পারেন কিন্তু এমন কি কার্য্য আছে যাহা করিতে তিনি অক্ষম। দ্বিতীয়, তিনি কি আহার করেন? তৃতীয়, তিনি কত দূরে অবস্থিতি করিতেছেন? এবং চতুর্থ, তিনি এই মুহূর্ত্তে কি করিতেছেন?"

বীরবল বাদসাহের এই সকল আপাত অসঙ্গত বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, প্রথমতঃ বিদ্রূপ বোধে ঈষৎ হাস্য করিলেন; কিন্তু সম্রাটের মুখমণ্ডলে যুগপৎ গাম্ভীর্য্য ও বিরক্তিভাব সন্দর্শন করিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ! আমি বিদ্যা বুদ্ধিতে রাসভ ও ক্ষমতায় কীটানু সদৃশ, তাহাতে আবার ভবদীয় আশ্রয়ে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ ও অর্থ চিন্তায় নিয়ত নিযুক্ত থাকায়, পরমার্থ চিন্তায় তিলার্দ্ধ মনোনিবেশ করিতে পারি না। যজ্ঞীয় অরণি যেমন নিয়ত যজ্ঞ কুণ্ড সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াও হোম-হবির আস্বাদনে সর্ব্বথা বঞ্চিত, তদ্রূপ আমিও ভবদীয় ধর্ম্মাধিকরণে সতত অবস্থিতি করিয়াও ধর্ম্মসঞ্চয়ে নিতান্তই অপটু। অপিচ, শর্করাবাহী বলদের ন্যায় তদাস্বাদনে বিরত থাকিয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি সন্দেহ নাই। অতএব আমি যে এই মুহূর্ত্তে আপনকার এই সকল মহার্থ বাক্যের অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইব, ইহা অতি অসম্ভব। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর দিতে হইলে আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস কাল রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া তদীয় বাক্যে

অনুমোদন করিলেন এবং বলিয়া দিলেন—"ছয় মাস মধ্যে প্রশ্নের উত্তর লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে; নচেৎ জীবন সংশয় জানিও।"

রাজা বীরবল তদীয় বাক্যে অর্দ্ধোৎফুল্ল ও অর্দ্ধসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীয় আবাসে গমন করিয়া রাজবেশ পরিত্যাগ ও কৃত্রিম জটাবল্কলাদি ধারণ পূর্ব্বক মেঘ সংযুক্ত শশধরের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং অচিরে অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়া তেজঃপুঞ্জ বিষয়-বীতরাগ শান্তচেতা ফকির গণের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে সম্রাট তদীয় পদে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া রাজ কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস অতীত প্রায়, কিন্তু বীরবল প্রত্যাগমন করিলেন না। সম্রাট তদীয় প্রতিনিধির প্রতি কপট ক্রোধ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন "কৈ বীরবল ত ফিরিল না, তোমাকেই ঐ চারি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। নচেৎ তোমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও।"

প্রতিনিধি প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! অপ্রতিমতেজা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য বীরবল যদি এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন, তাহা হইলে আমার ন্যায় হীন বুদ্ধি কেমন করিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে বলিতে পারি না। শিবা কখন সিংহভার বহন করিতে পারে? এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার যদি ছয় মাসের অবকাশ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এ অধমের যে এক বৎসরের আবশ্যক হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।"

সম্রাট এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, প্রতিনিধি আলানমুক্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বগৃহে গমন করিয়া ফকিরবেশ ধারণপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট তদীয় পদে আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

মাসের পর মাস অতীত ও এক ঋতুর পরে অন্য ঋতুর সমাগম হইতে লাগিল, প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ হইল না। প্রতিনিয়ত অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিধির পুষ্ট কলেবর ক্রমশঃই বিশীর্ণভাব ধারণ করিতে লাগিল। তাঁহার বদনমণ্ডল পরিম্লান ও হৃদয়-কমল বিশুষ্ক হইয়া আসিল। তিনি কখনও বা প্রখর ভানুকরে প্লুষ্ট দেহ ও কখন বা বরষায় আর্দ্র কলেবর হইয়া, বন হইতে বনান্তরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; তথাপি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ হইল না। তিনি কখনও বা মনে করিতে লাগিলেন, সুচতুর বীরবল সম্রাটকে বৃথা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া শান্তি রসাস্পদ অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন। হতভাগ্য আমি—আমার ভাগ্যে বিধাতা না জানি কি নিষ্ঠুর দণ্ড বিধিই বিধান করিয়াছেন। আবার কখনও বা মনে করিতে লাগিলেন, আর সম্রাট সন্নিধানে প্রত্যাগমন না করিয়া, অনাহারে বা সলিল মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভারভূত জীবনের অবসান করাই শ্রেয়ঃকর্ম্ম।

এই রূপ নানাবিধ দুশ্চিন্তায় অনেক দিন অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তথাকার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। ক্রমশঃ যতই তিনি অগ্রপদ হইতে লাগিলেন, ততই পবন-পথ পরিস্তীর্ণ বিবিধ কুসুম সৌগন্ধে ও প্রাণ-স্পর্শী সুমধুর বিহঙ্গম সঙ্গীতে পরম পুলকিত হইতে লাগিলেন। তথায় যুদ্ধ নাই, বিগ্রহ নাই, অসত্য নাই, চাটুবাদ নাই; তথায় অহঙ্কার নাই মাৎসর্য্য নাই, আছে কেবল সুখ ও শান্তি; বিষয় ভাবনা নাই—আছে কেবল পরমার্থ চিন্তা।

এই সুরম্য কানন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তিনি এক খানি কুটীর দেখিতে পাইলেন; এবং কুটীরাজির পরিব্যাপ্ত বটচ্ছায়ায় এক সৌম্যমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জকলেবর ফকির দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তৎপরে, তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করায় ফকির তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, উপবেশনার্থ মৃগচর্ম্ম প্রদান করিলেন।

আগন্তুকের বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া ফকির বলিলেন—"কেন ভাই! প্রভাত কালীন শশধরের ন্যায় তোমার বদন মণ্ডল এমন পরিম্লান দেখিতেছি কেন? এস্থান শান্তির আবাস ভূমি; এস্থানে ফকিরভোগ্য তরুচ্ছায়া, তোয় এবং ফল মূলাদির অভাব নাই। তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ বা যথেচ্ছ উপবেশনাদি করিয়া এস্থানে শান্তি-সুধা উপভোগ করিতে পার।"

ফকির বাক্যে আগন্তুকের চিন্তা দূর হইল না। ফকির পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সবিশেষ সমস্ত বর্ণনা করিলেন। ফকির আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভাই! চিন্তা দূর কর। এখান হইতে রাজধানী বড় অধিক দূর হইবে না; যোজনৈক পথ অতিক্রম করিলেই রাজমার্গ প্রাপ্ত হইবে। তুমি গিয়া সম্রাটকে বল এক ফকির তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন।"

ফকির বাক্যে আগন্তুকের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা ও পাদবন্দনাদি করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন; এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ-সমীপে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে এত সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ সেই ফকির কোথায়?" প্রতিনিধি কহিলেন, "তিনি রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, অনুমতি হয়ত আনয়ন করি।" সম্রাট 'তথাস্তু' বলিয়া ফকিরের আগমন প্রতীক্ষায় অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রতিনিধি অনতিবিলম্বে ফকিরকে রাজ-সমীপে আনয়ন করিলেন। ফকির তাম্র-কূট সেবন করিতে করিতে সম্রাট সমক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাট সেই তেজঃপুঞ্জ ফকিরকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নির্ভয়চিত্ত ফকির অবাধে সম্রাটকে হুঁকা ধরিতে আদেশ করিয়া, কক্ষস্থিত মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সম্রা-

টও কি করেন অগত্যা তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তদবস্থ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন এবং হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ উল্লিখিত প্রশ্ন চতুষ্টয় একে একে ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সম্রাট। ঈশ্বর অনন্ত শক্তিমান, অতএব তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু এমন কি কার্য্য আছে যাহাতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম?

ফকির। সত্য তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তিনি অপরাধী সন্তানকে নিজ বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে পারেননা; কারণ সমগ্র আকাশ পৃথিবী, সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি স্বর্গ বা নরক সমস্তই তাঁহার বাটী সুতরাং অপরাধীকে যে স্থানেই বহিস্কৃত করিয়া দিন না কেন, তাঁহারই বাটী মধ্যে অবস্থিতি করিবে।

সম্রাট। ভাল, তিনি কি আহার করেন?

ফকির। মনুষ্যের গালাগালি ভিন্ন আর কিছুই তিনি আহার করেন না। তিনি কৃতঘ্ন মনুষ্যকে সকল সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াও তাহার গালাগালির ভাজন হইয়াছেন।

সম্রাট। ভাল,—তিনি কতদূরে অবস্থিতি করিতেন?

ফকির। তিনি দূরে নাই, ছায়ার ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন, কিন্তু কেহই স্পর্শ করিতে পারে না। মনুষ্য নিজ দেহে তদীয় শক্তি সন্দর্শন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারে না।

সম্রাট। ভাল,—এই মুহূর্ত্তে তিনি কি করিতেছেন?

ফকির। এই মুহূর্ত্তে তিনি সম্রাটকে ভৃত্য ও ভৃত্যকে সম্রাট করিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে কিরূপ? স্বচক্ষে দেখুন আমি আপনকার ভৃত্য রাজাবীরবল, আপনাকে হুঁকা ধরিতে আদেশ করিয়া, সচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতেছি; আর আপনি আমার প্রভু প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবর, আমার আদেশে হুঁকা ধরিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

এই বলিয়া বীরবল মুহূর্ত্তমধ্যে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সলজ্জ ভাবে তদীয় পদতলে নিপতিত হইলেন। সম্রাট বিস্মিত হইয়া সমস্তই স্বপ্নবৎ বোধ করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়াই আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার উত্তর চতুষ্টয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

কাদম্বিনী দর্শনে।

সখিরে!
রজনী অবিদিতগতযামা।
ফুল্ল ফুলে কিবা, মধুর নিনাদে,
মধুকর মধুকর-বামা;
রজনী অবিদিতগতযামা।

দিবস ত আয়ল সখি!
ভানু উঠল নেহি কাহে?
কানন ভরল সুবাসে,
চারু বিহগদল গাহে।

অবিরলিতকপোলে, মৃহু মুহুভাবত,
আঁখি পলক নেহি ফেলে;
হেরলো সজনি! ওহি, রজনী বিরামত,
কমল, কমলআঁখি মেলে।

দিবস ত আয়ল সখি!
ভানু উঠল নেহি কাহে?
কুমুদিনী বিরহ বিভোলা
শশী'পর আকুল·চাহে।

মেঘ মেছুর সখি! ঘনতম ছায়ল
দিনকর উজল বয়ান;
রাগ কুটিল আঁখি, বিজলী বিদারিল,
কোমল কমল পরাণ।

আঁখিপর পেখনু সখি!
কাঁদে কমল মিরমান;
আঁখি ভরি পেখনু কিবা,
সুবিমল প্রেম বিধান।

বাম নয়ন ভুজ ভুলি গিয়া নাচনি,
আজু সখি! বহুদিন ভেল;
কতশত যামিনী দিবস বিদায়িনু,
মাধব মধুপুর গেল।

কত নিশি যাপনু সখি!
আশা কি ছলন বিলাসে;
কত দিনু ঝুরল সখি!
চাতকী নীর·পিয়াসে।

মেঘ বিমুখ সখি! দুখিনী ললাটে,
বিন্দু বরখে নেহি বারি;
যত দিনু যায়ত তমসগভীরে,
ছায়ত হৃদয় আধারি।

ঝুরু ঝুরু অনিল বহে,
কাঁপিল হৃদয় অধীরে;
মৃদু মধু কুঞ্জে পিকু,
ভাসনু নয়ন কি নীরে।

কাহে সরস সখি! বিরস হামারি,
ডালিছে গরল পরাণে?
বুঝনু বিরস চিত, বীণ বিতন্ত্রী,
বাজত বিষময় তানে।

কত ঠাঁই ঢুড়নু বহু,
আশা সফল নেহি ভেল;
বিকলিয়া প্রাণ মম,
প্রাণজীবন চলি গেল।

কুসুম কাননমে, লতিকা নিকুঞ্জে ;
টুঁড়নু পলব কি ছায়ে ;
টুঁড়নু সরসী নীর সলিল তরঙ্গে
আকুল বিরহ কি দায়ে।

কত ঠাঁই ঢুঁড়নু সখি !
প্রাণ শীতল নেহি ভেল ;
অপহরি নয়ন মণি,
প্রাণ বঁধুয়া চলি গেল।

শোক দহন সখি ! জ্বলিল বিশাল
বারি নয়ন নীর দানে ;
কাম কুছুত নেহি, বিফল বিলাপে
বাঁধনু হৃদয় পাষাণে।

মানস কঠিন অতি
অবিকল বিরহ কি নামে ;
পাষাণ মুরতি সম
রহনু সজনি ! এহি ধামে।

নিভৃত নিদাঘ, বরখা বিরামিল
আয়ল শরদ কি খেলা ;
শিশির চলিল মৃদু মৃদুগতি আয়ল
মাধব মধুময় মেলা।

কো নেহি রহল সখি !
ধাম আপন চলি গেল ;
বিরহ কি চরম গতি
প্রাণ সজনি ! নাহি ভেল।

হামি কানন লতা কুসুম বিবর্জ্জিতা
বিরহিতা পাদপ ছায়া ;
হামি কানন ফুল দেব চরণ বিনু
ধরণীবিলুণ্ঠিত কায়া।

সকলিত সহল সখি !
সার করিনু দুখগীতি ;
গিরিবর পতিত লঘু,
পুরব পতন কো ভীতি।

আজিহ আজিহ কভু, চপলা চমক সম
হিয়া পর মুরতি জাগে ;
মেঘ কালিম ছায়া নিরখি নয়ানে
দূরসে দূরতর ভাগে।

দোষ কুছুত নেহি তার,
নশীব কি দোষ হামারি ;
সুখ নিধি গঠিল বিধি
কৈনু যতন নেহি অরি।

মেঘ বিমুখ সখি ! দুখিনী ললাটে
ভানু'কৃপা বহুদূর ;
মেঘ নিঠুর অতি, কাল কুটীল বহু
ছাযি রহল এহিপুর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

———

বাইবেল-সমালোচনা।

আদিম পাপ বা পাপের উৎপত্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত বা খ্রীষ্টকৃত পরিত্রাণ।

আমরা বাইবেল পাঠে অবগত হই যে ব্যবস্থা লঙ্ঘনই পাপ। (রোমীয় ৭; ৭ ও ১ যোহন ৩; ৪।) এবং ঐ পাপ আদম দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল। (আদিপুস্তক ৩;১৩ ও রোমীয় ৫; ১২।) সুতরাং আদমের বংশজাত তাবৎলোক পাপেতে জাত। (ইয়োব ১৫; ১৪। ২৫; ৪। গীত ৫১; ৫।) এবং ঐ আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ পাপের দণ্ড মৃত্যু। (আদি পুস্তক ২; ১৭।)

আমাদের আদিপিতা আদম হইতে কি রূপে পাপের উৎপত্তি হইল, বাইবেল হইতে প্রথমে তাহার বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে পাঠক পাঠিকাগণের সুবোধার্থে সমালোচনা করিতেছি—

আদি পুস্তক দ্বিতীয় অধ্যায়।

"৮ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকস্থ এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া, সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। ৯ এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমিতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবন বৃক্ষ ও সদসংজ্ঞানদায়কবৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। * * * । ১৫ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া ঐ এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৬ এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; ১৭ কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ,তাহার ফল ভোজন করিও না, কেন না যে দিনে তাহার ফল খাইবা সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।" * * * ২৫ ঐ সময়ে আদম ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।"

তৃতীয় অধ্যায়।

"১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে (অর্থাৎ আদমের স্ত্রী হবাকে) কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন তোমরা এই উদ্যানের কোন কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? ২ তাহাতে নারী সর্পকে কহিল আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; ৩ কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। ৪ তখন সর্প নারীকে কহিল কোন ক্রমে মরিবা না। ৫ কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা সেই দিন তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে; তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। ৬ তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও

কৌশল প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল এবং আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলে সেও ভোজন করিল। ৭ তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন করিল। ৮ পরে তাহারা দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন কারি সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। ৯ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? ১০ সে কহিল আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। ১১ তিনি কহিলেন তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? ১২ তাহাতে আদম কহিল তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিল, তাহাতে খাইলাম। ১৩ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল সর্প অমাকে ভুলাইল, তাহাতে খাইলাম। ১৪ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবা; তুমি বুকে হাঁটিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। ১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈর ভাব উৎপন্ন করিব, তাহাতে সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবা। ১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন আমি গর্ভবেদনায় অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। ১৭ অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম; তুমি নিজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিলা, এই জন্যে তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহা ভোগ করিবা। ১৮ এবং তাহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে; এবং তুমি ক্ষেত্রের ঔষধি ভোজন করিবা। ১৯ তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করিবা: কেন না তুমি তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; তুমি ধূলী, এবং তুমি ধূলীতে প্রত্যাগমন করিবা।"

সমালোচনা আরম্ভ।

২; ৮ পদ—সদাপ্রভু ঈশ্বর যিনি আজ্ঞামাত্রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন তিনি স্বহস্তে উদ্যান প্রস্তুত করিলেন!! ইংরাজিতে আছে Lord God planted a garden অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বর একটি বাগানে বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেন। তিনি কিরূপে বৃক্ষ রোপণ বা "উদ্যান প্রস্তুত" করিলেন! উদ্যান প্রস্তুত করা বা বৃক্ষ রোপণ করা উভয় কর্ম্মই কৃষি যন্ত্রাদি ও হস্তসাপেক্ষ; আত্মা স্বরূপ নিরাকার ঈশ্বর হস্ত পাইলেন কোথায় ও তখন কৃষিযন্ত্রাদিই বা পাইলেন কিরূপে?

২; ৯ মোশির ঈশ্বর নিশ্চয়ই একজন ভাল মালী (botanist) ছিলেন; এক দেশের একই স্থানে একই ঋতুতে "সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ" রক্ষা করা যে কত দূর কঠিন ব্যাপার এবং সময় ও যত্ন সাপেক্ষ, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন;

কিন্তু মোশির ঈশ্বর একই দিনে একই ঋতুতে এক স্থানেই "সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষ" উৎপন্ন করিলেন; তিনি সর্ব্বশক্তিমান কি না, তাই সকলই করিতে পারেন। এই জন্য তিনি নিজে যে নিয়ম করিয়াছেন তাঁহার নিজের প্রয়োজন হইলে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিতেও পারেন। নিয়ম বা ব্যবস্থা লঙ্ঘন আমাদের বেলাই পাপ ও অনন্ত নরক যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু ঈশ্বরের বেলা লীলা!! ঈশ্বর দয়াময় কিনা এবং মনুষ্যকে নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কি না তাই মনুষ্যের প্রতি এত সদয়!!! ঈশ্বর কেবল এক স্থানে এক দিনে "সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ" উৎপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি ঐ বাগানের মধ্যস্থলে দুইটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন একটির নাম "জীবন বৃক্ষ" অর্থাৎ তাহার ফল খাইলে অমর হয়; অপরটির নাম "সদসৎ জ্ঞান দায়ক বৃক্ষ" অর্থাৎ যে বৃক্ষের ফল খাইলে ভাল মন্দ বিচারশক্তি বা হিতাহিত বোধ (বিবেক) জন্মে। আদম ও হবা "সদসৎবৃক্ষে"র ফল খাইয়া কেমন হাতে হাতে ফল পাইয়াছিলেন তাহা কোন খ্রীষ্টিয়ানেরই অবিদিত নাই; কিন্তু তাঁহারা "জীবন বৃক্ষে"র ফল কখন খাইয়াছিলেন, কিনা তাহা বাইবেলে লিখিতে মোশির ভুল গিয়াছে; এই জন্য সে বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ানরাও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তবে আমার বোধ হয়, আদম ও হবা নিশ্চয়ই "জীবনবৃক্ষে"র ফল খাইয়াছিলেন, কিন্তু "সদসৎজ্ঞান দায়ক বৃক্ষে"র ফলে "জীবন বৃক্ষে"র ফলের গুণনাশক (antidote) ক্ষমতা ছিল এবং আদম ও হবা "সদসৎজ্ঞানদায়কবৃক্ষে"র ফল শেষে খাওয়াতে ও তৎপরে "জীবনবৃক্ষে"র ফল আর খাইতে না পাওয়াতে (আদিপুস্তক ৩; ২৪) তাঁহারা পূর্ব্বে যে জীবনবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন তাহার গুণ অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল অবশিষ্ট যাহা যৎকিঞ্চিৎ গুণ ছিল তাহার তেজেই আদম নয় শত ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন (আদি পুস্তক ৫; ৫) ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে (আদিপুস্তক ২; ১৭) সেই দিনেই মরেন নাই!!! কিন্তু নয় শত ত্রিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া অনেক পুত্র কন্যার জন্ম দিয়া মনুষ্য জাতীর অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন! আদম ও হবা যদি কখন "জীবনবৃক্ষে"র ফল না খাইতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা "সদসৎজ্ঞানদায়কবৃক্ষে"র ফল খাইবা মাত্র মরিয়া যাইতেন!!

২;১৫—ঈশ্বর আদমকে যখন "উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন" তখন আদম কি কি উপকরণ দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করিতেন তাহা মোশি খুলিয়া লিখেন নাই; আদিপুস্তকের ৩; ১৭, ১৮ ও ২৩ পড়িলে বোধ হয় আদম ও হবা এদন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের ভূমি কর্ষণ করিবার আবশ্যক ছিল না, আর আবশ্যক হইলেও তাঁহারা লাঙ্গল কোদাল খন্তা প্রভৃতি কৃষিযন্ত্র কোথায় পাইবেন? তখন ত কামার ছিল না—ঈশ্বর কি স্বয়ং ঐ সকল যন্ত্র গড়িতে পারিতেন? ঈশ্বর আদম ও হবাকে যখন এদন উদ্যানে রাখিয়াছিলেন তখন তাঁহারা দুইজন ভিন্ন পৃথিবীতে আর

লোক ছিল না এবং আমরা (আদি ১;২৯,৩০) প'ড়িয়া জ্ঞাত হই যে ঈশ্বর, মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবজন্তুর খাদ্য পূর্ব্বেই নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তখন অপরাপর প্রাণীগণের খাদ্য আদম হবা খাইতেন না এবং আদম হবার খাদ্য অন্য কোন প্রাণীতে খাইত না; আর আদম হবার খাদ্য কাড়িয়া খাইবার জন্য অন্য কোন মনুষ্যও ছিল না। তবে আদম এদন উদ্যানটি কাহা হইতে কি রূপ রক্ষা করিতেন? অনেক খৃষ্টানি গ্রন্থে শয়তানের যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শয়তানের পৃষ্ঠে ঠিক্ বাদুড়ের ডানার মত দুইটি ডানা দেখা যায়—তবে বুঝি শয়তান তখন বাদুড়ের বেশ ধারণ করিয়া এদন উদ্যানের ফল সকল খাইয়া যাইত এবং আদম চৌকী দিয়া সেই সকল বাদুড় তাড়াইতেন!

২;১৬,১৭—ঈশ্বর মনুষ্যকে ঐ বাগানের অপরাপর সমস্ত বৃক্ষের ফল খাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থিত সেই "সদসৎ জ্ঞানদায়কবৃক্ষে"র ফল খাইতে নিষেধ করিলেন কেন? সেই বৃক্ষের ফল মনুষ্যের ভক্ষণ করা যদি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে ঈশ্বর সেই বৃক্ষকে ঐ এদনে রাখিলেন কেন? আবার তিনি আদমকে বলিয়া দিলেন যে ঐ বৃক্ষের ফল যে দিনে খাইবা সেই দিনে মরিবা। মনুষ্য যেন সেই বৃক্ষের ফল খাইয়া মরে, ইহা হয় ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, না হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ হইতেন; তাহা হইলে সেই বৃক্ষকে এদনে রখিলে আদম যে সেই বৃক্ষের ফল খাইবেন, তাহা ঈশ্বর অবশ্যই জানিতেন। ঈশ্বর যদি তাহা জানিয়াই সেই বৃক্ষকে এদনে রাখিয়া থাকেন তাহা হইলে ঈশ্বর আদমের পাপ ও মৃত্যুর প্রবর্ত্তক; আর ঈশ্বর যদি মনুষ্যের পাপ ও মৃত্যুর প্রবর্ত্তক না হন তাহা হইলে আদম ও হবা এত দুর্ব্বল মনা যে তাঁহারাই সর্পের প্রবঞ্চনা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া সেই ফল খাইবার প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই; কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টপ্রাণী সুতরাং ঈশ্বর ও দুর্ব্বল মনা।

আমি বাল্যকালে এক জন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশককে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান বটেন তত্রাপি তিনি কোন মতে পাপের প্রবর্ত্তক নহেন—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সকলই জানিতে পারেন; আদম ও হবা সেই বৃক্ষের ফল খাইবে কি না ঈশ্বর জানিতে ইচ্ছা করিলে জানিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা জানেন নাই, কারণ তিনি মনুষ্যকে বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়া এবং কোন কর্ম্ম করিবার বা না করিবার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং আদম ও হবা সেই ফল খাইতে ইচ্ছা করিলে খাইতে পারিতেন, ইচ্ছা না করিলে না খাইতেও পারিতেন"।

আমি। অজ্ঞান শিশু ইচ্ছা করিলে অগ্নিতে হাত দিতে পারে—ইচ্ছা না করিলে

হাত না দিতে পারে ইহা জানিয়া যদি কোন পিতা তাহার অজ্ঞান শিশুর নিকটে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহাকে বলিয়া যায় যে, দেখ এই প্রদীপে হাত দিও না, দিলে হাত পুড়িয়া যাইবে, আর ঐ শিশু যদি প্রদীপে হাত দিয়া হাত পুড়ায় তাহা হইলে আপনি দোষী কাহাকে করিবেন—শিশুকে অথবা তাহার পিতাকে ?

উপদেশক। অবশ্য পিতার দোষে শিশুর হাত পুড়িল স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু শিশুর সহিত মনুষ্যের তুলনা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ শিশু নির্ব্বোধ ও তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও হিতাহিত বোধ জন্মে নাই কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানী এবং তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও হিতাহিত বোধ আছে।

আমি। ঈশ্বর যখন আদম ও হবাকে তাঁহার সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করিলেন তখন অবশ্য আদম ও হবার স্বাধীন ইচ্ছা, জ্ঞান ও হিতাহিত বোধ থাকা সম্ভবপর বটে, কিন্তু আমরা যখন বাইবেল পাঠেই অবগত হইতেছি যে হবা সর্পের পরামর্শের অধীন হইয়া এবং আদম, হবার প্রতি বিশ্বাসের অধীন হইয়া সেই নিষিদ্ধ ফল খাইল তখন তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? আর যখন তাহারা ঈশ্বরের বাক্য অবহেলা করিয়া সামান্য একটা সর্পের কথায় ভুলিয়া গেল তখন তাঁহারা যে নির্ব্বোধ ছিলেন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; তৎপরে আদিপুস্তক ৩; ২২ পড়িয়া দেখিতেছি যে আদম ও হবার সেই নিষিদ্ধ ফল ভোজনের পরেই হিতাহিত বোধ জন্মিয়াছিল; সুতরাং সেই ফল খাইবার পূর্ব্বে হিতাহিত বোধ ছিল না ইহা প্রমাণ হইতেছে এবং শিশুর হস্ত পূর্ব্বে কখন অগ্নিতে না পোড়ায় শিশু যেমন অগ্নিতে দগ্ধের মর্ম্ম কিছুই বুঝে নাই, আদম তদ্রূপ সেকাল পর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যু না দেখায় এবং নিজেও কখন মরিয়া না দেখায়, ঈশ্বর তাহাকে যে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছিলেন তাহাও তিনি কোনমতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অতএব সেই নিষিদ্ধ ফল ভোজনের অপরাধ আদম ও হবার অপেক্ষা ঈশ্বরেরই অধিক বলিতে হইবে।

উপদেশক মহাশয় আর 'হালে পানি' না পাইয়া চক্ষু রাঙাইয়া দন্ত খিঁচাইয়া টেবিলের উপর একটি বজ্রমুষ্টি প্রহার পূর্ব্বক আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে কহিলেন তুমি খ্রীষ্টিয়ানের ছেলে হইয়া এরূপ নাস্তিকের মত কথা কহ !!!" আমার বাল্যাবস্থা বশতঃ পিতা মাতা ও গুরু শিক্ষকের ভয়ে তখন আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ঈশ্বর মনুষ্যকে যখন সৃষ্টি করিয়া এদনে রাখিয়াছিলেন, তখন তাহাদের সদসৎজ্ঞান অর্থাৎ ভাল ও মন্দ বিচার করিবার শক্তি বা বিবেক ছিল না। মনুষ্যের বিবেক না থাকিলে মনুষ্য পশুর সদৃশ হয়। আমরা ঈশ্বরের দৃশ্য কখন দেখি নাই। বাইবেলে লেখে যে মনুষ্য ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। কিন্তু তখন মনুষ্যের বিবেক না থাকায় মনুষ্য পশু সদৃশ ছিল; সুতরাং ঈশ্বর পশু সদৃশও বটেন। বিবেক কি মন্দ জিনিস? বিবেকবিহীন হইয়া এদন উদ্যানে পশুতুল্য থাকা ভাল অথবা বিবেকী হইয়া সৎ ও

অসৎজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া এদন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হওয়া ভাল ? ঈশ্বরের অপার মহিমা —তাঁহার কর্ম্ম বুঝা ভার—মনুষ্যের সৎ ও অসৎজ্ঞান জন্মে, ইহা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি আদমকে "সদসৎজ্ঞান-দায়কবৃক্ষে"র ফল খাইতে নিষেধ করিলেন কেন ? মনুষ্যের সৎ ও অসৎ জ্ঞান জন্মে ইহা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইত তাহা হইলে তিনি "সদসৎ বৃক্ষ" উৎপন্ন করিতে এত বড় পৃথিবীতে আর স্থান পাইলেন না। যেখানে থাকিলে আদম ও হবা নিশ্চয় খাইবে সেই খানেই রাখিলেন কেন ? ঈশ্বর যদি মনুষ্যের মৃত্যু ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে আদম ও হবা সেই নিষিদ্ধ ফল খাইয়া যেমন মৃত্যুর অধীন হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় জীবন-বৃক্ষের ফল খাইয়া ত অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিত ; পাছে তাহারা জীবনবৃক্ষের ফল খাইয়া অনন্তজীবী হয়, এইজন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে এদন উদ্যান হইতে দূর করিয়া, জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন কেন ? (আদি ৩ ; ২৪) মনুষ্যের মৃত্যু যদি ঈশ্বরের বাঞ্ছিত হইত তাহা হইলে ঈশ্বর মনুষ্যকে অনন্ত জীবন দিবার জন্য নিজ অদ্বিতীয় প্রিয়পুত্রকে অপমান জনক ও যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশীয় মৃত্যু ভোগ করিবার জন্য নরাকারে এই পৃথিবীতে পাঠাইলেন কেন ? (যো ৩ ; ১৬। রো ৫ ; ৮)।

কোন মনুষ্য এরূপ অসঙ্গত কর্ম্ম করিলে আমরা তাহাকে নির্ব্বোধ, খামখেয়ালী ও উন্মাদ আখ্যা দিতাম কিন্তু ঈশ্বর বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না। ঈশ্বর যখন আদমকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছিলেন, তখন আদম মৃত্যু-সম্বন্ধে যাহাই বুঝুক ঈশ্বর স্বয়ং কি ভাবিয়াছিলেন তাহাও নির্ণয় করা কঠিন ; কারণ আমরা বাইবেল পাঠেই দেখিতে পাই যে আদম সেই নিষিদ্ধ ফল খাইয়াও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে "সেই দিনে" মরে নাই—তিনি নয় শত ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে সেই নিষিদ্ধ ফল খাইবার পরে আদম ও হবার উলঙ্গতা বোধ ও তন্নিবন্ধন লজ্জা জন্মিয়া ছিল মাত্র। হে খ্রীষ্টিয়ানগণ ! হে মোশি ! আপনাদের বিবেচনায় উলঙ্গতা বোধ ও লজ্জাই যদি সৎ ও অসৎ জ্ঞান হয় তাহাহইলে অনেকানেক উপদ্বীপ নিবাসী উলঙ্গ অসভ্য জাতীয়দের আদিপিতামাতা কি আদম ও হবা নহেন ? ঈশ্বরের ও আপনাদের অভিধানে মৃত্যুর অর্থ যদি উলঙ্গতা বোধও লজ্জা হয় তাহাহইলে আপনাদের মতে পৃথিবীতে কেবল পশু, শিশু, পাগল ও মাতাল ইহারাই জীবিত আর সকলে মৃত বা দানপ্রাপ্ত।

২ ; ২৫—তখন মনুষ্য এবং তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ ছিল এবং তাহারা লজ্জা করিত না। লজ্জা কি পদার্থ ও তাহার স্বরূপ কি এতৎসম্বন্ধে মোশির জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। যাহা হউক, মনুষ্যের লজ্জাসম্বন্ধে যথাস্থানে সবিস্তার সমালোচনা করিব।

৩ ; ১—সর্প ভূচর প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল। প্রকাশিত ভবিষ্যৎ বাক্যের ১২ ; ৯ ও ২০ ; ২ পদে এবং বাইবেলের

অন্যান্য স্থানে সর্পকে শয়তান,ভূত বা ড্রেগণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানরাও তদ্রূপ সর্প অর্থে শয়তান বুঝেন এবং সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে শয়তান সর্পের বেশ ধরিয়া আমাদের আদিমাতা হবাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল;কিন্তু তাঁহারা বাইবেলের কোন্ স্থান হইতে শয়তানের এই ছদ্মবেশের বিষয় শিক্ষা করিলেন তাহা দেখাইতে পারেন না। আমি অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, 'হবাকে কে ফল খাওয়াইয়াছিল?' তাঁহারা একেবারে নিঃসন্দেহে বলেন 'যে শয়তান সর্পের বেশ ধরিয়া খাওয়াইয়াছিল।' পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে 'শয়তান সর্পের বেশ ধরিয়াছিল—একথা কোথায় শিখিলে?' তাহাতে তাহারা বলেন যে,'বাইবেলেই লেখা আছে;' কিন্তু বাইবেল হইতে বাহির করিতে বলিলে আর খুঁজিয়া পান্ না। যাহা হউক, বাইবেলের অন্যান্য স্থানে সর্পের সহিত শয়তান, ভূত ড্রেগণ ও পাপীদিগের তুলনা থাকুক এবং খ্রীষ্টিয়ানগণ সর্পকে যাহাই বলুন, মোশি এখানে সর্পকে প্রকৃত সর্প ভিন্ন যে আর কিছুই মনে করেন নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে—মোশি সর্পকে যৎকালে বলিতেছেন যে "সর্প ভূচর প্রাণিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল তখন সর্প যে ভূচর প্রাণিদের মধ্যে একটা প্রাণিবিশেষ ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে; আদি পুস্তকের ৩; ১, ৪, ১৩, ও ১৪ পদে পাঁচ বার সর্পকে সর্প বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, শয়তান বা সর্পের বেশে শয়তান কোন স্থানেই উল্লেখ নাই; ঈশ্বর সর্পকে যখন অভিশাপ দিতেছেন, (আদি ৩; ১৪,১৫) তখন স্পষ্টই বলিতেছেন "তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ", শয়তান এই কর্ম্ম করিয়াছে বা শয়তান তোমার বেশ ধরিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছে, বলেন্ নাই। "এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবা" এই কয়েকটি কথা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সর্প গ্রাম্য ও বন্য পশুদের ন্যায় একটি প্রাণিবিশেষ ছিল। "তুমি বুকে হাঁটিবা ও যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা" এই কয়েকটি কথা হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে সর্পই বুকে হাঁটে এবং ধূলী অর্থাৎ ধূলীবৎ সামান্য সামগ্রী ভোজন করে, শয়তান বুকেও হাঁটে না এবং ভৌতিক কোন সামগ্রী ভোজন করে না। তাহা ছাড়া সর্প অর্থে যদি শয়তান কিম্বা সর্পের বেশে শয়তান হইত তাহা হইলে ঈশ্বর শয়তানকে কোন অভিশাপ না দিয়া সর্পকেই অভিশাপ দিলেন কেন? কৈ তিনি শয়তানকে ত কোন অভিশাপ দেন নাই। আদিম খ্রীষ্টিয়ানগণও এই সর্পকে সর্প ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতেন না—এই ঘটনার প্রায় চারি সহস্র বৎসর পরে সাধু পোল যখন্ করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিয়া ছিলেন তখনও তিনি ঐ সর্পকে সর্পই বলিয়াছিলেন, যথা "কিন্তু ঐ সর্প আপন ধূর্ত্ততাতে যেমন হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল"(২ করি ১১; ৩) যাহা হউক মোশির লিখিত এই সর্প যে প্রকৃত সর্প ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিলাম। এক্ষণে আর এক বিষয়

সমস্যা উপস্থিত—হবার সহিত সর্পের কি ভাষায় কিরূপে কথা বার্ত্তা হইল? তখন কি মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর বাক্শক্তি ছিল কিম্বা তখন মনুষ্য, সর্প প্রভৃতি ইতর জীবের ভাষা বুঝিত অথবা তখন পর্য্যন্ত কোন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; মনুষ্য এবং অন্যান্য জীব সকল কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারা পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিত? এই বিষয়টি মীমাংসা করিতে হইলে ভাষার ইতিহাস লইয়া অনেক গোলযোগ করিতে হয়; সুতরাং বহুল্য ভয়ে ঐ বিষয়টির মীমাংসা না করিয়া খ্রীষ্টিয়ান উপদেশকদিগের নিমিত্ত রাখিয়া দিলাম।

৩; ২—ঈশ্বর আদমকে যখন সেই ফল খাইতে নিষেধ করেন তখন হবার অস্তিত্ব ছিল না; কারণ আমরা বাইবেল হইতে দেখিতে পাই যে ঈশ্বর আদমকে ফল খাইতে নিষেধ করিবার পরে হবাকে নির্ম্মাণ করিলেন। ঈশ্বর হবাকে সৃষ্ট করিয়া তাহাকেও যে ঐ ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে মোশি কিছুই লিখেন নাই, অথবা আদম কখনও সে বিষয় হবাকে বলিয়াছিলেন তাহাও শাস্ত্রে লেখা নাই। তবে সর্পের সহিত হবার কথোপকথন শুনিলে বোধ হয় যে আদমের প্রমুখাৎ হবা ঐ ফলের বিষয় শুনিয়া থাকিবেন।

৩; ৪—ঈশ্বর আদমকে ঐ ফল ভোজন সম্বন্ধে যে ভয় দেখাইয়া ছিলেন এবং সর্প হবাকে ঐ ফল ভোজন সম্বন্ধে অভয় দান করিয়া যে লাভের আশা দিয়াছিল এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য ও কোনটা মিথ্যা? আদি পুস্তক ৩; ৭, ২২ পড়িলে দেখা যায় যে আদম ও হবা সেই ফল খাইয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সেই দিনেই মরে নাই; কিন্তু সর্পের কথা অনুসারে তাঁহাদের চক্ষুপ্রসন্ন হওয়াতে তাহারা ঈশ্বরের মত হইয়াছিল। মোশি সর্পকে সর্ব্বাপেক্ষা খল বলিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যকে পাপে পতিত করিবার জন্য ঈশ্বরকেই যে সর্ব্বাপেক্ষা খল, ঈর্ষাকারী ও মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা মোশি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

৩; ৬—হবা যখন সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল লইয়া আদমকে খাইতে দিলেন, তখন কি সেই ফলের বিষয় আদমকে কিছু বলিয়া দিয়াছিলেন? আদম সেই ফল খাইবার পূর্ব্বে কিছু সন্দেহ করিয়া হবাকে কি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? নব অনুরাগের সময়ে প্রণয়ী ও প্রণয়িণীগণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসে কিরূপ অন্ধ হয়, তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেরই সম্যক্‌রূপে জানা ও ভোগা আছে—আদম ও হবার এক্ষণে সেই নবানুরাগ, তাহাদের এখন পর্য্যন্ত একটিও সন্তান সন্ততি হয় নাই, পৃথিবীতে তাহারা ব্যতীত আর মনুষ্য নাই, আদমের এক মাত্র সঙ্গিনী হবা ও হবার এক মাত্র সঙ্গী আদম; আদম নানা বৃক্ষ হইতে সুস্বাদু ফল আহরণ করিয়া স্বয়ং খায় এবং হবাকে খাইতে দিলে হবাও তাহা দ্বিধাশূন্য মনে খায় এবং হবাও তদ্রূপ কোন ভাল ফল পাইলে নিজে খায় ও আদমকে দিলে আদমও

তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করে, কেহ কাহার প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাস করে না; এমন সময়ে হবা সদসংজ্ঞানদায়কবৃক্ষের ফল আনিয়া আদমকে খাইতে দিলে, আদম খাইল—আদমের সেই ফল খাইবার ধরণ দেখিয়া অর্থাৎ আদম সেই ফল খাইবার পূর্ব্বে হবাকে সেই ফল সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করায় বেশ বুঝা যায় যে আদম তাহা সদসং জ্ঞান দায়ক বৃক্ষের ফল না জানিয়াই, হবার প্রতি অতি বিশ্বাস বশতঃ নিঃসন্দেহে ও অনবধানতাতেই ঐ নিষিদ্ধ ফল খাইয়াছিলেন।

৩; ৭—ঐ ফল খাওয়াতে আদম ও হবার উলঙ্গতা বোধ জন্মিল, অর্থাৎ উহাদের শরীর ও গুহ্যাঙ্গ সকল অনাবৃত আছে বুঝিতে পারিয়া, পরস্পর পরস্পরকে লজ্জা করিতে লাগিল। মোশি ইস্রায়েল বংশকে পথ দেখাইয়া ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সমুদায় লোক তাম্বুতে একত্র বাস করিত, তাহাতে, সে সময়ে স্বামী ও স্ত্রীগণ তত স্বাধীন ভাবে নির্ব্বিঘ্নে মিলিত হইতে পারিত না, সুতরাং সম্পূর্ণ বিরলে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাতে এবং স্ত্রী স্বামীর সাক্ষাতে যে উলঙ্গ হইলেও কেহ কাহাকে লজ্জা করে না, তাহা মোশি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই মোশির বিবেচনায় আদম ও হবাকে ডুম্বুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া পরিধান করিতে হইল। হে আদম! হে হবা! তোমরা পাপ করিলে কোথায় এবং আচ্ছাদন কর বা কোথায়? চক্ষু ফল দেখিল, খাইবার ইচ্ছা হইল মনে, পদ হাঁটিয়া গেল, হস্ত ফল পাড়িল ও মুখে তুলিয়া দিল, মুখ ফল ভক্ষণ করিল, কিন্তু তোমরা চক্ষু, হস্ত, পদ, মুখ বা মন কিছুই আচ্ছাদন না করিয়া তোমরা ডুমুর পত্র সিঙ্গাইয়া কটিতে বাঁধিলে কেন? লজ্জার স্বরূপত্ব সম্বন্ধে মোশির কিরূপ বোধ ছিল তাহা মোশিই জানিতেন, কিন্তু আমাদের বোধ অন্যরূপ। লজ্জা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম ও অভ্যস্ত, সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে; সে মতামত লইয়া আমাদের এক্ষণে সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। আমাদিগকে এক্ষণে কেবল দেখিতে হইবে যে আমরা যাহাকে লজ্জা বলিয়া থাকি, তাহার স্বরূপ কি? লজ্জা নানা প্রকার আছে; তন্মধ্যে প্রধান দুই প্রকার লজ্জার বিষয় এক্ষণে আলোচনা করিব—(১ম), কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করা বা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করা। যাহার সহিত আমাদের কোন রূপ বাধ্যবাধকতা আছে তাহার প্রতি আমাদের কতকগুলি কার্য্য করণীয় ও কতকগুলি কর্ম্ম অকরণীয়। আমরা যদি সেই করণীয় কার্য্যগুলি না করি অথবা অকরণীয় কার্য্যগুলি করি, তাহা হইলে তাহাকে মুখ দেখাইতে বা তাহার সহিত কথা কহিতে আমাদের মনের মধ্যে যে এক প্রকার অব্যক্ত কষ্ট অনুভূত হয় এবং ঐ কষ্ট এড়াইবার জন্য সেই ব্যক্তি হইতে দূরে থাকিতে বা তাহার নিকটে মুখ লুকাইতে ইচ্ছা হয় সেই কষ্ট ও কষ্টজনিত ঐরূপ ইচ্ছা প্রথম প্রকারের লজ্জা। (২য়), যৌবনকালে কামরিপু প্রবল হইলে স্ত্রীর সহিত পুরুষের ও পুরুষের সহিত স্ত্রীর রমণেচ্ছা

জনিত বাহ্যাবয়বের যে সকল বৈলক্ষণ্য জন্মে, সেই বৈলক্ষণ্য সংগোপন করিবার যে ইচ্ছা. সেই ইচ্ছাই দ্বিতীয় প্রকারের লজ্জা। বালক বালিকাদিগের রমণেচ্ছা না থাকা বশতঃ, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের রমণেচ্ছাজনিত বাহ্যাবয়বের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না ঘটা প্রযুক্ত, এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগের ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য বশতঃ তাহাদের শারীরিক কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না হওয়া প্রযুক্ত, বালক বালিকাদিগের, জিতেন্দ্রিয় সাধুদিগের এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগের শীতোষ্ণ নিবারক বস্ত্র ব্যতীত লজ্জানিবারক কোন প্রকার পরিচ্ছদের আবশ্যক করে না। সভ্যজগৎ বালক বালিকাদিগকে বস্ত্র পরিধান করিতে জোর করিয়া অভ্যাস করায়; সাধুদিগকে উলঙ্গ থাকিতে দেয় না; এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পূর্ব্ব সংস্কার বা অভ্যাস বশতঃ বস্ত্র পরিধান করে বা যুবক ও যুবতী আত্মীয় স্বজনগণ তাহাদের নিজ নিজ মনের বিকার বশতঃ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগকে উলঙ্গ দেখিতে না পারায় বস্ত্রাবৃত করে। এই যে দুই প্রকার লজ্জার স্বরূপ বর্ণনা করিলাম তন্মধ্যে মোশির বিবেচনা অনুসারে আদম ও হবার প্রথম প্রকার লজ্জারই কারণ দেখিতে পাই; কিন্তু প্রথম প্রকার লজ্জা বশতঃ আদম ও হবা ডুম্বুর পত্র সিলাইয়া নিজ নিজ উলঙ্গতা নিবারণ করিলেন কেন, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত; সুতরাং খ্রীষ্টিয়ানগণ ইহার সঙ্গত কারণ দর্শাইয়া মোশির ও বাইবেলের সম্মান রক্ষা করুন।

৩; ৮—১২—এই কয়টি পদ পড়িলে দেখা যায় যে মোশি ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের ও সর্ব্বজ্ঞত্বের অপলাপ করিতেছেন। ঈশ্বরকে "উদ্যানে গমনাগমনকারী" বলায় বুঝাইতেছে যে ঈশ্বর উদ্যানের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা থাকিতেন না; সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী কিরূপে হইতে পারেন? "তুমি কোথায়" এই কথা বলিয়া ঈশ্বর আদমকে ডাকায় ইহাই স্বভাবতঃ মনে হয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বদা যে স্থানে আসিয়া আদমের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, আদম সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকাতে ঈশ্বর তাহাকে খুঁজিয়া পান নাই এবং আদম কোথায় আছে তাহাও ঈশ্বর জানিতেন না; সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?" ঈশ্বরের ঈদৃশ প্রশ্ন করায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আদম সেই নিষিদ্ধ ফল খাইয়াছে কি না ঈশ্বর তাহা নিশ্চয় জানিতেন না; কেবল আদমের ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন মাত্র; সুতরাং প্রমাণ হইল যে মোশির ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। আদম ও হবার নিকটে ঈশ্বর আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা "ডুম্বুর বৃক্ষের পত্র সিলাইয়া কটি বন্ধন" করিয়াছিল; তবে যখন ঈশ্বর আদমকে ডাকিলেন তখন "তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম" আদম ইহা কেন বলিলেন? আদম ঈশ্বরকে উলঙ্গতা কিরূপে বুঝাইলেন? হে

খ্রীষ্টিয়ানগণ! তোমরা মোশির ঈশ্বরকে যখন আদমের সহিত দেখা করিতে এদন উদ্যানে উপস্থিত দেখ, তখন তোমাদের কল্পনা চক্ষে ঈশ্বরকে কিরূপ দেখিতে পাও? মোশির ঈশ্বর হ্যাট কোট পরা বা ধুতি চাদর পরা বা পশু চর্ম্ম আবৃত কিম্বা ভল্লুকের ন্যায় লোমাবৃত অথবা নির্লোম ও উলঙ্গ, আমরা ভাবিয়া নিজের জ্ঞানে কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি মোশির জ্ঞানচক্ষু লইয়া "উদ্যানে গমনাগমন কারী সদাপ্রভু ঈশ্বরের" প্রতি অবলোকন করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ঈশ্বর উলঙ্গ নহেন; কারণ যে সদসৎ জ্ঞান জন্মিবামাত্র আদম ও হবা ডুমুর পত্র সিঙ্গাইয়া কটি বন্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সদাসৎজ্ঞান ঈশ্বরের পূর্ব্বাবধিই ছিল (আদি ৩; ২২), তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ঈশ্বর পশুচর্ম্ম পরিহিত; কারণ ঈশ্বর যদি পশুচর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি "আদমের ও তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের অঙ্গরক্ষিণী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইলেন" (আদি ৩; ২১) কেন? মোশির বিবেচনায় আদম ও হবা ঈশ্বরকে যে ঐরূপ চর্ম্মাবৃত দেখিতেন এবং সেই জন্য যখন তাঁহাদের সদসৎ জ্ঞান জন্মিল, তখন তাঁহারা ঈশ্বরের সেই চর্ম্ম-পোষাক অনুকরণেচ্ছায় চর্ম্মাভাবে "ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া কটি বন্ধন" করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩; ১৩—ঈশ্বর আদমকে ও হবাকে একে একে ডাকিয়া ফল খাওয়ার কৈফিয়ৎ লইলেন, কিন্তু তিনি সর্পকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। আদমকে জিজ্ঞাসা করায় আদম হবার উপর এবং হবাকে জিজ্ঞাসা করায় হবা সর্পের উপর দোষারোপ করিলেন; কিন্তু সর্পকে জিজ্ঞাসা করিলে সর্প কাহার উপর দোষারোপ করিত বা কি বলিত তাহা শুনিতে আমাদের বড়ই কৌতুহল হয়!!

৩; ১৪—১৯—পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে, নারীকে ও আদমকে অভিশাপ দিলেন। সর্পকে অভিশাপ দিলেন যে "তুমি বুকে হাঁটিবা এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা এবং নারীর বংশ "তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে।" মোশির বিবেচনায় সর্পকে ঈশ্বর পূর্ব্বে চতুষ্পদ পশু বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্প হবাকে প্রবঞ্চনা করিয়া ঐ নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানতে ঈশ্বরের অভিশাপে সর্পের চারটি পা খসিয়া যায়। তাহাতেই সর্প সেই অবধি বুকে হাঁটে এবং বুকে হাঁটিতে সর্পের অতিশয় কষ্ট হয়। আর মোশি বোধ হয় সর্পকে কখন ভেক, মৎস্য, পক্ষী বা সুমিষ্ট ফল খাইতে দেখেন নাই; কিন্তু সর্পকে মৃত্তিকার মধ্যে গর্ত্তে প্রবেশ ও গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে সর্প যৎকালে মৃত্তিকার মধ্যে বাস করে, তখন অবশ্য সেখানে আর কিছু খাইতে পায় না, কেবল মৃত্তিকা ধূলী প্রভৃতি অতি সামান্য সামগ্রীই

খাইয়া জীবন ধারণ করে ; এবং তাহাতেই সর্পের শরীর এত শীর্ণ হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানেরা সর্প অর্থে শয়তান বলিয়া থাকেন, কিন্তু মোশির লেখা অনুসারে তাহা কোন মতে হইতে পারে না ; খ্রীষ্টিয়ানদের বিবেচনা অনুসারে সর্প অর্থে যদি শয়তান হয় অথবা শয়তান যদি সর্পের বেশ ধরিয়া হবাকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে সর্পের ত কোন দোষই নাই, শয়তানেরই সমুদায় দোষ ; কিন্তু কৈ ঈশ্বর ত শয়তানের কিছুই করিতে পারিলেন না। শয়তান বুকেও হাঁটে না এবং ধূলীও ভোজন করে না ! খ্রীষ্টিয়ানদের মতে সর্প যদি শয়তান হয়, নারী অর্থে হবা ও নারীর বংশ অর্থে খ্রীষ্ট হয়, তাহা হইলে শয়তানের বংশ কে ? আর খ্রীষ্ট যদি শয়তানের মস্তক চূর্ণ অর্থাৎ তাহার ক্ষমতা নষ্ট করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরেও বাইবেলে শয়তানের ক্ষমতার এত পরিচয় পাওয়া যায় কেন ? শয়তান সাধু পৌলেরও সদনুষ্ঠানে বাধা জন্মাইয়াছিল (১ থিষল ২;১৮)। ঈশ্বর অভিশাপ দিয়া শয়তানের কিছুই ক্ষতি করিতে পারেন নাই। নারীর বংশ অর্থাৎ খ্রীষ্ট, সর্পের অর্থাৎ শয়তানের মস্তক চূর্ণ করা দূরে থাকুক, তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই; কিন্তু সর্প অর্থাৎ শয়তান নারীর বংশের অর্থাৎ খ্রীষ্টের কার্য্যে যৎপরোনাস্তি বাধা দিয়াছে এবং একাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের অভিপ্রায় নিষ্ফল করিতেছে। ঈশ্বরের বাক্য রূপ বীজ লোকের মনে ব্যাপ্ত হইলে পাছে তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ পায়, "এই আশয়ে শয়তান আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়"(লূক৮;১২)। ঈশ্বর নারীকে অভিশাপ দিলেন যে আমি তোমার গর্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব। ইংরাজিতে আছে "I will greatly multiply thy sorrow and thy conception" "তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে।" ইব্রীয়তে আছে "তোমার বাসনা তোমার স্বামীর অধীন হইবে" ; "ও সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে।" আমরা স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনাই জানি কিন্তু "গর্ভবেদনা" কাহাকে বলে তাহা আমরা অবগত নহি। "গর্ভবেদনা" কাহাকে বলে তাহা মোশিই বলিতে পারিতেন এবং খ্রীষ্টিয়ানেরাই বলিতে পারেন! "গর্ভবেদনা" ও "প্রসব বেদনা" মোশির মতে এক নহে ; কারণ গর্ভবেদনার পরেই মোশি বলিতেছেন "তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা" ; সুতরাং মোশির মতে "গর্ভবেদনা" ও "প্রসব বেদনা" দুইটি স্বতন্ত্র বেদনা। ঈশ্বর নারীকে যে অভিশাপ দিলেন, সে অভিশাপ সকল নারীর উপর বর্ত্তিল না। ক্লীবা চিরকুমারী, বালবিধবা, চিরবন্ধ্যা ও অনেকানেক অসভ্য রমণীগণ ঈশ্বরের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিল—ঈশ্বর তাহাদের কিছুই করিতে পারিলেন না। অথচ অনেকানেক গ্রাম্য পশুদিগকে ঈশ্বরের সেই অভিশাপ ভোগ করিতে দেখা যায়। হে খ্রীষ্টিয়ানগণ! আপনারা কি ঐ সকল গ্রাম্য পশুদিগকেও নারীর বংশ বলিতে এবং চিরবন্ধ্যা, চিরকুমারী প্রভৃতিকে অপর কাহারও বংশ

ব'লতে ইচ্ছা করেন? স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাসনা থাকা যদি ঈশ্বরের অভিশাপ হয়, তাহা হইলে সতী সাধ্বী স্ত্রীগণের উপরেই ঈশ্বরের যত কোপ পড়িল; কিন্তু চিরবন্ধ্যা প্রভৃতিরা বাঁচিয়া গেল এবং কুলটাগণ ঈশ্বরের সে অভিশাপ গ্রাহ্যও করিল না। স্বামী স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে বলিয়া, ঈশ্বর নারীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন বটে, এবং তদনুসারে সাধু পৌলও, ইফিষীয় ৫;২২ পদে ভার্য্যা সকলকে স্বামীর বশীভূতা হইতে, ২৪ পদে ভার্য্যা সকলকে সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হইতে, ৩৩ পদে ভার্য্যাকে স্বামী হইতে ভীতা হইতে, তীতের ২;৫ পদে যুবতীদিগকে বিনীতা,সতী, গৃহসেবিনী, সুশীলা ও স্বামিবশীভূতা হইতে, উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান বৃটিশরাজের শাসনে নারীগণ ঈশ্বরের সেই অভিশাপ হইতে মুক্তা হইয়াছেন। এক্ষণে খ্রীষ্টিয়ান রাজার আইন অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার ও সমান স্বাধীনতা হইয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা মারিয়া ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক ওষধি উৎপন্ন করিয়া ঘর্ম্মাক্তমুখে ভোজন করিতে ও অবশেষে মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করিতে অভিশাপ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতকগুলি লোক ল্যাপল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে গিয়া সম্পূর্ণ মৎস্যাশী হইয়া, ধনবানগণ বিনা পরিশ্রমে উদরপূরণ করিয়া এবং আমাদের দেশের মুনি ঋষিগণ স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলে প্রাণধারণ করিয়া ঈশ্বরকে প্রায় ফাঁকী দিল; কেবল ধরা পড়িয়া গেল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কৃষকগণ!!

মোশি ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর এমনই অক্ষম যে তিনি সর্পকে,নারীকে ও আদমকে যতগুলি অভিশাপ দিলেন তাহার একটিও সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বসাধারণ ভাবে ফলিল না! মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করা মনুষ্যের সাধারণ নিয়ম বটে, কিন্তু বিজ্ঞানচক্ষে দেখিলে ঐ নিয়মটি মনুষ্যের পক্ষে আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অভিশাপ কোন ক্রমেই হইতে পারে না; আর শেষে মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করা যদি ঈশ্বরের অভিশাপ বশতঃই হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর আর জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতিও মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করে কেন? ইহারাও কি সেই নিষিদ্ধ ফল খাইয়া ঈশ্বরের অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিল?

দয়াময় ঈশ্বর মনুষ্যকে এই সকল অভিশাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না—পাছে আদম ও হবা "হস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করিয়া অনন্ত জীবী হয় এই নিমিত্তে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে এদনের উদ্যান হইতে দূর করিলেন।" এমন না হইলে ঈশ্বরকে কি দয়াময় বলা যায়।

আদম ও হবা সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খাইল, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিল—ব্যবস্থার লঙ্ঘনই পাপ (রো ৭;৭।১ যো ৩;৪); সুতরাং আদম ও হবা পাপী হইলেন। পাপের সাক্ষাৎ ফল হইল আদম ও হবার মৃত্যু, অর্থাৎ তাহাদের চক্ষু

প্রসন্ন হওয়া, ঈশ্বরের ন্যায় ভাল ও মন্দ বুঝিতে পারা, ও আপনাদের উলঙ্গতা বোধে শরীর আবৃত করা। পরম্পরিত ফল হইল ঈশ্বরের অভিশাপে নারীর গর্ভবেদনা ও প্রসব বেদনা এবং স্বামীর বশীভূত থাকা এবং পুরুষের কৃষিকার্য্য করা, ক্ষেত্রের কাঁটা ও শেয়াল কাঁটা মারা, ঘর্ম্মাক্ত মুখে ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করা এবং মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করা।

যে নির্ব্বিকার ঈশ্বর অদ্য মনুষ্যের প্রতি ক্রোধে এতদূর নির্যাতন করিলেন, তিনিই আবার কিছুদিন পরে মনুষ্যের দুঃখে কাতর হইলেন; কিন্তু কি করেন, একবার যাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহার অন্যথা করিতে পারেন না, অথচ যির ১৩;২৩।ম ১২; ৩৪।২ পি ২;১৪ পদে লিখিত আছে যে পাপীরা আপন শক্তিতে পাপত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার এক জাত পুত্রকে প্রদান করিলেন যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া, অনন্ত জীবন পায়।" (যো ৩;১৬)। 'ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের বিচার করিতে পাঠাইলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহা দ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্ত।" (যো ৩;১৭)। খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া লজ্জা ও যন্ত্রণা দায়ক ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টের ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ হইতে মনুষ্যের পরিত্রাণ সম্ভব কি না, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

আত্মা, পরলোক, স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে মোশির কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না—মোশির বিবেচনায় আমাদের এই শরীর এবং জীবনই যথা সর্ব্বস্ব ছিল। মিসর নরক, এবং দুগ্ধমধু প্রবাহী কৈনানই স্বর্গ ছিল; এই জন্য মোশি ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন জন্য মনুষ্যের প্রতি শারীরিক দণ্ড ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দণ্ডের বিধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা, পরলোক, স্বর্গ ও নরক জানেন এবং অনন্তকাল আত্মার নরক যন্ত্রণা ভোগকেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের প্রকৃত ফল বা দণ্ড বলিয়া অনুমান করেন।

খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা প্রায়শ্চিত্তে যদি মনুষ্যের পরিত্রাণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে মোশির মতে ঈশ্বরের অভিশাপ হইতে খ্রীষ্টভক্তগণের মুক্ত হওয়া উচিত অর্থাৎ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকারী পুরুষগণের জীবনধারণের জন্য ও খাদ্যের জন্য কোন প্রকার পরিশ্রম বা ক্লেশ করিবার আবশ্যক না হওয়া, আহার কালীন মুখে ঘর্ম্ম না হওয়া, চক্ষু অন্ধ হওয়া, উলঙ্গতা বোধ ও লজ্জা না থাকা, এদন উদ্যানে পুনঃ প্রবেশ করিতে অনুমতি পাওয়া এবং মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন না করিয়া, জীবন বৃক্ষের ফল খাইয়া অনন্তজীবী হওয়া উচিত; স্ত্রীগণের গর্ভবেদনা ও প্রসব বেদনা না হওয়া, স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে না থাকা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাসনা না থাকা এবং উলঙ্গিনী থাকিতে লজ্জা বোধ না হওয়া উচিত। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত যখন খ্রীষ্টে বিশ্বাসকারী কোন পুরুষের বা স্ত্রীর এরূপ শাপমুক্তি হয় নাই, তখন প্রমাণ

হইল যে খ্রীষ্টের মৃত্যুজনিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মোশির মতে মনুষ্যের পরিত্রাণ কখনই সম্ভব নহে। ব্যবস্থা লঙ্ঘন জন্য ঈশ্বর নর ও নারীকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়াও যদি সেই অভিশাপ মোচন না হইল, তাহা হইলে খ্রীষ্টের মৃত্যুতে মনুষ্যের পরিত্রাণ হইল কিরূপে?

খ্রীষ্টিয়ানদের মতে মনুষ্যের শরীর অনিত্য; মনুষ্য পাপ না করিলেও এক সময়ে না এক সময়ে মনুষ্যদেহের পতন হইত, এবং যত দিন এ পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, মনুষ্য পাপী হউক অথবা খ্রীষ্টভক্ত সাধু ও পুণ্যবান হউক, এ পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ ধার্ম্মিক ও পাপী উভয়ের পক্ষে অনিবার্য্য। খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস যে মনুষ্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করাতে মনুষ্য আত্মীক মৃত্যুর অধীন হইয়াছিল; অর্থাৎ মনুষ্যের দৈহিক মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছিল; কিন্তু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু জনিত প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিয়া, আত্মা, অনন্ত নরক যন্ত্রণা এড়াইয়া অনন্তকাল স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা মনুষ্যের আত্মীক মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ সম্ভব কি না? কোন ব্যক্তি কোন মহাজনের নিকট একশত রৌপ্যমুদ্রা ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, ঐ মহাজন ঐ ঋণীকে যদি কারাগারে দেয় কিন্তু যদি কোন ধনবান ব্যক্তি ঐ ঋণীর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া একশত তাম্রমুদ্রা লইয়া ঐ মহাজনকে বলে যে আমি আপনাকে এক শত তাম্র মুদ্রা দিতেছি, আপনি ঐ ঋণীকে কারাগার হইতে মুক্ত করুন; তাহা হইলে কি ঐ মহাজন ঐ ঋণীকে ছাড়িয়া দেন? খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা মনুষ্যের অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণ ঠিক্ সেই প্রকার। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যের যদি আত্মীক মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর পাপীর আত্মাকে যদি অনন্তকাল নরকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, আর খ্রীষ্ট যদি মনুষ্যের সেই দণ্ড নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার করিতে অবতার হইয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টকে আত্মীক মৃত্যু ভোগ করা অর্থাৎ খ্রীষ্টের আত্মাকে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করা উচিত ছিল; কিন্তু আমরা বাইবেল পাঠে দেখিতে পাই যে খ্রীষ্ট কেবল দৈহিক মৃত্যু ভোগ করিয়াছিলেন; আত্মীক মৃত্যু কখন ভোগ করেন নাই অর্থাৎ তাঁহার আত্মা কখন নরকে যায় নাই। এক শত রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার সহিত যদিও একশত তাম্রমুদ্রার তুলনা সম্ভব হয়, তত্রাপি আত্মীক মৃত্যুর সহিত দৈহিক মৃত্যুর তুলনা কোন মতে হইতেই পারে না। সুতরাং প্রমাণ হইল যে খ্রীষ্টের দৈহিক মৃত্যুদ্বারা মনুষ্যের আত্মীক মৃত্যুর নিবারণ অর্থাৎ অনন্তনরক যন্ত্রণা হইতে মনুষ্যের আত্মার পরিত্রাণ হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে। রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানগণ বলিয়া থাকেন যে "খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে যে তিন দিন তাঁহার শরীর কবরে ছিল, সেই তিন দিন তাঁহার আত্মা নরকে ছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হওয়াতে, মৃত্যুকে ও নরককে পরাজয় করিয়া তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করাতে নরক হইতে আমাদের আত্মার পরিত্রাণ হইয়াছে।" রোমাণক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদের এইরূপ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা আমরা লূক ২৩; ৩২ ও ৩৯—৪৩ পদে প্রমাণ পাই। কারণ খ্রীষ্ট যে মৃত্যুর পরেই স্বর্গে গিয়াছিলেন এবং কখন নরকে যান নাই তাহা ঐ কয়েকটি পদ পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

জনৈক খ্রীষ্টিয়ান-তনয়।

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকা।

সখি! ফিরি কি আইল শ্যাম?
তেমনি করিয়ে মুরলী বাজায়
কে যেন গাহিল রাধার নাম।

হৃদয় ভেদিয়া মরম মাঝারে
পশিল পুলক ধারা;
জর জর প্রাণে সুমধুর রব
জোছনা অমিয় পারা।

নীরস হৃদয় হইল সরস
মানস আঁধার গেল;
ক্ষীণ দেহে আজ নববল আনি
কে যেন ঢালিয়ে দিল?

নেহার নিকুঞ্জে ফুটিল কুসুম
পুলকে মধুপ গুঞ্জে;
মাধবী তমালে বেড়িল সোহাগে
কুহরে কোকিল কুঞ্জে।

মধুর মলয় বহিছে সুমন্দ
উড়িছে সুরভি সার;
মুঞ্জরিত তরু, হাসিছে কানন,
সরস লতিকা ভার।

বন ফুল গুলি ফুটেছে আবার
তাহারি মাঝারে অই;
নাচে শুক সারী সুখে ফিরি ফিরি
দেখনা দেখনা সই!

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে ডাকিছে
হরষে ছড়ায়ে পাখা;
নাচেনা ত ওরা অমনি করিয়ে
বিহনে ব্রজের সখা।

শুষ্ক গোঠ পুনঃ নবতৃণময়
গোপাল বিচরে তায়;
গোপাল বিহনে ব্রজের বালক
মাঠ পানে নাহি ধায়।

তবে বুঝি সই এল প্রাণ নাথ
গোকুল হাসিছে তাই;
নহে কেন আজ আশার পুলকে
ভাসিছে দুঃখিনী রাই?

দেখলো সজনি! মোহন মুরলী
শুনিয়া কালিন্দী কূলে;
কল কল তানে বহিছে উজানে
নাচিয়া লহরী তুলে?

শ্যামের বাঁশরী বিনা কার স্বরে
কভু কি যমুনা ভুলে;
প্রাণনাথ বিনে কে আর বাঁশরী
বাজাবে কদম্ব মূলে?

চল তবে সই দেখিব প্রাণেশে
জুড়াব বিরহ জ্বালা;
সাধাব সাধিব, কাঁদাব কাঁদিব
বুঝিব কেমন কালা।

জানেনা রাধায় ভুলেছে কি আজ
রমণী গরব কত?
শিখাব তাঁহারে মরমে দহিতে
আমারে দহিল যত।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

রসিক ও মূষিক।



রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে; পুনঃ পুনঃ মেঘ গর্জ্জনে চমকিত হইয়া রসিকরাজ সহসা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, প্রকৃতি অসিত বসনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অবিরল ধারে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে মনোমধ্যে এক অসাধারণ ভাবের আবির্ভাব হইল। বুঝিলেন, আর কাল বিলম্ব করা নিতান্তই অবিধেয়; এই মুহূর্ত্তে অন্তর মধ্যে যে অত্যুচ্চ ভাবরাশির সমাবেশ হইয়াছে, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিলে হয়ত এ সমস্তই শূন্যে পরিণত হইতে পারে। যে ভাব সমূহ এক্ষণে এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, কাল বিলম্বে উহাই আবার সুগভীর গহ্বরে পরিণত হইতে পারে। অতএব এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে 'কি পুস্তক লিখিব' 'কি পুস্তক লিখিব' বলিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করা নিতান্তই বাতুলের কর্ম্ম; এই ভাবের বনিয়াদ একবার গাড়িতে পারিলে তদুপরি এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিব।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে রসিকরাজ শশব্যস্তে পুনর্ব্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রিয়তমার সুকোমল সদ্যশীতল আলিঙ্গন পাশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কাগজ লেখনী ও মস্যাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্ট ক্রমে সকলই যুটিয়া গেল। রসিকরাজ দিয়াশালাই টানিয়া আলো জালিলেন এবং লিখিবার সমস্ত সরঞ্জাম কেরোসিন্ তৈলের বাক্সের উপর সংস্থাপিত করিয়া লিখিতে বসিলেন। অচলা ভক্তি সহকারে কাগজের শিরোভাগ 'ওঁ তৎসৎ' এই পঞ্চ বর্ণ সন্নিবেশিত হইল। ভাব-নিচয় একত্র সম্মিলিত থাকায় কোনটী প্রথম, কোনটী দ্বিতীয়, কোনটী তৃতীয়, কিছুই নিশ্চয় জানা যাইতেছিল না। তিনি তৎসমুদয় পৃথক পৃথক করিয়া ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় তক্তাপোষের নিম্নস্থ বিবরে খুট্ খুট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। রসিকরাজের স্থিরান্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎ পরিমাণে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেহে বাপু তুমি! এমন সময় আবার জ্বালাতন কর্‌তে এলে?" বিবর মধ্য হইতে উত্তর হইল—'মূষিকোহং—'।

রসি। তোমার জ্বালায় কি একটু লিখতে পাব না?

মূষি। কেন? তোমার কায তুমি কর; আমার কায আমি করি; তোমার অস্থির হইবার আবশ্যক কি?

রসি। হাঁ, তা হইলেই সর্ব্বনাশটা কর ভাল ক'রে আর কি?

মূষি। তোমার ঘরে আছে কি, যে তোমার সর্ব্বনাশ করব?

রসি। শাল দোশালাই নাই, ভাল কাপড়

চোপড়ই নাই, ভাল কেতাব গুলোও আছে ত?

মূষি। আমি সপরিবারে survey ক'রে দেখেছি এক খানিও ভাল নয়।

রসি। তুমি ক্ষুদ কুঁড়ো খাও, তুমি কেতাবের ধার্ ধার কি?

মূষি। সে যাই হো'ক তুমি সে সকলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

রসি। কেন—তোমার তাতে কি?

মূষি। না—আর ঘিদ্যে ছরকুটে কায নাই। ফের যদি কলম ছোঁবে, তা হলে দেখো দেখি তোমার কি দুর্দ্দশা করি।

রসি। কি আপদেই পড়লেম্ গা! শালার ইন্দুর এসে শেষ টিট্‌কারি দিতে আরম্ভ বরলে যে!

"মাতঙ্গ পড়িলে জালে,
পতঙ্গেতে কি না বলে!"

মূষি। বা রে রস্‌কে!

রসি। নিস্তার! লাঠি গাছটা কোথায়? শালার মূষিকের বংশনাশ করব আজ।

নিস্তারিণী নিদ্রিতা ছিলেন, এমন অসময়ে প্রাণ নাথের এই অতৃপ্তি জনক বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বিরক্তগদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আ পোড়া কপাল আর কি, আমি কেন লাঠি খুঁজতে গেলেম্, যার ঘাড়ে ভুত চেপেছে সে গিয়ে খুঁজুক্। আলো জেলেছে, কেন, বই লিখ্‌তে হবে বুঝি? বল্লেম্ ঘরে চাল নেই,' সে কথা কাণেও পুর্‌লে না; বল্লেম্ আমার কাপড় কিন্‌তে হবে, কেবা শোনে? কি খেয়ে বাঁচ্‌তে হ'বে তা' দেখ আগে, তা' না হ'য়ে কেতাব লিখতে বস্‌লেন; বলি, ও ছাই লিখে হবে কি? ওতে কি পেট ভর্‌বে?

নিস্তারিণীর নিশিত-শস্ত্র-সন্নিভ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ গোচর করিয়া মূষিক বিকট অট্টহাস সহকারে রসিককে বলিল—"কেমন হে বাপু! হলো এখন? বড় যে আস্ফালন!"

রসিক উভয় পক্ষ হইতে অবমানিত হইয়া স্বয়ং যষ্টি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন; বহু কষ্টে এক খানি জীর্ণ বংশখণ্ড হস্তগত হইল। রসিক সেই জীর্ণ বংশ খণ্ড করতলে ধারণ পূর্ব্বক বীরদর্পে উহা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে, চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। মূষিক রসিকের পাগলামি দেখিয়া বিবর মধ্যে নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিল। নিস্তার, প্রাণেশ্বরের প্রমত্ত ভাব সন্দর্শন করিয়া প্রগাঢ় ক্রোধে অধীরা হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বলি এ কি কেতাব লেখবার গৌরচন্দ্রিকা হচ্চে না কি? এ দিকে ভাতের হাঁড়ি, এ দিকে জলের কলসী, এ দিকে মশারি—ওমা করে কি গো! এই রাত্তিরে জন প্রাণী কেও জেগে নাই ওঁর কেতাব লেখবার ধূম পড়ে গেল! গুণের বালাই নিয়ে মরে যাই আর কি!!"

এবম্বিধ প্রকারে তিরস্কার করিয়া নিস্তারিণী রসিকের হস্ত হইতে বংশ খণ্ড কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং আপন মনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। রসিকরাজ হতাদর ও হতাশ্বাস হইয়া মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভাই ইন্দুর! এইবার

আমি সাদা flag উড়াইলাম, আর নয়, এই বার অনুগ্রহ করিয়া আমায় একটু লিখিতে দাও।"

মূষিক বলিল, "আমি আর কি করিলাম; তুমিই ত ভাই ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া গাত্রে ঘাম বাহির করিয়া ফেলিলে। ভাল আমি আর তোমায় বিরক্ত করিব না; তুমি লেখ বসে। কিন্তু দাদা! শুনিও একবার।"

রসিক, মূষিকবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া লিখিতে বসিলেন এবং অবিলম্বে কতিপয় পংক্তি লিখিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই মূষিক রসিককে জিজ্ঞাসা করিল— "কি দাদা! কিছু লিখেছ না কি?" রসিক বলিলেন—"হাঁ দাদা একটু লিখলাম বটে, কি রূপ হলো তা বল্‌তে পাচ্চিনে।" মূষিক বলিল—"আচ্ছা শুনাও।" রসিক আরম্ভ করিল—

আহা কি সুন্দর কান্তি, নীলম্বর মাঝে,
সুবিমল মেঘের বিকাশ;
ঘন ঘন সৌদামিনী বিলোল নয়নে,
ঘোর রবে করে অট্টহাস।
মরি কি মধুর হাসি শ্রান্তসমীরণ,
পরিমল আনিয়ে যোগায়;
মরি কি মধুর পাখী গাইতেছে গান,
উহু মরি বুঝি প্রাণ যায়।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে নাচে অলিকুল,
প্রেম ভরে নাচিল-বল্লরী;
হাসে কিবা কমলিনী স্বপনের ভরে,
তরঙ্গিনী তুলিলা লহরী।
শ্যামল বিটপী কোলে হাসিছে পনস,
সৌরভে পূরিল কুঞ্জবন;
তমোময় চারি দিক মেঘের গর্জ্জন,
ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন।
আহা কিবা কমনীয় প্রিয়ার বয়ান,
রসনায় কুহরে কোকিল;
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের মধুর নিনাদ,
আমোদে পূরিল খালবিল।
হেরলো সজনি! ওই জোছনার মাঝে
ভাসিতেছে তারকানিচয়;
সুমধুর বাঁশরীর প্রেমময় তানে,
তিরপিত এ ভগ্ন হৃদয়।
সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতি মাখা কি-যেন-কি আসি,
প্রাণ ভরি ঢালে সুধাধার;
সুরসুন্দরীর প্রভা অনন্ত যৌবনা,
উথলিল সুখ পারাবার।
দ্রুত ইরম্মদ গতি অনশ্বর পথে
একেকটী সর্পের আকার;
ভীম প্রক্ষেড়ন করে ত্র্যম্বক যেমতি
শোক-ভরে ফেলে অশ্রুধার।
কিবা সহকার সাথে লতা বিথানিয়া
দুলিতেছে হরষিত চিতে;
চির বিধবার যেন দিনেক মিলন,
প্রাণ হীন পতির পিরীতে।
স্ফটিক চন্দ্রমা করে উড়িছে চকোর,
তুলনা কি এ জগতে আছে?
প্রেম ভরে কুমুদিনী আমোদে বিভোর,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
সে ফুলবালারে বল কেমা আদরিবে
ভাইটীরে যদি নাহি ভুলে,
প্রাণতম বলি তারে কেনা আলিঙ্গিবে,
কেনা সম্ভাষিবে প্রাণ খুলে?

মূষি। দাদা! ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও—

রসি। কেন—কি হলো আবার?

মূষি। এমন না হলে কি পদ্য?

রসি। আরও আছে যে, মাঝ খানে ভঙ্গ দিলে ভাই?

মূষি। আর কায নাই দ্রব হয়ে যাব আবার!

রসি। কিজান দাদা! এ হলো এক-মেটে।

মূষি। এই একমেটেতেই যা' ছরকুটেছ বোধ হয় দোমেটে আর করতে হবে না। তবে তোমায় আমি ভাজ বলি। কেননা এই অন্নকষ্টে তুমি মহাজনের বচন বিস্মৃত হও নাই।

রসি। সেটী কি?

মূষিক বলিল—

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বেএব রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥"

তা—তুমি যে এই কাব্যামৃত রসাস্বাদে অঙ্গ ঢেলেছ, এই দেখেই আমি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েছি।

রসি। বলি—ঠাট্টা নয়—কবিতা টুকু হ'য়েছে কেমন শুনলে?

মূষি। দাদা! সে আর বলব কি?—মুষিকবৃদ্ধদিগের নিকট শুনেছি—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদ লালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

তা—দাদা! তোমার এ মাঘ কাব্য, এতে সব আছে,—উপমা আছে, অর্থ গৌরব আছে, পদলালিত্য আছে, সব আছে।—তবে কিছু দিন বাঁচলে হয়।

রসি। মূষিক ভাই! তোমায় একটী কথা বলে দি, তুমি প্রবীণ হয়ে বোধ করি সে কথা রাষ্ট্র করবে না। পদ্য লেখবার একটী সহজ উপায় আছে; কিন্তু সকলে সেটী জানে না। বিবেচনা কর গিয়ে তুমি লিখলে—

'কেহ যায় পদব্রজে কেহ গাড়ি চড়ি;'

তার পর এর একটী মিল চাই। এখন তোমায় কি করতে হবে! ধরে যাও "কড়ি" "খড়ি" "গড়ি" "ঘড়ি" "ছড়ি" "জড়ি" "ঝড়ি", "পড়ি", "ফড়ি", "বড়ি"—এই 'বড়িটী' এখন পেলে—বটেত? এখন তুমি অনায়াসেই লিখতে পার—

"শীতকালে দেয় সবে কুমড়ার বড়ি।"

এই মিলে গেল। তার পর অর্থ? তুমি ত এখন কলম ফেলে দিলে, অর্থ করুক গিয়ে বেটার টীকাকার। তোমার আমার দায় পড়ে গেছে? আর একটী কথা—ফুরসুৎ পেলেই ডিক্সনারি খুলে ভাল ভাল কথায় সব দাগ দিয়ে রাখবে; সময়ে সে গুলিতে অনেক উপকার দেবে। এই দেখনা কেন, আর একটা লিখেছি, কেমন সুন্দর হয়েছে—

মলম্বা চঞ্চল কান্তি অনম্বর পথে।
আহবে সাজিছে চমূ চড়ি দিব্য রথে॥
কুন্দকলি বৃন্দারক বিনোদ রসনে।
মন্দার কুসুম কান্তি কষিত কাঞ্চনে॥
অনন্ত নীলম্বুনাদে কম্বুর বাদন।
আখণ্ডল পুত্র করে খাণ্ডব দাহন॥
বহিছে জীমূতমন্দ্র-মরুদ্ভ নির্ঘাত।
বিচিত্র বিজলী আভা অশনি নিপাত॥
ধাইছে কর্ব্বুর বৃন্দ প্রমত্ত পয়োধী।
উটজ অজিরে বহে শোণিতের নদী॥
গড্ডলিকা প্রাড়্বিবাক্ দিগ্গজ সমান।
সরিমুচ নাহি দেখে বাসর বয়ান॥
ঝলকে শিংসপাশীর্ষে দিনান্ত ময়ূখ।
তিরশ্চীন কাকোদর সদা নম্র মুখ॥
ক্রকচ অলাতশল্য প্রত্যুপ্ত হৃদয়।
গণ্ড-গণ্ড-পিণ্ড-কণ্ডু ভ্রাট্যের নিলয়॥
উত্তুঙ্গ নগেন্দ্র শৃঙ্গে তুঙ্গ সন্তানক।
ফলিত সৈকত চরে নলিনীনায়ক॥

কন্দুক কুত্রিম সুতে ক্রীড়ার বিলাস।
ব্রীড়ায় বারীন্দ বন্ধ'বিফল প্রয়াস॥

শব্দ গুলো হস্তগত থাকায় কেমন লিখেছি দেখ দেখি, লেখা যেন অজগরের মত গর্জ্জন করছে, এরূপ না হলে কি লেখা?

মূষি। দাদা ইতি কর রাত ঢের হয়েছে একটু নিদ্রা যাও। তুমিও নিস্তার পাও, তোমার নিস্তারও নিস্তার পা'ক্।

রসি। তবে কি তোমার এটা ভাল লাগ্‌ল না?

মূষি। বেশ লেগেছে—দুশো বেশ লেগেছে।

রসি। আচ্ছা তোমায় তবে একটু গদ্য শোনাই তা'তেও যদি তোমার তৃপ্তি হয়।

মূষি। আমি কিন্তু দাদা, বড় ঠোঁট্-কাটা; আমার কাছে কথা পেড়ে যে, মানুষ প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ঘরে ফিরে যাবে সে সুকৃতি টুকু আমার নাই। আমি মানুষকে বিষয়ের অষ্টপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য এই বিধি-দত্ত মুক্তা গঞ্জিত দশন পংক্তি ক্ষয় করিলাম, তথাপি আমার সুখ্যাতি নাই। আমাকে দেখ্‌লেই লোকে পরম শত্রু বোলে যষ্টি প্রহার কর্‌তে ত্রুটি করে না। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ মূষিক তাই দিনের বেলা কত কষ্টে বিবর মধ্যে বাস করি। রাত্রে এক বার আধবার বাহির হই; তাতেও নিস্তার নাই। পোড়া লোকে কল পেতে আমার মরণের চেষ্টা করে। আমি লোককে বিষয় লালসার প্রবল হুতাশন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তা'রা আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টাটি আগে করে। আমি গর্ত্ত কাট্‌লে সেটী আবার বোতলচুর দিয়ে বুঁজিয়ে দেওয়া হয়। আজ শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে দেখা, দুটো কথাই না হয় শুনিয়ে যাই।

রসি। ভাল সে আফ্‌শোষ বাসায় গিয়ে তোমার Better-halfএর কাছে করো, এখন তুমি যে বল্লে আমার লাইব্রেরীতে এক খানিও ভাল বই নাই এর মানে কি?

মূষি। আচ্ছা তুমি দেখাতে থাক, আমিও Remark করে যাই।

রসি। ভাল এগুলির বিষয় তুমি কি Remark কর্‌তে চাও।

মূষি। We can not blame indeed but we can sleep.

রসি। যাগ্—আচ্ছা এই নামটী পড়ো দেখি—কি লিখ্‌ছে?

মূষি। পড়লেম্, তাতে আর হয়েছে কি? যশোভাগ্য যশ লাভ করেছে। মানুষটা এত লিখছে কিন্তু তা'তে নিজের কিছুই নাই। "Moon shines in a borrowed light."

রসি। এও যদি তুমি বড় না দেখ্‌লে তোমায় আর যা' দেখাব, সকলই ত তা'র নিচে। ভাল এটা পড়ো দেখি।

মূষি। সো পাপিষ্ঠততোধিকম্।

রসি। তুমি যে বড় টয়ে দেখ্‌তে পাই?

মূষি। গৌরচন্দ্রিকাতেই ত বলেছি।

রসি। আচ্ছা, এইবার তোমায় হারাব।

মূষি। আমি হলেম গণেশের বাহন, আমাকে হারান বড় শক্ত।

রসি। আচ্ছা চকে চশমা লাগিয়ে দেখ দেখি একবার ভাল করে, এটা কি লেখা রয়েছে।

মূষি। হাঁ, ও'আমার দেখা আছে, ওঁর লেখায় দেশের কিছু উপকার হয়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীকে স্বামীর নাম ধর্‌তে শেখায় ঐটা বড় দোষ।

রসি। বা! তুমি যে সর্ব্বজ্ঞ দেখ্‌ছি।

মূষি। বলিছি ত ভাই! আমার মক্ষিকা দোষ আছে নিখুৎ কি পাওয়া যায়? চাঁদেও কলঙ্ক আছে।

রষি। আচ্ছা এখানির পানে একবার চেয়ে দেখ দেখি? কি লেখ্‌সে?

মূষি। এখানি কেন বল? ঐ ক'খানি বল। ও আমার খুব দেখা আছে। Author টা খুব নাম জাদা বটে, হাবড়হাটি লিখেওছে অনেক গুলো; কিন্তু দাদা হিন্দু মুসলমানকে এক বিছানায়—এক শানকে না বসাতে পাল্লে ওঁর আকাঙ্ক্ষাটা মিট্‌ছে না। আর কদাচারী হয়ে ধর্ম্মকথা লেখে কেন? ধর্ম্মটা কি কলা মাখা ভাত, যে, টপ্‌ করে গালে ফেল দিলেই হোল? সদ্‌গুরুর নিকট যা'র উপদেশ হয় নাই, সে ধর্ম্ম কথা লিখ্‌বে কেমন করে? আন্দাজীর কায নয় যে দাদা।

রসি। যেতে দাও, যেতে দাও, অত করে লোককে বল কেমন করে? ভাল এটা কি লিখছে দেখ দেখি?

মূষি। তাইত! কবিতে দেখছি যে! ওঁকেও আমি জানি।

রষি। কি রকম।

মূষি। ভাল বটে, দ্বিতীয় ভাগে যদি না বিদ্যে প্রকাশ কর্‌তেন।

রসি। তুমি যে বড় ভয়ানক লোক দেখতে পাই। ভাল এইবার দেখ দেখি?

মূষি। ইস্‌, তাই ত টুপি মাথায় যে! ভাই হে সকলই কর্‌লে 'মা' 'মা' করেও কাঁদ্‌লে, ফরমাসি কথাও কতক গুলো বাঙ্গালা-ভাষায় এনে ঢোকালে, কিন্তু হিন্দুর মুখটা উজ্জল কর্‌তে পার্‌লে না। ভাল, ইউক্লি-ডের জ্যামিতির মত একটা নূতন জিনিষ রেখেগেছে।

রসি। ও ভগবান! ও দীননাথ! ও মধুসূদন! যাব কোথা? তোমার যে কাকেও মনে ধরে না দেখতে পাই!—

মূষি। আগেই ত বলেছি দাদা তুমি কেন গোল বাধাচ্ছ?

রসি। আচ্ছা আর দুই এক খানি দেখাব একবার এদিক পানে শুভ দৃষ্টি কর।

মূষি। ও'হঠাৎ কেমন নামটা একবার বেরিয়ে গেছে, আর সেই নামে এখনও বিকুচ্ছে। আমা হেন লোক ওকে ভাল বলে না।

রসি। ও দাদা! আমার যে ষ্টক্‌ ফুরিয়ে এলো। আর এই এক আধ খানি আছে। ভাল এই ক খানি দেখ দেখি?

মূষি। বা! বা! কেমন সোণার জলে বাঁধান! অতি চমৎকার!!

রসি। বল ডঙ্কা মারি তবে? লাগে।

মষি। রস দাদা! দেখি ভাল করে; এঃ! খালি আধুনিক জড় করেছ? তা, তোমার দোষ কি। তুমি নিজে আধুনিক তোমার Taste ও আধুনিক।

রসি। যা হোক্‌ একটা ব'লে ফেল শুইগে, বড় রাত হয়েছে।

মূষি। ও'আর কি বলব দাদা! বলে

বড় বড় ঘোড়া গেল তল
বেতো ঘোড়া বলে আমায় বল।

ওযে সকলই বিলিতী; বিলিতী কথা, বিলিতী ভাব; দরটা কেবল বিলিতী কাপড়ের মতন হ'লেই ভাল হতো।

রসি। যা বল ভাই! এগুলি আমার বড় আদরের ধন।

মৃষি। হঁা, তোমার লেখার ভাবেই দেখ্‌ছি, সে আর আমায় বলে দিতে হবে না।

রসি। আচ্ছা ভাই আমি যেটাকে এত ভাল বাসি, তুমি কি সেটাকে একটু ভালোও বাস্‌বে না? একটা Remark করে ফেল।

মৃষি। আচ্ছা করি, করি দাদা—

"Through and through the
inspired leaves,
"Ye maggots! make your windings
"But bear respect to his
lordship's taste,
"And spare the golden bindings."

কেমন দাদা কি বল? মনের মতন হলো কি না।

রসি। আরে যাও—হাড় কালি করলে তুমি। এ সমস্তই যদি তুমি এক গাড়ে গাড়লে তবে তোমার মতলবটা কি?

মৃষি। ক্রমে সকলই কাট্‌ব, তবে কেউ আগে কেউ পেছে।

রসি। তবে রাখ্‌বে কি?

মৃষি। যা' চিরকাল যুগ যুগান্তর রক্ষা করে এসেছি তাই রাখ্‌ব। যা' রেখেছি ভূর্জ্জপত্রে, রেখেছি যা' তাল পাতে, তুলটে যা রেখেছি সে সমস্ত এখনও রাখ্‌ব।

রসি। তুমি যদি মহামহোপাধ্যায় গণের নামেও কলঙ্ক আরোপ কল্লে তবে আর "অন্যে পরে কাকথা?" এই কাগজ কলম ফেলিয়া দিলাম। আমি মনে করেছিলাম What man has done man must do এখন দেখছি আমরা man হতে অনেক দেরি।

মৃষি। মাতঃ সংস্কৃত ভাষা! বঙ্গের গণ্যমান্য সুসন্তানগণ কর্ত্তৃক তোমার পুনরুত্থানের পথ প্রকাশিত হইতেছে। মাগো কুন্তল জাল ভাল করিয়া বাঁধ। মলিন মুখ খানি অসিত বসন হইতে উন্মুক্ত কর। মাগো! হীন প্রাণ বঙ্গবাসী তোমার আদর বুঝিয়াছে। জর্ম্মণী তোমার ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিয়াছে। তুমি মা! যে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি মা সেই সিংহাসনেই আছ। কুটীল কাল তোমার অবনতির উপায় দেখিতেছিল, কিন্তু মা! তাহার চেষ্টা বিফল হইল। তোমার উচ্চনাম সুমেরু চূড়ায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। 'তুমি পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছ'—এই নিষ্ঠুর বচন কে আমাদিগকে শুনাইতে চায়? উঠ, উঠ, উজ্জয়িনী নাথ! উঠ উঠ অশোক! উঠ, কৃষ্ণচন্দ্র! উঠ, তোমাদিগের মাতার সিংহাসন মস্তকে করিয়া গাত্রোত্থান কর। সম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী 'তোমাদের সহিত যোগ দিতেছেন' তোমরা উঠ। মা! তোমার ক্ষীণপ্রাণা কন্যাকে রাখিয়া দিব্যাঙ্গ কোথায় গোপন করিয়া রাখিয়াছ? দেখ মা! দেখ আসিয়া

কুসন্তানগণ তাঁহার অবমাননা করিতেছে। তোমার সেই শশাঙ্ক নিভানন তমোজাল ভেদ করিয়া একবার ভাল করিয়া দেখাও। তৃষিত সন্তানগণ পরিতৃপ্ত হউক। সপ্ত-স্বতি! দৃষদ্বতি! তোমাদের অঙ্কস্থল এখন শূন্য পতিত রহিয়াছে। নবদ্বীপ তুমি কিঞ্চিৎ মর্য্যদা রক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু ভাল করিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হও। দাক্ষিণাত্য! তোমার জয় হউক, তুমিই মাতার মলিন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিবার চেষ্টায় আছ।

পূর্ব্বোক্তরূপ আক্ষেপ করিয়া মূষিক, রসিকের ভরাঘাত হৃদয়ের সন্তোষ সম্পাদন করিল। রসিকও মূষিকরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। মূষিক রজনী অবসান প্রায় দেখিয়া স্ববিবরে প্রবেশ করিল। শব্দ হইল—খুট্!!

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

বাদল।

বিষম দুর্দ্দিন হ'তেছে বর্ষণ,
বহে অবিরাম শীতল পবন,
ভগ্ন তরু 'পরে বিলোল বল্লরী,
কাঁপি'ছে সঘনে শিহরি শিহরি,
পাতা গুলি খসে সমীরণ শ্বাসে,
বেরেছে ভীষণ আঁধার ঘোর।

বিষণ্ণ জীবন ঝরে অশ্রুধার,
নীরব নিশ্বাস বহে অনিবার,
অতীতের কোলে ভাবনা-বল্লরী,
সদা কম্পমান্ মরমেতে মরি,
যৌবনের আশ পাইছে বিনাশ,
তমসে আচ্ছন্ন জীবন মোর।

কেন হা হুতাশ কর খিন্ন মন?
ঘন অন্তরালে বিকাশে তপন;
প্রকৃতির এই রীতি সাধারণ,
সবারি ললাটে ঘটিবে এমন,
হবে একদিন তিমিরে মলিন
বিষাদে ঝরিবে নয়ন-মোর।

শ্রীরসময় লাহা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুবোধিনী।

দ্বিতীয় খণ্ড। } চৈত্র—১২৯৮ { দ্বাদশ সংখ্যা।

গান সমাপন।



এতদিনে বুঝি গান হ'ল সমাপন,—
গাহিতে হবেনা বুঝি আর ;
ভেঙ্গে যায়, পড়ে যায়—বুঝি এত দিনে,
সাধের এ গৃহ লতিকার।
কত সাধে লতিকারে করিয়া যতন,
বেঁধেছিলি সুখময় গেহ ;
বিলোল বল্লরী ডোরে
অটুট বাঁধন দিয়ে,
জননীর স্নেহে সদা করিতিস্ স্নেহ।

হেরিয়া জুড়াত তোর প্রাণ,
সুখময়, শান্তিময়,
বিমল ছায়ায় যার
ছিল তোর সদা অধিষ্ঠান ;
নিভৃত নিলয়ে যার
বসিয়ে প্রশান্ত মনে,
আমাদের বসা'য়ে যতনে,
গেয়েছিলি কত গান,
গেয়েছিনু কত গান,
প্রফুল্ল হৃদয়ে তোর সনে।

কোথা গেলি—কোথা গেলি ?
প্রাণের দোসর তুই !
কোথা গেলি ? দেখ একবার—
কি দশা হয়েছে আজি
শান্তিময় গৃহে তোর,
জীবন ঢালিয়া যার
করেছিলি জীবন সঞ্চার ;
সাধনের ধন তোর,—
যাহার শ্যামল কান্তি,

সে গান মিশিত গিয়া
তটিনীর কলকল তানে।
সে গান পশিত গিয়া
ঘুমন্ত সে কুসুমের প্রাণে।
ভাসিয়া বেড়াত সেই গান
সুমন্দ প্রভাত সমীরণে।
পাখীদের কলরব
মিশিয়া সে প্রেম গানে
সুধাধারা ঢলিত কাননে।

সে গান মিশিত যবে
তটিনীর কল কল স্বনে—
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া,
কত দেশ উপবন
শ্যামল প্রান্তর কত
কুসুম ভূষণে ভূষিত করিয়া,
স্রোতস্বিনী যাইত বহিয়া।
সেই কলকল গান,
মিশ্রিত মধুর তান,
হৃদয়েতে ধরিয়া যতনে
প্রাণের আবেগ ভরে
চালিত জীবন ধারা
—হইয়া আপন হারা—
ফুল্লমনে জলধি জীবনে।
সে গান মিশিত পুনঃ
জলধির ভীম গরজনে;
অবশেষে শ্রান্ত হয়ে,
আকাশের শান্ত কোলে,
ঘুমাইত অবশ নয়নে।

সে গান পশিত যবে
ঘুমন্ত সে কুসুমের প্রাণে—
সহসা ভাঙ্গিয়া যেত ঘুম,
চমকিয়া উঠিত কুসুম,
সুখ স্বপ্ন স্মৃতিমাখা—
মেলিয়া আঁখির পাতা,
নেহারিত পুলক নয়নে।
নলিন নলিন মুখে
চুম্বিত মনের সুখে,
মধুকর প্রেম মধুপানে;
পরিমলে ঢল ঢল
প্রফুল্লিতা শতদল
মুহু মুহু নিক্কণ ঈক্ষণে।
ছোট ছোট ফুল গুলি
ঢেলেদিত প্রাণ খুলে
বুকভরা সুরভি সম্ভার
আমাদের সেই গানে;
মধুময়—সুধাময়
হইত সে প্রেম গান
কুসুম সৌরভ পরশনে।
সৌরভ করিয়া বিতরণ,
সে গান করিত বিচরণ;
সেই সুরে মিশিত আবার—
সুমধুর ভ্রমর গুঞ্জন।
শ্যাম কিশলয় ছায়ে
বিরাম লভিত শেষে
শ্রান্ত হয়ে পড়িত যখন।

সে গান ভাসিত যবে
সুমন্দ প্রভাত সমীরণে—
কত পাখী উঠিত গাহিয়া,
কত পাখী উঠিত জাগিয়া,
আমাদের সেই গানশুনে।
কানন হইত ভরপুর
মিশিয়া ভাসিত সেইসুর,
পাখীদের মধুর কূজনে।
উঠিত সে ললিত বিভাষ
বায়ুভরে সহকার পরে;
যথায় পঞ্চম তানে
কোকিল প্রিয়ার সনে
উচ্চকণ্ঠে গাহিত সুস্বরে;

আরো উচ্চে উঠিত সে গীত
মিলিয়া সে পঞ্চমের সুরে।
সুনীল অম্বর তলে
বিমুক্ত বিমান কোলে
শ্যামার সরস শীষ্ সতত যথায়—
মাতাইয়া বনস্থলী দিগন্তে বিলায়;
সেই উচ্চে, সেই শীষে,
সে গান মিশিয়া শেষে,
লভিত বিরাম বুঝি, কে জানে কোথায়!
শিখরীর উচ্চ চূড়ে
অথবা বিটপিশিরে
নিভৃত নিস্তব্ধ কিম্বা গিরির গুহায়!!

কোথা হতে প্রতিধ্বনি আসিত ছুটিয়া
আমাদের সাধের কুটীরে;
—বুঝিবা সে বিরামের তরে—
সেই সুর সেই তানে,
আমাদেরি সেই গানে,
স্বরগের সুধাধারা
মিশায়ে তাহারি সনে,
প্রবেশিয়ে হৃদয় কন্দরে—
ঢালিত, সঙ্গীত রসময়,
মধুর অক্ষয় ব্রজভাষ
মানস-মোহন-কাব্য-সুধা
ঢেলেছিল যথা কালিদাস।
মাতিয়া উঠিত তাহে প্রাণ
আনন্দের বহিত উচ্ছ্বাস!!

আজো আসি, আজো বসি,
এই লতা কুঞ্জে তোর,
আজো গাই তোরি সে কারণ
তোর সেই মধুময়—
অকৃত্রিম ভালবাসা,
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম করিয়া স্মরণ।

এই লতাকুঞ্জে হায়!
প্রিয় সখে! তোর সনে,
কত সুখে কাটিয়াছে দিন;
কত প্রেম আলাপনে
নিত্য কাব্যরস পানে
সে সুখের দিন হায়! হয়েছে বিলীন।
থাকিতিস্ তুই সদা
এই লতিকার গৃহে,
নিরিবিলি বসিয়ে একেলা;
আসিতাম আমরা দুবেলা;
কত খেলা খেলিতাম
কত গান গাহিতাম,
প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোলা।

সুখময় নিদাঘ উষায়,
তপনের হেমময় আভা
লতিকার শ্যামল পাতায়
পড়িয়া, ধরিত কত শোভা।
কত রমণীয় আহা!
হইত দিবস পরিণাম;
সুশীতল লতা গৃহে বসি
লভিতাম কতই বিরাম।

চকিতে চপলা চল
নিচোল উড়ায়ে কিবা
নাচিয়া বেড়াত ফুল্লমনে;
প্রাবৃটের সুগভীর গান

গাহিয়া বেড়াত ঘনদলে,
সুমধুর মুরজ নিক্কণে।
এই লতিকার ঘরে
থাকিয়া আমরা সবে
হইতাম স্তম্ভিত সে স্বনে।
ঝম্ ঝম্ মঞ্জীর শিঞ্জনে
করিত বারিদ বরিষণ ;
লতিকার শ্যামল সুষমা
হইত তাহাতে সম্বর্দ্ধন।
রবিকরে ম্রিয়মাণ
নশ্বর মঞ্জুল মঞ্জরী
নববলে উঠিত বাঁচিয়া ;
সুষীম শীকরভরে
কমনীয় কিশলয়
ধীরে ধীরে উঠিত কাঁপিয়া।

শক্রধনু করে ধরি
সহসা শরৎ আসি,
দেখা দিত গগণ প্রাঙ্গণে ;
বিভিন্ন পয়োদ-মালা
করি ভীম আর্ত্তনাদ
পলাইত সজল নয়নে।
চন্দ্রমার আসিত সুদিন,
নক্ষত্র খচিত নীলাকাশে
ভাসিয়া বেড়াত মনোল্লাসে ;
রজত জলদখণ্ড
ঘেরিয়া দাঁড়াত আসি,
সুধাকর-সুধা অভিলাষে।
লুকাইয়া বিধুমুখ
ঘুমাইত নিশাপতি
স্নিগ্ধ কাদম্বিনী-হৃদিতলে ;

আধ নিমীলিত আঁখি
ঢুলু ঢুলু ঘুম ঘোরে,
জোছনার হাসি দিত ঢেলে।
ধরিত এ লতাকুঞ্জ
মধুর উজ্জ্বল শোভা
ঝুনস্ত সে হাসির হিল্লোলে।
নিশীথিনী অভিমানে
রহিত আনতাননে
বাষ্পময় আঁখি দুটি মেলে।

নয়নের প্রান্তহতে তা'র,
শিশির মুকুতা অশ্রু ধার
ঝরিত এ লতার পাতায় ;
মাঞ্জিষ্ঠ ময়ূখ পাতে
ধরিত মোহন শোভা,
হিমময় হেমন্ত উষায়!

বিরস শিশিরবায়ে
রসহীন পাতা গুলি,
ধীরে ধীরে যাইত ঝরিয়া ;
পেলব পল্লব চয়
মাধব মলয় বাসে,
উঠিত আবার মুঞ্জরিয়া।
নবনব উঠিত মুকুল,
বিকসিত হ'ত কত ফুল
কোথা হতে মকরন্দ লোভে
ছুটিয়া আসিত অলিকুল।

সুমধুর কাকলী করিয়া
কত পাখী নাচিত আসিয়া ;
প্রজাপতি বেড়াত উড়িয়া
কৌতুকে আকুল!

প্রফুল্ল অন্তরে কুতূহলে
ফুল গুলি আমরা সকলে
আনিতাম্ সযতনে তুলে
ভরিয়ে দুকুল;
ভাল ভাল ফুল গুলি আগে
বাছিয়ে মনের অনুরাগে
সাজাতেম্ কতই সোহাগে
সাধের মঞ্জুল।

আসিয়া এ লতাকুঞ্জে
হইত মিলিত যারা
মনসুখে আমাদের সনে—
গাঁথিয়া চিকণ মালা
তাঁহাদের গলে সুখে
দোলায়ে দিতাম ফুল্লমনে!
কতফুল দিতাম বিলায়ে
কতলোক আসিত হেথায়;
প্রসন্ন বদনে তারা সবে
একে একে লইত বিদায়।
হরষের পূর্ণ কোলাহলে
হইতাম প্রমত্ত সকলে।

এইরূপে বারমাস
প্রিয়সখে! তোর সনে,
কেটেছিল মনের উল্লাসে;
এতপ্রেম ভালবাসা
প্রাণের অতৃপ্ত আশা
না মিটিতে গেলি কোন দেশে?
কোথা তুই—কোথা আমি,
কোথা বা সে স্বর্গভূমি?
একবার আসিবিনে সখে!

সাধের এ লতাকুঞ্জ
শুধু একবার এসে
যাবিনে যাবিনে ফিরে দেখে?
তুই ছিলি—তুই নাই!
এই লতাকুঞ্জে আর
কে করিবে সলিল সেচন?
অনিল বহিছে বেগে
শিথিল বাঁধনি সব
কে দেবে সে অটুট বন্ধন?
ভেঙ্গে যায়—ভেঙ্গে যায়
এতদিনে—ভেঙ্গে যায়
পড়ে যায়—"সাধের নিলয়;"
কে আর রাখিবে বল,
এই লতা কুঞ্জ তোর,
তুই বিনে অন্ধকার ময়!!
কে আর যতন ক'রে
বসাইয়ে আমা সবে
করিবে মধুর আলাপন;
হৃদয়ের প্রতি কথা
কহিয়ে কাহার সনে,
পুলক পাইব প্রতিক্ষণ?
প্রিয়সখে! প্রাণ সখে!
কার কাছে প্রাণ খুলে
গাহিব গাহিব সুখে গান?
কে রাখিবে লতাকুঞ্জ?
তাই বলি, এত দিনে—
বুঝি গান হয় অবসান।

শ্রীরসময় লাহা।

জাতীয় একতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতাও দুই প্রকার—আক্রমণশীলধর্ম্মৈকতা ও রক্ষণশীলধর্ম্মৈকতা। আক্রমণশীল-ধর্ম্মাবলম্বীরা অন্য সকল ধর্ম্মকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলিয়া হেয়জ্ঞান করে এবং আপনাদিগকে অভ্রান্ত জ্ঞানে বাহুবলে অপর ধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ করে।

রক্ষণশীলধর্ম্মাবলম্বীরা বৃথা বাহ্যাড়ম্বর প্রিয় নহে। রক্ষণশীলধর্ম্ম; অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় সতত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগতের হিত সাধন করিয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম্ম অসিবলে আত্মপ্রসার করিতে চাহে। হয় মুসলমান হও, না হয় তরবারির আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন দাও; হয় কাফের মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, না হয় মুসলমান কাফের হস্তে ছিন্নশিরা হইয়া পরত্র দিব্যাপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত, যশ-জ্যোতি সমুদ্ভাসিত,মনোরম সুগন্ধে সুবাসিত, স্বর্গভূমে সুখে বিচরণ করিবে। এইরূপ বলপূর্ব্বক বিজাতীয় ধর্ম্মাপহরণ করিয়া নিজধর্ম্ম বিস্তার করায়, মুসলমান যে ধর্ম্মৈকতা সূত্রে বদ্ধ তাহাকে 'আক্রমণশীল' না বলিয়া আর কি বলা যায়?

খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকেরা অন্য জাতিকে নানাবিধ প্রলোভনে পাতিত করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মে মজাইতে চাহে এবং চীন প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া, তদ্দেশবাসী জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া তদ্দেশ, পরিত্যাগকরণার্থে বারম্বার অনুরুদ্ধ হইলেও রণতরি ও কামানের ভয় দেখাইয়া, গায়ের জোরে তথায় বসবাস করিয়া, খৃষ্টানধর্ম্মকে ইতরলোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করে। ইহাকে ইউরোপীয় রাজনীতি মূলক বল বা খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারের প্রথাই বল—ইহাকে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা বা 'আক্রমণশীল ধর্ম্মৈকতা' না বলিয়া কি 'রক্ষণশীল ধর্ম্মৈকতা' বলিতে পারা যায়? বিশেষতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 'মুক্তি ফৌজ' (Salvation Army) নামটাতেই 'আক্রমণশীলতার' তীব্রগন্ধ বিরাজিত।

ম্যাক্সমুলর বলেন পৃথিবীতে তিনটী উন্নতিশীল (Progressive) ধর্ম্ম আছে, যথা—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম। আর তিনটী স্থিতিশীল (Conservative) ধর্ম্ম আছে; যথা;—হিন্দু, য়িহুদি ও জড়োপাসক। তাঁহার মতে ধর্ম্ম যত উন্নতিশীল হয়, ততই ভাল; এবং এবিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মের নিকট সকল ধর্ম্মই হার মানিয়াছে।

আমরা একথার কোন প্রতিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে

উন্নতিশীল ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য অবশ্য প্রলোভন অথবা গায়ের জোর দেখাইয়া করাও ভাল নহে। ধর্ম্মগ্রহণ বা পরিত্যাগ, মানবের ইচ্ছানিচ্ছা ও জ্ঞানাজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। এক ধর্ম্মাবলম্বীকে অপর ধর্ম্মে আনিবার পূর্ব্বে তাহাকে তাহার ধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যদি অতদূর করিতে না পারা যায় এবং অতদূর করিতে পারা যদিচ এক প্রকার অসম্ভব—কেননা যে, যে ধর্ম্মে দৃঢ়নিবিষ্ট সে তদ্ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদিও কোন ধর্ম্মাবলম্বীর তদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভক্তির বৃদ্ধি হ্রাস হেতু সন্তোষাসন্তোষ নিবন্ধন সুবিধা পাইলে, (এথানে ধর্ম্মান্বেষী ধর্ম্মপিপাসুর কথাই বলা হইতেছে; যাহারা পার্থিব লোভে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে তাহাদের কথা নয়) নিজধর্ম্ম ত্যাগ করা অথবা স্বধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তিমান হওয়া সম্ভব—তথাপি নানা প্রলোভন দেখাইয়া নানাপ্রকার বাগাড়ম্বরে ভাগ করিয়া অবোধ লোককে ভজাইয়া, ইহকালের ও পরকালের লোভ দেখাইয়া, একধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন করা কি ভাল? যদি ম্যাক্সমূলরের মতে এই রূপে ধর্ম্ম বিস্তার করিলেও সেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলি, ঐ হিসাবে আমাদের হিন্দুধর্ম্মকে সামান্য বলিলেও আমরা দুঃখিত নহি। ধর্ম্মেরবল, ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তেই দেখা যায়। কোন্ ধর্ম্মের কত বল তাহা তদ্ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত সমূহের আস্থা ও শ্রদ্ধা দর্শনে নির্ণয় করা যাইতে পারে, এবং তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক যুক্তিসঙ্গত।

কেহ কেহ তর্কউত্থাপন করিবেন, যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যাজকদিগকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাধা দেওয়া এবং দেশ হইতে দূরীকরণের চেষ্টা করিলে তাহারাও অবশ্য রাজবলের সাহায্য লইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রচার করিবেন ইহাতে হানি কি? যদি রাজ বলে তাড়াইয়া দেওয়া হইতে পারে, তবে রাজবলে তাহার প্রতিবন্ধকতা করা কেন দোষের হইবে? যদি লোকে আমাদের ধর্ম্মগ্রহণ না করে, আমরা কিছু তাহাদিগকে গিলাইয়া আমাদের ধর্ম্মে আনিতেছি না। তাহারা যদি আমাদের না চাহে আমরাই বা কেন সেস্থানে থাকিব? কথাটা শুনিতে কতকটা যেন যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তলাইয়া দেখিতে গেলে অতীব অসার যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিলক্ষণই প্রতীত হইবে।

দেখুন নির্ব্বোধ বোকাগণ—যাহারা ধর্ম্মের 'ধ'ও বোঝে না, খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রথমে তাহদেরই ঘাড়ে চাপে। তাহার পর তাহাদিগকে নাচাইতে শিখাইয়া, খ্রীষ্টানধর্ম্ম শান্তিময় স্থান ভূতের দৌরাত্মে পূর্ণ করিয়া তোলে। মানুষে—ভালমানুষে কি তাহা সহিতে পারে? কাযেই কলহ বাধে এবং শেষে, বিষয় বড়ই গুরুতর হয়। ইহাকেই কি ধর্ম্মপ্রচার—উন্নতিশীল (Prograssive) ধর্ম্মপ্রচার বলে? বলিতে হয় বল—আমরা কিন্তু এরূপ ধর্ম্মৈকতা, ধর্ম্মৈকাগ্রতা, এবং ধর্ম্মৈকপ্রাণতাকে 'আক্রমণশীল ধর্ম্মৈকতা' বলিতে বাধ্য হইব।

বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতিশীল (ম্যাক্সমূলরের মতে) ধর্ম্ম বটে, কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্তরূপ অত্যাচ্ছিত-ভাবে প্রচারিত হয় নাই। রাজার সাহায্যে

অনেক সময় প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু গায়ের জোরে নহে। যুক্তি যাহার ধর্ম্মের সোপান, তাহা কি কখন জোর করিয়া গিলান যাইতে পারে? তবে একথা স্বীকার করি, অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান বহুবুদ্ধিমানের নিকট যুক্তিতর্কে পরাজিত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিত ও তদ্ধর্ম্মের আশ্রয় লইত।

বলিয়া রাখা ভাল, 'আক্রমণশীল একতা' মাত্রই সর্ব্বদা সশস্ত্র সসজ্জ ও যুদ্ধার্থ সর্ব্বদাই সমুদ্যত; সকলেই তরবারির খাপ খুলিয়া বিপক্ষ মারিতে অগ্রসর। 'আক্রমণশীল ধর্ম্মৈকতা' সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

হিন্দুজাতির ধর্ম্মৈকতা রক্ষণশীল বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। হিন্দু কাহাকেও স্বধর্ম্ম ভজাইতে চাহে না এবং পরধর্ম্মেরও মিছামিছি গায়ে পড়িয়া নিন্দা করে না। হিন্দু আপনার লইয়া আপনি সন্তুষ্ট; কাহারও নিকটে জোর করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে যায় না এবং কাহারও দ্বারে ভিক্ষার্থী বা কিছুরই প্রত্যাশী নহে। হিন্দুর এই স্বধর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকাতে কেহ কেহ 'বোকামী' 'ভণ্ডামী' 'অক্ষমতা' 'শূন্য হৃদয়তা' ও 'আধ্যাত্মিক-হিন্দুয়ানী' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়া থাকেন। করুন এবং তাঁহারা বরাবর ঐরূপই করিতে থাকুন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। যাহা যথার্থ তাহার, কতকগুলি বিশেষণ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণীকৃত হয় না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টান হউক, বৌদ্ধ হউক, মুসলমান হউক, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, তাহাকেই আশ্রয়দান করিয়া থাকেন। যোগমার্গে বা ভক্তিমার্গে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীকেই না গ্রহণ করা যাইতে পারে? তবে কথা এই, হিন্দুজাতি কোন ম্লেচ্ছ যবনকে স্বসমাজভুক্ত করিবেন না। তাহার কারণ সমাজ বন্ধন পৃথিবীর ঘটনা পরম্পরা ও কার্য্যের গতি পদ্ধতি দেখিয়াই সম্পাদন করা হয়।

উপরে যে হিন্দু-ধর্ম্মৈকতা বলা গেল বাস্তবিক উহাকে 'একতা' পদ বাচ্য না করাই ভাল। কেননা হিন্দুধর্ম্মাচারী যোগ ও ভক্তি মার্গে বিচরণকারীরা, কাহারও নিকট হইতে ভীত বা উপদ্রুত হয়েন না। তাহার মুখ্য কারণ পৃথিবীতে যত বিবাদ বিসম্বাদ দেখা যায়, ইহার মূল কারণ পার্থিব বিষয় ব্যাপার লইয়া। তুমি রাজ্যই কাড়িয়া লও, আর, সহস্র উৎপীড়নই বা কর না কেন, যোগী বা ভক্ত সাধক সকলই তুচ্ছ করিয়া, কোন এক নিভৃত স্থানে আপনার সাধনের স্থান বাছিয়া লইয়া নিরাশঙ্কভাবে নিরুপদ্রবে এবং তোমার চক্ষে ধূলি দিয়া আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন। তবে যাহাকে 'হিন্দুধর্ম্মৈকতা' বলিয়া উল্লেখ করা গেল তাহা এই—

আমাদের গার্হস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ইত্যাদি কতকগুলি আশ্রমাচার এবং হোম স্বস্ত্যয়নাদি দেব পূজা ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আছে। ঐ সকল আচারানুষ্ঠান যখন বিনাশ পাইতে যায় অর্থাৎ যখন কাহারও উপদ্রবে আমাদের ঐ সকল ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত ঘটে, তখনই আমাদের ধর্ম্মরক্ষার্থে আমরা একতা অবলম্বন করি। কিন্তু তখনও অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে বৈরি প্রতিকূলতা [illegible] করি

কারণ যাহাতে বৈরিগণ অনর্থক ক্লেশভাগী না হন। যে জাতির যোদ্ধৃবর্গ, পলায়িত আশ্রিত, বিপন্ন, অস্ত্রশস্ত্রহীন অরিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও অনুকম্পা দেখাইয়া থাকে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য একতাবলম্বন কালে তাহাদিগের দ্বারা কি অনর্থক একটুকু ক্লেশাপাতের সম্ভব? কখনই নহে। যেটুকু অনিষ্ট না ঘটিলে নহে, যাহা ঘটিতে না দেওয়া একেবারে অসম্ভব--প্রকৃতি বিরুদ্ধ, সেই টুকুই ঘটিয়া থাকে।

এক দেশে বাস করার জন্য তদ্দেশবাসী বলিয়া পরস্পরের মধ্যে যে একতা জন্মে তাহাকে 'দেশৈকতা' বলিলেও চলে। এই দেশৈকেতাও আবার দুইরূপ—আক্রমণ-শীল ও রক্ষণশীল। যে দেশৈকতা-বশত এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয় লোক তুলনায় আপনাকে বৃহৎ, ক্ষমতাবান, ও গৌরবান্বিত বোধ করিয়া অপরের স্কন্ধে দারুণ ভার সমর্পণ করিতে যায় বা গায়ে পড়িয়া বিবাদ করে, তাহাকে 'আক্রমণশীল-দেশৈকতা' কহে। আর যে দেশৈকতা বশতঃ এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য একত্রিত হয়, তাহাকে 'রক্ষণশীলদেশৈকতা' বলে।

এংলো ইণ্ডিয়ানগণ আপনাদিগকে রাজার জাতি মনে করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক নেটিভ দিগকে—হতভাগ্য আমাদিগকে—ভ্রূভঙ্গি এবং নাসিকাকুঞ্চন পুরঃসর যে ঘৃণা ও নিন্দা-ব্যঞ্জক স্বরে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং কুক্কুর শৃগালবৎ ব্যবহার করেন 'আক্রমণশীল দেশৈকতা'র ইহাই একটী দৃষ্টান্ত স্থল।

আমরা মর্ম্মাহত হইয়া এবং সবুট পদদ্বারা বিতাড়িত হইয়া, যদি আমরা তাঁহাদের এই সাধুজন বিগর্হিত আচরণের নিবারণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টান্ত হইবে 'রক্ষণশীলদেশৈকতা'। কিন্তু বঙ্গদেশবাসী আমরা, আমরা অতি নিরীহ ভাল মানুষের জাতি বলিয়া সকল অত্যা-চারই নীরবে সহ্য করি অথবা অসহ্য হইলে বাড়ীতে গিয়া দু'এক জন বন্ধুবান্ধবের নিকট, সাহেবের অভদ্রতা কাহিনী বিবৃত করিয়া মনের যত দুঃখ যত তিমির সমস্তই বিনষ্ট করি।

অনেকে আমাদের এইরূপ আচরণে দোষ দেন এবং বলেন বাঙ্গালীরা অতি হীন ও অক্ষম জাতি। ইহারা পদদলিত হইলেও তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে না ও জানে না; এবং বাঙ্গালী কখনই একটা বড় জাতি বা বড় জাতি বিশেষের অংশও ছিল না—এখন ত নাই-ই!

ইহাঁদের অভিযোগ গুরুতর হইলেও উপেক্ষণীয়; কেন না (১ম) বড়জাতি থাকি-লেও পতন সম্ভব। (২য়) বাঙ্গালী জাতির উদর চিন্তা ও জরাদি কারণে চিন্তা করি-বার অবকাশাভাব। (৩য়) বাঙ্গালী অতি সহিষ্ণু জাতি। (৪র্থ) বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী, বাঙ্গালী রাজার জাতির এরূপ বিসদৃশ আচরণ অসম্ভব মনে করে না; বরং সম্ভবই মনে করিয়া থাকে। (৫ম) বাঙ্গালী অনেক দিন হইতে পরপদানত থাকিয়া রাজার

জাতি যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহারাও তাহাতেই নির্ম্মিত এ কথা ভুলিয়া গিয়াছে। (৬ষ্ঠ) মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে সমস্ত বাঙ্গালা এক জন নৃপতির অধীন না থাকা প্রযুক্ত বাঙ্গলী এক দেশবাসী বলিয়া পরস্পর পরিচিত নহে। (৭ম) মুসলমানের দারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনকার অত্যাচারকে, বাস্তবিক মর্ম্মভেদী অসহ্য হইলেও, গায়ে মাখিতে চেষ্টা করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশৈকতা, অন্য সর্ব্ব একতা অপেক্ষা অতিশয় আধুনিক। পূর্ব্বে জাতীয়একতা এবং তৎপরে ধর্ম্মৈকতা ছিল; পরে যখন বড় বড় রাজ্যস্থাপন হইল, রাজগণ এবং যোদ্ধৃগণ এবং কোন জাতি সাধারণ কোন স্থানে চিরস্থায়ী রূপে বসবাস করিতে লাগিল, যখন ভূমি, লোকের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হইল এবং লোকের ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল, নানাজাতি নানাদেশ হইতে আসিয়া সেই স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে লাগিল, যখন অনেক লোকসংখ্যা ও প্রজাসংখ্যার কারণ রাজাদিগের প্রতি প্রজাসাধারণের দলপতিত্ব ভাব লাঘব হইয়া গিয়া তাঁহাদিগেরই প্রদত্ত ভূখণ্ড তাঁহাদিগেরই অনুমতিক্রমে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছি এরূপ ভাব আসিয়া পড়িল, রাজাকে ভূস্বামী বলিয়া বোধ দূরীভূত হইতে লাগিল, সেই সময় হইতেই দেশীয় সাম্রাজ্যের (Territorial sovereignty) পত্তন হইল; এবং লোকে যখন সেই রাজ্য রক্ষার জন্য দেশের জন্য অমঙ্গল নাশ পুরঃসর মঙ্গল সাধনার্থে একতাবলম্বন করিতে শিখিল তখনই দেশীয় একতার সূত্রপাত হইল। ইংরেজেয় যে পার্লেমেণ্টকে এখন দেশৈকতার ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ অবলোকন করিতেছ, উহা পূর্ব্বে একটী জাতীয় বা একটী দলের মন্ত্রিসভা ছিল এবং তজ্জন্য জাতি বা দলের একতা সাধন করিত। এক্ষণে ইহার মেম্বর নির্ব্বাচনে স্পষ্টই দেখা যায়, যে, ইহা জাতীয় একতা সাধক হইতে দেশীয় একতা সাধক রূপে পরিণত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে ইহাও বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ জাতির বর্ত্তমান একতা কেবল দেশীয়একতা—ইহার জাতীয়একতা এক্ষণে বিদ্যমান নাই। অথবা বলিতে পারা যায় যে ইহার জাতীয় একতা ও দেশীয় একতা একই; কিন্তু তাহাও রূপকে বলিতে পারা যায়। আইরিস্ জাতির সহিত বিবাদ কালে ইংরেজ জাতির জাতীয়একতা কিছু কিছু দেখা যায় বটে কিন্তু, তাহার মধ্যেও কতটুকু ইংরেজের বা ইংলণ্ডবাসীর বিজেতৃ ভাব বশতঃ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আমাদের দেশৈকতা যে কত কালের তাহা বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মনুসংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া ইউরোপীয় দিগের কর্ত্তৃকও অনুমোদিত। ইহা হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধা॥
[মনুঃ ২।২২

এই শ্লোকের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে যে স্থানকে মনুতে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানে হিন্দুগণ অনেক দিন অবধি বসবাস করিয়া তথাকার চিরস্থায়ী অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়াছেন। এবং ঐ শ্লোকের পর শ্লোক—

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সজ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥
[মনু।২।২৩

দ্বারা স্থানমাহাত্ম্য স্বতঃই কীর্ত্তিত হইতেছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বে যে জাতীয় একতা আর্য্যদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবে ছিল, অন্ততঃ মনুর সময়ে তাহা দেশৈকতায় পরিণত হইয়াছে। (যদি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের মত জাতীয় একতার পর দেশৈকতা এবং হিন্দু আর্য্যেরা অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বসবাস করিবার পূর্ব্বে পারস্যের উত্তর কাস্পিয়ান সাগর বা ককেসস্ পর্ব্বতের নিকট কোন এক স্থানে বাস করিতেন স্বীকার করা যায়।)

ঐ শ্লোক দুটীকে মনুতে প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায় না; কেননা ঐ দুটি শ্লোক মনু হইতে তুলিয়া ফেলিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে না।

বিষ্ণুসংহিতাও সর্ব্বসম্মতি ক্রমে অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বর্ণাশ্রম, প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম্ম, দায়ভাগ, স্ত্রীপুং ধর্ম্ম, ইত্যাদি বিষয়ে পৃথিবী ভগবান বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করায় ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে আর্য্যহিন্দুগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতেই দেশের জন্য যত্নবান্ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দেখুন—

উদ্ধৃতাহং ত্বয়া দেব রসাতলতলঙ্গতা।
স্বেস্থানেস্থাপিতাবিষ্ণো লোকানাংহিতকাম্যয়া॥
[বিষ্ণু।১।৪৩

তত্রাধুনা মে দেবেশ কা ধৃতির্বৈ ভবিষ্যতি।
এব মুক্তস্তদা দেব্যা দেবো বচনমব্রবীৎ॥৪৪
বর্ণাশ্রমাচারতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ।
ত্বাং ধরে ধারয়িষ্যন্তি তেষাং ত্বদ্ভার
আহিতঃ॥ ৪৫

আবার মনুতে—

পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাংপূর্ব্ববিদো বিদুঃ
[মনু ৯।৪৪

আবার মনুতে দেখুন।—

রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুখং গৃহীতরাষ্ট্রোহি পার্থিবঃ সুখমেধতে।১১
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্॥১১৪
[মনু ৯; ১১৩।১১৪

ইহাতে দেশরক্ষার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে। যদি জাতিরক্ষা করিবার জন্যই লিখিত হইত তাহা হইলে রাষ্ট্ররক্ষার বিষয় মুখ্যরূপে বর্ণিত হইত না।

অবশ্য লোকরক্ষাও রাষ্ট্ররক্ষা সাধনের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে একথা বলা বাহুল্য। এখানে রাষ্ট্ররক্ষা মুখ্যরূপে উক্ত ও লোকরক্ষা গৌণভাবে শ্লোকের ভাবের অন্তর্নিহিত।

"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"
প্রজা ও রাজা উভয়ই ভূমির কর্ত্তা।

এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন

যে পূর্ব্বোক্তরূপ হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েই ভূমির মালিক ; রাজা একেলা নহেন। যেমন দেশীয় সাম্রাজ্য(Territorial sovereignty) বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রাজাই হউন আর প্রজাই হউন অথবা উভয়েই হউন, যিনিই কেন ভূম্যাধিকারী হউন না, তাহাতে দেশীয় একতার কিছুমাত্র অসম্ভাব্যতা নাই, বরঞ্চ যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়েই আপনাদিগকে ভূম্যধিকারী বলিয়া গণ্য করে, সেখানে দেশীয় একতা লাভের অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুযোগ ঘটিয়া থাকে। মনে কর Feudal systemএর সময়ে যেরূপ রায়তেরা জমিদারের আদেশ ক্রমে এবং তাঁহাদের যুক্ত্যনুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত। যদি রায়ত স্বেচ্ছায় ও রাজার প্রার্থনায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিবার রীতি থাকিত, তাহা হইলে কি দেশীয় একতার অপেক্ষাকৃত অধিক সুখময়ফল আশা করিতে পারা যাইত না।

অস্মদ্দেশীয় রাজন্যবর্গের ভূপতি আখ্যা অতীব প্রাচীন। ইহা ত হইবারই কথা। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিলব্ধ দ্রব্যের মালিক নির্ণীত হওয়া অতি প্রাচীন কালে ঘটাই সম্ভব এবং বহুপূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশগুলি বহুলোকাকীর্ণ, ধনপূর্ণ, শিল্প ও বাণিজ্যশালী।

কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে সমস্ত ভারত কখনও কোন হিন্দুরাজার অধীনতায় আইসে নাই এবং সেই হেতু ভারতবর্ষের দেশীয় একতা বড় প্রবল হইতে পারে নাই। যদি দেশীয়একতাকে ছিল বলিয়াই ধরিতে হয় তবে বড় জোর বলা যাইতে পারে যে, দেশীয়একতা ইংলণ্ড প্রভৃতির সহিত তুলনায় একটু সামান্য স্থান ব্যাপিয়া ছিল। কিন্তু একথাটী সর্ব্বসময় মনে রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের আয়তন ইংলণ্ড প্রভৃতির কতগুণ। এবং ইহাও যদি স্বীকার করা যায় যে কোন হিন্দুরাজার অধিক বিস্তৃত রাজ্য ছিল না, ভারতবর্ষ অনেক গুলি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল তথাপি একথা অবশ্য উড়াইয়া দিবার যো নাই যে রাজাদিগের মধ্যে দেশীয় একতা না থাকিলেও জাতীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতা প্রবল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু দেশীয় একতার যে বহুপ্রসার ছিল না একথা বলিতে পারি না। 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দের উল্লেখ করিলে তুমি বলিবে আর্য্যেরা যেস্থানে প্রথমে বসবাস করিতেন প্রাচীনকালে তৎভূখণ্ডকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলিত এবং এখনও সেই আখ্যা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিলে ওরূপ কথা বলিতে পারিবে না। ভরতরাজার নামানুসারে 'ভারতবর্ষ'আখ্যা হয়,অতএব একরূপ বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ কখনও কখনও এক এক ভূপতির অধীনে থাকাও সম্ভব। কিন্তু তুমি বলিতে পার যে ধারাবাহিকরূপে ভূপতিগণ ভারত সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য না করিলে ভারতীয় একতা বুঝিতে পারা যায় না। আরও তুমি তর্ক করিবে যে জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সকল একনামে অভিহিত হইলেও যেমন একভূপতির অধীনে থাকার বিষয় কোন

প্রমাণ পাওয়া যায় না তদ্রূপ ভারতের বিষয়ও একভূপতির স্বামীত্ব অপ্রামাণ্য। কিন্তু ভারতবর্ষের নামকরণ ভরতরাজার হইতে ও জম্বুদ্বীপের নামকরণ জম্বুবৃক্ষ হইতে ইহা ভাবিয়া দেখা পাঠকগণের উচিত।

সে যাহা হউক, দেশীয় একতা ভারতের মধ্যে অল্প পরিমাণ স্থান ব্যাপক ছিল, একথা স্বীকার করিলেও ভারতে জাতীয় একতা ও ধর্ম্মৈকতার যে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং বহুপ্রসার হইয়াছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতে ধর্ম্মবিষয়ক একতার বিষয় যিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহার অবিদিত নাই; ক্ষত্রিয়েরধর্ম্ম যুদ্ধ। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন হিন্দুদিগকে জাতীয় একতায় বদ্ধ করিবার কি উপায় ছিল। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ জাতীয় একতাবলে কতদিন ধরিয়া কত শত বিদেশীয়, বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীদিগের আক্রমণ স্রোত অবরোধ করিয়াছিল। সভ্যজাগতিক একতা বলিয়া যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক নহে। কেননা উক্ত বিধ একতা শব্দ কেবল অদ্যতন কতকগুলির সভ্যতাভিমানী জাতি, অপর জাতির সহিত ব্যবহারের সময়ে এমন কি তাহাদের উল্লেখ স্থলেও ব্যবহার করিয়া থাকে। এই একতা কেবল কথায় মাত্র কাযের বেলায় নাই—ইহাতে কেবল দাম্ভিকতা, ঘোর অভিমান, অপরের প্রতি অযথা নিন্দাবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আজকাল নানা কারণে বাঙ্গালী জাতির দিন দিন অধঃপতন হইতেছে। বাঙ্গালী অনেক কাল হইতে পরাধীন, বাঙ্গালী দারিদ্র্য দুঃখে ম্রিয়মাণ, দুর্ভিক্ষভারে প্রপীড়িত ও ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী নিজশিক্ষা পায় না, বিলাতী শিক্ষায় দিন দিন বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়িতেছে; বাঙ্গালী চিরজীবন খাটিয়া খুটিয়া উদরান্নের সংস্থাপনের জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। বাঙ্গালী জাতির অধ্যক্ষ নাই। অধ্যক্ষ পদবাচ্য হইবার লালসা যাঁহারা করেন তাঁহারা বাঙ্গালীর আহার, বিহার, শিক্ষা, সংস্কার, বল, নৈতিক জ্ঞান, আচার ব্যবহার, সংসারযাত্রা, ধর্ম্ম প্রত্যেক বিষয়েই ঘোরতর অনাস্থা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বিজাতিভাবে ডুবুডুবু হইয়া থাকেন,—কই, নেতৃত্ব লাভের জন্য তাঁহাদের সমবেদনা কই,—অণুমাত্র স্বার্থত্যাগই বা কই? স্বার্থত্যাগ ত দূরের কথা বাঙ্গালীজাতির সহিত সহানুভূতিই বা কই? আর যাঁহারা বাস্তবিক অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, কালের গুণে তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ বিরোধিকারণ সত্ত্বেও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এখনও অনেকস্থলে নানাবিধ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানের অনুগ্রহে দিন দিন বাঙ্গালীর শ্রীবৃদ্ধি হইলে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গালীজাতির একতা হীনতার কারণ বিষয়ে অনেকের অনুমান যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযথা অনুমান মাত্র; এবং অনুমানগুলি সত্য হইলেও

বাঙ্গালীজাতিকে ঘোরতর দোষী করা যাইতে পারে না। কেননা বাঙ্গালীজাতির যে একতা হীনতা অনেকে অনুমান করেন সেই একতাহীনতার মূল কারণগুলি বাঙ্গালীর অশুভাদৃষ্ট সঙ্ঘটিত, সেই সকল কারণগুলির অন্যথা করা বাঙ্গালীজাতির আয়ত্তের বহির্ভূত।

বাঙ্গালী ঘোর স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর, ভীরু, কাপুরুষ ও বিষম হিংস্রকস্বভাব এই জন্য ইহাদের একতা নাই—একথা সত্য নহে; হইতে পারে দিন দিন বাঙ্গালীর মধ্যে উক্ত প্রাকৃতিক লোকের বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু জাতিসাধারণ যে ঐ প্রকৃতির ইহা বলিতে পারা যায় না। কেননা তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতির ভূমণ্ডলে কোন সত্বাই থাকিতে পারিত না,—কোন জাতির দীর্ঘ জীবন কেবল তাহাদের সদ্‌গুণের উপর নির্ভর করে। যেমন শরীরের দীর্ঘস্থায়িত্ব শারীরিক যন্ত্রাদির সুসামঞ্জস্য বশতঃই ঘটিয়া থাকে; যন্ত্রাদির অসামঞ্জস্য ঘটিলে মুহূর্তকালও শরীর থাকিতে পারে না। তবে যদি বল বাঙ্গালীর জীবন নাই, কেবল শরীর খানি বৃটিশশাসনরূপ সংরক্ষণীদ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহা কেবল মিথ্যাতর্ক করিয়া আপনদিক্ বজায় রাখা মাত্র; প্রকৃত বাস্তবিক ঘটনা নহে। বাঙ্গালী আছে, অন্ততঃ মুমূর্ষু অবস্থায়ও আছে একথা সকলেরই স্বীকার্য্য।

মূর্খ ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া বাঙ্গালী একতা বিহীন একথাও অস্বীকার্য্য। কেননা মূর্খ ও কুসংস্কারের মধ্যেও একতার ভূয়িষ্ঠতা ভূরিপরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে পূর্ব্বজন্মে পাপ করিয়াছে তাহার ফল সে অবশ্যই ভুগিবে, এইজন্য একটা জাতির মধ্যে যে একতা থাকিতে পারে না একথা অপ্রামাণ্য। ব্যক্তিবিশেষের স্থলে পরিত্যাগ ধরিয়া লইলেও জাতীয় একতা থাকিতে পারে। আর যদি এরূপ ধরা যায় যে বাঙ্গালী জাতি মনে করে যে তাহারা পাপী তাহারা পাপের ফল ভোগ করিবে, তাহা হইলে জাতীয় একতার অসম্ভবতা কিছুই নহে, বরং, ধৈর্য্যশীলতা ও ঈশ্বর নির্ভরতাই দেখিতে পাওয়া যায়। আর প্রকৃত কথা এই—বাঙ্গালীরা, কেহ বিপদে পড়িলেই সে নিজের পাপের ফল ভোগ করিবে আমাদের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন এরূপ বিবেচনা করে না, যখন তাহাকে শত শত চেষ্টা যত্ন করিয়া বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে অসমর্থ হয় তখনই বলিয়া থাকে উহাতে নিজ অকিঞ্চনতা, ঈশ্বর নির্ভরতা, প্রকাশ পাইয়া মনের অশান্তির উদ্রেক হইতে পারে না।

বাঙ্গালীর পৌরাণিকধর্ম্ম বশত একতা নাই একথাতেও আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই নানা দল আছে। ক্ষুদ্র ইংলণ্ডেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে 'প্রটেষ্টাণ্ট' 'রোমান কাথলিক্' 'ব্যাপটিষ্ট,' 'স্যালভেসনিষ্ট.' 'ইউনিয়নিষ্ট' 'কোয়েকারিজিম্' প্রভৃতি কত কত দল ভেদই না আছে। আরও আমাদের প্রত্যেক পুরাণেই শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি আরাধ্য দেবতাদিগের সেবকদিগের মধ্যে পাছে বিরোধ হয় এই আশঙ্কায় যিনি শিব

তিনিই বিষ্ণু, তিনিই দুর্গা এইরূপ বর্ণনা আছে। ইহাতে শিববিষ্ণু ও দুর্গার প্রভেদ পরিহার হইয়াছে; তবে সাধকদিগের উপাসনার জন্য ভিন্ন ভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর নৈতিকজ্ঞান কম, এই বলিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে একতা নাই, একথাও স্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালীর হিতাহিতজ্ঞান নাই এইজন্য একতা নাই একথা যিনি বলেন তাঁহার দেখান চাই' তিনি কি প্রকার একতা কামনা করেন। তিনি যদি দেশীয় বা রাজনৈতিক একতার কামনা করেন, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বাঙ্গালীর হিতাহিতের জ্ঞান অতি প্রবল সেই হেতু তাঁহারা ঐরূপ একতা বন্ধনে বদ্ধ হইতে যায় না।

শ্রীশ্যামলাল লাহা,
এম, এ, বি, এল।

সান্ত্বনা।

কেন সখি হইলি এমন?
ছাড়ি বৃন্দাবন যবে প্রাণ প্রিয়তম,
মথুরায় করিল গমন,
কি জানি কেন যে তোর হইল শরম,
ফুটিল না একটি বচন।

মিছে আর ভেব না ভেব না,
প্রভুর চরণতলে রহিবি পড়িয়ে,
করেছিলি অগাধ বাসনা।
সে অসীম আশা তোর গেল যে ফুরায়ে,
মুখে তোর কথা স্ফুরিল না।

একদৃষ্টে মেলিয়ে নয়ন,
আকুল হৃদয়ে শুধু রহিলি দাঁড়ায়ে
দেখিতে পাইলি যতক্ষণ।
নিমেষে নয়ন তোর আসিল মুদিয়ে
তপ্ত অশ্রু হইল পতন।

কি বুঝাব তোমায় সজনী?
নাহি তব অবিদিত জান সমুদয়
বৃন্দাবন ছাড়া নন তিনি
তাঁহারি আমরা সবে তাঁরি এ হৃদয়—
আমাদের তিনি নীলমণি।

প্রবোধ।

জানি সখি তিনি হৃদয়ের ধন
তিনি হৃদয়ের স্বামী;
পরম পুরুষ, মানুষ রতন,
সবার অন্তরযামী।

বৃন্দাবন ছাড়া, নন তিনি কভু
শুধু চান ভালবাসা
পরম ঈশ্বর, তিনি মহাপ্রভু,
প্রাণের সর্ব্বস্ব আশা।

আমাদের ভাল বাসেন সতত,
আনন্দ করেন দান;
মায়া মরুভূমে, দুখশোক যত,
হয়ে যায় অবসান।

হইলে আমরা, তাঁর অনুগত,
অভাব কি থাকে আর;
আপনা আপনি, হইয়ে বিস্মৃত
সুখে ভাসি অনিবার।

পারিনে বুঝিতে, কেন যে আমার
হতেছে আকুল প্রাণ;
এস সখী সবে, মিলে একবার
করি তাঁর গুণগান।

শিক্ষা ও শিক্ষক।



আজ কাল দেশে শিক্ষার যেমন বাড়াবাড়ি; পুস্তক পত্রিকা, সংবাদ পত্রেরও তেমনি ছড়াছড়ি;—সুতরাং প্রবন্ধাদি লিখিবার হুড়াহুড়িও হইবেই—নহিলে সব দিক চলে না তা ভালই হউক আর মন্দই হউক আজ আমাদেরও আর্জ কালকার শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।

অবশ্য বলিয়া রাখা ভাল, আমরা আজ যাহা বলিতেছি, এ বিষয়ে আর কেহ যে ইহার পূর্ব্বে কিছু বলেন নাই, তাহা নহে তবে ভাল বিষয়ের আলোচনা এবং আন্দোলন যত হয় ততই ভাল।

শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই সেই সঙ্গে শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আমাদের মতে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবে না।

শিক্ষা বলিলেই এখানে বুঝিতে হইবে ইংরাজী শিক্ষা; কেননা ইহারই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ইংরাজী শিক্ষার প্রখর আলোক প্রভাবে আর সকল ভাষাই একরূপ মলিন হইয়া উঠিতেছে; বিলীন হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মধ্যে সংস্কৃতের আদর একবারে ছিল না বলিলেই হয়, তবে বড়ই সৌভাগ্য আজ কাল অধিকাংশ স্বধর্ম্ম নিরত সাহিত্যানুরাগী হিন্দু সন্তানের মতি গতি ফিরিয়াছে। মাতৃভাষা আজ তাঁহাদের কাছে একটু সমাদর পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে এরূপ ভাবান্তর বড় শুভ লক্ষণ। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এইরূপ মতি গতি যেন সকলেরই হয়। আবার যেন আমরা অতলে পতিত না হই।

কিন্তু এইরূপ বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা মাতৃভাষার এই সামান্য আলোচনাতেই সন্তুষ্ট। যে পরিমাণে ইংরাজি শিক্ষার প্রচার হইতেছে তাহার তুলনায় মাতৃভাষার আলোচনা যে অতি সামান্যই হইতেছে তাহা ব্যক্তি মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তাই বলি যত দিন না মাতৃভাষার চর্চ্চা অপর অপর ভাষাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে হইতেছে তত দিন আমাদের নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। বোধ হয় একথায় কেহ বিরক্ত হইবেন না বা অত্যুক্তি দোষ ধরিবেন না যে, যখন এ দেশে মাতৃভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল, তখন দেশও স্বাধীন ছিল, আর হিন্দুরাও বেশ নিষ্ঠা সম্পন্ন প্রবল জাতি ছিল। তার পর যে কারণেই হউক দেশে মাতৃভাষার আদর কমিয়া আসিল—হিন্দুরও জাতীয়তা ঘুচিতে আরম্ভ হইল দেশেও দ্রুতগতিতে উচ্ছন্ন যাইতে চলিল। আর কিছু দিন এই রূপ থাকিলে এত দিন বোধ হয় আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিত না। বড় পুণ্যে এখন সে অধোগতির স্রোত ফিরিয়াছে এই

সময় একবার প্রাণপণযত্নে চেষ্টা করা চাই। লৌহ গরম থাকিতে থাকিতে পিটিতে হইবে, নতুবা সব বিফল। বাঙ্গালীর সভা হইতেছে, বক্তৃতা চলিতেছে, বেশ কথা—তাহাতে আমাদের আপত্য নাই—কিন্তু মাতৃভাষা রূপদণ্ড আশ্রয় করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে যাওয়া চাই। মাতৃভাষার পুনরুদ্ধার হইলে আপনা হইতেই জাতীয় জীবন লাভ করিব, জগতে আবার হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতে পারিব। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মে যাহার আস্থা নাই, তাহাকে কি আখ্যা প্রদান করিব তাহা অভিধানে নাই। চীন, তাতার বা অসভ্য জাপানের কথা বলিতে চাহি না, কেননা নব্য সংস্কারক তাহাতে নাক সিঁট্‌কাইবেন, হো হো হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন; কথাটার তত বিশ্বাস হইবে না; কেননা এ সকল দেশ ইউরোপের চতুঃসীমার মধ্যে নয়। ভাল, বলি জার্ম্মাণি ত ইউরোপের মধ্যে; কিন্তু আজ যাঁহারা জার্ম্মাণির সম্পদ ও স্বাধীনতা দর্শনে মুগ্ধ এবং পুলকিত, তাঁহারই কি বলেন না যে এক মাত্র অতীত শিক্ষার ও শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়াই জার্ম্মাণি আজ এত উন্নত! ভারতেও তাহাই হইবে। অস্মদীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণের আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং দেশের শিল্পাদির উৎসাহ বর্দ্ধন ও দেশজাত দ্রব্যের প্রচলন আরম্ভ না করিলে আমরা ত কখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। জড়তা যদি না ঘুচিল, তবে চলিব ফিরিব কেমন করিয়া? কেহ না ঠেলিয়া দিলে ত নয় কিন্তু এরূপ পরের মুখ চাহিয়া কত দিন চলিবে? ফলই বা কি দাঁড়াইবে? এখন এত গুলি করিতে হইলে, দেশে ও সমাজে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে হইলে, কি করিতে হইবে? বড় বড় 'স্পিচে' কেবল কায হইবে না, প্রথমেই শিক্ষার সংশোধন আবশ্যক; আর শিক্ষার সংশোধনের কথা বলিতে হইলেই শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা অত্যাবশ্যক।

প্রবন্ধের সূচনা দেখিয়াই হয় ত অনেকে ভাবিবেন আমরা বুঝি ইংরাজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী—কিন্তু তাহা নহে। ইংরাজি শিক্ষা হউক তাহাতে আপত্য নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দুর যাহা কিছু প্রিয় ও পূজ্য তাহাও শিক্ষা দেওয়া হউক। শিক্ষা অবশ্য ইংরাজি শিখিলেও হইবে এবং মাতৃভাষাতেও হইবে। কিন্তু এ দুয়ে অনেক প্রভেদ আছে। শিক্ষা সম্বন্ধে যে কেহ দু'এক কথা বলিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন যে ইংরাজি শিক্ষা বহির্মুখ আর হিন্দুশিক্ষা অন্তর্মুখ। এই জন্য, আজ আমরা ইংরাজীর সহিত যাহাতে মাতৃভাষার ও হিন্দুর রীতি নীতি শিক্ষার বিশেষ কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় তজ্জন্য এত কথা বলিতেছি। কেবল পরেরটী শিখিলে চলিবে না। যাহা কিছু আপনার তাহা অগ্রে শিখিতে হইবে। আপনার যাহা কিছু তাহা যদি হাঁরাইলাম, তবে শিখিলাম কি? অথবা কি লইয়াই বা গৌরব করিব?

আবার এই ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার সহিত নীতি শিক্ষাও প্রগাঢ় সংশ্লিষ্ট। নৈতিক শিক্ষাই শিক্ষার প্রাণ। আজ কাল বালকদিগের নীতি শিক্ষার যে কতদূর আবশ্যক

তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। এক মাত্র প্রকৃত নীতি শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের বালকগণ দিনি দিন কত না কুসঙ্গে মিশিয়া, পাপ পঙ্কে ডুবিয়া, কত শত সংসারকে একেবারে নিঃস্বহায় ও শ্রীহীন করিতেছে। বলিতে কি, আমাদের যে কিছু ভবিষ্যত উন্নতি, তাহা এই এক মাত্র বালক গণের উপরই নির্ভর করিতেছে। তথাপি বালকগণ এরূপ মন্দ চরিত্র হইতেছে কেন? 'কেন' তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই এ বিষয়ে অত মনযোগী নহেন। আর তাঁহারা মনযোগী নহেন বলিয়াই আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বালক বৃন্দের আজ এই ভয়ানক পরিণাম! কিন্তু যত দিন না আমাদের বালকগণের নৈতিক শিক্ষার কোন রূপ উন্নতি বিধান করা হয়; তত দিন আমরা শত চেষ্টা করিয়া, শত শত মহাসভা স্থাপন করিয়াও কথনই দেশের অনুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। ব্যক্তিগত উন্নতি না হইলে কোন জাতি বা কোন দেশ কথন উন্নত হইতে পারে না। যে দারুণ সময় আসিয়াছে তাহাতে অন্যান্য আন্দোলনের পূর্ব্বে বালকগণের নীতি শিক্ষার উন্নতির জন্য আন্দোলন বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রধান কর্ত্তব্য। *

বালকগণের এই নীতি শিক্ষার অভাবের কারণ দেখাইতে হইলে, আমরা আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর একটু দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না। দেশে নীতি শিক্ষার উপযোগী কোন পুস্তকের অভাব আছে এমন আমরা বলিতে পারিনা; দেশে শিক্ষারও বিস্তার বই আর কমিতেছে না। তবে এমন হয় কেন? 'কেন' তাহা আমরা যত দূর সাধ্য ক্রমে বলিব। এক্ষণে সংক্ষেপে এই খানে বলিয়া রাখি, চরিত্র সংগঠন এবং চরিত্র সংশোধন বিদ্যা শিক্ষার এই প্রধান উদ্দেশ্য সাধন না হইলে, মনুষ্য কি ইহ জীবনে, কি পর জীবনে, কোন দিকেই অনুমাত্র উন্নতি লাভ লাভ করিতে পারে না। এমন ভাবে শিক্ষা দিবার অভাব আজ কাল প্রায় সকল বিদ্যালয়েই আছে। সে পক্ষে যাহার দোষ তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে দেখা যাউক এইরূপ নীতি শিক্ষার অভাবে বালকগণ কত দূর মন্দদশাপন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। পূর্ব্বে

---

* At any rate internal and external changes must go hand in hand, otherwise it would be like promoting mental interests, without attempting the least for bodily interests, for we best know that bodily and mental interests are inseparably bound together, and no part can rise or fall, without the rest taking a share. And as physical evil always infers moral evils such is the case with improvements external and internal. As long as an internal condition would remain diseased, so long, rest assured our external condition would never be cured.

SOCIAL SCIENCE.

বলিয়াছি এই নীতি শিক্ষার অভাবে বালকগণ পাপ পঙ্কে ডুবিয়া কত শত সংসারকে শ্রীহীন করিতেছে। আমাদের এ কথা কত দূর সত্য, যে কেহ আজ কালকার বালকগণের আচার ব্যবহার চাল চলন দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। আবার দুঃখের কথা বলিব কি, হিন্দুর রীতি নীতি ক্রিয়াকলাপ আচার ব্যবহার তাঁহাদের বিষম কুসংস্কার বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এক পাতা ইংরাজি উল্টাইতে না উল্টাতেই মাথা উল্টাইয়া যায়। পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম তাহাদের কাছে 'রিলিজন্ অফ্ সুপারষ্টিসান' (Religion of superstition) বলিয়া বিশ্বাস হয়। ভব্যতা বা শিষ্টাচার বোধ হয় শিক্ষার বহির্ভূত জ্ঞান করে। যে বিনয় গুণে ভূষিত থাকিলে বালক, কি আত্মীয়, কি পর, সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা আর তাহাদের মধ্যে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি কোন কোন বালক এত উদ্ধত প্রকৃতি যে তাহাদিগকে দেখিলে ভয় হয়। চাণক্য পণ্ডিতের 'স্থান ত্যাগেন' মনে পড়ে। তাহাদের সেই কিবা কুটিল চক্ষের উপর লরেন্স মেওর (Lowrence & mayo) সাসী খড় খড়ি শোভা পায়। মরি মরি মুখে গ্যাড্ ম্যাড্ কথার উপর আবার চুরট, বার্ডস্ আই, চারিদিকে কেবল ধুয়া। আমার বেশ মনে আছে এক দিন একটী বাবুকে বার্ডস্আই টানিতে দেখিয়া এক বৃদ্ধা আমায় জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁগা বাবা ও গুলো ওরা কি খায়?' আমি বলিলাম 'বার্ডস্ আই'। বৃদ্ধা একটু চমকিয়া বলিল 'কি বাবা বাসি আকার ছাই! শাঠ্ শাঠ্ তা কেন হবে?' আমি হাসিয়া বলিলাম 'হ্যাঁ তাই।' বুড়ি বিষন্নমুখে বলিল 'কে জানে বাপু শেষে এরা সব বাসি আকার ছাই খেতে আরম্ভ কল্লে গা!' এই বলিয়া বুড়ি চলিয়া গেল।

তার পর, গুরুজন দেখিলে যে বেশ নম্র ভাবে কথা বার্ত্তা কওয়া এবং ভদ্র ব্যবহার ও শিষ্টাচার তাহাদের কুষ্ঠিতে একেবারে লেখা নাই। তা না থাকুক সেও বরং ভাল; তবে 'ওল্ড ফুল' বলাটা যেন কেমন কেমন। বাবু চিঠি লিখিবেন তাও সেই এক বাঁধা 'মাইডিয়ার' গৎ। কাহাকে কি পাঠ লিখিতে হয় জিজ্ঞাসা করিলেই অজ্ঞান—তাড়াতাড়ি কুকসের লেটার রাইটারের কথা ভাবিবেন। পোড়া শিশুবোধকের কথা তাহার কল্পনাতেও থাকিবে না। বংশের আদি পুরুষের নাম কি, কি গোত্র, কোন মেল, কোথাকার সমাজ, কি ভাব, জিজ্ঞাসা করিলেই চারিদিক আঁধার!! অথচ ফিজি জুজুতে, হা হা হিহিতে, কি কি জন্তু জন্মায়, সে টুকু বেশ আদর করিয়া মনে রাখা হয়। হিন্দুর ধারণা পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম—কোথাও যাত্রা কালে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গমন করিলে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এ ধারণা তাহাদের নিকট বিকট কালকূট বলিয়া বোধ হয়। আহা! এইরূপ এক একটী নব পাষণ্ডের, পিতা মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলে অন্তরাত্মা একেবারে শুকাইয়া যায়। সুশিক্ষার ফল আর কতদূর দাঁড়াইবে!!

যিনি বিদ্যা দাতা তিনি অবশ্য পিতার ন্যায় পূজনীয়। তাই সে কালে এই গুরু শিষ্যের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ ছিল। গুরু, শিষ্যকে পুত্র সম এমন কি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; শিষ্যও গুরুকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু এখন আর বড় দেখিতে বা শুনিতে পাই না। এখন পিতাপুত্রেও যেমন সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, গুরু শিষ্যেও সম্বন্ধ তেমনি হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এরূপ কেন হইতেছে?

'কেন হইতেছে' তাহার কারণ ত বলিতে বাকী নাই। বিদ্যালয় সমূহে যে রূপ নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ কতকটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এটা অসম্ভব হইলেও অত্যাবশ্যক এবং যেটা অত্যাবশ্যক, অসম্ভব হইলেও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা সেটা সম্ভবপর করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে ত আর প্রকৃতিগত কোন অসম্ভাবনা নাই। অবশ্য অনেক বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা পূর্ণ গ্রন্থ পঠনের অভাব নাই; কিন্তু হইলে কি হইবে? যেরূপ নীতি শিক্ষা দিলে বালকের মতি গতি ফিরিবার সম্ভাবনা অর্থাৎ স্বদেশ এবং স্বধর্ম্মের উপর আস্থা হয়, এমন নীতি শিক্ষার বিলক্ষণ অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়--বোধ হয় কেন নিশ্চয়। পশ্চাত্য ধারণায় যে রীতি নীতি গুলি ভাল বলিয়া বোধ হইবে, আমাদের দেশের বালকের পক্ষে তাহা ঠিক্ উপযোগী না হইতে পারে। আবার যে গুলি উপযোগী হইবার সম্ভাবনা, সে গুলি যেরূপ করিয়া শিক্ষা দিলে বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম হয়, ঠিক্ সেইরূপ করিয়া শিক্ষা দেওয়া কখনই হয় না। শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এতদুভয়ে অনেক প্রভেদ। শিক্ষা দিবার উপায় একরূপ নয়। কেন বলিতেছি? মাঠে ধান হয়, কিন্তু কোন মাঠে কি রূপ ধান হইতে পারে সেটা অগ্রে দেখিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে কি রূপ করিয়া 'পাট' করিলে কত পরিমাণে সার মিশাইয়া কত খানি মাটী খনন করিলে তবে সেই খানে আবার সেইরূপ ধান হইতে পারে। নতুবা যে সে স্থানে যে সে ধান যে সে রূপ করিয়া বুনিলে চলিবে না। বীজ বপন কর ক্ষতি নাই, চারাও দু'একটী হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ফল তেমন ফলিবে না। আবার দেখ দুই ব্যক্তির রোগ এক রকমের হইতে পারে বটে, কিন্তু তা বলিয়া উভয়েই যে এক ঔষধ একরূপ চিকিৎসায় ও একই সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইবে তাহার ত কিছু নিশ্চয় নাই। রোগের কারণ দেখিতে হইবে, উভয় রোগীর শরীরের অবস্থা লক্ষণাদি বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে, তবে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তখন রোগের উপশম হইবে। এইরূপ করিয়া বালকের প্রকৃতি অগ্রে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বুঝিতে হইবে; তবে ত সেই রূপ উপদেশ দিতে হইবে। তা নয় 'লাগে তুক না লাগে তাক্' করিয়া যা ইচ্ছা তাই উপদেশ দিলে কি হইবে? মন্দ স্রোতে বালির বাঁধ টিকিতে পারে কিন্তু খরস্রোত রোধ করিবার শক্তি তাহার কোথায়? হস্ত দ্বারা একটী সামান্য কণ্টক তরু তুলিতে

পারা যায় কিন্তু প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিত করিতে হইলে, কত বল, কত বুদ্ধি, এবং কত রকম আয়োজনের আবশ্যক। তেমনি দেখিতে হইবে বালকের হৃদয়, কণ্টক তরুতে আকীর্ণ, কি মহা মহীরুহে সমাচ্ছন্ন।

এখন ভালরূপ নীতি শিক্ষা বালকদিগের কেন হয় না? এ দোষ কেবল যে শিক্ষক দিগেরই তাহা নহে। বালক দিগেরও তত দোষ দেওয়া যাইতে পারে না; কেননা তাহাদের কোমল প্রকৃতিকে যে দিকে লইয়া যাইবে সেই দিকেই যাইবে। কেবল তাহার উপর অভিভাবকগণের খর-দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথম কথা, পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য সন্তানের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা। অনেক পিতা মাতা সময়াভাবে পুত্রের উপর তেমন নজর রাখিতে পারেন না। স্কুল এবং শিক্ষক গণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভ্রম। সকল সময়ে বালকেরা ত বিদ্যালয়ে থাকে না। তার পর বিদ্যালয়ে আজ কাল যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা কত দূর সমীচীন বলিতে পারি না। বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক যাহা প্রচলিত আছে, তাহা হিন্দু বালক দিগের তত উপযোগী নহে। হিন্দু রীতি নীতির সহিত এক প্রকার বিপরীত বলিলেও হয়। তবে ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে হিন্দুবালকের যা কিছু শিখিবার আছে তাহাও আবার সময়াভাবে ভাল করিয়া হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয় না। শিক্ষকেই বা কি করিবেন? বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিয়ম, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণের নিয়ম, এই সময়ের মধ্যে এতগুলি পুস্তকের এত গুলি পৃষ্ঠা অবশ্য পড়িতে হইবে, নহিলে চলিবে না—পরীক্ষায় গোল পড়িবে। সুতরাং সেই অনুসারে শিক্ষক গণের দৈনিক কার্য্য করণ তালিকা প্রস্তুত হইল। শিক্ষকও কেবল তোতা পাখীর মত বালকের পাঠ কণ্ঠস্থ করাইয়া দৈনিক কার্য্য সমাপন যথেষ্ট জ্ঞান করিলেন। তাঁহারও আর অধিক শিখাইতে সময় হইল না। সুকুমার মতি বালক গণেরও তেমন নীতি শিক্ষা হইল না। এই খানেই মহাগোল বাধিল। এখন এ দোষ যায় কিসে? আমরা বলি ইংরাজি শিক্ষা হউক কিন্তু সেই সঙ্গে যাহাতে বালক গণ হিন্দুরীতিনীতি, আর্য্যগণ প্রকশিত ধর্ম্ম ও পথ অবলম্বন করিয়া বেশ ধার্ম্মিক ও সৎ-ক্রিয়াবান হয়, এইরূপ গ্রন্থ সকল অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নিয়োজিত করিলে কি চলিতে পারে না? না পারিবে কেন? এইরূপ করিতে হইবে, নতুবা আর রক্ষা নাই।

এইবার শিক্ষক মহাশয়গণের সম্বন্ধে আর দু'চারিটী কথা বলিব। অবশ্য সকল শিক্ষকের কথা আমরা বলিতেছি না তবে অনেক শিক্ষক আজ কাল শিক্ষাদানে তাদৃশ মনোযোগী বা অনুরাগী নহেন। যেমন তেমন করিয়া দিনটা কাটাইয়া মাসটা পূর্ণ করি করিতে পারিলেই হইল। তাঁহারা বালকের জন্য আপনাদিগকে তত দায়ী মনে করেন না। তাঁহারা ভাবেন বালককে কেবল অর্থ এবং দু একটী উপায় বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু তাহাতে হয় না, হইবার নয়।

এমন দিন ছিল যখন কেবল পাঠ কেন শিষ্যের পাপ পুণ্যের জন্যও গুরু ঈশ্বরের নিকট আপনাকে দায়ী মনে করিতেন। বড়ই দুর্ভাগ্য এখন আর সে পবিত্র ভাব নাই! ইহার অপেক্ষা আর কি আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এ জগতে বিশেষ এ দুর্দ্দিনে শিক্ষকতার অপেক্ষা দায়িত্বের কার্য্য আর কিছুই নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ, একমাত্র আশাস্থল বালকগণের উন্নতি তাঁহাদেরই হস্তে।

কিন্তু কয় জন শিক্ষক এ দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করেন? যাঁহারা করেন না তাঁহারা যে এ দায়িত্ব অবগত নহেন তাহা নহে। তবে তাঁহারা ততদূর যত্ন করিয়া কার্য্য করিতে চাহেন না। সে সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব,কত দূর সঙ্গত হইবে জানি না। শিক্ষক গণও যে মনে না করেন যে আমি তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় পাশ কোর্স হইয়া 'বি এর' দল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অল্প মাত্র বেতন পাইলেই তাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হন। এটা কিছু কম সুবিধার কথা নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই সকল বি, এ, শিক্ষকের দ্বারায় তেমন কায হয় না। অবশ্য অল্প বেতনভোগী বি, এ, উপাধিধারী শিক্ষকের দ্বারায় এই যে কলিকাতার গলিতে গলিতে যে সকল স্কুল থাকে, তাহাতে ইঁহাদের বিশেষ উপকার হয়; কেননা এই সকল স্কুলের মধ্যে অনেক স্কুল যেমন দু' পাঁচ মাসস্থায়ী তেমনই উপরোক্ত শ্রেণীর অনেক শিক্ষকও স্বল্পকাল কার্য্য করিয়াই অন্য কোন রূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তার পর আজকাল কার অধিকাংশ বি, এ, উপাধিধারী শিক্ষক বি, এল দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাহাদিগকে পড়িতেও হইবে, অথচ কিছু উপায় করিয়া সংসার খরচ, অন্ততঃ নিজের পুস্তক প্রভৃতির খরচ, চালাইতে হইবে। তবেই হইল দুই দিক রাখিতে হইবে। তার পর যেই বি, এল, পাশ করিলেন, অমনি শিক্ষকতা ছাড়িয়া আদালতে বাহির হইলেন। যে কয় দিন তিনি স্কুলের কার্য্য করিলেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের পাঠ ও পরীক্ষার গোলোযোগে অতিবাহিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে যাঁহার নিজের চিন্তাতেই এত সময় অতিবাহিত হইল, তাঁহার দ্বারা শিক্ষকতা কতদূর ভাল করিয়া চলিতে পারে! তিনি জানেন, তিনি চিরদিন শিক্ষকতা করিবেন না; দুদিনের জন্য কেবল স্বার্থ-সাধন বা নিজের কার্য্য উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন মাত্র। তবে তাহার অত পরিশ্রম যত্ন করিয়া কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? এ ত জানা কথা,যে দুদিনের জন্য যে কায তাহাতে স্বভাবতই তত যত্ন হয় না। যদি সেই কার্য্য চিরদিন করিতে হইবে জানিতেন, তাহা হইলে কাযে কাযেই তখন তাঁহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভবিষ্যৎ চাহিয়া,প্রাণপণ যত্ন করিয়া,কার্য্য করিতে হইত; নহিলে উন্নতির আশা নাই। কিন্তু তিনি ত দুদিনের জন্য থাকিতে আসিয়াছেন তবে আর তাঁহার অত যত্ন কিসে হইবে?

তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে এই সকল কারণ কি কুফল প্রসব করিতেছে। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে এই সকল কারণে ভাল শিক্ষক আর বড় মিলিতেছেনা। যিনি যতই লেখাপড়া শিখুন, একেবারে কেহ ভাল শিক্ষক হইতে পারেন না। শিক্ষা বিভাগে অনেক দিন থাকা চাই—তবে ত। কিন্তু এই সকল বি, এল, প্রাণ লোলুপ শিক্ষকগণের নিকট সে আশা দুরাশামাত্র। আর ইহাঁরা থাকিতে ভাল মিলিবার যো নাই। কেননা, প্রথমতঃ ইহাঁরা যাহা কিছু পাইলেই কার্য্যে ব্রতী হন সাত পাঁচ ভাবেন না—কিন্তু যিনি চিরদিন কার্য্য করিবেন তাঁহাকে অনেক ভাবিয়া তবে স্বীকৃত হইতে হইবে। তবেই এখন স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণকে দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। আর সেই সঙ্গে শিক্ষকগণের বেতন সম্বন্ধেও একটু বিবেচনা করিতে হইবে। নতুবা এ সকল বিষয়ের সংস্কার হওয়া সুকঠিন। অর্থের মায়ায় ভুলিয়া যে সে লোক নিযুক্ত করিলে চলিবে না। যাঁহারা শিক্ষা বিভাগে চিরদিন থাকিতে চাহেন এমন লোক বাছিয়াই নিযুক্ত করিতে হইবে। বেতন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা বিভাগে বেতন অল্প বলিয়াই আবার অনেক ভাল লোক এ বিভাগে থাকিতে চাহেন না। থাকিতে আসিয়াও অধিক দিন থাকিতে পারেন না। বাধ্য হইয়াই অল্প দিনের মধ্যে অন্য চেষ্টা দেখিতে হয়।

আরও একটি কথা, কোন শিক্ষক নিযুক্ত করিবার সময় তাঁহার চরিত্র বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা যাহার চরিত্র ভাল নয় তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য হইবে? শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ হওয়া চাই। তাঁহার চরিত্র কোন রূপ দোষ থাকিলে তাঁহার দ্বারা বালকদিগের চরিত্রে একেবারেই গঠিত হইতে পারে না। নৈতিক বলে যে ব্যক্তি বলীয়ান নয়, নীতি শিক্ষা সে ব্যক্তি কেমন করিয়া দিবে? চরিত্র সংগঠনের উপায় এবং উপকার সে কেমন করিয়া জানিবে?

তাই বুঝি বালকদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। সকল বিষয়ে উত্তম একেবারে না মিলিতে পারে কিন্তু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিলিতে পারে। এই সচ্চরিত্র ব্যক্তি আবার কিছু দিন শিক্ষা বিভাগে থাকিলে সকল দিকেই বেশ ভাল একজন শিক্ষক হইতে পারেন। এই সকল ব্যক্তি আবার না অন্য কোন বিভাগে প্রবেশ করেন, সে বিষয়ে একটু বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। কেননা একজন শিক্ষা বিভাগে অনেক দিন থাকিয়া শিক্ষকতার বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন; কিন্তু হয় ত অধিক বেতন পাইবার আশায় তিনি শেষে কোন আফিসে প্রবেশ করিলেন। হইতে পারে আফিসে প্রবেশ করিয়া তিনি আফিসের কার্য্য বেশ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে থাকিলে তিনি সাধারণের যে উপকার টুকু করিতে পারিতেন, সাধারণকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। পুরাতন শিক্ষকের পরিবর্ত্তে নূতন শিক্ষকের কাছে পাঠাভ্যাস করিতে বালকদিগেরও বিশেষ কেমন মনের মধ্যে একটু ভাবান্তর হইল।

অতএব এক্ষণে এই সকল বিবেচনা করিয়া শিক্ষা বিভাগে যে কিছু সংস্কার করিবার আবশ্যক বোধ হয়, তাহার যত শীঘ্র অনুষ্ঠান হয়, ততই দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

ত্রিধারা।

বৃষ্টি।

হয়েছে নীরস ধরাতল,
সকলে মিলিয়া যাই চল
ধরাতল করিতে প্লাবন ;
তপনের বেড়েছে প্রতাপ,
সকলে করিছে মনস্তাপ,
কিসের বিলম্ব অকারণ ?
প্রবল যে তপন কিরণ
অর্দ্ধপথে হারাবে জীবন,
কোর না গমন একা কেহ ;
দলে দলে মিলিয়া সকলে,
যাই চল মহা কুতুহলে
ভাসাইব ভূধরের দেহ।
কি আর করিবে দিবাকর,
ঢাকিব তাহারি কলেবর
দেখিব তাহার কত বল ;
ভীম রবে করিব গর্জ্জন,
চমকি' উঠিবে ত্রিভুবন,
বারিধারা ঢালিব কেবল।
সত্য বটে দুর্ব্বল আমরা
ভাসাইতে পারি বসুন্ধরা,
একতাই আমাদের বল।

স্রোতস্বতী।

শিখরীর তুমি হাসি সুমধুর,
প্রভাতের তুমি রজত মুকুর,
তুমি কলকণ্ঠ বিহগের বীণা,
শ্যাম প্রান্তরের শোভা অতুলনা
ফুল্ল ফুলময়ী বসন্ত নবীনা
নাচিছে তোমার উরস 'পরে ;
যেতেছে বহিয়া ধরণীর কোলে
রজত কাঞ্চন রাখি দুই কূলে,
পথহারা স্বচ্ছ তোমার লহরী
কিবা সমুজ্জ্বল মম মনোহারী,
সিকতা সজ্জিত হেমরেণু যত
রাখালের মন মোহিত করে।

উজল স্ফটিক সদৃশ বিমল
তব অনশ্বর উরস কমল,
যা কিছু রেখেছ করিয়া গোপন
নিটোল উপল খণ্ড সুচিকণ
বিস্মিত নয়ন করি দরশন,
ভাসিছে তোমার তরঙ্গ ধীরে ;

সরলতাময় মধুর সেদিন
হায় কত দিন হয়েছে বিলীন
তাই জনস্থান করি পরিহার
বুঝি এ বিজনে বসতি তোমার
সরল অন্তরে কল কল স্বরে
মিশি প্রেমভরে নির্ঝর নীরে।

প্রবাহ।

হে স্রোত কর্দ্দমময় !
মলিন সম তুমি
কোথা যাও দ্রুতগতি ?
"আমি যে জীবন ঊর্ম্মি,
বেলা পঙ্কে এ দেহ পঙ্কিল ;
কালকূল পঙ্ক হতে
মুক্ত করিবারে দেহ,
যুঝিয়া যুঝিয়া তাই
ক্ষীণ স্রোতস্বিনী সহ,
ধাইতেছি জলধি সলিল।"

শ্রীরসময় লাহা।

বর্ষরাজকরে সুবোধিনী সম্প্রদান।

চলেছ বর্ষরাজ! আসিবেনা আর, অধমের এক নিবেদন—
পালিলাম এতদিন "সুবোধিনী" ধনে, প্রাণ সম করিয়ে যতন।
কোলে পিঠে, বুকে বুকে রাখি এতদিন, হয়েছে যে স্নেহের সঞ্চার,
কেমনে সে স্নেহপাশ, কঠোর কর্ত্তনে, বিদায়িব এ ধনে আমার।
ভাবি তাই নিরবধি আকুল অন্তর, কার করে করি সম্প্রদান,
কে জানে যতন, বল কেবা দিবে তায়, ভালবাসা অমিয় সমান?
কোথা গেলি কালিদাস! হৃদয়েরধন, আয় ভাই! আয় একবার,
তুই নাই! বোধ হয় নিশার স্বপন, তুই বিনে সকলি আঁধার!!
মা আমার অভিমানে সদা নম্রমুখী, সহেনাক কারো কুবচন;
তাহাতে জনক শোকে পাগলিনী প্রায়, কে করিবে তা'র বিনোদন?
তাই হে বরষরাজ! ভেবেছি অন্তরে, ভয়বাসি বলিতে তোমায়,
বিবাহ করহ তুমি সুবোধিনী ধনে, লয়ে যাও আপন আলয়।
তব গেহে চির সুখে রবে মা আমার, ভুলে যাবে শোক তাপ যত;
আমি হেথা বরষিব নয়ন আসার, শোক ভরে সদা অবিরত।
লভিবে আশ্রয় মাতা মহতের ঘরে, হয় বটে আনন্দ অপার;
দারুণ বিরহজ্বালা স্মৃতিপথে আসি, দহিতেছে হৃদয় আগার।
যৌবনেতে সম্প্রতি তব অনন্ত কুমার! লহ তবে দুহিতা রতন;
নাহি পিতা আমি হই স্থানীয় তাহার, তব করে করি সমর্পণ।

অহো! কি আবেগ ভরে পূরিল হৃদয়, আয় মাগো! আয় সুবোধিনি!
আজি তোরে নিজ হাতে সাজাইব আমি, আয় মাগো! আনন্দ দায়িনি!
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু সাজিবে গো ভাল, ফুলসিঁথি ফুলকণ্ঠহার,
ফুলমালা, ফুল বাজু, ফুলের কুণ্ডল নাহি মোর স্বর্ণ অলঙ্কার।
বিমল কৌষেয় বাস পরাইব আজি, ও বদন চর্চ্চিব চন্দনে;
নয়নে কজ্জল রেখা, কুন্তলে কুসুম, অলক্তক ও রাঙা চরণে।
আমি যে দরিদ্র তব পিতার সোদর, জাননা কি জননি! আমার?
চলি গেল পিতা তোর, অনন্ত নিলয় আমা সবে দিয়ে গুরুভার।

আপনি যে বীণাপাণি শিখাইলা তোরে, সুধা মাখা কাব্যের রচন ;
অপার সাহিত্যক্ষেত্রে সুকুমার করে, করিবারে সলিল সেচন।
প্রকৃতি আপন করে পালিলা তোমায়, কত খেলা দিলা সযতনে ;
আনন্দে কাটিয়ে যেতো দিবস রজনী, নাইকি মা! নাই কিছু মনে ?
পড়ে কি স্মরণ পথে সে সুখের দিন, পশি যবে কাব্যের কানন,
উঁচু ডাল নোয়াইয়ে, সুকোমল করে, করিতিস্ কুসুম চয়ন ?
নাচিয়ে নাচিয়ে তুই ফিরিতিস্ ঘরে, ফুল ভারে ভরিয়ে বসন ;
চাপিয়ে দশনকুন্দে অধরপল্লব, হাসিতিস্ ছড়ায়ে কিরণ।
তোর সেই আধ আধ অমিয় বচন, শ্রুতিমূলে কোকিল ঝঙ্কার,
কেমনে ভুলিব তোরে ? ভুলিবার ধন, তুই কি গো জননি! আমার ?

এসো মা প্রকৃতি! আজি এয়ো হয়ে তুমি সঙ্গেতে লইয়ে নিজ গণ,
বহুক আনন্দ নদী উল্লাসে অপার, হোক্ সবে আনন্দে মগন।
সমীরণ! ফুল শাখা হেলাও যতনে সুবোধিনী শুভ পরিণয় ;
পিক বধূ! হুলাহুলি দেহ অবিরাম, তরু! কর কুসুম সঞ্চয়।
চন্দ্রমা! কৌমুদী রাশি কর বিতরণ, আলো কর বিবাহ মণ্ডপ ;
উজ্জ্বলহীরককান্তিনক্ষত্রখচিত নীলনভঃ! ধর চন্দ্রাতপ।
নীলাম্বু! কম্বুর নাদে কাঁপাও মেদিনী, দিক্‌বালা! কর পরিক্রম ;
শূন্য এ হৃদয় মম আঁখি অশ্রুময়—পদে পদে ঘটিছে বিভ্রম।
সকলে সহায় হও শুভ পরিণয়ে, করে করে করি সমর্পণ ;
হৃদয় পিঞ্জর খুলি জনমের মত, দেহ রেখে দিব প্রাণধন।
লীলাময়ি! বাল্য লীলা হলো অবসান, পতি পদে লহ গো আশ্রয়,
কেমনে বিদায় দিব আজিগো তোমায়, পাষাণেতে বাঁধিয়ে হৃদয় ?
আয় বাছা! মাথা পেতে নে গো দূর্ব্বাধান করে নে মা! তাম্বুল সন্দেশ ;
একবার ও মুখানি করিব চুম্বন, এই বুঝি—বুঝি এই শেষ !!
এস এস ভ্রাতৃগণ ধরহে আমায়, তমোময় দেখি যে সকলি ;
ছিঁড়িয়ে মমতা পাশ বিদায়িব আজি, আমাদের স্নেহের পুতলি।
দেহেতে নাহিক বল, নয়নেতে জ্যোতিঃ, টল টল দুর্ব্বল চরণ ;
ধর ধর রসময়! ধর ভোলানাথ! ওহে শ্যাম! ও রাধাজীবন!
একবার মুখতুলে চা আমার পানে, দেখে নে মা! "সাধের নিলয়" ;
করুক্ অমিয় আঁখি অমিয় বর্ষণ, অমঙ্গল যাক্ নিজালয়।

অলক্তক রাগ মাখা পদচিহ্ন, তোর পরিয়ে রহিল গৃহতল;
এই কি দেখিয়ে আমি বাঁধিব এ বুক, নিবারিব নয়নের জল?
তোর এই খেলা ঘর তোর এ রচনা, দেখে দেখে দহিবে অন্তর;
আমরা এ শূন্য ঘরে শূন্য হৃদি লয়ে কেমনে রহিব অতঃপর?
আর কি হবেনা দেখা জনমের মত, বল মাগো বল সুবোধিনি!
ভুলে গিয়ে জন্মশোধ জনক আলয়, হবি কি গো পতি সোহাগিনী?
আয় বাছা! আয় তবে, করি আশীর্ব্বাদ, প্রাণ ভরে করি আলিঙ্গন;
একবার ভাল করে নেহারিব এবে, সুধামাখা ও চাঁদ বদন।
শিরোদেশে শিবদুর্গা হউন সহায়, বক্ষদেশে দেব নারায়ণ,
দুই পার্শ্বে রামকৃষ্ণ করুন বিরাজ, পৃষ্ঠদেশে পবন নন্দন।
সকলে রাখহ মায়ে দিয়ে পদছায়া, মা আমার প্রসূন-প্রতিমা,
শুকা'বে আতপ তাপে বদন কমল, নয়নেতে পড়িবে কালিমা।
সকলে রাখহ মায়ে করি কৃপাদান, মা আমার ননীর পুতুল;
আর না দেখিতে পাব ও চারু বয়ান, তাই ভেবে হয়েছি আকুল।
নবদূর্ব্বাস্তরণ বিছাও মেদিনি! কিশলয়! ধর ছত্রশিরে,
প্রশস্ত মুহূর্ত্ত এই বিদায় কারণ, আয় বাছা আয় ধীরে ধীরে।
তিলেক বিচ্ছেদ তব বরষ সমান, কেমনে মা! করিব যাপন?
কেমনে ধরিবে প্রাণ আশাপথচেয়ে, এ অক্ষয় অক্ষয় জীবন?
কোথা হে **পরমানন্দ**! এস একবার, একবার দেখ দেখ চেয়ে।
কাটায়ে সকল মায়া কোথা যায় চলি, সুবোধিনী আদরের মেয়ে।
সকলে দুন্দুভিনাদ কর একবার, কর সবে কুসুম বর্ষণ;
চলেছে কমলা আজি পতির আলয়, সবে হও হরষে মগন।
চলিলি চলিলি মা গো! করি আশীর্ব্বাদ—তব যশ ঘোষিবে সংসার,
লভহ অনন্ত কোলে অনন্ত জীবন, চির সুখে থাক মা আমার।
বহুক মঙ্গল বায়ু চৌদিকে তোমার, হোক্ যত অরিষ্ট নিপাত,
হেসে খেলে চিরদিন হউক যাপন, ঘুচে যাক্ বিরাগব্যাঘাত।
পতিসনে এক প্রাণে করহ বিরাজ, শঙ্করের যেমন পার্ব্বতী;
সিন্দূর শঙ্খক পর চিরদিন তরে, রাখ বাছা আপন আয়তি।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় শ্রীবিলাভ।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ক্রমে দিন দিনই উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি। কারণ আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই যে আমাদের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী এবং তদভাবেই যে দেশের শোচনীয় অবস্থা হইতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও তর্কদ্বারা বুঝাইতে হইবে না। অতএব ইংরাজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনেও যে সকল মহাত্মা নিজব্যয়ে ও বহুশ্রমে আর্য্য-চিকিৎসার উন্নতি কল্পে ব্রতী হয়েন, তাঁহারা যে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সমস্ত ভারত বাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন তাহার সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় শিক্ষিত সমাজে একজন সুপরিচিত লোক। আমরা তাঁহার চিকিৎসা কার্য্যের অভিজ্ঞতায় এবং সদ্‌গুণে এত অধিক সন্তুষ্ট ও বাধ্য হইয়াছি যে প্রাণের সহিত প্রশংসা করিয়াও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। কবিরত্ন মহাশয় বিপুল অধ্যবসায় বা কঠোর পরিশ্রম সহকারে ব্যাকরণ সাহিত্য ও দর্শনাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যথা নিয়মে চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করতঃ প্রায় ১০ দশ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। কলিকাতা ৩৫ নং মানিক তলা ষ্ট্রীট ভবনে একটী ঔষধালয় সংস্থাপন করতঃ স্বীয় তত্ত্বাবধানে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত ও বটিকাদি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীদিগকে দিতেছেন। প্রতিষ্ঠাভাজনও হইয়াছেন। এমন কি এক্ষণে ইনি কলিকাতায় এক জন প্রধান কবিরাজ বলিয়াই পরিগণিত। নাড়ীজ্ঞান, চিকিৎসার সুকৌশল এবং ঔষধাদির অকৃত্রিমতাই শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ। কবিরত্ন মহাশয় আমাদের পরিবারস্থ অনেককে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন। আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াই আমরা সাধারণের অবগতার্থে ইহাঁর সুচিকিৎসার পরিচয় দিতেছি।

আমরা নিয়ত দেখিতেছি কবিরত্ন মহাশয়ের বাহ্যিক আড়ম্বর নাই, বিজ্ঞাপনের হুড়া হুড়ি নাই, বাক্ চাতুরী নাই, কোন কপটতা বা ব্যবসায়ের কায়দা নাই, একারণ তিনি সাধারণের নিকট সম্যক্ পরিচিত না হইতেও পারেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন বা তাঁহার চিকিৎসাধীনে একবার চিকিৎসিত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় কখনই কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইনি একজন সচ্চরিত্র, সুবুদ্ধিমান্, ধর্ম্মশীল ও অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি লোক। এরূপ ন্যায় সঙ্গত ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কবিরাজ বোধ হয় অতি অল্পই আছেন।

কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার নিজ ঔষধালয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আগত সুযোগ্য ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। ৮।১০ জন ছাত্র নিয়ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। পরন্তু অর্থহীন সমাগত রোগীগণকে ইনি উপযুক্ত ব্যবস্থার সহিত বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করেন। ঔষধের মূল্য দিতে অসমর্থ বলিয়া প্রকাশ করিলে তাহার নিকট মূল্য গ্রহণ করেন না। অসমর্থ পক্ষে দর্শনী (ভিজীট) সম্বন্ধেও কোন আপত্তি নাই। স্থূল কথা এরূপ উদারস্বভাব কবিরাজ এ যাবৎ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

কবিরত্ন মহাশয়ের প্রণীত নাড়ীজ্ঞান দীধিতি ও শারীর বিজ্ঞানাদি বৈদ্যক গ্রন্থ দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতেছে। অপিচ অষ্টাঙ্গহৃদয়, দ্রব্যগুণ, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ও ভাব প্রকাশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের প্রধান গ্রন্থ কয়েকখানি বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক অনেককেই সুশিক্ষা প্রদান করিতেছে। আশা করি ইহাদ্বারা আয়ুর্ব্বেদের যশোরাশি ক্রমে আরও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবে।

শ্রীভোলানাথ মিত্র।

সুবোধিনী সম্পাদক।